হিন্দুধর্ম্ম ও সমাজের মুখপত্র

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং ২২০।১৪
শ্রেণী সং
কলিকাতা।

জন্মভূমি

(সচিত্র মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী)।

চতুর্দ্দশ ভাগ-চতুর্দ্দশ বর্ষ।

(১৩১২ সালের শ্রাবণ হইতে ১৩১৩ সালের আষাঢ় মাস পর্য্যন্ত
দ্বাদশ সংখ্যা সম্পূর্ণ)।

কলিকাতা—হাটখোলা দত্তবাটী, ৩৯ নং মাণিক বসুর ঘাট ষ্ট্রীট,
জন্মভূমি কার্য্যালয় হইতে
স্বত্বাধিকারী শ্রীনরেন্দ্রনাথ দত্ত.
ব্রাদার্স কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

CALCUTTA.
Printed By N. Dutt. At The
JANMABHUMI PRESS.
39 MaNick Boses Gaht Street,
1906

বার্ষিক মূল্য ১৷৹ দেড় টাকা।] [ডাঃ মাঃ ।৵৹ ছয় আনা।

জন্মভূমির ১৪শ বর্ষের সূচীপত্র।

সংখ্যা	বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
১।	অদ্বৈতমতের সমালোচনা	শ্রীযুক্ত আশুতোষ দেব এম, এ,	১৩,৬১,
১।১।	অশ্রু মুছাও	...	... ৭৯
২।	অবিনাশ চন্দ্র কবিরত্ন	,, কবিরাজ বারাণসী গুপ্ত বৈদ্যরত্ন	২১৯
৩।	অসার সংসার (পদ্য)	,, অমর নাথ বসু	২২৫
৪।	অভিমান (গল্প)	,, শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	২৭৯, ৩১৮, ৩৭৩,
৫।	আয়ুর্ব্বেদ	,, কবিরাজ গোবিন্দ প্রসাদ রায় কবিরত্ন	২৫০
৬।	আয়ুর্ব্বেদ সমালোচনা	,, তারানাথ চক্রবর্ত্তী	১৪৩, ২৩৫,
৭।	আয়ুর্ব্বেদোক্ত হিতাহার	কবিরাজ বারাণসী গুপ্ত বৈদ্যরত্ন	২০
৮।	আবাহন	,, গোপাল চরণ স্মৃতি-ভূষণ	৭৪
৯।	আশায় নিরাশ	,, ...	১০৪
১০।	আঁধার	,, শ্রীমতী চারু ভাষিণী গুপ্তা	১১৪
১১।	আধুনিক বাংলা সাহিত্য	,, হেমেন্দ্র কুমার রায়	২৪৭
১২।	আবাহন (পদ্য)	,, কৃষ্ণ চন্দ্র কুণ্ডু বি, এ,	৩৩৩
১৩।	আমার বালক	,, বিধু ভূষণ ঘোষ	৪১৮
১৪।	আত্মহত্যা ও আত্মবলিদান	রাজা বিনয় কৃষ্ণ দেব বাহাদুর	৪৪৮
১৫।	উনবিংশ শতাব্দিতে স্ত্রীশিক্ষা	,, যতীন্দ্র চন্দ্র বসু এম, এ,	৮৫
১৬।	উষ্ণ জলের উপকারিতা	,, ডাক্তার হেমচন্দ্র সেন এম, ডি,	৪০৫
১৬।১।	হৃষিকেশ ...	হিমারণ্যবাসী পরিব্রাজক	৪২৪
১৭।	ঋগ্বেদে রমেশচন্দ্র	,, গোপাল চরণ স্মৃতি ভূষণ	৩৮৯
১৮।	কীর্ত্তিমান ও সাধুর কথোপকথন	... ...	১১৫
১৯।	কলিকাতায় যুবরাজ	... ...	২১৪
২০।	কলেরা প্রতিষেধক	,, দেবেন্দ্র নাথ বন্দোপাধ্যায়	২৯৯
২১।	গীত		৬৫, ৩৮৭, ৪৩২, ১১৬,
২২।	গীত	,, মন্মথ মোহন বসু বি, এ,	৩৭
২৩।	গীত	,, মহেন্দ্র নাথ বন্দোপাধ্যায়	১০৪
২৪।	গর্ভিণী বা প্রসূতির খাদ্য	,, বিপ্রদাস মুখোপাধ্যায়	২৫৬
২৫।	গ্রহেরফের (গল্প)	,, নারায়ণ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য	২৩৭
২৬।	চন্দ্রশেখরে বঙ্কিমচন্দ্র	,, গোবিন্দ চন্দ্র রাহা বি, এ,	১১০, ১৫৫
২৭।	চক্রির উপর চক্র	... ...	১৯৭
২৮।	ছবি (পদ্য)	,, কৃষ্ণ চন্দ্র কুণ্ডু বি, এ,	২২৬
২৯।	জনক (পদ্য)	,, অমরনাথ বসু	৪৩৩
৩০।	জন প্রবাদও ইতিহাস	,, যতীশচন্দ্র বসু এম, এ,	২২৯
৩১।	জন্মভূমির বর্ষবৃদ্ধি		

সংখ্যা	বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা।
৩২।	জামাই বাবু (গল্প)	... ...	৪৩৮
৩৩।	তর্পন	,, চন্দ্র নাথ কবিরত্ন	৪১
৩৪।	তেত্রিশ কোটি দেবতা	,, মোক্ষদা চরণ ভট্টাচার্য্য	৫৪
৩৫।	দিবা অবসান (পদ্য)	,, শ্রীমতী জ্যোৎস্নাময়ী ঘোষ	২০৯
৩৬।	ধন (পদ্য)	,, নারায়ণ চন্দ্র বিদ্যারত্ন	১৪৭
৩৭।	ধুলাখেলা (পদ্য)	,, কুমুদ রঞ্জন মল্লিক বি, এ,	১৪২
৩৮।	নিশীথ চিন্তা (পদ্য)	,, বঙ্কিম বিহারী বসু	৩৩৫
৩৯।	নিরাশ প্রণয় (গল্প)	,, নারায়ণ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য	৩৪২
৪০।	নাদযোগ	,, আশুতোষ দেব এম, এ,	১৮৫
৪১।	নারীজাতীর মহত্ব	,, অক্ষয় কুমার ঠাকুর এম, এ,	১৭৯
৪২।	নিয়তি (পদ্য)	,, সতীশ চন্দ্র দত্ত	৩৮০
৪৩।	পরম কল্যাণ গীতা	,, শ্রীমদ্ শিবনারায়ণ স্বামী	১১৭, ২৭০, ৩৭১, ৪০৭, ৪২৯,
৪৪।	পঞ্চতত্ত্বমতে চিকিৎসা	ডাক্তার শ্রীযুক্তহেমচন্দ্র সেন এম, ডি,	৩৮৬
৪৫।	পতিপ্রেমে বঞ্চিতাকামিনী	,, নারায়ণ চন্দ্র বিদ্যারত্ন	২১১
৪৬।	পতিপত্নী (পদ্য)	,, শ্রীমতী জ্যোৎস্নাময়ী ঘোষ	১১
৪৭।	প্লেগ প্রতিষেধক ও চিকিৎসা	,, নিলমনি পাল	৩৪০
৪৮।	পতিতা (গল্প)	,, নারায়ণ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য	২৫
৪৯।	প্রায়শ্চিত্ত (গল্প)	,, কৃষ্ণচন্দ্র কুণ্ডু বি, এ,	৪১৩
৫০।	পূজা প্রসঙ্গে	,, তারক নাথ মুখোপাধ্যায়	৭৭
৫১।	প্রাচীন বৈষ্ণবদিগেরস্মৃতি	,, নগেন্দ্র নাথ সোম	৪০৩
৫১।	পঞ্চ"ম"কার	,, হেমেন্দ্র কুমার রায়	৯৮
৫২।	প্রতিভা	,, হেমেন্দ্র কুমার রায়	৪৩৪,
৫৩।	প্রার্থনা (পদ্য)	,, নারায়ণ চন্দ্র বিদ্যারত্ন	১১৪
৫৪।	প্রেম	,, হেমেন্দ্র কুমার রায়	১৫৯
৫৫।	প্রেততত্ত্ব	,, বিধু ভূষণ ঘোষ	২০৩
৫৬।	বসন্ত পীড়ার মুষ্টিযোগ	,, কবিরাজ মহেশচন্দ্র কবিরত্ন	৩৭৯
৫৭।	বঙ্গবধু	,, শ্রীমতী নগেন্দ্র বালা মুস্তফী	৩৯৪
৫৮।	বর্ত্তমান কনোজ ও বালাপীর	,, ধর্ম্মানন্দ মহাভারতী	২, ৪৯, ১৫০,
৫৯।	বঙ্গীয় সমাজ সমালোচনা	,, ত্রিলোচন চট্টোপাধ্যায়	২৭৪
৬০।	বঙ্গ ভাষা (পদ্য)	,, নগেন্দ্র বালা স্বরসতী	২৫৪

বিষয়	সংখ্যা	পৃষ্ঠা
৬১। বিশুদ্ধ বুকলবৃক্ষ বিলোকনে	,, শ্রীমতী জোৎস্নাময়ী ঘোষ	৪১০
৬২। বিজয়া	... ...	১০১
৬৩। বিষম সমস্যা	,, পরিব্রাজক	৩০২
৬৪। বিরহ (পদ্য)	... ...	৪৪৫
৬৫। বিচিত্র প্রসঙ্গ	... ...	৩০০
৬৬। ব্রজাঙ্গনা	,, শ্রীমতী জ্যোস্নাময়ী ঘোষ	১৫৪
৬৭। ভারতীয় শিল্প	,, তারক নাথ মুখোপাধ্যায়	৩৪৯
৬৮। ভুল (পদ্য)	,, নারায়ণ চন্দ্র বিদ্যারত্ন	৭৩
৬৯। ভালবাসা (পদ্য)	,, শ্রীমতী নগেন্দ্র বালা স্বরসতী	৩৩১
৭০। ভৈরবী (গল্প)	... ...	১২১
৭১। মা	,, সুরেন্দ্র মোহন বসু	১৫৭
৭২। মা আসিতেছেন	,, ঐ	৪৭
৭৩। মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন	... ...	৩৮১
৭৪। মধুর মধু (পদ্য)	,, শ্রীমতী জ্যোৎস্নাময়ী ঘোষ	৩৩৪
৭৫। মৃত্যুর প্রতি (পদ্য)	,, শ্রীমতী চারু হাসিনী গুপ্ত	১৪৮
৭৬। মাতৃ উপাসনা	,, যতীন্দ্র নাথ দত্ত	১৮৯
৭৭। মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গের জন্ম	;, ধর্ম্মানন্দ মহাভারতী	৩৭০
৭৮। গযুল স্বীকারী	... ...	১৬৩
৭৯। যৌবনে যুবক	,, দেবেন্দ্র নাথ মাহিন্ত	৪১০
৮০। শিবে পাগলা	... ...	৬
৮১। শ্রীশ্রীকৃষ্ণের বসন্তোৎসব	,, যতীন্দ্র নাথ দত্ত	২৯০
৮২। শ্মশান (পদ্য)	... ...	৩৩৭
৮৩। সহানুভূতি	,, হেমেন্দ্র কুমার রায়	৫৭
৮৪। সমালোচনা	,,	৩৮, ৮৩, ২২৮, ২৬৮, ৩০৬, ৩৮৮
৮৫। সান্ত্বনা (পদ্য)	,, শ্রীমতী চারু শীলা দাসী	২২৬
৮৬। সোণারবাংলা	নাট্যাচার্য্য গিরীশচন্দ্র ঘোষ	২২২
৮৭। স্বরসতী-বন্দনা	,, ললিত মোহন পাল	২৬৬
৮৮। স্বরসতি স্তোত্রম	,, পূর্ণচন্দ্র দে উদ্ভট সাগর বি, এ,	২৫৫
৮৯। সাধক (পদ্য)	;, কুমুদ রঞ্জন মল্লিক বি, এ,	২৬০
৯০। সাহিত্যালোচনা	... ...	২৬২
৯১। সীতাষ্টক স্তোত্রম্	;, হরিহর ভট্টাচার্য্য	২৯৫
৯২। সাবিত্রী (পদ্য)	,, শ্রীমতী নগেন্দ্র বালা স্বরসতী	৩০৫
৯৩। স্থূলকথা	,, সিদ্ধেশ্বর শর্ম্মা	৩০৯
৯৪। স্বর্গীয় যোগেন্দ্র চন্দ্র বসু	... ...	৬৬
৯৫। হেমন্তকাল	,, সুধন চন্দ্র দে	১৭৪
৯৬। হায় দাদা (পদ্য)	,, শ্রীমতী হেমনলিনী দাসী	৩৮৪

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং
কলিকাতা।

"জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী।"

(সচিত্র মাসিক পত্র ও সমালোচনী।)

১৪শ বর্ষ। | শ্রাবণ, ১৩১২ সাল। | ১ম সংখ্যা।

জন্মভূমির বর্ষবৃদ্ধি।

১৩১২ সালের শ্রাবণ মাস। এই মাসে জন্মভূমির ত্রয়োদশ বর্ষ পূর্ণ হইল, চতুর্দ্দশ বর্ষ আরম্ভ। ত্রয়োদশ ও চতুর্দ্দশ বর্ষ শ্রবণ করিলেই বঙ্গবাসীর হৃদয় এক প্রকার বিস্ময়—হর্ষে পরিপ্লুত হয়; চতুর্দ্দশ বর্ষ—শ্রীরামচন্দ্রের বনবাস। ত্রয়োদশ বর্ষ—পঞ্চ-পাণ্ডবের বনবাস ও অজ্ঞাতবাস। জন্মভূমি নির্ব্বিঘ্নে ত্রয়োদশ বর্ষ অতিক্রম করিল। চতুর্দ্দশ বর্ষান্তে শ্রীরামচন্দ্র রাজা হইয়াছিলেন; চতুর্দ্দশ বর্ষে জন্মভূমির ভাগ্যে কিরূপ ফল লাভ হইবে বিধাতাই তাহা জানেন। আমরা এই বর্ষ বৃদ্ধির উল্লাসে জগদীশ্বরকে প্রণিপাত করিয়া জন্মভূমির গ্রাহক অনুগ্রাহক ও হিতৈষী মহাশয়গণের করুণা ভিক্ষা করিতেছি।

বর্ত্তমান কনোজ ও বালাপীর।

লেখক,—শ্রীধর্ম্মানন্দ মহাভারতী।

(প্রথম প্রস্তাব)

যে সকল ঈশ্বরভীরু ও ধর্ম্মপ্রবণ পুরুষ ধনমদ, বিদ্যামদ ও যৌবনমদের অসারত্ব, মানবজীবনের চপলতা, পার্থিব সুখের অনিত্যতা, পরাক্রম ও প্রভুত্বের নশ্বরতা এবং নলিনীদলগত সলিল কণার ন্যায় সংসারের চঞ্চলতা দর্শন করিয়া বৈরাগ্যবিগলিত-হৃদয়ে মোক্ষপথের অন্বেষণ করিতে চাহেন, আমি তাঁহাদিগকে পশ্চিমোত্তর প্রদেশান্তর্গত ইতিহাসপ্রসিদ্ধ কনোজ নগরে প্রবেশ করিয়া এই মহা-সমৃদ্ধিসম্পন্ন সুপ্রাচীন স্থানের বিষাদময় ভগ্নাবশেষ রাশিকে অবলোকন করিতে অনুরোধ করি। যাঁহারা মনে করেন, দুগ্ধফেননিভ সুকোমল কুসুমশয্যায় শয়ন এবং সুবর্ণ বা রজতপাত্রে রসনাতৃপ্তিকর বহুবিধ আহার্য্যকে গলাধঃকরণ ভিন্ন মানব-জীবনের আর কোন উদ্দেশ্য নাই; যাঁহারা মনে করেন যথেচ্ছামত জীবনযাপন, ঈশ্বরকে বিস্মরণ, পরলোককে উপেক্ষা অথবা দেহের অজরত্ব ও অমরত্ব সম্পর্কে ভ্রমাত্মক বিশ্বাস পোষণপূর্ব্বক মৃত্যুকে স্মরণ না করাই জীবের সুখ, এতাদৃশ প্রাকৃতিক ভবমায়া-বিভ্রান্ত-হতভাগ্য-ব্যক্তিকে সঙ্গে লইয়া আমি ভগ্নভীতি সঙ্কুল কনোজ নগরে প্রবেশ করিতে আশঙ্কা করি। কনোজের বর্ত্তমান দুরবস্থা এরূপ ব্যক্তির পক্ষে বিশেষ শিক্ষার ও চৈতন্যের সহায় হইতে পারে, ইহা ধ্রুব সত্য। আমি যখন কনোজে প্রবেশ করিয়াছিলাম তখন বাসন্তীয় অনিলের সুখময় প্রবাহে নবশক্তি লাভ করিয়া এক মনোহর তরুবরের নবপল্লবাবৃত শাখা হইতে একটী কোকিল ডাকিতেছিল—কুঃ কুঃ কুঃ। আমি উৎফুল্ল পিকবরের এই দিক্‌দিগন্ত মোহনকারী গুরুগম্ভীর স্বরের অর্থ তখন বুঝি নাই; কনোজে প্রবেশ করিয়া, কনোজ নগর দর্শন করিয়া, বুঝিলাম এই সংসারের সকলই কু, সকলই কু, সকলই কু। পাঠক মহাশয়! আসুন, আমি আপনাকে ঐ জগৎপ্রসিদ্ধ কনোজধামের অভ্যন্তরে লইয়া গিয়া সংসারের অনিত্যতা দেখাইয়া ও বুঝাইয়া দিই।

পরিব্রাজকেরা ই, আই, রেলওয়ের কানপুর ষ্টেশনে অবতরণ করিয়া অশ্ব-শকট-সাহায্যে অথবা পদব্রজে সার্দ্ধেক ক্রোশ দূরে আলোয়ারগঞ্জ নামক স্থানে গমন করেন, তথায় বি, বি, সি, আই রেলওয়ের গাড়ীতে আরোহণ করিয়া সার্দ্ধ চারি ঘণ্টায় কনোজ পৌছিতে পারেন। কনোজ নগর, কনোজ রেলওয়ে ষ্টেশন হইতে

প্রায় তিন মাইল দূরে অবস্থিত। ষ্টেশনে অবতরণ করিয়াই আমরা গোলাপজল, বিবিধপ্রকার আতর, কস্তুরী, সুগন্ধি দ্রব্য, পুষ্পনির্য্যাস প্রভৃতির আঘ্রাণে মোহিত হইয়া গেলাম। অনুসন্ধানে জানা গেল, অতি প্রাচীনকাল হইতে এই নগরে অসংখ্য প্রকার সুগন্ধির কারখানা চলিয়া আসিতেছে এবং এই সকল সুগন্ধি সমগ্র ভারতে পৃথিবীর নানাস্থানে প্রতিদিন প্রচুর পরিমাণে প্রেরিত হইয়া থাকে। রেলওয়ে ষ্টেশন নির্ম্মিত হইবার পর হইতে রেলওয়ে শকট সাহায্যে প্রেরণ ক্রিয়া সম্পাদিত হয়; প্রতিদিন ষ্টেশনপ্রাঙ্গনে রাশি রাশি পার্শেল জমা থাকে। এক সময়ে সেই নগরে পঞ্চবিংশ সহস্রাধিক পুষ্পোদ্যান ও প্রায় এক লক্ষাধিক সুগন্ধির আপণ ছিল, এক সময়ে চল্লিশ সহস্র তাম্বুল বিক্রেতা এখানে পর্ণ বিক্রয় করিত; দ্বাদশ সহস্র পণ্ডিত, অশীতি সহস্র যোদ্ধা, তিন লক্ষাধিক অট্টালিকা, ত্রিংশ সহস্র দেবমন্দির, একাদশ সহস্র মণি-মাণিক্যের দোকান, এক সহস্রাধিক সঙ্গীতাশ্রম এবং ছয় সহস্র চতুষ্পাঠী বর্ত্তমান থাকিয়া এক সময়ে এই ইতিহাস প্রসিদ্ধ নগরকে শোভা ও সমৃদ্ধির আকর করিয়া তুলিয়াছিল। পঞ্চাশ সহস্র নর্ত্তকী নৃত্য করিয়া নগর-বাসীদিগকে আমোদিত করিত। এখন এই নগরের চারিদিক কেবল রাশি রাশি ভগ্ন প্রস্তর ও ইষ্টকের কুদৃশ্যে পরিপূর্ণ! যে নগরে এক সময়ে রাজা ও ধনবান গৃহস্থেরা হীরা, রত্ন, প্রবাল প্রভৃতি ভস্ম করিয়া তাম্বুলের সহিত চূণের পরিবর্ত্তে ব্যবহার করিত, এখন সেই নগরের সর্ব্বত্র এক মুষ্টি অন্নের জন্য কাতর হইয়া শত শত ভিখারী অশ্রুবর্ষণ করিতে করিতে চীৎকার করিয়া বেড়াইতেছে। যেখানে হস্তি, উষ্ট্র ও অশ্বের পদভরে ভূমি কাঁপিত, যেখানে রথবাহী হয়বৃন্দের হ্রেষারবে দিক্‌দিগন্ত প্রতিধ্বনিত হইত, আজি কালি সেখানকার অনেক লোকে মাতঙ্গ বা তুরঙ্গ কিরূপ পশু তাহা জানে না। কালের কি আশ্চর্য্য প্রভাব! তাঁহাতেই কহিতেছিলাম—

নলিনী-দলগত-জলবৎ তরলং
তদ্বৎ জীবন-যৌবনমতিশয় চপলং॥

আমরা আলোয়ারগঞ্জ হইতে কনোজ আসিবার সময় পথিমধ্যে পূততোয়া জাহ্নবী-তীরবর্ত্তী বিঠুর গ্রাম দর্শন করিয়াছিলাম; বিঠুরের অপর নাম ব্রহ্মবর্ত্ত; বহুসংখ্যক যাত্রী এ স্থানে স্নান করিবার জন্য আসিয়া থাকে। সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাসপ্রসিদ্ধ-নায়ক বাবা নানা সাহেব ও কুমার সিংহ এতদুভয়ের প্রধান আড্ডা বিঠুরেই অবস্থিত ছিল। এই স্থান হইতে নানা সাহেব অদৃশ্য হয়েন এবং কুমার সিংহ গঙ্গাতটে ভবলীলা সম্বরণ করেন। আলোয়ারগঞ্জ হইতে কনোজের দিকে

দুই একটা রেলওয়ে ষ্টেশন অতিক্রম করিলে একটি ক্ষুদ্র শাখা রেল লাইন দৃষ্টিগোচর হয়, উহা বিঠুরের হিন্দু সুবেদার সাহেব বাহাদুর কর্ত্তৃক নির্ম্মিত, এক লাইন দিয়া বিঠুর যাইতে হয়। যাহা হউক আমরা যখন কনোজ ষ্টেশনে অবতরণ করিলাম তখন মধ্যাহ্নকাল; গ্রীষ্ম-ঋতুতে পশ্চিমোত্তর প্রদেশে মধ্যাহ্নকাল কিরূপ ভয়ানক অনেকে তাহা অবগত আছেন। কনোজের ষ্টেশন মিরাসরাই নামে এক প্রাচীনা পল্লীতে অবস্থিত, এখানে যাহা কিছু আহার্য্য দ্রব্য প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহাতে একজন বাঙ্গালী-ভদ্রলোকের একবেলা অথবা (অতি কষ্টে) দুইবেলা যাপিত হইতে পারে কিন্তু তদপেক্ষা অধিক সময় কাটান যায় না। ষ্টেশনের বাম পার্শ্বে দেওয়ানী (মুন্সেফী) কাছারী, দক্ষিণ পার্শ্বে জিয়র নগরের রাজার বিশ্রামাগার। আমি যে সময়ে কনোজে গিয়াছিলাম তথায় তখন একজন মাত্র বাঙ্গালী ছিলেন, এই বাঙ্গালী ভদ্রলোক মুন্সেফের কার্য্য করিতেন। সম্মুখে (পথপার্শ্বে কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দোকান এবং গবর্ণমেণ্ট বাহাদুরের ব্যয়ে নির্ম্মিত একটি কূপ ও সামান্য পান্থশালা দৃষ্ট হয়। আমরা মধ্যাহ্নকাল ষ্টেশনপ্রাঙ্গনে যাপন করিয়া অপরাহ্ণে এক্কা-নাম্নী গাড়ীযোগে কনোজ নগরাভিমুখে প্রয়াণ করিলাম। প্রশস্ত পথপার্শ্বে তহশীলদারের কাছারী, সরকারী আবকারী আড্ডা, রেজেষ্ট্রী আফিশ, ডাকখানা, চৌকি, মস্তান খাঁ সাহেবের উদ্যান এবং কতকগুলি প্রাচীন অট্টালিকার ভগ্নাবশেষ দেখিয়াছিলাম। কনোজে উপস্থিত হইয়া আমরা মস্তান খাঁএর সরাই নামক পান্থশালায় অবস্থান করিলাম প্রায় অর্দ্ধশত বর্ষ কাল পূর্ব্বে মস্তান খাঁ নামক এক পাঠান বিবিধ কারণে ধনবান ও পরাক্রমী হইয়া উঠিয়াছিল, ঐ ব্যক্তি তাহার উপার্জ্জিত অর্থরাশি মধ্যে কিঞ্চিৎ অর্থব্যয় করিয়া সাধারণের উপকারার্থে একটা উদ্যান ও একটা পান্থশালা প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিল, ঐ উদ্যান "মস্তানবাগ" এবং ঐ পান্থশালা "মস্তান সরাই" নামে খ্যাত। পান্থশালায় অবস্থান করিলে পথিকদিগের নিকট হইতে প্রতিদিন দেড় আনা হিসাবে শুল্ক আদায় করা হইয়া থাকে। কনোজে গ্রীষ্মকালে জলকষ্ট হয়, বিশেষতঃ সরাইয়ের পথিকদিগকে দূরবর্ত্তী স্থান হইতে জল আনিতে বা আনাইয়া লইতে হয়। পান্থশালার মধ্যে যে কূপ আছে তাহার জল এমন লবণাক্ত যে তাহা পানের যোগ্য নহে। বস্তুতঃ সকল ঋতুতেই কনোজে নানা প্রকারের অসুবিধা আছে। এক সময়ের অপূর্ব্ব সৌখীন কনোজ সহর এক্ষণে পথিকের পক্ষে বিরক্তির উৎপাদক স্থানরূপে পরিগণিত!! সুখের কনোজ—বিলাসের কনোজ—ধনধান্য পরিপূর্ণ কনোজ—এক্ষণে বিদেশী পথিককে স্থান দিতেও অসমর্থ! কনোজের চারিদিক এখন মরুভূমিবৎ

বর্ত্তমান। কনোজ নগর ফরক্কাবাদ জিলার একটা তহশীল (মহকুমা); নগরের মধ্যে থানা, স্কুল, ডাকঘর, হাট, বাজার, বহুসংখ্যক মন্দির এবং স্বর্ণকার ও সুগন্ধিকারের দোকান—মালা দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। নগরের যে দিকেই অবলোকন করি সেই দিকেই ভগ্নস্তূপ দেখিতে পাই, সমগ্র নগরটা ভগ্নাবশেষে পরিপূর্ণ। প্রাচীনকালের অসংখ্য অট্টালিকা ও মন্দির একেবারে চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া গিয়াছে; কোথায় ভগ্নাবশেষ আছে, কোথাও চিহ্ন পর্য্যন্ত নাই। নগরের মধ্যে এখনও অতি পুরাকালের কতকগুলি গেট্ (ফাটক) দেখা যায়, তাহার দ্বারা বুঝা গেল প্রাচীন সময়ে এই নগর ভিন্ন ভিন্ন অংশে বিভক্ত ছিল এবং সহজে আক্রমণকারী শত্রুসেনা ইহাতে প্রবেশ করিতে পারিত না। সহরের চারিদিকে ইষ্টক ও প্রস্তর নির্ম্মিত উচ্চ এবং সুদৃঢ় প্রাচীর ছিল, এখন স্থানে স্থানে তাহার চিহ্নমাত্র দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে।

কনোজ নগরের মধ্যবর্ত্তী স্থানে ফুলমতী নামে এক প্রাচীনা দেবীমূর্ত্তি ও তাঁহার মন্দির আছে, আমরা তাহা দর্শন করিয়া হিন্দুরাজাদিগের কেল্লা (দুর্গ) দেখিতে গেলাম। এই সুপ্রাচীন দুর্গ কতদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল তাহা ঠিক বলা যায় না। যেদিকে যতদূর দৃষ্টি চলে সেদিকে ততদূর পর্য্যন্ত দুর্গের ভগ্নরাশি। দেখিতে পাই; ইহাতেই পাঠকেরা প্রাচীন কনোজের আয়তন বুঝিয়া লইতে পারেন। কেবল ইষ্টক ও প্রস্তর ভিন্ন কেল্লার আর কিছু দেখিবার নাই, বোধ হয় ত্রিংশ বর্ষ পরে তাহাও থাকে কি না সন্দেহ,ক্রমে ক্রমে বহু স্থানের চিহ্ন পর্য্যন্ত লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। দুই একটা স্থানে দুই একটা স্তম্ভ এবং কতিপয় স্থানে সুদৃঢ় প্রাচীর দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। ক্ষুদ্রাকার ইষ্টকগুলি দেখিলে পুরাকালের ইট গঠনপ্রণালী বুঝা যাইতে পারে। দুর্গের অভ্যন্তরে এক শতাধিক সরোবর ও দ্বিশতাধিক কূপ ছিল, এখন তাহার কিছুই নাই; কেবল একটা কূপ একজন মুসলমান ফকির অধিকার করিয়া আছে। ঐ কূপের জল নির্ম্মল, শীতল, সু-স্বাদু ও স্বাস্থ্যপ্রদ। কেল্লার ভিতর নাট্যশালা, রাজপ্রাসাদ, অস্ত্রালয়, শাস্ত্র-শিক্ষাগার, সেনা-নিবাস, দেবমন্দির, মল্লভূমি, যোদ্ধাদিগের পরিচ্ছদ প্রস্তুত করিবার কার্য্যালয়, পশ্বালয়, বিবিধ প্রকার অস্ত্র প্রস্তুত করিবার কারখানা প্রভৃতি বর্ত্তমান ছিল। দুর্গের চারিদিকের সুপ্রশস্ত ও সুদৃঢ় দ্বার সমূহ চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া গিয়াছে, দুই এক স্থানে কিছু কিছু চিহ্ন অদ্যাপি বিরাজমান দেখা যায়। কেল্লার বহুস্থানে এখন কৃষি কার্য্য চলিতেছে এবং অনেক স্থানে লোকের বসৎবাটী নির্ম্মিত হইয়াছে। কনোজের হিন্দু নরপতিগণ বিশেষ ধনবান, বলবান, সাহসী, শিক্ষিত, পরাক্রমী

এবং সমর-নীতিবিশারদ ছিলেন। তৈমুরলঙ্গ, আলাউদ্দীন, মহম্মদ ঘোরী প্রভৃতি দুর্বৃত্ত ম্লেচ্ছ দস্যুগণকে দমন করিবার জন্য যে সকল ধাৰ্ম্মিক হিন্দু নরপতি অগ্রসর হইয়াছিলেন, কনোজের রাজবংশ তাঁহাদের অগ্রগণ্য। লুণ্ঠনপ্রিয়, কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞানশূন্য যবন ডাকাইতেরা যখন হিন্দুর সুপবিত্র সোমনাথ মন্দির ভঙ্গ করিতে অগ্রসর হইতেছিল, কনোজের মহাবলী অশেষ গুণভূষণ হিন্দু রাজা সর্ব্বপ্রথমে ধন, ধান্য ও সেনা লইয়া তাহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিয়াছিলেন। কনোজ নগরে কখনও যবনের প্রভুত্ব ছিল না; দিল্লীর সম্রাট প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল বটে কিন্তু তাহাতে কনোজের হিন্দু প্রভুত্ব ও হিন্দুধৰ্ম্মপ্রভাব কমে নাই। সুপবিত্র কনোজে এখনও সনাতন হিন্দু আর্য্যের সংখ্যাই অধিক, অনার্য্য ম্লেচ্ছের সংখ্যা অতি অল্প। যে কয়েকটা অবস্থাপন্ন মুসলমান এখানে বাস করে তাহাদের সংখ্যা অঙ্গুলি দ্বারা গণনা করা যায়। ইহাদের অধিকাংশ হিন্দুর বেতনভোগী কৰ্ম্মচারী। কিন্তু সুবিধা পাইলে অন্নদাতা প্রভুর গলদেশে ছুরিকা প্রয়োগ করিতে অথবা তাহার ধৰ্ম্ম ও যশ নাশ করিতে বিস্মৃত হয় না।

(ক্রমশঃ)

শিবে—পাগ্‌লা।

উৎকল-দুর্ভিক্ষের নিমিত্তভাগী অভিনেতা বীজন সাহেবের যখন বাঙ্গালার লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণরী পদ হইতে অবসর গ্রহণ করেন, তাহার কিছু পূর্ব্বে এতৎ-নগরের চোরবাগানে সিদ্ধেশ্বরীতলার—সন্নিকটে জগদীশঠাকুর নামে এক ব্রাহ্মণ থাকিত। সন্নিকটে বটে, কিন্তু কোথায় তাহার আবাস ছিল, কেহই তাহা ঠিক জানিতনা।

জগদীশ প্রতিদিন উষাকাল হইতে রাত্রি ১০টা ১১টা পর্য্যন্ত সিদ্ধেশ্বরীর মন্দিরের পূর্ব্বভাগে বসিয়া, নয়ন মুদিয়া জপ করিত। গলায় জবাফুলের মালা ললাটে চিনের সিন্দুরের দীর্ঘ ফোঁটা, হস্তে একগাছি লৌহ বলয়। শাক্ত সন্ন্যাসীর ন্যায় আচার কিন্তু বেশভূষা সাধারণ সন্ন্যাসীর মত ছিল না। অঙ্গে ভস্ম মাখিত না, মাথায় জটা রাখিত না, গৈরীক অথবা পশু চর্ম্ম পরিধান করিত না, আংটা ধারী হইয়া গাঁজাও খাইত না। তাহার পরিচ্ছদ এক প্রকার নূতন ছিল। শাল-

পত্র, কদলীপত্র, বাদামপত্র, এবং বংশীবট পত্র শুষ্ক করিয়া, একসঙ্গে শেলাই করিয়া কটি দেশে জড়াইয়া রাখিত। গলায় পৈতা ছিল, সেই লক্ষণে লোকেরা তাহাকে ব্রাহ্মণ বলিয়া স্থির করিত। মাথায় জটা ছিলনা, তাহার একটি হেতুবাদ আমরা এইরূপ পাইয়াছি যে, লোকটির সমস্ত মস্তকে টাক ছিল, জটা রাখিবার স্থান ছিল না; গোঁফ দাড়িও রাখিত না; ইহাকে কিন্তু কদাকার দেখাইত না। কলেবর শ্যামবর্ণ, চারি হস্ত দীর্ঘ আকার কিছু কৃশ, সম্মুখের তিনটি দাঁত কিছু উচ্চ উজ্জ্বল।

জগদীশ ঠাকুর উষাকাল হইতে রাত্রি এক প্রহর দেড় প্রহর পর্য্যন্ত কালী মন্দিরে থাকিত, কখন কি আহার করিত, কখনই বা প্রকৃতি সতীর আজ্ঞানুসারে মানবের নিত্যক্রিয়া সমাধান করিত, কেহই তাহা বলিতে পারে না; দুই একজন বৃদ্ধ বলেন, তাহা জানিবার কোন উপায় ছিল না। কারণ তাঁহারা এক একবার চক্ষে দেখিয়াছেন, সমস্ত রজনীই জগদীশ ঠাকুর কালী মন্দিরের নিম্ন সোপানে বসিয়া কালী কীৰ্ত্তন গান করিতেছে। এই প্রমাণে বুঝা যায়, জগদীশ ঠাকুর সকল রাত্রে কোথায় যাইত, সকল রাত্রে শয়ন করিত না, সকল রাত্রে নিত্য ক্রিয়া সমাধানের অবসরও রহিত না। স্বভাবের বেগ ধারণে তাহার অভ্যাস হইয়াছিল।

সিদ্ধেশ্বরীর মন্দিরে এই বিচিত্র লোকটি নিত্য নিত্য কি কি কার্য্য করিত, তাহাও একটু জানা আবশ্যক। জপ করিত, চক্ষু বুজিত, চুপ করিয়া বসিয়া থাকিত, এই তিন কার্য্য ছাড়া কালী তলায় জগদীশের আরও কতকগুলি ভাল ভাল কার্য্য ছিল। তন্মধ্যে একটি চমৎকার কার্য্য এইখানে আমরা বলিব। মায়ের সম্মুখে যখন ছাগবলি হইত, জগদীশ সেই সময় ছুটিয়া গিয়া সর্ব্বশরীরে পাঁঠার রক্ত মাখিত; পাঁঠার রক্তে গড়া গড়ি দিয়া কালী কালী শব্দে রাম প্রসাদী গীত ধরিত। একটু পরেই আবার ছাড়িয়া উঠিয়া, কালী কালী বলিয়া, বাহু তুলিয়া নৃত্য করিত; মহা যোগীদের যেরূপ ভাব আইসে, নৃত্য করিবার সময় জগদীশের শরীরেও প্রায় সেই রূপ ভাব দেখা দিত। জগদীশ অচেতন হইত না, কিন্তু যাহাকে প্রকৃত জ্ঞান বলে, সে বস্তুটি ক্ষণেকের জন্য চলিয়া যাইত। মনের উল্লাসে, সেই ভাবের মহবশে, জগদীশ ঠাকুর দুইহাতে পাঁঠার—রক্ত চাটিয়া চাটিয়া পান করিয়া ফেলিত! এক রাত্রে জগদীশ ঠাকুর—কেমন এক প্রকার ভাবের বশে উলঙ্গ হইয়া, মন্দিরের—দিকে মুখ ফিরাইয়া, কীৰ্ত্তন গাইতে গাইতে উন্মত্তবৎ হইয়া যাইত।

সেই সকল লক্ষণ দেখিয়া পল্লিবাসী অন্য লোকেরা জগদীশকে পাগল স্থির করিয়াছিল। বেশী কথা কি, সেই মন্দিরে যাঁহারা পূজা করেন, সেই সকল ভট্টাচার্য্য মহাশয়েরাও সেই পরমভক্ত জগদীশ ঠাকুরকে সত্য সত্য পাগল বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন। আরাম করিবার জন্য যত্ন করিয়া তাঁহারই জগদীশের বাম হস্তে লৌহ বলয় পরাইয়া দিয়া ছিলেন।

তদবধি জগদীশ ঠাকুরের নাম হইল শিবে পাগলা। হায় হায় হায়! শিবে পাগলার তুল্য পাগল হইবার অভিলাষে কত শত সাধু পুরুষ, কত শত সাধনা করেন, সেই শিবে পাগলাকে সামান্য একটা চোর বাগানের পাগল বলিয়া সামান্য লোকেরা উপহাস করিত, সিদ্ধেশ্বরীর পূজক মহাশয়েরা তাহাতে আহুতি দিলেন, বড় আশ্চর্য্য ব্যাপার!!!

কালীতলার সন্নিকটে তখন কতকগুলি সামান্য সামান্য বিলাসিনীর—কুটীর ছিল, কুৎসিত কুৎসিত বিলাসিনীরা সেই সকল কুটীরে অবস্থান করিত, শিবে পাগলা তাহাদের সেই সকল জঘন্য কুটীরে তামাসা করিতে যাইত। বিলাসিনীরা তাহাকে পাগলা পাগলা বলিয়া হাস্য করিত, ও করতালি দিত, পাগলকে রম্ভা খাওয়াইত; সন্দেশ খাওয়াইত অনেক রকম আদর করিত। পাগলাও অকৃতজ্ঞ ছিল না, গোপনে তাহাদের হস্তে সিকি, আধুলী (মধ্যে মধ্যে টাকাও) প্রদান করিয়া আসিত। পাগল মানুষ, টাকা পাইত কোথায় এই তর্ক লইয়া বিলাসিনী দলে একটা গোল উঠিল। কেহ বলিল, ভিক্ষা করে; কেহ বলিল, কালী তলায় নমস্কারী পাইত; কেহ বলিল, ছলের পাগল; কেহ কেহ বলিল, তবে হয়ত চোর—?

যে দলে যে প্রকার গোল উঠুক, পল্লিবাসী প্রাচীনের মুখে কথিত আছে, পাগলার অনেক টাকা ছিল। গোপনে গোপনে পাত্র বিশেষে পাগলা কিছু কিছু সৎকার্য্যে দান করিত। কোনও লোকের মলিন বদন, মলিন বসন, রুক্ষ কেশ দর্শন করিলে পাগলা তাহার নিকটে গিয়া, একটু সংগোপনে লইয়া, পরিচয় জানিত, বাসস্থান জানিয়া লইত, অবস্থা জিজ্ঞাসা করিত, বর্ণনা সত্য বোধ হইলে পাগলা তাহাকে ১০৲ দশ টাকা বিশ টাকা বিনাসুদে ধার দিত; অবস্থা ভাল হইলে সেই লোক যদি ধর্ম্ম ভাবিয়া সে ঋণ পরিশোধ করিত, তবেই পাগলার টাকা গুলি ঘরে আসিত,

* এই প্রসঙ্গে একটি আশ্চর্য্য গল্প আছে। সত্য মিথ্যা ধর্ম্ম জানেন, কিন্তু অনেকের মুখে শুনা যাইত, প্রতারক খাতকেরা কালী তলার রাস্তা ছাড়িয়া অন্য পথে যাইলেও রাস্তার মোড়ে মোড়ে শাল পাতা পরা শিবে পাগলকে দেখিতে পাইত। শিবে পাগলা হাসিত, খাতক মুখ ফিরাইয়া অন্য পথে পালাইত; সে পথেও সন্মুখে দেখিত, সেই রকম সহাস্যমুখ মুর্ত্তিমান শিবে পাগলা!

এমন একটা নহে; শুনা যায়, শিবে পাগলার ঐ রকম বিশ পঁচিশটা খাতক ছিল; তাহাদের—মধ্যে কেহ কেহ এত দূর ধর্ম্ম ভীরু যে, তাহারা শিবে পাগলার—ভয়ে কালীতলা দিয়া পথ চলা বন্ধ করিয়াছিল?

শিবে পাগলার অনেক গুলি টাকা ঐ রকমে নষ্ট হইয়াছিল। টাকার শোকে শিবে পাগলার মুখ এক দণ্ডও কেহ বিষণ্ণ দেখে নাই। শিবের যেমন জপ করা, তপ করা, রক্ত মাখা, রক্ত খাওয়া, নৃত্য করা গান করা ইত্যাদি নিত্য অভ্যাস, শিবের তাহা সমস্তই ঠিক ছিল, টাকার শোকে আসল কার্য্যের কিছু মাত্র ব্যতিক্রম ঘটে নাই।

সিদ্ধেশ্বরীর প্রতি শিবে পাগলার অন্তরে অচলা ভক্তি ছিল; কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে, শিবে পাগলা একদিনও স্বয়ং মায়ের পাদ পদ্মে পুষ্পাঞ্জলি সমার্পন করে নাই, লোকে যেমন কপালে হাত তুলিয়া নমস্কার করে, শিবু সে রকম একটা সামান্য নমস্কারও ব্রহ্মময়ীর চরণে অর্পণ করে নাই, ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিতে ত দৈবাৎ একদিনও কেহ চক্ষেই দেখে নাই!

এ রহস্যের প্রকৃত হেতু কি? সে বিষয়ের তত্ত্ব তুলিতে নাই। সাধক ভিন্ন সাধকের নিজের মনোভাব আর কাহার জানিবার অধিকার নাই। এখন শিবে পাগলার শেষ দশায় কি গতি হইল, দেখা যাউক।

যে রাত্রে শিবে পাগলার দেহ লীলার অবসান হয়, সেই রাত্রেই আগত হইবার কিছু পূর্ব্বে সন্ধ্যাকালে স্বভাব সিদ্ধ সমান উল্লাসে মা কালীর সম্মুখে সংকীর্ত্তন করিয়াছিল; সে রাত্রে শিবে মাকে ছাড়িয়া কুত্রাপি যাইতে পারে নাই। মন্দিরের সোপানে বসিয়া বসিয়াই সচ্ছন্দে পঞ্চত্ব প্রাপ্তি। প্রভাতে সর্ব্ব প্রথমে যে মন্দিরের দরজা খোলে; সে আসিয়া সিঁড়িতে দেখিল, শিবে পাগলা অজ্ঞান; পরীক্ষায় জানিল মৃত্যু। ভয় পাইয়া লোক ডাকিতে ছুটিল, লোক লইয়া ফিরিয়া আসিয়া দেখিল, শিবের দেহ সেখানে আর নাই!!! হঠাৎ যেন দৈববাণীর ন্যায় এক দূর ধ্বনি আসিয়া কাণের কাছে বলিতেছে, "মা কালীর সঙ্গিনীরা সে দেহটি কোথায় উড়াইয়া লইয়া গিয়াছে, মানুষ হইয়া কেন তাহার—সন্ধান কর!!!"

ভয়ে কি করে, মহা সংশয়ে মা কালীর সেবক ক্ষণকাল হতবুদ্ধি হইয়া রহিল। দরজা খোলার কার্য্যটা—বিস্মৃতি গর্ভে ডুবিল, ভাবিল হয়ত দায়ীত্বটা তাহারই মাথায় পড়িবে। কেননা, সে ভিন্ন আর কেহ কালী মন্দিরে শিবে পাগলার মৃতদেহ দেখে নাই; তাহার মুখে যাহারা শুনিয়াছিল, কাণ্ড দেখিয়া তাহারাও অবাক।

যে শুনিবে, তাহাকেই অবাক হইতে হইবে। কত লোক কত কথা কহিল, "ভূত হইয়া উড়িয়া গিয়াছে" বিশ্বাসী লোকেরা এত বড় শক্ত কথাটা বলিতেও কুণ্ঠিত হইল না। বাস্তবিক সেই অদ্ভুত রহস্যটা যে কি, দেহ অদর্শনের পর দশ বৎসরের মধ্যেও শিবে পাগলার অস্তিত্বের কোন নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই।

একটি কথা বলিয়া উপসংহার করা হউক। একটি অতি প্রাচীন প্রবীণ ভদ্রলোক গল্পচ্ছলে এই কথাটি ব্যক্ত করিয়া ছিলেন। সিদ্ধেশ্বরীর তলার নিকটেই তাঁর বাস। তিনি কোন প্রকার বিশ্বস্ত সূত্রে জানিতে পারিয়া ছিলেন, শিবে পাগলার টাকা ছিল, সে কথা সত্য। যে গুলি যাইবার গেল, অবশিষ্ট যাহা কিছু সঞ্চিত ছিল, একটি অবীরা স্ত্রীলোক তাহা প্রাপ্ত হইয়াছে। সেই অবীরা স্ত্রীলোক আপনার অবকাশ কালে, পাগলের অবকাশ—কালে, ঝামাপুকুরের একখানি ক্ষুদ্র কুটীরে—পরমযত্নে পাগলের সেবা ভক্তি করিত। সেই যত্নে মুগ্ধ হইয়া জাপক পুরুষ ঐ অবীরাকে সঞ্চিত অর্থ গুলি দান করিয়া গিয়াছেন। আহা শিবেরে! তোর মতন পাগল হইতে আমাদেরও সাধ হয়!

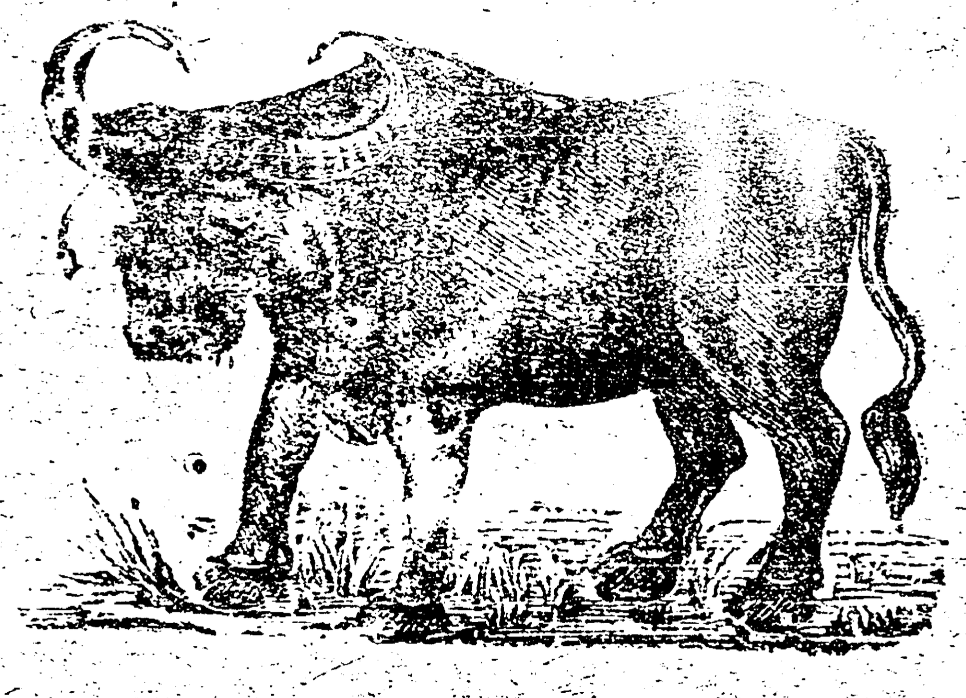

পতি-পত্নী।

(জীবন-সঙ্গিনী—শ্রীমতী মণিমালার প্রতি।)

পতি-পত্নী, দুই দেহ;—অভিন্ন হৃদয়;
পতি বপুঃ পত্নী তার বিম্বরূপা হয়।
পতি নিত্য পূজনীয়—প্রমদার কাছে;
পতি-তুল্য-রত্ন তা'র আর কিবা আছে?
পতি বিনা অন্য-গতি নাহি অবলার,
পতি ইষ্টদেব,—ইথে সংশয় কি আর!
পতি সর্ব্ব-দেব-ময়, এ কথা নিশ্চয়;
পতি-পদ-অর্চ্চনায় সর্ব্ব-সিদ্ধি হয়।
পতি-সেবা, গুরু-সেবা হ'তে উচ্চ জানি;
পতি সবা-হ'তে পূজ্য;—এই উক্তি মানি।
পতি, সাধনার ধন;—হৃদয়-রঞ্জন;
পতি হ'তে মিত্র বল, আছে কোন জন?
পতি-মুখে প্রিয়-বাক্য অমৃত সোসর;
পতি-ওষ্ঠ-গত-হাস্য মনো মোহকর।
পতি-সহবাস আর ব্রহ্মে অবস্থান,
পতি-প্রাণা, এই দুই, করে তুল্য-জ্ঞান।
পতি যদি দয়া-ধর্ম্ম-জ্ঞান-হীন হয়,
পতিব্রতা তবু তাঁরে গণে গুণময়।
পতি-সহ বন-বাস,—সে ও সুখকর,
পতি পূজি' শান্তি লভে, সতী নিরন্তর।
পতি যদি মন্দ-ভাষে, তবু সতী-নারী
পতি-রতা রহে সদা,—নারী-ধর্ম্ম-স্মরি'।
পতি যদি হয় অন্ধ, খঞ্জ-কুব্জ-কায়,
পতি-প্রাণা হেরে তাঁরে কন্দর্পের প্রায়।
পতি-প্রতিবিম্ব নারী প্রেমাঙ্গী তা গানে;
পতি, সতী-গতি জ্ঞানে গুরু বলি' মানে।

পতি না খাইলে অন্ন, পত্নী নাহি খায় ;
পতি নিদ্রাগত হ'লে প্রিয়া নিদ্রা যায়।
পতি জাগরিত হ'লে, রহে সেবা-রত ;
পতি-পত্নী-ভাব এই,—নহে অন্য মত।
পতি ল'য়ে সাবিত্রী-দ্রৌপদী-সীতা বনে,
পতি-সেবা ক'রেছিল শিষ্ট-আচরণে।
পতি-মুখ হেরি' সবে, ভুলেছিল দুখ ;
"পতি" শব্দ শ্রুতি মাত্র মনে জাগে সুখ।
পতি যথা রহে, সেই মুখ্য-তীর্থ-স্থান ;
পতি-বিনা ইন্দ্রালয় শ্মশান সমান।
পতি, নারী-দেহে প্রাণ, চেতন-স্বরূপ,
পতি-পত্নী ভাব গত হয় একরূপ।
পতি সুধাকর, সতী কৌমুদী তাহার ;
পতি রবি, সতী রৌদ্র ;—বুঝহ ব্যাপার।
পতি রত্ন, সতী তার প্রভা-মনোহর ;
পতি বহ্নি, পত্নী দীপ্তি ;—রহে একত্তর।
পতি জ্ঞান, পত্নী তা'র মূলা-শক্তি হয়,
পতি-পত্নী না মিলিলে সৃষ্টি নাহি রয়।
পতি-পত্নী দু'য়ে এক ; ভেদ-মাত্র নাই ;
পতি-পত্নী ভিন্ন, ইহা জ্ঞানে নাহি পাই।
পতি-পত্নী ভেদ হ'লে দুই(ই) লোপ পায়,
পতি-পত্নী-তত্ত্বে সৃষ্টি তত্ত্ব বুঝা যায়।
পতি মৃত হ'লে, রাখে স্ত্রী নিজ-অন্তরে ;
পতি রাখে পত্নী স্মৃতি, হৃদি-অভ্যন্তরে।
পতি জ্ঞান, পত্নী শক্তি,—সদা যুক্ত রয় ;
পতি-পত্নী সম্মিলনে জীব সৃষ্টি হয়।
পতি জীব-আত্মা হন মায়া পত্নী যোগে ;
পতি—নিত্য-শুদ্ধ জ্ঞান, প্রকৃতি বিয়োগে।
পতি "কর্ত্তা" নামধারী স্ব-পত্নী-সংযোগে ;
পতি ক্রিয়া-শূন্য হন শক্তি পরিত্যাগে।

পতি-পত্নী উচ্চ তত্ত্ব ; বুঝ' পার যদি ;
পতি বিনা পত্নী—যথা নীর-শূন্য-নদী।
পতি যে কি পরমার্থ, কহি স্থির-জ্ঞানে,
পতি-সোহাগিনী 'মণিমালা'র সদনে।

শ্রীমতী জ্যোৎস্নাময়ী ঘোষ।

অদ্বৈতমতের সমালোচনা।

লেখক—শ্রীআশুতোষ দেব, এম, এ।

২। মায়া।

পরব্রহ্মের প্রতিবিম্ব যাহাতে বিদ্যমান, তিনিই প্রকৃতি ; তিনি সত্ত্ব রজঃ এবং তমঃ—এই ত্রিগুণময়ী ; তাঁহার দুই প্রকার রূপ,—মায়া ও অবিদ্যা। যে প্রকৃতির ধর্ম্ম শুদ্ধ সত্ত্বগুণ, তাহাই মায়া এবং যাহার ধর্ম্ম রজ-স্তমো মলিনীকৃত সত্ত্বগুণ, তাহাই অবিদ্যা।

মায়া প্রতিবিম্বিত চিদানন্দ ব্রহ্ম ঈশ্বর,মায়া তাঁহার বশবর্ত্তিনী বলিয়া ঈশ্বর সর্ব্বজ্ঞ এবং সর্ব্বৈশ্বর্য্যশালী। কিন্তু অবিদ্যা প্রতিবিম্বিত ব্রহ্মের নাম জীব, তিনি অবিদ্যার বশবর্ত্তী। মলিনতাব ন্যূনাধিকতা বশতঃ অবিদ্যার ভেদ হইয়া থাকে এবং অবিদ্যার ভেদে জীব ও নানা প্রকার হইয়া থাকে ইহা ভিন্ন প্রকৃতির আরও একটী অবস্থা আছে, তাহাকে তমঃ প্রধান অবস্থা বলে। ইহা হইতে পঞ্চভূত উৎপন্ন। কিন্তু এই তিন অবস্থা পরস্পর বিরোধিনী। এই তিন অবস্থা পরিত্যাগ করিয়া সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মকেই বুঝিতে হইবে।

ব্রহ্মরূপ সদ্বস্তুর শক্তি মায়া ; মায়ার পৃথক্ সত্তা নাই, সৃষ্টি প্রভৃতি কার্য্য দেখিয়া মায়াশক্তির অনুমান করিতে হয়, যথা অগ্নির দাহিকা শক্তি। কার্য্য জন্মিবার পূর্ব্বে কেহ কখন শক্তিকে জানিতে পারে না। পরমাত্মশক্তি মায়াকে পরব্রহ্মের স্বরূপ বলা যায় না ; যে হেতু আপনিই আপনার শক্তি ইহা বলা অসঙ্গত—যেমন অগ্নির দাহিকা শক্তিকে অগ্নির স্বরূপ বলা যায় না। এই মায়ার মত পৃথক্ নহে, যে হেতু বেদে দ্বিতীয় বস্তুর সত্তা প্রতিষিদ্ধ হইয়াছে। সদ্বস্তু পরব্রহ্মের সত্তাসম্বন্ধেই তাহার সত্তা। সুতরাং মায়ার দ্বিতীয়ত্ব নাই। বস্তু এবং তাহার শক্তি এতদুভয়ের পৃথক্ জীবন গণনা লোক প্রচলিত নহে।

পূর্ব্বোক্ত শক্তি সম্পূর্ণ ব্রহ্ম ব্যাপী নহে, কিন্তু একদেশ ব্যাপী, যেমন ঘট শরাবাদি জনন শক্তি পৃথিবীর সর্ব্বাবয়বে নাই, কেবল আর্দ্র মৃত্তিকাতেই তৎশক্তি অবস্থিত। এই পরমাত্মার এক পাদ সর্ব্বভূতে ব্যাপ্ত এবং তিন পাদ নিত্য শুদ্ধ মুক্ত, স্বয়ম্ প্রকাশ স্বরূপ মায়া যে ব্রহ্মের একদেশ বৃত্তি, তাহা শ্রুতি প্রকাশ করিয়াছেন এবং জগৎ যে ব্রহ্মের একদেশে অবস্থিত, তাহা ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে উপদেশ দিয়াছেন, যথা—আমি কিয়দংশ দ্বারা এই সমুদয় জগৎকে ব্যাপিয়া অবস্থিতি করিতেছি। "তিনি" (পুরুষ) ব্রহ্মাণ্ডকে সর্ব্বতোভাবে আবৃত করিয়া ব্রহ্মাণ্ড বর্হিভাগেও অবস্থিতি করেন, ব্রহ্মাণ্ড বহির্ভাগেই তিনি শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত স্বরূপ—এই প্রকার শ্রুতি আছে; সূত্রকারও বলিয়াছেন যে ব্রহ্মের স্বরূপ বিকারের দ্বারা আবৃত নহে, অনাবৃত অংশও আছে। শ্রোতা প্রশ্ন করিয়াছিলেন যে, শক্তি সম্পূর্ণ ব্রহ্ম ব্যাপিণী, না ব্রহ্মের একদেশ ব্যাপিণী? শ্রুতি, সেই প্রশ্নকারী শ্রোতার হিতাভিলাষে নিরংশ অর্থাৎ অখণ্ড ব্রহ্মের অংশ আরোপ করিয়া তদীয় ভাষাবলম্বনেই ঐরূপ উত্তর দিয়াছেন। যেমন রং ভিত্তিকে আশ্রয় করিয়া তাহাতে বিবিধ চিত্রের সৃষ্টি করিয়া থাকে, তদ্রূপ মায়া শক্তি, সদ্বস্তু ব্রহ্মকে আশ্রয় করিয়া তাঁহাতেই নানাবিধ বিকার অর্থাৎ কার্য্য পরম্পরা সৃষ্টি করিয়া থাকেন। তাঁহার প্রথম বিকার আকাশ। রজ্জুতে সর্প ভ্রম হইলে সর্পের যে অস্তিত্ব জ্ঞান হয়, তাহা রজ্জুর অস্তিত্ব মূলক। রজ্জুর অস্তিত্ব বা সত্তা ব্যতীত সর্পের অস্তিত্ব বা সত্তা স্বতন্ত্র নহে; এখানে রজ্জু অধিষ্ঠান, সর্প আরোপিত; সেইরূপ ব্রহ্মেই মায়াসৃষ্ট আকাশ ভ্রম কল্পিত। ব্রহ্ম অধিষ্ঠান, আকাশ আরোপিত। আকাশের অস্তিত্ব জ্ঞান সদ্‌বস্তু ব্রহ্ম সম্বন্ধ হইতেই উৎপন্ন, ব্রহ্মের একমাত্র সত্তা ব্যতীত, পৃথক্ সত্তা আকাশে নাই।

বেদান্ত দর্শনে নিম্নোক্ত প্রকারে বিশ্বের মায়িকত্ব প্রদর্শিত হইয়াছে। পঞ্চ-ভূত হইতে জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে; এখন যদি বুঝিতে পারা যায় যে প্রত্যেক ভূত ধর্ম্মবিশিষ্ট, তাহা হইলে বিশ্ব মায়িকত্ব যে মায়িকত্ব ধর্ম্মবিশিষ্ট হইবে তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

প্রথমে আমরা দেখিয়াছি যে মায়াশক্তি, সদ্বস্তু ব্রহ্মকে আশ্রয় করিয়া, তাঁহা-তেই কার্য্য পরম্পরা বা বিকার সৃষ্টি করিয়া থাকেন। মায়াশক্তি পরব্রহ্মে যে সকল বিকার সৃষ্টি করিয়া থাকে, তন্মধ্যে আকাশ প্রথম বিকার। আকাশের দুইটী স্বরূপ, আকাশের অস্তিত্ব ব্যবহার হইতে বুঝা যায় যে সদ্বস্তু পরব্রহ্মের সম্বন্ধ তাহাতে বিদ্যমান, দ্বিতীয় স্বরূপ, অবকাশ, বা স্থান। কিন্তু সৎবস্তু অর্থাৎ

ব্রহ্ম, এক স্বভাব বিশিষ্ট—সত্তা মাত্রই তাঁহার স্বরূপ; তাঁহার অবকাশ স্বরূপ নাই। অথবা আকাশের গুণ প্রতিধ্বনি, এই প্রতিধ্বনিরূপ শব্দ ব্রহ্মে নাই; আকাশের অস্তিত্ব বা সত্তা এবং শব্দ—এই দুই ধর্ম্ম উপলব্ধ হয়। সুতরাং সদ্বস্তু এক স্বরূপ এবং আকাশ দ্বি স্বরূপ। কিন্তু যাহা যদপেক্ষা অধিক দেশে থাকে, তাহা তাহার ধর্ম্ম হইতে পারে না, কিন্তু ধর্ম্মী আশ্রয় হইতে পারে। ব্রহ্ম স্বরূপ সদ্বস্তু অধিক দেশে থাকেন বলিয়া, তিনিই ধর্ম্মী—এবং আকাশ ধর্ম্ম। সুতরাং সদ্বস্তুকে পৃথক্ জ্ঞান করিলে, আকাশের কিছুই স্বরূপ থাকে না, অতএব আকাশের সৎ স্বরূপ ভিন্ন, অন্য স্বরূপ মিথ্যা। জাতি ও ব্যক্তি, জীব ও দেহ, গুণ ও দ্রব্য,—ইহারা যে প্রকার পরস্পর পৃথক্, তদ্রূপ আকাশ ও সদ্বস্তুর যে পরস্পর বিভিন্নতা হইবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি আছে। যেমন মৃত্তিকার ঘট স্বরূপত্ব, অথবা রজ্জুর সর্প স্বরূপত্ব হইয়া থাকে, সেইরূপ একমাত্র সৎ, অর্থাৎ সত্য পরব্রহ্মের আকাশ স্বরূপত্ব হইয়া থাকে। ইহা মায়া শক্তিরই কার্য্য। পূর্ব্বোক্ত প্রকারে শাস্ত্র ও যুক্তি দ্বারা আকাশের মিথ্যাত্ব এবং সৎ বস্তুর সত্যত্ব সাধিত হইলে বায়ু প্রভৃতিকে নিম্নোক্ত প্রকারে সদ্বস্তু হইতে পৃথক্ ভাবে নিশ্চয় করিতে হইবে।

মায়া সদ্বস্তুর একদেশে অবস্থিত, আকাশ মায়ায় একদেশবর্ত্তী এবং বায়ু আকাশের একদেশে অবস্থিত। সুতরাং সদ্বস্তু, মায়া এবং আকাশের গুণ বায়ুতে বর্ত্তমান; ইহা ভিন্ন শব্দ, স্পর্শ, গতি এবং বেগ এই কয়টী বায়ুর স্বাভাবিক ধর্ম্ম আছে। বায়ুতে অস্তিত্বরূপ যে সত্তা, তাহা সদ্বস্তুর গুণ, বায়ুকে সৎ হইতে পৃথক করিলে তাহার যে অসত্যতারূপ, তাহা মায়ার গুণ এবং বায়ুতে যে শব্দগুণ উপলব্ধ হয়, তাহা আকাশের গুণ। বায়ুতে সৎ স্বরূপ পরব্রহ্মের যে সৎ অংশ তাহাকে পৃথক্ করিলে, যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহা অসৎরূপ মায়িক অংশ, তাঁহা মিথ্যা। সুতরাং বায়ুর মিথ্যাত্ব এবং সৎ বস্তুর সত্যত্ব সাধিত হইতেছে।

পুরাণে এইরূপ উল্লিখিত হইয়াছে যে আকাশের দশাংশের একাংশ পরিমিত অগ্নি, অগ্নির দশাংশের একাংশ পরিমিত বায়ু, ইত্যাদি প্রকারে দশাংশরূপ তার-তম্য সকল ভূতেই বিদ্যমান্ আছে। অগ্নি, উষ্ণ এবং প্রকাশ স্বভাব সম্পন্ন। অনুবৃত্ত সম্বন্ধ বিশিষ্ট হওয়াতে, অগ্নি অস্তিত্ব বিশিষ্ট, (ইহা সদ্বস্তুর অনুবৃত্তি), অগ্নি অসত্য,—অর্থাৎ সদ্বস্তুর সত্তা ব্যতীত সত্তা অগ্নিতে নাই (ইহা মায়ার অনুবৃত্তি), অগ্নি শব্দবিশিষ্ট (ইহা আকাশের অনুবৃত্তি); অগ্নি স্বীয় সাক্ষাৎকার বায়ু হইতে স্পর্শগুণ প্রাপ্ত হওয়ায়, প্রথমেই উষ্ণ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে।

এইরূপ সদ্বস্তু, মায়া, আকাশ এবং বায়ুর অংশযুক্ত অগ্নির নিজগুণ রূপমাত্র। তন্মধ্যে সদ্বস্তুর অতিরিক্ত অর্থাৎ অস্তিত্ব ভিন্ন আর সমগ্র ধর্ম্মই মিথ্যা। এই প্রকারে অগ্নির মিথ্যাত্ব এব সদ্বস্তুর সত্যত্ব সাধিত হইতেছে।

জল অগ্নি হইতে দশাংশন্যূন এবং অগ্নিতে কল্পিত এবং পূর্ব্বোক্ত প্রকারে সদ্বস্তু হইতে অগ্নি পর্য্যন্তের অনুবৃত্তি সম্বন্ধ হেতু, জলের অস্তিত্ব, অসত্যতা, শব্দ, স্পর্শ এবং রূপ আছে,—তাহার নিজ গুণ রসমাত্র। সদ্বস্তুর অতিরিক্ত ভিন্ন আর সমগ্র ধর্ম্মই মিথ্যা বলিয়া, জল সদ্বস্তু হইতে বিবেচিত এবং জলের মিথ্যাত্ব প্রতিপন্ন হইল।

জল হইতে দশাংশন্যূন পৃথিবী জলেতে কল্পিত হইয়া থাকে এবং সদ্বস্তু হইতে জল পর্য্যন্ত পদার্থের সম্পর্কে পৃথিবীর অস্তিত্ব—অসত্যতা, শব্দ, স্পর্শ, রূপ এবং রস আছে; পরন্তু গন্ধই তাহার নিজগুণ। অতএব সত্তা বা সদ্বস্তু যে পৃথিবী হইতে ভিন্ন ইহা নিশ্চিত হইল। সত্তা পৃথক নিশ্চিত হইলে ভূমি যে মিথ্যা ইহা পর্য্যবসিত হয়।

পূর্ব্বোক্ত অসত্য, ভূমি হইতে দশাংশ ন্যূন ও তন্মধ্যগত ব্রহ্মাণ্ড ভূমিতে কল্পিত হয় সেই ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে ভূরাদি চতুর্দ্দশভুবন, সেই চতুর্দ্দশ ভুবনেতে যথাযোগ্য প্রাণিদেহ অবস্থিত। ব্রহ্মাণ্ড, চতুর্দ্দশভুবন এবং প্রাণিদেহে সদ্বস্তুকে পৃথক্ করিলে, অসৎ স্বরূপে বিবেচিত সেই ব্রহ্মাণ্ডাদি প্রতিভাত হইলেও কোন হানি নাই। ভূত সকল, ভৌতিক পদার্থ সকল এবং মায়া,—ইহাদের অসত্তা অসৎ স্বরূপে হৃদয়ঙ্গম হইলে সদ্বস্তু বিষয়ে অদ্বৈত জ্ঞানের আর যখন বিপর্য্যয় হয় না।

পূর্ব্বোক্ত ভূত এবং ভৌতিক পদার্থের আলোচনার দ্বারা সদ্বস্তুর প্রতিষ্ঠা করিলাম এবং অসদ্বস্তুর যে কত প্রকার অবান্তর ভেদ হইতে পারে, তাহাও দেখিলাম। ইহার নামই মায়ার মায়িকত্ব; মায়িকত্বের হেতু কেবল মিথ্যা স্বরূপ ভিন্ন আর কিছুই নহে।

পারমার্থিক সত্তা হইতে আলোচনা করিয়া আমরা অবগত হইলাম যে, ভূমি প্রভৃতি বিবিধ পদার্থ অদ্বিতীয় সদ্বস্তু হইতে পৃথক্। কিন্তু ব্যবহারিক ভিত্তি হইতে দেখিলে উহাদের ব্যবহারিক সত্তা অনুভূত হইয়া থাকে। এই জন্য এক পুরুষের অজ্ঞান নিবৃত্তি হইলে, জগৎ নিবৃত্ত হয় না উহার ব্যবহার কার্য্য হইয়া থাকে।

এই সদ্বস্তু সত্য জ্ঞান এবং অনন্ত স্বরূপ। উপাধিদ্বয় সাহায্যে ইহার ঈশ্বরত্ব এবং জীবত্ব কল্পিত হইয়া থাকে। এই উপাধি, সর্ব্ব-বস্তু-নিয়ামিকা শক্তি বিশেষ।

ইহা আনন্দময় প্রভৃতি সমুদয় বস্তুতে নিগূঢ়। এই শক্তি দ্বারা জগৎ যথোপযুক্ত নিয়মবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। নিত্য চৈতন্য পরব্রহ্মের উক্ত শক্তি, তাঁহার অধিষ্ঠান বশতঃ চেতনবৎ হয়, অতএব সেই শক্তির জগৎ-শৃঙ্খলা-নিয়মকর্ত্তৃত্ব অসম্ভব নহে, সেইরূপ শক্তিরূপ উপাধি সংযোগ প্রযুক্ত স্বয়ং পরব্রহ্ম চৈতন্য ঈশ্বর হন এবং পঞ্চকোষ রূপ উপাধি সম্বন্ধ বলে ব্রহ্মই জীবরূপে পরিচিত হন। যেমন লৌকিক সম্বন্ধ ব্যাবহারে একব্যক্তি পুত্রকে অপেক্ষা করিয়া পিতা ও তিনিই পৌত্রকে অপেক্ষা করিয়া পিতামহ হন এবং পুত্র ও পৌত্রের অভাবে তিনি পিতা বা পিতামহ কিছুই নহেন, তদ্রূপ এক পরব্রহ্ম চৈতন্য মায়া শক্তি উপাধি সাহায্যে ঈশ্বর এবং পঞ্চকোষ উপাধি দ্বারা জীব, আর উপাধির অভাবে নিরুপাধি কেবল চৈতন্য মাত্র হইয়া থাকেন।

পরমেশ্বরীয় মায়াশক্তিরূপ উপাধির যে প্রকার জগৎ সৃজন সামর্থ্য আছে, তদ্রূপ তাহার মোহন শক্তিও আছে; সেই শক্তি দ্বারা জীব মুগ্ধ হইয়া ঈশ্বরত্ব বিস্মৃত হইয়া সুখ-দুঃখ প্রাপ্ত হয়।

জীব কোন প্রকারে কূটস্থ চৈতন্যের স্বরূপ বিবেচনা করিতে সমর্থ হয় না, সেই অবিবেচনা শক্তিকে অনাদি অবিদ্যা বলা যায় এবং তাহাই মূলাজ্ঞান-শব্দ-বাচ্য। অবিদ্যার শক্তি দুই প্রকারে বিভক্ত;—আবরণ শক্তি ও বিক্ষেপ-শক্তি। এই উভয়ের মধ্যে যদ্দ্বারা নিত্য স্বপ্রকাশ স্বরূপ কূটস্থ চৈতন্যের অপ্রকাশ বা অভাব বোধ হয়, তাহাকে আবরণ শক্তি বলা হয়। কোন জ্ঞানী পুরুষ যদি কোন অজ্ঞানীকে কূটস্থ চৈতন্য বিষয়ক কোন প্রশ্ন করেন, তবে সে অবশ্যই বলিবে যে, কূটস্থ চৈতন্য আমি জানি না, আমার বুদ্ধিতে কূটস্থ প্রকাশ পায় না এবং কূটস্থ নামক কোন পদার্থও নাই—এই প্রকার অনুসন্ধানে কূটস্থ চৈতন্যের প্রকাশ বিরোধিকা আবরণ শক্তি অনুভূত হয়। যেমন শুক্তিকাদিতে রজতের অধ্যাস হয়, তদ্রূপ অবিদ্যার আবরণ শক্তি দ্বারা আবৃত কূটস্থ চৈতন্যে, যে শক্তি দ্বারা স্থূল শরীর ও লিঙ্গশরীর সহিত জীবচৈতন্যের অধ্যাস সম্পাদিত হয়, তাহাকে বিক্ষেপ শক্তি বলা যায়। কূটস্থ চৈতন্যে মিথ্যাজীবের অধ্যাসরূপ যে আবরণ শক্তি, তাহা আত্মজ্ঞান দ্বারা নিবারিত হয়। কিন্তু সেই অজ্ঞানের যে বিক্ষেপ শক্তি, তাহা প্রারব্ধ কর্ম্ম নিবৃত্তিকে অপেক্ষা করে, অর্থাৎ প্রারব্ধ কর্ম্মের ভোগাবসান ব্যতীত স্বয়ং নিবৃত্ত হয় না।

মায়া যে জড়স্বরূপ অথচ মোহরূপ তাহা শ্রুতি বিশেষ করিয়া বলিয়াছেন; বালক মূর্খ প্রভৃতি সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত বলিয়া মায়া যে অনন্ত ইহাও শ্রুতি প্রতি-

পাদিত। অচেতন ঘটাদির যে স্বরূপ, তাহাকে জড় বলা যায় এবং বুদ্ধি যে বস্তুতে প্রবেশ করিতে অসমর্থ হয়, তাহাকে মোহ বলা যায়। উক্ত প্রকার লৌকিক দৃষ্টিতে মায়ায় সর্ব্বানুভবসিদ্ধ-অনন্তরূপত্বই ব্যবহার সিদ্ধ হইয়া থাকে। কিন্তু যুক্তিদ্বারা তাহার স্বরূপ নিশ্চয় করা যায় না এবং শ্রুতিতেও অনির্ব্বচরূপে বর্ণিত হইয়াছে। জ্ঞান দৃষ্টিতে নিত্য নিবৃত্ত বলিয়া তাহাকে "তুচ্ছ" মাত্র বলা যায়। সুতরাং মায়াকে তিন প্রকারে ব্যক্ত করা যায়,—শ্রৌত দৃষ্টিতে "তুচ্ছ," যুক্তি দৃষ্টিতে অনির্ব্বচনীয় এবং লৌকিক দৃষ্টিতে বাস্তবিক।

চৈতন্য ব্যতিরেকে মায়ায় স্বতন্ত্র উপলব্ধি হয় না, এজন্য তাহাকে পরাধীন বলা যায় এবং অসঙ্গত চৈতন্যকে অন্যরূপ অর্থাৎ সসঙ্গাদি করে বলিয়া তাহাকে স্বাধীনও বলা যায়। মায়ার এমন সামর্থ্য যে, কূটস্থ চৈতন্যকে অচেতন জড় স্বরূপ প্রতীত করায় এবং আভাস চৈতন্য দ্বারা জীব ও ঈশ্বরের স্বরূপ নির্ম্মাণ করিয়া তাহার প্রভেদ প্রতীত করায়, আত্মার কূটস্থ স্বরূপের কোন হানি না করিয়াই তাঁহাতে জগৎ ভাসমান করে। ইহা আশ্চর্য্য ব্যাপার হইলেও অঘটন ঘটনপটীয়সী মায়ার পক্ষে ইহা আর আশ্চর্য্য কি?

জীব সকল সংসারে আসক্তচিত্ত হইয়া কখন স্বপ্রকাশ কূটস্থ চৈতন্যের স্বরূপ জানিতে সমর্থ হয় না; ইহাই অজ্ঞান। আর তৎপ্রসঙ্গে সেই ব্যক্তি কূটস্থ চৈতন্যের প্রকাশ নাই, কূটস্থ চৈতন্য নাই—এইরূপ বলিয়া থাকে; ইহাই আবরণ শক্তি। এবং আমিই কর্ত্তা বা ভোক্তা এইরূপে সেই ব্যক্তি বিক্ষেপ প্রাপ্ত হয়। আপ্ত বাক্য দ্বারা একমাত্র কূটস্থ চৈতন্য আছে, এই প্রকার যে জ্ঞান হয়, তাহাকে পরোক্ষ জ্ঞান বলে। পরে বিচার দ্বারা আমিই কূটস্থ চৈতন্য এইরূপ জ্ঞান জন্মে; ইহাই অপরোক্ষ অর্থাৎ প্রত্যক্ষ জ্ঞান। অনন্তর কর্ত্তৃত্ব ভোক্তৃত্ব প্রযুক্ত যে শোক পরম্পরা, তাহা পরিত্যক্ত হয়, ইহাই শোকাপগম এবং তৎপরে কৃতকার্য্যতাও লব্ধ লভ্যতা বোধে পরিতোষ জন্মে, তাহাকে তৃপ্তিরূপ দৃষ্টি বলা যায়।

তত্ত্বজ্ঞান হইলে ভোগ্য বস্তুর মায়িকত্ব মাত্র বোধ হয়, তাহার নাশ হয় না। যেমন কোন ইন্দ্রজাল নির্ম্মিত পদার্থের বিনাশ না করিয়াও, তাহা ইন্দ্রজাল বলিয়া অবগত হওয়া যায়, তদ্রূপ জগতের সমুদায় ভোগ্যবস্তুর অপহ্নব না করিয়াও কেবল তাহার মায়িকত্ব অবগত হওয়া যায়। চিত্ত নিরোধ হইলেই জগতের মায়াময়ত্ব সম্পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম হয়।

ঈশ্বর হইতে মায়া শক্তির পৃথক সত্তা নাই, কারণ লোকে দেখা যায় যে,

শক্ত বস্তু হইতে শক্তি ভিন্ন নহে। কিন্তু ইহাও বক্তব্য যে শক্তি, শক্ত বস্তুর সহিত অভিন্নও নহে, যেহেতু মধ্যে মধ্যে শক্তির বাধও দৃষ্ট হয়, যদি অভিন্নই হয় তবে যে বাধ কাহার হইবে? শক্ত বস্তু ত আছেই, শক্তি কার্য্য দ্বারা অনুমেয় অতএব কারণ সত্ত্বে কার্য্য না হইলেই তাহাকে বাধ বা প্রতিবন্ধ বলা যায়। প্রজ্বলিত অগ্নি যদি দাহ না করে, তবে সে স্থলে মন্ত্রাদিকে শক্তির প্রতিবন্ধক বলিতে হইবে।

শ্রুতিতে এইরূপ উক্ত হইয়াছে যে সেই পরম দেবতা পরমেশ্বরের শক্তি, সত্ত্ব রজঃ প্রভৃতি স্বীয় গুণ দ্বারা নিগূঢ়। ক্রিয়া, জ্ঞান এবং ইচ্ছা ইহাঁর স্বাভাবিক পরমশক্তি। বশিষ্টদেব শ্রীরামচন্দ্রকে বলিয়াছেন যে—নিত্য পরিপূর্ণ সর্ব্বশক্তিমান্ অদ্বিতীয় পরমেশ্বর যখন যে শক্তি দ্বারা বিবর্ত্তিত হন, তখন তদ্রূপে প্রকাশ পান। হে রাম! মনুষ্যাদির শরীরে পরব্রহ্মের চৈতন্য শক্তির উপলব্ধি হয়। বায়ুতে স্পন্দন শক্তি, প্রস্তরে দৃঢ়তাশক্তি, জলে দ্রবশক্তি, অগ্নিতে দাহিকা শক্তি, আকাশে শূন্যশক্তি আর বিনশ্বর পদার্থে বিনাশশক্তি—এইরূপে সর্ব্বত্র পরব্রহ্মেরই শক্তি প্রকাশিত হয়। যেমন কারণ অবস্থায় এক ডিম্ব মধ্যে একপ্রকাণ্ড সর্প থাকে অথবা এক অণুমাত্র বীজমধ্যে ফল পত্র, লতা, পুষ্প, শাখা, স্কন্ধ ও মূলবিশিষ্ট বৃহৎ এক বৃক্ষ থাকে, তদ্রূপ কারণ অবস্থায় এই সমুদয় জগৎ সেই পরব্রহ্মে অবস্থিত থাকে। দেশ কাল বিশেষে ভূমি হইতে বীজাঙ্কুরের ন্যায় কোন সময়ে কোন স্থানে কোন কোন শক্তি তাঁহা হইতেই সমুদ্ভুত হয়। হে রাম! নিত্য বৃহৎ সর্ব্বজ্ঞ সেই চিন্মাত্র পরমাত্মা, যখন মায়াশক্তি প্রভাবে জননী শক্তি অর্থাৎ স্ব পরা বাবোধন-সামর্থ্য ধারণ করেন, তখন তিনি মনঃশব্দে অভিহিত হন। উক্ত প্রকার মন প্রথমে উৎপন্ন হয় তদনন্তর বন্ধ ও মুক্তি উভয় কল্পিত হয়, পশ্চাৎ চতুর্দ্দশ ভুবন নামে বিখ্যাত এই বিচিত্র প্রপঞ্চ কল্পিত হয়।"

শক্তি, কার্য্য এবং আশ্রয় হইতে পৃথক্। যেমন ফোস্কা দাহিকা শক্তির কার্য্য এবং অঙ্গার উহার আশ্রয়; এ উভয়ই প্রত্যক্ষগম্য, কিন্তু শক্তিকে তাহাতে অনুমান করিতে হয়, অতএব শক্তি পৃথক্। কম্বুগ্রীবাদি বিশিষ্ট ঘট অচিন্তনীয়া ঘটোৎপাদিকা শক্তির কার্য্য, পঞ্চগুণযুক্ত মৃত্তিকা সেই শক্তির আশ্রয়,—কিন্তু শক্তি তদ্রূপ নহে, এই জন্য শক্তিকে ভিন্ন বলা যায়।

ঘট যেমন মৃত্তিকা হইতে অতিরিক্ত পদার্থ নহে, যে হেতু মৃত্তিকার অভাবে আর ঘট থাকিতে পারে না, এবং মৃত্তিকা হইতে অভিন্ন পদার্থও নহে, যেহেতু ঘটোৎপত্তির পূর্ব্ব অবস্থাতে ঘট দেখা যায় না। অতএব শক্তির ন্যায় শক্তি

জন্য বস্তুও অনির্ব্বচনীয়। ঘটের অব্যক্ত অবস্থাতে যাহাকে শক্তি বলা যায়, ব্যক্ত হইলে তাহাকেই ঘট বলিয়া স্বীকার করা যায়। ঐন্দ্র জালিকের মায়াও কার্য্যোৎপত্তির পূর্ব্বে অভিব্যক্ত থাকে না, কিন্তু পশ্চাদ্ গন্ধর্ব্বসেনাদিরূপে প্রকাশিত হয়। এইরূপ মায়াময়ত্ব হেতু সমুদায় বিকারজাত পদার্থকে অসত্যরূপে এবং সমুদায় বিকারের আধারকে সত্যরূপে শ্রুতিতে বর্ণনা করা হইয়াছে।

আয়ুর্ব্বেদোক্ত হিতাহার।

লেখক কবিরাজ শ্রীবারাণসীনাথ গুপ্ত বৈদ্যরত্ন।

সুখ দুঃখময় মানব জীবনে সুখদুঃখের হ্রাসবৃদ্ধি যে দৈব এবং পুরুষকার অবলম্বনে অবস্থিত ইহা বোধ হয় অনেকেই স্বীকার করিয়া থাকেন। যে সকল সুখ দুঃখ দৈবাধীন, তাহার প্রবৃত্তি নিবৃত্তি বিষয়ক সমালোচনা অদ্যকার প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে, পরন্তু যাহা পুরুষাকারের উপর প্রতিষ্ঠিত, যাহা আমাদের স্বকৃত কর্ম্মের সাবধানতা বা অসাবধানতা প্রযুক্ত উৎপন্ন, বর্ত্তমান প্রবন্ধে তৎসম্বন্ধে দুই এক কথা বলিবার আছে।

সংসারে সুখসাধনের প্রধান সোপান হিতানুষ্ঠান, "নহি কল্যাণকৃৎ কশ্চিৎ দুর্গতিং তাত! গচ্ছতি" হিতকর কর্ম্মসমূহের অনুষ্ঠান করিতে পারিলে সংসারে দুঃখ ভোগ করিতে হয় না। কি আহারে কি বিহারে কি আচারে কি আলাপে সকল বিষয়েই মানব হিতানুসন্ধিৎসু হইলে তাহাকে শারীরিক মানসিক কোন প্রকার সুখদুঃখে বা রোগে শোকে মৃয়মান হইতে হয়না। রোগ বা আরোগ্য, সুখ দুঃখেরই নামান্তর মাত্র—"সুখসংজ্ঞকমারোগ্যং বিকারো দুঃখমেব চ" শারীরিক যে কোন প্রকার দুঃখ শারীরিক রোগ মধ্যে গণ্য এবং মানসিক যে কোন প্রকার দুঃখ, তাহা মানসিক রোগ মধ্যে গণ্য, এই শারীরিক মানসিক রোগের আক্রমন হইতে মানব কি উপায়ে রক্ষা পাইতে পারে তৎসম্বন্ধে মহর্ষি চরক বলিয়াছেন।

"নরো হিতাহারবিহারসেবী
সমীক্ষ্যকারী বিষয়েষ্বশক্তঃ।
দাতা সমঃ সত্যপরঃক্ষমাবান্
আপ্তোপসেবীচ ভবত্যরোগঃ॥

অর্থ এই যে, যে মানব হিতকর আহার বিহারের সেবা করে, পূর্ব্বাপরদর্শী হইয়া কার্য্য করে, স্ত্রীপুত্রধনাদিতে অনাসক্ত, যিনি দানশীল, সমদর্শী, সত্যনিষ্ঠ, যিনি অপরাধীকে ক্ষমা করেন এবং যিনি আপ্তপুরুষ বা আপ্তজনের বাক্যের সেবা করেন, শারীরিক মানসিক কোন প্রকার রোগই তাঁহাকে আক্রমণ করিতে পারে না।

ভারতে এমন একদিন গিয়াছে, যেদিন প্রত্যেক আর্য্যসন্তান এই সকল আর্য্যোপদেশের প্রকৃত মাহাত্ম্য বুঝিয়া তাহার সমধিক অনুশীলনে শারীরিক মানসিক অক্ষয় সুখের অধিকারী হইয়া নিরাময় ভাবে কালাতিপাত করিয়াগিয়াছেন। অধুনা কালবিপর্য্যয়ে, ভাগ্যবিপর্য্যয়ে বা শিক্ষা বিপর্য্যয়ে উক্ত দান, দীক্ষা, সত্যনিষ্ঠা, আপ্ত সেবা দূরে যাউক, সাধারণতঃ হিতকরআহার বিহারাদিতেও আর্য্যসন্তানগণ দিন দিন সদ্ভাব ভ্রষ্ট হইয়াপড়িতেছে, আজ কাল অনেকেই অনেক স্থলে সদসৎ বিচার শূন্য হইয়া যেখানে, সেখানে, যার তার হাতে যা তা জিনিষ ভোজন করিয়া থাকে, বিশেষতঃ পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রতিভাপ্রভাবে আজকাল যে মেস্ (ছাত্র নিবাস) সমূহের সৃষ্টি হইয়াছে, সেগুলির প্রত্যেকটীকে এক একটী স্বাস্থ্য হানির সাজ্বাতিক যন্ত্রাগার বা বিবিধ ব্যাধির সূতিকাগার বলিলে চলে, এখানে জাতি বিচার নাই, খাদ্যাখাদ্য বিচার নাই, পাত্রাপাত্র বিচার নাই, এখানে কলু, মালী, তেলী তাম্লি ধোপা, নাপিত, ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ, শূদ্র, সকলেই এক,—একশয্যায় শয়ন, এক পাত্রে ভোজন, একত্র উপবেশন। ইহাতে রামের শরীরে যদি কোন ব্যাধি থাকে তবে সংসর্গদোষে তাহা শ্যামের শরীরে প্রবেশ করিতেছে শ্যামের শরীরে যদি কোন ব্যাধি থাকে তবে তাহা রামের শরীরে প্রবেশ করিতেছে, ঐ রূপ নিত্য নিত্য কত নূতন নূতন সংক্রামক ব্যাধি সমূহের সৃষ্টি হইয়া সমাজের যে কতদূর অনিষ্ট সাধন করিতেছে তাহা বলা যায় না। হাটে বাজারে সুসজ্জিত যে সকল খাদ্য দ্রব্যের বিপণী দেখিতে পাওয়া যায় সে গুলিতে ও উক্ত প্রকার সংক্রামকতা দোষ যথেষ্ট পরিমাণে বিদ্যমান থাকে, পরন্তু সেগুলি সাধারণের উচ্ছিষ্ট বলিলেও চলে শাস্ত্রে উক্ত আছেঃ—

'আহারনির্হারবিহারশয্যা
সদৈব সদ্ভির্বিজনে বিধেয়া।'

অর্থ এই যে, আহার, মল মূত্র ত্যাগ ও বিহারশয্যা জ্ঞানবান কর্ত্তৃক সর্ব্বদা নির্জ্জন প্রদেশে সম্পাদিত হওয়া উচিত। "প্রাণাঃপ্রাণভৃতামন্নং" অন্নই প্রাণীর প্রাণস্বরূপ। সেই পবিত্র অন্নের অপব্যবহার ঘটিলে আয়ু, স্বাস্থ্য সকলই দিন দিন

হীন হইতে থাকে, সুতরাং ক্ষুদ্বোধ মাত্রই বিবেক বুদ্ধিপরিশূন্য পশ্বাদির ন্যায় অবিচারিতচিত্তে অহিতকর অপকৃষ্ট দ্রব্যাদি ভোজনে বুভুক্ষা বৃত্তির নিবৃত্তিকরা নিতান্ত অজ্ঞানের কার্য্য।

চন্দ্র, সূর্য্য ও বায়ু এই শক্তিত্রয়ের সাহায্যে বাহ্যজগৎ যেমন ধৃত হইয়া রহিয়াছে, মানবদেহ সেইরূপ বায়ু, পিত্ত, কফ এই ত্রিশক্তির অনুকম্পায় অবস্থিত; চন্দ্র, সূর্য্য ও বায়ু এই শক্তিত্রয়ের মধ্যে কোনটির সাম্যাবস্থার বিচ্যুতি ঘটিলে বাহ্যজগতে যেমন মহা বিপ্লব উপস্থিত হইতে দেখা যায়, দেহান্তর্গত বাত পিত্ত কফের তদ্রূপ কোন প্রকার সাম্যাবস্থার অন্যথা হইলে মানব দেহে নানাপ্রকার ব্যাধিরূপ বিপ্লব দেখা দিয়া থাকে, পরন্তু বাহ্য জগতে গ্রহ উপগ্রহাদির সমতা বিধানকল্পে জপ, হোম, শান্তি, প্রভৃতি দৈবানুষ্ঠানের যেমন আবশ্যকতা, শরীরান্তর্গত বাত, পিত্ত, কফের সমতা বিধান জন্য তদ্রূপ যুক্তিসঙ্গত হিতকর আহার বিহারাদির সেবা প্রয়োজন। যোগারূঢ় ভগবান বাসুদেব বলিতেছেন :—

যুক্তাহারবিহারস্য যুক্তচেষ্টস্য কর্ম্মসু।
যুক্তস্বপ্নাববোধস্য যোগো ভবতি দুঃখহা॥

অর্থাৎ যুক্তিযুক্ত হিত এবং পরিমিত আহার বিহারের যিনি অনুগত, কায়মনো বাক্যের যাবতীয় চেষ্টাই যাঁহার পরিমিত, যিনি যুক্তিযুক্ত নিদ্রা ও জাগরণের বশবর্ত্তী তাঁহার যোগ দুঃখ নাশক হইয়া থাকে। অধিক কি ইচ্ছা করিলে যুক্তিযুক্ত হিতকর আহার বিহারাদির অনুশীলনপ্রভাবে মানব যোগ মার্গ অবলম্বন পূর্ব্বক মোক্ষপথে অগ্রসর হইতে পারে, অতএব সংসারে থাকিয়া শারীরিক মানসিক, ঐহিক পারত্রিক সুখ প্রার্থী হইতে হইলে, এই ভোগায়তন শরীরযন্ত্রকে নিরাপদ করিতে হইলে, হিতকর আহার বিহারাদির সেবা নিতান্ত প্রয়োজন। হিতাহার কাহাকে বলে তৎসম্বন্ধে মহর্ষি আত্রেয় শিষ্যঅগ্নিবেশকে লক্ষ্য করিয়া উপদেশচ্ছলে একস্থলে বলিয়াছেন :--

"যদাহারজাতমগ্নিবেশ! সমাংশ্চৈব
শরীরধাতুণ প্রকৃতৌ স্থাপয়তি, বিষমাংশ্চ
শমী করোতীত্যেতদ্ধিতংবিদ্ধি, ত্বহিতং বিপরীতং।"

যে সমস্ত আহার শারীরিক সমভাবাপন্ন ধাতু সমূহকে স্বাভাবিক অবস্থায় স্থাপন করে পরন্তু বিষম অর্থাৎ বিকৃত ধাতু সমূহকে ও সমভাবে আনয়ন করিতে পারে, তাহাই হিত জনক আহার, এবং ইহার বিপরিত যাহা, তাহাই অহিতাহার মধ্যে গণ্য। জগন্মিত্র মহর্ষি আত্রেয় মানব জাতির হিতার্থে সাধারণতঃ আতুর অনাতুর

সকলের পক্ষে কোন কোন আহার্য্য একান্ত হিতকর এবং কোন কোন আহার্য্যই বা সাধারণতঃ অহিতকর নিম্নোক্ত প্রকারে তাহার নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন :—

ধান্য জাতির মধ্যে রক্ত বর্ণ শালী ধান্যেরঅন্ন (যাহা রামশালী বলিয়া প্রসিদ্ধ) আতুর অনাতুর সকলের পক্ষে সুপথ্য বলিয়া গণ্য; দ্বিদল [ডাল] জাতীয়ের মধ্যে মুদ্গ, লবণ জাতীয়ের মধ্যে সৈন্ধব লবণ, কূপ, তড়াগ বা নদ, নদী প্রভৃতির জল অপেক্ষা আন্তরীক্ষ অর্থাৎ আকাশ বিচ্যুত জলই সর্ব্বাপেক্ষা সুপথ্য, শাকজাতীয়ের মধ্যে জীবন্তী শাক * পশুমাংসের মধ্যে এণ নামক হরিণের মাংস, পক্ষীমাংসের মধ্যে তিত্তির পক্ষীর মাংস ও ভূগর্ভশায়ী জন্তুদিগের মধ্যে গোধামাংস সুপথ্য; মৎস্য জাতির মধ্যে রোহিত, ঘৃতের মধ্যে গব্যঘৃত, দুগ্ধের মধ্যে গোদুগ্ধ শ্রেষ্ঠ পথ্য। তৈল জাতির মধ্যে তিলতৈল, কন্দ [মূল] জাতীর মধ্যে আদ্রক, ফল জাতীর মধ্যে কিস্‌মিস্ এবং শর্করা জাতীর মধ্যে ইক্ষুজাত শর্করাই সর্ব্বতোভাবে সুপথ্য বলিয়া প্রসিদ্ধ।

মানব মাত্রেই ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতিতে গঠিত, কেহ বাত প্রকৃতি, কেহ পিত্ত প্রকৃতি কেহবা শ্লেষ্মা প্রকৃতি; তন্মধ্যে আবার উক্ত বাতাদি দোষত্রয়ের পরস্পর সম্মিলনের তারতম্যে বাতশ্লেষ্মা, পিত্তশ্লেষ্মা, বাতপিত্ত, প্রভৃতি অনেক প্রকার প্রকৃতি গঠিত হইয়া থাকে। কিন্তু উল্লিখিত আহারজাত উক্ত প্রকার সকল প্রকৃতির মানব দিগের সর্ব্বাবস্থায় হিতকর। শ্যামের প্রকৃতিতে যাহা হিতকর, রামের প্রকৃতিতে তাহা অহিতকর ইত্যাকার বিরোধীভাব ইহাদিগের মধ্যে নাই, এজন্য মহর্ষি সাধারণ হিতাহার বলিয়া ইহাদিগের নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন।

মানবজাতির হিতার্থে মহর্ষি যেমন হিতাহার বিধির উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন, পরক্ষণেই তদ্রূপ একান্ত অহিতাহার সকল ও বিধিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, উপরোক্ত আহার সমূহ সাধারণতঃ যেমন হিতাহার বলিয়া গণ্য, নিম্নোক্ত আহারজাত তদ্রূপ অহিতাহার মধ্যে গণ্য হইয়া থাকে। যথা শূকবিশিষ্ট ধান্যজাতির মধ্যে যবক (ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যব বিশেষ উত্তর পশ্চিম অঞ্চলে, যাহা যাউ বলিয়া প্রসিদ্ধ) সাধারণতঃ

* জীবন্তী শাক আমাদের দেশে বড় দেখিতে পাওয়া যায় না, ইহা পর্ব্বত বহুল স্থানে জন্মিয়া থাকে, ঔষধার্থে চিকিৎসকেরা যাহা ব্যবহার করেন তাহা শুষ্ক এবং তত্তদ্দেশ হইতে আনীত। আয়ুর্ব্বেদে জীবন্তী শাক ব্যতীত পাটো বা স্তোক, ও কাকামাচ শাক সুপথ্য বলিয়া উক্ত আছে।

অপথ্য কর, দ্বিদলজাতির মধ্যে মাষ চড়াই, উদকজাতির মধ্যে বর্ষাকালীয় নদী জল, লবণ জাতির মধ্যে ক্ষারবহুল (ক্ষারি লবণ) লবণ, শাকাদির মধ্যে সর্ষপ শাক, পশুমাংসের মধ্যে গোমাংস, পক্ষী মাংসমধ্যে ক্ষুদ্র কপোতের (ঘুঘুর) মাংস, বিলেশয় জন্তুদিগের মধ্যে ভেকমাংস অতীব অপথ্য, মৎস্য-জাতির মধ্যে চিলিচিম (১) মৎস্য, ঘৃত ও দুগ্ধের মধ্যে মেষের ঘৃত ও দুগ্ধ শস্য-জাত তৈলের মধ্যে কুসুম্ভবীজ জাত তৈল, এবং কন্দজাতির মধ্যে মূলক (২) ও ফলজাতির মধ্যে নিকুচফল (চলিতভাষায় যাহাকে ডেও মান্দার বলে) অহিতাহার বলিয়া উক্ত হইয়াছে। এই সকল আহারাদিতে পাত্রাপাত্র বা প্রকৃতিগত বিচার নাই ইহা সাধারণতঃ সকল প্রকৃতির ই সর্ব্বতোভাবে অহিতাহার বলিয়া পরিগণিত। ধর্ম্মতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত দিগের ধর্ম্মশাস্ত্রের আলোচনায় দেখা যায়, এই, সকল অহিতাহার তিথি নক্ষত্র বিশেষে অধিকতর অপথ্য হইয়া উঠে, এজন্য তাঁহারা আহার বিধির অধিকতর সূক্ষ্মতত্ত্বে উপনীত হইয়া তিথি নক্ষত্রাদি বিশেষে তাহাদের বিধি নিষেধের আবশ্যকতা দেখাইয়া গিয়াছেন। কিন্তু কি দুঃখের বিষয় আর্য্য মনিষীদিগের গভীর গবেষণায় যে সকল সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম আয়ু তত্ত্ব উদ্ঘাটিত হইয়াছে অধুনা তাহার তাৎপর্য্যবধারণে অক্ষমতা প্রযুক্ত অনেক হিন্দুসন্তানের নিকট তাহা অনাদৃত, হেয় ও অহেতুক বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়া থাকে। যে, আয়ুর্ব্বেদোক্ত হিতাহার বিধির অবলম্বনে পূর্ব্বপুরুষ মহাত্মাগণ স্বচ্ছন্দে নিরাময় শরীরে শতাধিক বৎসরকাল জীবিত থাকিয়া ধর্ম্ম কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া গিয়াছেন, যে সকল হিতাহার নিত্য নৈমিত্তিক অনুশীলন প্রভাবে সাক্ষাৎ দেবকান্তি, অনুপম লাবণ্য ও অভাবনীয় তেজস্বিতা দেহে বিরাজ করিত, কালমাহাত্ম্যে সেই সকল মহামূল্য হিতাহারের অনুষ্ঠান ক্রমশঃই যেন ভারতে লোপ পাইতে বসিয়াছে।

অধুনা আর্য্য সন্তানগণ কুসংস্কারবশে অধিকতর অহিতাহারে রত থাকিয়া নিত্য নিত্য নানারূপ শারীরিক মানসিক এবং সংক্রামক রোগ সমূহ দ্বারা আক্রান্ত হইয়া আর্য্য দেবকান্তির পরিবর্ত্তে যেন পিশাচের ন্যায় প্রতিভাত হইতেছে এবং

(১) সুশ্রুতগ্রন্থের টীকাকার মহানুভব ডল্লনাচার্য্য মহোদয় চিলিচিম অর্থে মহাশল্ক রোহিত মৎস্য বিশেষ অর্থ করিয়াছেন, কিন্তু মান্দ্রাজ প্রদেশের কোন কোন পণ্ডিত চিলিচিম অর্থে চিংড়ীমাছ বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন কিন্তু তাহা সমিচীন বলিয়া বোধ হয় না। যেহেতু আয়ুর্ব্বেদে ব্যাধি বিশেষে "চিংড়ীমাছ" সুপথ্য মধ্যে উক্ত আছে।

(২) পুরাণ শুষ্কমূলা ব্যাধি বিশেষে প্রযুক্ত হইলেও সাধারণতঃ বর্জ্জনীয়।

অহরহ অশান্তির অনলে দগ্ধ হইতেছে। তাহাদের দেহে বল নাই, মনে স্ফূর্ত্তি নাই স্ত্রী পুত্র পরিবারের সুখ নাই, কিন্তু তথাপি তাঁহাদের অহিতানুষ্ঠানের আকাঙ্ক্ষাও নিবৃত্তি হইতেছেনা। পরন্তু সান্নিপাতিক পিপাসার ন্যায় তাহা ক্রমাগত বৃদ্ধিই পাইতেছে, ভারতবাসী এক্ষণে পটোল, বাস্তুক ও জীবন্তীর পরিবর্ত্তে, কপি, শালগমের আস্বাদ বুঝিয়াছে, পবিত্র ঘৃত দুগ্ধের পরিবর্ত্তে চপ কাটলেট ও মটনের মর্য্যাদা রক্ষা করিতেছে, ভগবান্ জানেন, আর্য্যজাতির ভাগ্যে ইহার অধিক আরও কিছু বিড়ম্বনা আছে কিনা!!!

পতিতা।

লেখক—শ্রীনারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

(১)

এত করিয়াও মিত্রজা মহাশয়ের তামাক খাওয়া হইল না। মাধ্যাহ্নিক নিদ্রা-ভঙ্গের পর তিনি গো-সেবা-নিরত নফরচন্দ্র ওরফে নফরাকে এত ডাকাডাকি করিয়া সবে মাত্র তামাক ছিলিমটীর যোগাড় করিয়া লইয়াছেন, এই মেঘাচ্ছন্ন দারুণ শীতের দিনে অচিরভুক্ত অহিফেনের নেশাটী জমকাইবার অভিপ্রায়ে সবে মাত্র অলস-চিত্তরঞ্জিনী কলনাদিনী হুঁক্কা দেবীর বদনকমলের সহিত নিজ বদন সংযুক্ত করিয়াছেন, সবে মাত্র দেবীর বর-প্রদানরূপ প্রথম কলধ্বনি বহির্গত হইয়াছে, এমন সময় সহসা ডাক-পিয়নের ধরা-চূড়া-বাঁধা প্রবাসি-জন-মনোহর-মূর্ত্তি তাহার এই বাঞ্ছিত শুভ সুযোগের বিঘ্ন স্বরূপে আসিয়া দণ্ডায়মান হইল, এবং বিনা বাক্য-ব্যয়ে একখানি লাল লেফাফা আবৃত টেলিগ্রাম তাহার হস্তে প্রদান করিয়া প্রস্থান করিল। টেলিগ্রাম দেখিয়াই তো মিত্রজার চক্ষুস্থির। তাঁহার হাতের হুকা হাতেই রহিল, এত সাধের তামাকু অনাদরে—অভিমানে আপন মনে পুড়িতে লাগিল। তিনি সে দিকে লক্ষ্য করিয়াই হুঁকাটীকে একপাশে রাখিয়া ঘোষাল-দের মহিমের কাছে ছুটিলেন। মহিম টেলিগ্রামখানি পড়িয়া তাঁহাকে অনুবাদ করিয়া বুঝাইয়া দিল যে, কলিকাতায় তাঁহার পুত্র অমরনাথ পীড়িত তাঁহার তথায় সত্বর গমন করা আবশ্যক। টেলিগ্রাম শুনিয়াই তো মিত্রজা বসিয়া পড়িলেন।

তারপর দ্রুতপদে বাটীতে প্রত্যাগমন করিয়া গৃহিণীকে সমস্ত কথা বলিলেন। বধূ ইন্দুও এক পাশে দাঁড়াইয়া নিশ্বাস রোধ করিয়া সমস্ত শুনিল। মুহূর্ত্তে বাটীর মধ্যে একটা বিষাদের করুণ রোল ছড়াইয়া পড়িল। মিত্রজা মহাশয় আর বিলম্ব না করিয়া কলিকাতা যাত্রার উদ্যোগ করিলেন। তিনি বাস্তুদেব রঘুনাথকে প্রণাম করিয়া জীর্ণপ্রায় চটী জোড়াটীর ধূলা ঝাড়িয়া তাহাতে চরণ সংলগ্ন করিলেন। চাদরখানা কাঁধে ফেলিয়া, নফরের হাতে ব্যাগটী লাঠিটী দিয়া এবং গৃহিণীকে সাবধানে থাকিতে বলিয়া, শ্রীদুর্গা স্মরণ করিতে করিতে বাটীর বাহির হইলেন। অমনই সম্মুখের তেঁতুল গাছ হইতে একটা কাক বিকটস্বরে ডাকিয়া উঠিল। তিনি ভ্রূকুটী করিয়া দুর্গা দুর্গা বলিতে বলিতে ষ্টেশনাভিমুখে চলিলেন।

এইখানে মিত্রজা মহাশয়ের একটু পরিচয় দিয়া রাখি। তাঁহার পুরা নাম—রামসদয় মিত্র। কিন্তু গ্রামের প্রায় সকল লোকেই তাঁহাকে কেহ 'মিত্তিরজা' কেহ 'মিত্তির খুড়ো' কেহ বা 'মিত্তির দা' প্রভৃতি নামে ডাকিত। মিত্রজা মহাশয় মধ্যবিত্ত গৃহস্থ হইলেও নলদা গ্রামবাসী অনেকের নিকটেই সম্মানিত। তাঁহার একমাত্র পুত্র অমরনাথ কলিকাতায় কোন এক সওদাগর অফিসে চল্লিশ টাকা বেতনে কার্য্য করেন। বাসা খরচ বাদে অমরনাথ মাসে মাসে পঁচিশ টাকা করিয়া বাটীতে পাঠান। মিত্রজা মহাশয়ের চাষের ধান, ক্ষেতের তরকারী, পুকুরের মাছ, তাহার উপর এই কয়টী টাকাতেই সংসার বেশ সুখ স্বচ্ছন্দে চলে। বরং ইহা হইতে মাসে মাসে কিছু উদ্বৃত্তও হয়। ইহা ব্যতীত তাঁহার নগদ সম্পত্তিও কিছু ছিল। তদ্দ্বারা তিনি গ্রামে মহাজনী করিতেন। কিন্তু সাধারণ মহাজন হইতে তিনি কিছু ভিন্ন প্রকৃতির লোক ছিলেন। কারণ কখনও তিনি খাতকের ঘর বাড়ী বিক্রয় করিয়া টাকা আদায় করেন না; একগুণ আসলে সাতগুণ সুদ আদায় করিয়া দরিদ্র খাতকের সর্ব্বনাশ করিতে পারেন না। এই জন্যই বোধ হয়, কেহ কখনও তাঁহার আসলের এক পয়সাও লোকসান হইতে দেখে না। খাতকগণ তাঁহার বড় বাধ্য। তাহাদের বিশ্বাস, মিত্তির মহাশয়ের নিকট কর্জ্জ লইলে সে ঋণ শীঘ্রই পরিশোধ হইয়া যায়।

মিত্রজার পরিবারের মধ্যে তাঁহার গৃহিণী, একমাত্র পুত্র অমরনাথ, রূপে গুণে লক্ষ্মী পুত্রবধূ ইন্দু; নফর ও শ্রীধর নামে দুইটী চাকর, গোয়ালে দুইটী বলদ, দুইটী গাভী, একটী বৎস। এই পরিজনগুলি লইয়া মিত্রজা মহাশয় নলদা গ্রামখানির মধ্যে একটী সুখের সংসার পাতিয়া ছিলেন। কিন্তু কয়েকজন পিশাচ তাঁহার এই সুখ দেখিয়া জ্বলিয়া মরিত। কেন জ্বলিত, সেই কথাটাই আগে বলিব।

(২)

নলদা গ্রামখানি ক্ষুদ্র হইলেও তাহাতে সমাজ বন্ধনের কোনরূপ ত্রুটী ছিল না। কিন্তু নগেন ঘোষ ও শরৎ রায় নামে দুইটী উচ্ছৃঙ্খলপ্রকৃতি যুবক মধ্যে মধ্যে সমাজের এই সুদৃঢ় বন্ধনটাকে ছিন্ন করিতে চেষ্টা করিত। তাহাদের পাপ-দৃষ্টি সময়ে সময়ে হারু পোদের স্ত্রী, ছিরু বাগ্‌দীর কন্যা প্রভৃতি হইতে অনেক সম্ভ্রান্ত কুল-মহিলার উপর পতিত হইত, এবং বিবিধ উপায়ে আপনাদের দুষ্প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিতে প্রয়াস পাইত। ইহাতে অনেকবারই তাহাদিগকে সমাজের শাসন-দণ্ডের অধীন হইতে হইয়াছিল, কিন্তু কিছুতেই তাহাদের চৈতন্য হয় নাই। শেষে তাহারা একবার এক ব্রাহ্মণ বিধবার উপর অত্যাচার করিল, সমাজ তাহাদিগকে শাসন করিতে চেষ্টা করিল। মিত্রজা মহাশয় সমাজ পরিচালন বিষয়ে একজন দলপতি ছিলেন। তাঁহারই বাটীতে কালী পূজার সময় তাহাদের প্রথম নিমন্ত্রণ বন্ধ হইল। তাহারা আসিয়া মিত্রজা মহাশয়ের নিকট অনেক কাঁদাকাটা করিল। কিন্তু তিনি পূর্ব্বে অনেকবার সকলকে বুঝাইয়া তাহাদিগকে ক্ষমা করিয়াছিলেন, এই সমস্ত পাপ কার্য্য হইতে নিরস্ত হইবার নিমিত্ত অনেক উপদেশ দিয়াছিলেন। কিন্তু কিছুতেই তাহাদের স্বভাব পরিবর্ত্তিত হয় নাই। এই জন্যই এবার মিত্রজা মহাশয় একটু কড়া হইলেন, তাহাদিগকে একটু শিক্ষা দিতে মনস্থ করিলেন, তাই এবার আর নগেন বা শরৎ কিছুতেই ক্ষমা পাইল না। তাহারা আরও দুই একজন দলপতিকে অনুরোধ করিল। কিন্তু সকলেই এবার মিত্রজা মহাশয়ের উপর নির্ভর করিলেন। তখন পাপিষ্ঠেরা বুঝিল, মিত্তির বুড়োই তাহাদের নিগ্রহের মূল, প্রধান শত্রু। তাহারা এবার মিত্রজার সর্ব্বনাশ করিতে বদ্ধ পরিকর হইল।

ইহার পরই একদিন ইন্দুর যৌবনোদ্দীপ্ত রূপশ্রী তাহাদের পাপদৃষ্টির সম্মুখে পড়িল। অমনই তাহাদের হৃদয়ে পৈশাচিক প্রবৃত্তি জাগিয়া উঠিল সঙ্গে সঙ্গে প্রতিহিংসা তৃষাও বলবতী হইল, অন্তর্গুপ্ত পাপবহ্নি ধক্ ধক্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। তাহারা কেবল সময় ও সুযোগের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

(৩)

রাত্রি প্রায় এক প্রহর অতীত হইয়াছে। সন্ধ্যার পর খুব এক পশলা বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে; আকাশ এখনও মেঘাচ্ছন্ন, টিপ্ টিপ্ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছে। কুয়াশার অন্ধকারমেঘে অন্ধকার মিশিয়া একটা জমাট অন্ধকারের সৃষ্টি করিয়াছে। সে অন্ধকারে আকাশ পৃথিবী সব এক হইয়া গিয়াছে। মধ্যে মধ্যে কেবল

এক একবার ক্ষীণ বিদ্যুতালোকে অন্ধকারটা আরও ঘনাইয়া আসিতেছে। হু হু করিয়া শীতের বাতাস বহিতেছে। একে শীত কাল, তাহাতে সন্ধ্যা হইতে বৃষ্টি; সন্ধ্যার পরই গ্রামবাসিগণ যে যাহার শয্যার আশ্রয় লইয়াছে। এক প্রহর রাত্রিতেই গ্রামখানি শব্দহীন, সুষুপ্ত। কেবল মাঝে মাঝে মেঘের মৃদুগর্জ্জন, গ্রাম্য কুকুরদলের চীৎকার, সুপ্ত গ্রাম খানিকে জাগাইয়া তুলিতেছে।

ঘরের মেঝেয় পা ছড়াইয়া বসিয়া মিত্রজা গৃহিণী, ইন্দুর সহিত গল্প করিতেছিলেন। সম্মুখে একটা মেটে প্রদীপ মিট্ মিট্ করিয়া জ্বলিতেছিল। সেই অস্পষ্টালোকে গৃহিণী এক একবার ইন্দুর বিষাদছায়া মণ্ডিত মুখ খানির দিকে চাহিতেছিলেন এবং হৃদয়ের বেদনা হৃদয়ে চাপিয়া বিবিধ প্রসঙ্গের অবতারণা দ্বারা বধূর বিষাদ-ক্লিষ্ট হৃদয়ে সান্ত্বনাবারি প্রক্ষেপের চেষ্টা করিতেছিলেন। একপাশে একখান মাদুরের উপর পড়িয়া বিলীর মা নাক ডাকাইতেছিল। নফর কর্ত্তার সহিত গিয়াছে; সিধু জ্বরে পড়িয়া দুই দিন হইতে অনুপস্থিত কাজেই বিলীর মা অদ্য এই দুইটী ভীতা স্ত্রীলোকের রক্ষণাবেক্ষণের ভার গ্রহণ করিয়াছিল। কিন্তু শয়নমাত্রই তাহার বিকট নাসিকা গর্জ্জন গৃহিণীর নিকট তাহার কর্ত্তব্য পালন জ্ঞানের পরিচয় প্রদান করিতেছিল।

সমস্ত নীরব নিস্তব্ধ। সেই গভীর নীরবতার মধ্যে এক একবার মেঘ গর্জ্জনের সহিত একটা অনিশ্চিত অমঙ্গলের বিকট ছায়া নাচিয়া উঠিতেছিল। গৃহিণী ইন্দুকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছিলেন, "নফরা যখন এখনও ফিরলো না, তখন বোধ হয় সে কলিকাতা পর্য্যন্তই যাবে। তা' হ'লে কাল সকালের গাড়ীতেই সে সংবাদ নিয়ে ফিরবে।"

কথাটার সঙ্গে সঙ্গেই বধূ ও শাশুড়ী উভয়েই মনে মনে শিহরিয়া উঠিলেন। নফরের প্রত্যাগমনের সহিত যেন মঙ্গলামঙ্গলের একটা সংশয় পূর্ণ চিত্র উভয়েরই নয়ন সমক্ষে জাগিয়া উঠিল। সে আশঙ্কার চিত্রখানাকে হৃদয় হইতে দূর করিবার অভিপ্রায়ে ইন্দু বলিল, "মাগো! বিলীর মার কি নাকের শব্দ, যেন ষাঁড়ের ডাক।"

গৃহিণী বলিলেন, "আহা গরীব মানুষ, সমস্ত দিন খেটেখুটে বেড়ায়; হোক্ ঘুমুক্।"

ঠক্ ঠক্ ঠক্—সহসা সদর দরজায় আঘাত হইল, ঠক্ ঠক্ ঠক্।

ইন্দু চমকিয়া উঠিল। গৃহিণী কাণ পাতিয়া শুনিলেন, দ্বারে কে আঘাত করিতেছে, ঠক্ ঠক্ ঠক্। তিনি ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে গা?"

উত্তর আসিল, "আমি।"

একটা মেঘগর্জ্জনে উত্তর দাতার স্বর মিশাইয়া গেল।

গৃহিণী আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে নফর?"

উত্তর হইল, "হুঁ।"

"নাম কর্ত্তেই এসেছে" বলিয়া গৃহিণী ইন্দুকে প্রদীপটা আনিতে আদেশ দিয়া দ্বার খুলিতে বলিলেন। ইন্দুও বাম হস্তে প্রদীপ লইয়া, তাহার উপর দক্ষিণ হস্তের আবরণ দিয়া ঘোমটা টানিয়া তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল। ঘরের বাহির হইতেই চৌকাটে পা বাধিল, উঠানে নামিতেই একটী খোঁটায় অঞ্চল বাধিয়া গেল। বুক্‌টা সহসা একবার কাঁপিয়া উঠিল। সে কম্পিত পদে শ্বশ্রূর অনুসরণ করিল।

গৃহিণী দরজা খুলিয়াই দেখিলেন, বাহিরে চারি পাঁচ জন লোক দাঁড়াইয়া আছে; কিন্তু অন্ধকারে তাহাদিগকে চেনা যায় না। তার পর ইন্দুর হাতের প্রদীপের আলোক যখন তাহাদের মুখের উপর পড়িল, তখন তিনি চীৎকার করিয়া উঠিলেন। অমনই তাহারা সম্মুখে লাফাইয়া পড়িল। একজন আসিয়া গৃহিণীর মুখ চাপিয়া ধরিল। ভয়ে ইন্দু থর থর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল, তাহার হাতের প্রদীপ মাটীতে পড়িয়া নিবিয়া গেল। মুহূর্ত্ত মধ্যে কয়েক জন দস্যু আসিয়া তাহাকে ধরিল, একজন তাহার মুখ বাঁধিয়া ফেলিল, তারপর তিন চারিজনে তাহাকে তুলিয়া লইয়া বাটীর বাহির হইল। ইন্দু একবার চীৎকার করিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু মুখ বদ্ধ, স্বর বাহির হইল না। বল প্রকাশ করিতে গেল, কিন্তু বৃথা চেষ্টা, যমদূতের ন্যায় চারিজন দস্যু তাহাকে ধরিয়াছে। ভয়ে ইন্দু অজ্ঞান হইয়া পড়িল। দস্যুগণ তাহাকে লইয়া অন্ধকারে মিশিয়া গেল।

যে দস্যু এতক্ষণ গৃহিণীর মুখ চাপিয়া ধরিয়াছিল, সেও অবসর বুঝিয়া তাঁহাকে ছাড়িয়া ছুটিয়া পলাইল গৃহিণী আছড়িয়া পড়িয়া চীৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। বিলী ঘুমের ঘোরে চোক মুছিতে মুছিতে তাঁহার নিকট আসিয়া দাঁড়াইল, এবং ক্রন্দনের বিশেষ কারণ না জানিয়াও গৃহিণীর সহিত কাঁদিতে লাগিল। উভয়ের সেই করুণ ক্রন্দন প্রবাহ সুপ্ত গ্রামখানির উপর কাঁপিয়া কাঁপিয়া ঘুরিতে লাগিল।

এ দিকে দস্যুগণ ইন্দুকে গ্রামান্তরে নির্জ্জন স্থানে লইয়া গিয়া সেই অজ্ঞানাবস্থাতেই তাহার সর্ব্বনাশ সাধন করিল। পাষণ্ডগণের ভীষণ অত্যাচারে হত ভাগিনীর একবার চৈতন্য হইয়াছিল, একবার যন্ত্রণাসূচক আর্ত্তনাদ করিয়াছিল।

কিন্তু তাহার সেই ক্ষীণ আর্ত্তস্বর নৈশ অন্ধকারেই বিলীন হইয়াছিল।

* * * * *

সে সেই দিন রাত্রির ট্রেনেই মিত্রজা মহাশয় কলিকাতায় উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, অমর নাথের শরীরে রোগের চিহ্নমাত্রও নাই। অমরনাথ টেলিগ্রামের কথা শুনিয়া বিস্মিত হইলেন। তখন একটা অজ্ঞাত আশঙ্কায় মিত্রজা মহাশয়ের হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল। নফর বলিল, "কর্ত্তা বাবু! ব্যাপারটা কেমন কেমন ঠেকছে। আজ কি আর গাড়ী নাই?"

রাত্রিতে আর ট্রেণ ছিল না। অগত্যা উদ্বেগে আশঙ্কায় রাত্রিটা কাটাইয়া পরদিন সকালের গাড়ীতেই মিত্রজা মহাশয় নফরের সহিত বাটী যাত্রা করিলেন।

বেলা নয়টার সময় মিত্রজা বাটীতে আসিয়া সমস্ত শুনিলেন। শুনিয়াই তিনি কাঁদিয়া ফেলিলেন। তারপর লোকজন সঙ্গে লইয়া ইন্দুর অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু কোন স্থানেই তাহার সন্ধান পাইলেন না। অবশেষে বাধ্য হইয়া তাঁহাকে পুলিসে সংবাদ দিতে হইল। দারোগা বাবু তাঁহার এজাহার ডায়েরী বুকে লিখিয়া লইলেন, এবং কনেষ্টবল চতুর সিংকে ঘটনার কিয়দংশ বুঝাইয়া দিয়া মাধ্যাহ্নিক নিদ্রার আয়োজনে ব্যস্ত হইলেন। চতুর সিংও ঘটনার পাক দিতে দিতে আপন মনে "সোহি আজু নেহি ছোড়িরে" ধরিল। মফস্বল পুলিসের তদন্ত প্রায়ই অনেক স্থলে এইরূপ। তবে হাতে চোর ধরাইয়া দিলে সে অন্য কথা।

(৪)

ইহার পরদিন খুব সকালে নফর বাহিরে আসিয়াই দেখিল যে, বাটীর সম্মুখে বৃক্ষতলে ইন্দুর অচেতন দেহ পড়িয়া রহিয়াছে। নফর তাড়াতাড়ি মিত্রজা মহাশয়কে ডাকিল। দেখিতে দেখিতে অনেক লোক জমিয়া গেল। তখন ধরাধরি করিয়া অচেতনাবস্থায় ইন্দুকে বাটীর ভিতর আনিল। গৃহিণী চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। পুলিসে সংবাদ গেল। ডাক্তার আসিয়া সযত্নে ইন্দুর চিকিৎসা করিতে লাগিলেন।

অমরনাথকে টেলিগ্রাম করা হইল। মধ্যাহ্ন কালে অমরনাথ বাটীতে উপস্থিত হইলেন।

অনেক যত্নে ও শুশ্রূষায় ইন্দুর চৈতন্য হইল। হতভাগিনী কাঁদিতে কাঁদিতে সমস্ত কথা পুলিসের নিকট বলিল। তাহার সর্ব্বনাশের মূল কারণ নগেন

ঘোষকে চিনিয়াছিল, ইহাও সে বলিল। পুলিস তখন প্রধান আসামী নগেন ঘোষকে গ্রেপ্তার করিল। পুলিসের পীড়নে নগেন, শরৎ ও অন্যান্য আসামীগণের নাম বলিয়া ফেলিল। শরৎ ও অন্য একজন আসামী ধরা পড়িল; অবশিষ্ট দুই ব্যক্তির কোন সন্ধান পাওয়া গেল না। মিত্রজা মহাশয় আইনের ভয়ে বিশেষত প্রতিহিংসা-পরবশ হইয়া আদালতে মোকর্দ্দমা রুজু করিলেন।

নির্দ্দিষ্ট দিনে অনেকেই এই বিচার দেখিতে ছুটিল। আদালত গৃহে লোকে লোকারণ্য হইল। সকলেই মনে মনে পাপিষ্ঠের শাস্তির জন্য ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতে লাগিল জনৈক ইংরাজ মাজিষ্ট্রেটের নিকট বিচার আরম্ভ হইল। আসামী গণকে কাট গড়ায় দাঁড় করান হইল। ইন্দুর এজাহার সমাপ্ত হইলে, ডাক্তার, পুলিস ও অন্যান্য লোকের সাক্ষ্য লইয়া মাজিষ্ট্রেট্ সাহেব রায় দিলেন। নগেনের ও শরতের দুই বৎসর এবং অপর আসামীর এক বৎসর কঠোর শরিশ্রমের সহিত কারাদণ্ড হইল। পলাতক আসামীদ্বয়ের জন্য ওয়ারেণ্ট বাহির হইল। প্রহরীরা আসামীগণকে লইয়া গেল। আদালত ভঙ্গ হইল। দর্শকগণ হৃষ্ট মনে বিচারককে ধন্যবাদ দিয়া গৃহাভিমুখে ফিরিল।

এতক্ষণ ইন্দু যেন কলের পুতুলের মত নীরবে একপার্শ্বে দাঁড়াইয়াছিল। সে কি করিয়াছে, কি বলিয়াছে, কি হইতেছে, কিছুই বুঝিতে পারিতেছিল না। এখন যেন অল্পে অল্পে তাহার চৈতন্য ফিরিয়া আসিতে লাগিল, একে একে সমস্ত ঘটনা, সমস্ত কথা মনে পড়িল। আদালত গৃহ লোক শূন্য হইলে প্রহরী তাহাকেও যাইতে বলিল। চমকিয়া সে চারিদিকে চাহিল, কিন্তু কাহাকেও দেখিতে পাইল না। তখন সে ভয়ে ভয়ে ধীরে ধীরে বাহিরে আসিয়া স্বামীকে খুঁজিল, শ্বশুরকে খুঁজিল, শেষে যাহাতে আসিয়াছিল, সেই পাল্কী খানাও খুঁজিল; কিন্তু কাহাকেও দেখিতে পাইল না। তখন ইন্দু পথের ধারে দাঁড়াইয়া কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিল। ভাবিল, তাহারা এইখানেই কোথায় আছে, এখনই তাহাকে লইতে আসিবে। কিন্তু অনেকক্ষণ অপেক্ষার পরও কেহই আসিল না দেখিয়া তাহার বড় ভয় হইল। সে দেখিল, রাস্তার লোকেরা তাহার দিকে চাহিয়া চাহিয়া চলিয়া যাইতেছে, সম্মুখের দোকানের লোক গুলা তাহাকে দেখিয়া কি বলাবলি করিতেছে। এদিকে বেলাও প্রায় শেষ হইয়া আসিতেছে। এ কি হইল? বিস্মিতা ইন্দু ভাবিল, এ কি হইল? ইহারা কোথায় গেল? কিছু বিপদ হইয়াছে, কি? আর তাহাকে কলঙ্কিনী ভাবিয়া চির দিনের নিমিত্ত বিসর্জ্জন— না, না, সে কথা মনে করিতেও ইন্দুর সর্ব্বশরীর কাঁপিয়া উঠিল। চারিদিকে

অন্ধকার দেখিল। অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া অবশেষে ভগবানকে ডাকিতে ডাকিতে ইন্দু রাস্তায় নামিল। সে সেখান হইতে নলদার রাস্তা কতকটা চিনিত। নলদাতেই তাহার মাতুলালয় ছিল। বাল্যকালে সে এই পথ দিয়া হাঁটিয়া তথায় দুই একবার গিয়াছিল।

(৫)

পথের লোককে রাস্তা জিজ্ঞাসা করিয়া ইন্দু যখন বাটীর নিকট উপস্থিত হইল, তখন সন্ধ্যা হইয়াছে। বাটী দেখিয়া ইন্দুর সাহস হইল। তারপর দ্রুতপদে বাটীতে প্রবেশ করিতে গিয়া দেখিল, বাটীর দ্বারের সম্মুখে অমরনাথ বসিয়া আছেন। তখন সন্ধ্যার অন্ধকার একটু ঘনাইয়া আসিয়াছে সেই অস্পষ্ট অন্ধকারে ইন্দু দেখিল, অমরনাথ মাথায় হাত দিয়া কি ভাবিতেছেন, আর এক একবার কোঁচার খুঁটে চক্ষু মুছিতেছেন। শিহরিয়া ইন্দু দাঁড়াইয়া পড়িল। অমরনাথ একবার শূন্য দৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিলেন, চাহিয়াই চক্ষু নত করিলেন। দুই চক্ষু দিয়া অবিরল অশ্রুধারা গড়াইতে লাগিল। ভয়ে ভয়ে ইন্দু জিজ্ঞাসা করিল, "কেন কাঁদিতেছ ?"

তখন সেখানে আর কেহ ছিল না।

সেই স্বরে অমরনাথের হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল। কি যেন বলিতে গেলেন, কিন্তু কথা বাধিয়া গেল। হায় হায়, সে নিষ্ঠুর হৃদয় বিদারক বাক্য তিনি কিরূপে উচ্চারণ করিবেন? কোন প্রাণে এই মৃদুলতার উপর বজ্রাঘাত করিবেন? কোন অপরাধে এই ফুল্ল কুসুমটীকে পদদলিত করিতে অগ্রসর হইবেন। এখন যে তাহার একদিকে পিতৃআজ্ঞা, অন্যদিকে পত্নীস্নেহ; একদিকে সমাজ; অন্যদিকে সুখ; একদিকে কর্ত্তব্য, অন্যদিকে জীবন, অমরনাথ এখন এই মহাসন্ধি স্থলে দণ্ডায়মান। পিতার আদেশ, জন্মের মত ইন্দুকে পরিত্যাগ করিতে হইবে;—সমাজের কঠোর শাসন, ইন্দুর—অজ্ঞান কলুষিতা ইন্দুর ছায়া সংস্পর্শে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে।

অমরনাথ পিতার অধীন, পিতা সমাজের অধীন; কিন্তু সমাজ স্বাধীন। তাই সে কাহারও মুখের দিকে চাহেনা, কাহারও সুখ দুঃখের—জীবন মরণের প্রতি লক্ষ্য করে না; যায় যাউক সংসার রসাতলে,—যায় যাউক নিষ্পাপীর মস্তকে বজ্রপাত; সে দোষী নির্দ্দোষী দেখিবে না, জ্ঞান অজ্ঞানের বিচার করিবে না; কেবল চক্ষুমুদিয়া আপনার কঠোর শাসন অপ্রতিহত ভাবে চালাইবে।

অমরনাথকে নিরুত্তর দেখিয়া ইন্দু বড়ই ভীতা হইল। সে আশঙ্কিত হৃদয়ে কম্পিত পদে দ্বারের দিকে অগ্রসর হইল। অমরনাথ আর থাকিতে পারিলেন না, বালকের ন্যায় কাঁদিয়া উঠিলেন। ইন্দু তাঁহার দিকে চাহিয়া স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইল।

এমন সময় ভিতর হইতে গম্ভীর স্বরে মিত্রজা ডাকিলেন, "অমর!"

পিতার সে কঠোর আহ্বানে অমরনাথের চৈতন্য হইল, তিনি চক্ষু মুছিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। মিত্রজা মহাশয় দ্বারের নিকট আসিয়া, ইন্দুর দিকে চাহিয়া কঠোর স্বরে অকম্পিত কণ্ঠে বলিলেন, "কি করিব মা! তোমার কোন দোষ নাই, কোনও পাপ নাই জানি, কিন্তু সমাজ যে তা' শুনিবে না। সমাজ তো ছাড়িতে পারি না মা!"

ইন্দুর মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল, সে কেবল স্থির দৃষ্টিতে মিত্রজার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। মিত্রজা মহাশয় "এস অমর!" বলিয়া অমরনাথের হাত ধরিয়া ভিতরে লইলেন। ইন্দু কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "আমি কোথায় যাব—"

"তুমি এখন যেখানে ইচ্ছা যাইতে পার, আমরা আর তোমাকে গ্রহণ করিতে পারি না।"

দ্বার রুদ্ধ হইল। ভিতর হইতে গৃহিণীর ক্রন্দন শব্দ শ্রুত হইল।

আর ইন্দু—সেই রুদ্ধ দ্বারের বাহিরে দাঁড়াইয়া হতভাগিনী ইন্দু চারিদিক শূন্য দেখিল। তাহার দৃষ্টিতে পৃথিবীর সমস্ত আলোক এককালে নিবিয়া গেল. সমগ্র বিশ্ব বিরাট্ মূর্ত্তিতে, ভীষণরবে তাহার চারিদিক ঘুরিতে লাগিল, পায়ের নীচে পৃথিবীটা যেন থাকিয়া থাকিয়া কাঁপিয়া উঠিল; মাথা ঘুরিয়া পড়িল, সর্ব্বাঙ্গ অবশ হইয়া আসিল। দাঁড়াইতে না পারিয়া হতভাগিনী সেইখানেই মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িল। তখন অন্ধকারটা বেশ জমাট বাঁধিয়াছে।

কতক্ষণ পরে?—ইন্দু তাহা জানে না—তাহার একটু একটু চৈতন্য তখন সে দ্বার হইতে উঠিয়া রাস্তায় আসিল। নিরাশ দৃষ্টিতে চারিদিকে চাহিল, কিন্তু সূচীভেদ্য অন্ধকারে কিছুই দেখা যায় না। কেবল অন্ধকার—অন্ধকারের পর অন্ধকার, কে যেন উপর হইতে স্তূপে অন্ধকার ঢালিয়া দিয়াছে। উপরে চাহিয়া দেখিল, উদার অনন্ত আকাশ, তাহাতে অনন্ত নক্ষত্র মালা; মাঝে মাঝে এক একটা বৃহদাকার কালো মেঘ ভীষণাকৃতি দৈত্যের ন্যায় ছুটাছুটী করিয়া সেই নক্ষত্রমালা, আকাশ পৃথিবী সমস্ত ঢাকিয়া ফেলিতেছে। সেই নীরব নিশিথে নীরব অন্ধকার স্তূপের মধ্যে দাঁড়াইয়া ইন্দু দেখিল, জগতে কেবল অন্ধকারের রাজত্ব সে এই বিরাট বিশ্বব্যাপী অন্ধকার-সমুদ্রে ডুবিয়াছে। তাহার জগৎ

এত বড় বিশাল ব্রহ্মাণ্ডে একটুও আলোক নাই। বুঝিল, এই বিশাল সমুদ্রে ডুবিয়া মরিতে হইবে তাহাকে,—এ সংসারে এমন একজনও দয়ালু নাই, যে তাহাকে উদ্ধার করিবে। হায়! হায়! তবে কোথায় যাইবে অভাগিনী? এই জীবন মৃত্যুর সন্ধিস্থলে দাঁড়াইয়া সে ভাবিল, হায় রে তবে কোথায় যাইব আমি? তখন তাহার শৈশবের; কৈশোরের, যৌবনের সব কথা মনে পড়িল। মনে পড়িল, অতি শৈশবে সেই একখানি স্নেহমাখা অস্পষ্ট মুখছবি। তার পর কৈশোরে—যৌবনে, শ্বশুরের আদর, শ্বশ্রুর অতুল স্নেহ, স্বামীর অগাধ ভালবাসা। মনে পড়িল, সুখের পাতান সংসার সে সংসারে আনন্দের শান্ত উচ্ছ্বাস। দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া ইন্দু বড় কান্নাই কাঁদিল। কিন্তু কে শুনিবে তাহার সেই কাতর ক্রন্দন, কে বুঝিবে তাহার হৃদয়ের অনন্ত যন্ত্রণা? কেবল নীরব রজনী নীরবে সেই করুণ ক্রন্দন বহিয়া বহিয়া কাঁপিতে লাগিল।

এই আশ্রয়হীনা অবলা কোথায় যাইবে? কাহার দ্বারে আশ্রয় ভিক্ষা করিবে? এ জগতে যে তাহার আর এতটুকুও স্থান নাই, আপনার বলিতে কেহই নাই? তবে বলিয়া দাও সমাজ! কোথায় দাঁড়াইবে এই অভাগিনী।

(৫)

নলদা গ্রামখানির প্রান্তভাগে ক্ষুদ্র নদীটী তর্ তর্ করিয়া বহিয়া যাইতেছে। একখান কালো মেঘের ছায়া পড়িয়া নদীবক্ষ অন্ধকার করিয়া রাখিয়াছে। তীরে বৃক্ষশিরে খদ্যোৎ জ্বলিতেছে, শরবনে ঝিঁ ঝিঁ পোকা ডাকিতেছে, সৈকতে শৃগাল দল আহারান্বেষণে ঘুরিতেছে। রজনীর নীরবতার সহিত নদীটীও নীরব হইয়াছে। কেবল স্থানে স্থানে সলিল-চুম্বিত বৃক্ষশাখায় প্রতিহত হইয়া কল্ কল্ শব্দ করিতেছে। চতুর্দ্দিক নীরব নির্জ্জন। এই অন্ধকারে—নীরব নির্জ্জন নদীতীরে আসিয়া দাঁড়াইল ও কে? অভাগিনী নিরাশ্রয়া ইন্দু।

অন্ধকারে নির্জ্জন পথের উপর দাঁড়াইয়া ইন্দু কত কি ভাবিল। সে ভাবনার অন্ত নাই, লক্ষ্য নাই, অনেক ভাবিয়াও সে কিছু স্থির করিতে পারিল না। তাহার প্রধান চিন্তা, সে এখন কোথায় যাইবে? সে সমাজ-পতিতা, কলঙ্কিনী, কে তাহাকে আশ্রয় দিবে? পতিগৃহে স্থান নাই, পিতৃকুলেও কেহ নাই, দূর আত্মীয় কেহ থাকিলেও তাহাকে আশ্রয় দিবে কেন? কি বলিয়াই বা তাহাদের নিকট আশ্রয় ভিক্ষা করিবে? তবে কোথায় যাইবে অভাগিনী? সে এখন একাকিনী অসহায়া, আবার যদি কোন পাষণ্ডের কবলে পড়ে? সংসারে তো অনেক নগেন ঘোষ আছে।

অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া অবশেষে হতভাগিনী মরিতে সংকল্প করিল। সংকল্পমাত্রেই সেই ভীষণ অন্ধকারের মধ্যে মৃত্যুর একটা করাল ছায়া তাহার সম্মুখে নাচিয়া উঠিল। সে ভীষণ ছায়া দর্শনে ভীতা হইয়াও ইন্দু তাহার অনুসরণ করিল। এখন ঐ করাল ছায়াই যে তাহার একমাত্র আশ্রয়। অভাগিনী একবার জন্মশোধ পতিগৃহ পানে চাহিল, উদ্দেশে পতির চরণে প্রণাম করিয়া অশ্রু মুছিতে মুছিতে সে স্থান ত্যাগ করিল। অজ্ঞানকলুষিতা পতিপরায়ণা হিন্দু-কুললক্ষ্মী মরিতে চলিল। কেহই দেখিল না, সকলেই নিদ্রিত কেবল উপর হইতে একজন দেখিলেন, তাঁহার করুণ হৃদয়োচ্ছাস-সম্ভূত এক বিন্দু অশ্রু সহস্র বজ্র রূপে সমাজের মস্তকে পড়িল। কিন্তু সমাজ তখন সুষুপ্ত।

সেই নীরব নিশীথিনী—নির্জ্জন নদীতীর প্রতিধ্বনিত করিয়া একটী মাত্র শব্দ উঠিল, "মাগো!" ক্ষণেকের জন্য নদীবক্ষ আলোড়িত হইয়া আবার স্থির হইল। কেবল সেই করুণ স্বরখানি তরঙ্গে তরঙ্গে কাঁপিতে লাগিল।

কিন্তু ইন্দু মরা হইল না সমাজ-নিপীড়িতা হতভাগিনীর মরণই মঙ্গল ছিল, কিন্তু তাহা হইল না। মরিলে বুঝি অভিশপ্ত সমাজের কঠোর প্রায়শ্চিত্ত জগৎ দেখিতে পাইবে না। তাই হতভাগিনী মরিতে গিয়াও বাঁচিল।

অনেকে হয়তো বলিবেন, সমাজ কোন্ পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিবে? আমি বলিব, তাহার পাপ, পক্ষপাতিতা, বিচার বিভ্রাট। সমাজ বলিবে, আঘ্রাত কুসুম হিন্দুর দেব পূজায় ব্যবহৃত হয় না। আমি বলি, সেই দেব পূজার অযোগ্য কুসুমটীকে এইরূপে নির্দ্দয় ভাবে পদদলিত করা ব্যতীত অন্য উপায় কি নাই? আর যে পাপিষ্ঠ এই দেব ভোগ্য কুসুমটীকে চিরদিনের জন্য নষ্ট করিল, তাহার জন্য কি ইহার অপেক্ষা কোন কঠোর শাস্তির বিধান হইতে পারে না? বিশেষতঃ যে বাঁচিয়াও মৃত প্রায়, তাহার ক্ষত বিক্ষত হৃদয়ে এরূপ নির্ম্মম ভাবে অস্ত্রাঘাত কি ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দু সমাজের ধর্ম্ম? জানি না আরও কতদিন সমাজ এই সকল ব্যথিত হৃদয়ের তপ্তশ্বাস মস্তক পাতিয়া লইবে, কতদিনে তাহার নিদ্রালস দৃষ্টি এ দিকে পড়িবে।

(৭)

যেথানে ইন্দু ডুবিয়াছিল, তাহার অনতিদূরে অন্ধকারে একখানি পান্‌সী বাঁধা ছিল। পানসীর দাঁড়ী মাঝিরা ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল, কেবল আরোহী যুবক অনিদ্রা প্রযুক্ত বাহিরে বসিয়াছিল। যুবকের বাস কলিকাতায়। জমিদারী পরিদর্শন উপলক্ষে মফস্বলে আসিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছিল। যুবক বসিয়া

বসিয়া অন্ধকারে অস্পষ্ট দেখিল, একজন স্ত্রীলোক আসিয়া নদীতীরে দাঁড়াইল। এই গভীর রজনীতে নির্জ্জন নদীতীরে কে স্ত্রীলোক আসিল? কিন্তু চিন্তার অবসর হইল না। মুহূর্ত্ত মধ্যে একটা করুণ স্বর তাহার কাণে বাজিল, স্বরের সঙ্গে সঙ্গে নদীজলে একটী গুরুভার পতনের শব্দ হইল। স্ত্রীলোকটীও অদৃশ্য হইল।

যুবকের আর বুঝিতে বাকী রহিল না। তৎক্ষণাৎ দাঁড়ী মাঝিগকে জাগাইয়া আলোক লইয়া জলমগ্না রমণীর অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইল। কিছুক্ষণ অন্বেষণের পর পান্‌সীর হালের নিকট ইন্দুর অচেতন দেহ পাওয়া গেল, সকলে ধরাধরি করিয়া তাহাকে উপরে তুলিল।

যুবকের শুশ্রূষায় ইন্দুর চৈতন্য হইল তখন যুবক তাহার পরিচয়াদি জিজ্ঞাসা করিল। এবং পরিচয় পাইলে তাহাকে তাহার বাটীতে রাখিয়া আসিবে একথাও বলিল। কিন্তু ইন্দু কিছুই বলিল না। বলিবেই বা কি? সে কেবল হুতাশ নয়নে কাঁদিতে লাগিল। অগত্যা যুবক এক্ষণে প্রশ্নে নিরস্ত হইয়া নৌকাতে রাখিতেই মনস্থ করিল। ভাবিল, সময়ান্তরে কৌশলে পরিচয় লইয়া বাটী পাঠাইয়া দিলেই হইবে। এখন ছাড়িয়া দিলে যদি আবার আত্মহত্যার চেষ্টা করে।

প্রভাত হইলে যুবক পান্‌সী ছাড়িতে অনুমতি দিল। পান্‌সী কলিকাতা অভিমুখে চলিল।

(৮)

যথা সময়ে নৌকা কলিকাতায় আসিল। যুবক কি ভাবিয়া ইন্দুকে বাটীতে না লইয়া গিয়া একটী স্বতন্ত্র বাটীতে রাখিয়া দিল। পরিচর্য্যার জন্য একজন ঝি নিযুক্ত হইল।

ইন্দু সমাজ-পতিতা ঘৃণিতা স্বজন পরিত্যক্তা হইলেও তাহার অতুলনীয় সৌন্দর্য্যরাশি তাহাকে ত্যাগ করে নাই। যুবক স্থিরচিত্ত হইলেও কয়দিন যাবৎ এক নৌকায় বাস করিয়া, সেই ভুবনমোহন রূপ—দেহভরা যৌবন রাশি দেখিয়া দেখিয়া চিত্ত স্থির রাখিতে পারিল না। রূপে কঠোর সংযমী মুনির সংযম ভঙ্গ হয়, যুবক কোন্ ছার! সে সেইরূপ মোহে আকৃষ্ট হইল, তাহার মনে বলবতী পাপ বাসনা জাগিল।

কলিকাতায় আসিয়া যুবক প্রথম কয়েকদিন ইন্দুর সহিত বেশ শিষ্ট ব্যবহার করিল। তারপর ইঙ্গিতে ইঙ্গিতে প্রেম বাসনা জানাইল অবশেষে হৃদয়ের

জ্বলন্ত আগুন চাপিয়া রাখিতে না পারিয়া একদিন মুখ ফুটিয়া সকল কথা বলিয়া ফেলিল। মিনতি করিয়া, ঐশ্বর্য্য অলঙ্কার প্রভৃতির লোভ দেখাইয়া, শেষে পায়ে পর্য্যন্ত ধরিয়া ইন্দুর নিকট প্রেম ভিক্ষা করিল। ভয়ে ইন্দুর অন্তরাত্মা শুকাইয়া গেল। হায়, একবার সে অজ্ঞানে যাহা হারাইয়াছে, যাহার জন্য বাঁচিয়াও মরিয়া রহিয়াছে, এখন স্বেচ্ছায় সেই অমূল্য রত্ন কাহাকে বিলাইয়া দিবে? কখনই না। একবার মরিতে গিয়া বাঁচিয়াছে, আবার মরিবে। কিন্তু কি উপায়ে মরিবে? হতভাগিনী কিরাত-কবলিতা কুরঙ্গীর ন্যায় ছট্‌ফট্ করিতে লাগিল। পলায়নের চেষ্টা করিল, কিন্তু পলাইবে কিরূপে? সে যে এখন বন্দিনী।

যখন যুবকের সকল কৌশল সকল অনুনয় বিনয় ব্যর্থ হইল, তখন সে অন্য উপায়ে আপনার অভীষ্ট সিদ্ধ করিতে বাসনা করিল। সে দাসী দ্বারা ইন্দুকে একটা মত্ততাকর ঔষধ গোপনে পানীয় দ্রব্যের সহিত খাওয়াইয়া দিল, এবং সেই মত্তাবস্থায় তাহাকে তীব্র সুরা পান করাইয়া পাপিষ্ঠ আপনার অভিলাষ পূর্ণ করিতে চেষ্টা করিল। তাহার পর যাহা হইল, তাহা হৃদয়ভেদী, মানব-নেত্রে অদৃশ্য!

ঐ চাহিয়া দেখ, প্রকাশ্য রাজপথের উপর জনতাবৃদ্ধি করিয়া, উন্মাদিনী আলুলায়িত-রুক্ষকুন্তলা, হাস্য-ক্রন্দন-বিভোলা, নিরাশ প্রতিমা কে ঐ দাঁড়াইয়া পাগলিনী? ঐ কি ইন্দুবালা?

তবে বলিয়া দাও সমাজ! কোন্ মহা অপরাধে—কাহার নিষ্ঠুর অভিশাপে হতভাগিনীর এই কঠোর শাস্তি? ইহা হিন্দুকুল লক্ষ্মীর কোন্ পাপের প্রায়শ্চিত্ত?

রাখী-পূর্ণিমা-সম্মিলনে রাখী-বন্ধন উপলক্ষে

গীত।

শ্রীমন্মথনাথ বসু বি, এ, বিরচিত।

খাম্বাজ—দাদ্‌রা।

হ্যাঁ হাঁ এই ভাল, এই ভাল।
পায়ে ধরে সাধা, স্বধু বসে কাঁদা,
আর সাজেনাক দাদা,—হাজার হলেও কাল।
এটা রাখীর বাঁধন—এটা ছেঁড়া কারুর সাধ্য নয়—
ক্রূর অক্রূর যেই বা আসুক নাইক কিছু ভয়;
কিন্তু বাঁধবার সনে, দোহাই দাদা, প্রাণটা একটু ঢাল।
ধড়া চুড়ো ছেড়ে দাদা, একবার রোদে দাও ত পিঠ,
আর মুড়ি মুড়কি ধর, ফেলে চা আর বিষকিট,
দেখি শ্যাম হারে, কি প্যারী হারে, গোরা হারে কি কাল॥

সমালোচনা।

দার্শনিকতত্ত্ব।

শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র ন্যায়রত্ন বিরচিত।

জ্ঞান-যোগ।—সংসার, ধর্ম্ম, জগৎ, পরমাত্মা, জীবাত্মা, জন্মান্তর, মুক্তি, জ্ঞান ও কর্ম্ম, সাকারোপাসনা, ভক্তি এবং জাতিভেদ, এই গুলি এই গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয়। ন্যায়রত্ন মহাশয় বলিয়াছেন শ্রুতি ও দর্শনশাস্ত্র এই জ্ঞান-যোগের অবলম্বন। এতদ্বারাই বুঝা যাইতেছে, সনাতন আর্য্যধর্ম্মের উপাসকেরা এই জ্ঞান-যোগ নির্দ্দিষ্ট বিষয় গুলি যত্নপূর্ব্বক আলোচনা করিলে জ্ঞান-যোগের অধিকারী হইতে পারিবেন। কর্ত্তব্য-নিষ্ঠাই ধর্ম্ম; কর্ত্তব্যে অবহেলাই পাপ; জ্ঞান-যোগে বিশেষরূপে ইহা বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে। দর্শন-শাস্ত্র সাধারণের পক্ষে সহজে বোধগম্য হয় না। ন্যায়রত্ন মহাশয় যতদূর সম্ভব জ্ঞান-যোগের ভাষাটী প্রাঞ্জল করিয়া সজ্জিত করিয়াছেন। এই গ্রন্থখানি হিন্দু সংসারের অনেক মঙ্গল সাধন করিবে।

কৃষি-সংগ্রহ।

মহর্ষি পরাশর প্রণীত কৃষি-বিজ্ঞান অবলম্বনে শ্রীযুক্ত হরিমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় এই পুস্তক খানি লিখিয়াছেন। ইহাতে মূল ও অনুবাদ উভয়ই আছে। বৃষ্টি-জ্ঞান, বাহনবিধি, গোশালা নির্ম্মাণ, হল-সামগ্রী, হল চালন, বীজপবন, ভূমিতে সার প্রদান, ধান্য রোপন ও ধান্যচ্ছেদন প্রভৃতির নিয়মগুলি এই পুস্তকে বিশেষ রূপে বর্ণিত আছে. এদেশে পাশ্চাত্য কৃষি প্রণালীর প্রবর্ত্তন হরিমোহন বাবুর বাঞ্ছনীয় নহে। বহুকাল পূর্ব্বে মহর্ষি পরাশর এই ভারতের জন্য যে সকল কৃষিবিধি—নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন তদনুসারে আধুনিক কৃষি প্রণালীর সংস্কার করার করাই তিনি আবশ্যক বোধ করেন। যাহারা এদেশের কৃষি-বন্ধু তাহারা এই পুস্তক নির্দ্দিষ্ট প্রণালী গুলি কৃষকগণকে শিখাইয়া দিলে এবং আপনারা যত্নপূর্ব্বক তত্ত্বাবধান করিলে উপকার হইতে পারিবে। রত্নভূমির উর্ব্বরতা সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন নাই। বিধিমতে যত্ন করিলেই রত্ন প্রসূত হইতে পারিবে। হরিমোহন বাবুর যত্ন সফল হইলেই আমরা তুষ্ট হইব। পুস্তকের মূল্য ৷৵০ দশ আনা মাত্র। পুস্তকে যেরূপ পাণ্ডিত্য প্রদর্শন করিয়াছেন সেজন্য ধন্যবাদ না দিয়া থাকিতে পারিলাম না।

নব্য জাপান রুষ জাপান যুদ্ধের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস।—শ্রীউমাকান্ত হাজারী প্রণীত মূল্য চারি আনা। জাপানের অভ্যুদয় ও জাপান সৈনিকের হস্তে রুষীয় বীরগণ পদে পদে বিপর্য্যস্ত এই দুইটী বিষয় লইয়া এই ক্ষুদ্র পুস্তক বিরচিত হইয়াছে। রুষ-জাপ যুদ্ধের বৃত্তান্ত গুলি সংবাদ পত্রের টেলিগ্রামে যখন যেরূপ প্রকাশ হইয়াছে তাহারই স্থূল মর্ম্ম এই পুস্তকে দৃষ্ট হয়। ভূমিকা যেরূপ বৃহৎ চারি আনা মূল্যের পুস্তক তাহার উপযুক্ত হয় নাই, ইহা বলাই বাহুল্য। তথাপি আজিকাল রুষ-জাপানের যুদ্ধ লইয়া সমগ্র জগতে যেরূপ তুমুল আন্দোলন পড়িয়াছে তাহাতে সংক্ষিপ্ত হইলেও এই পুস্তক খানি কৌতূহলী পাঠক বৃন্দের কতূহল অনেক পরিমাণে পরিতৃপ্ত হইতে পারিবে এরূপ আশা করা যায়। এই গ্রন্থ লেখকের পর্য্যবেক্ষণ শক্তির যথেষ্ট পরিচয় পাইলাম।

রামচন্দ্র মাহাত্ম্য।—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ দেবের পরমপ্রিয়ভক্ত সিমুলিয়া নিবাসী (অধুনা ৺স্বর্গবাসী) ডাক্তার রামচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের সংক্ষিপ্ত জীবন কাহিনী; রামকৃষ্ণের সেবকমণ্ডলী কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মহাত্মা রামচন্দ্রের জীবন-ব্রত, অসাধারণ ত্যাগ স্বীকার, আশ্রমে দীনভাব, ধর্ম্মে অচলা ভক্তি ও গুরু পদে জীবনোৎসর্গ প্রভৃতি দেবোপম গুণাবলী দু চারি কথায় বলিয়া শেষ করা অসাধ্য। তাঁহার জীবনান্তে এই জন্মভূমি পত্রিকায় সংক্ষিপ্ত জীবনী প্রকাশিত হইয়াছিল। এই পুস্তকে তদতিরিক্ত অনেকগুলি জ্ঞাতব্য বিষয় আছে। তত্ত্বমঞ্জরী মাসিক পত্রিকায় সময়ে সময়ে রামবাবুর চরিত্র সম্বন্ধে যে কয়েকটী প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল, এই পুস্তিকায় সেইগুলি সংগৃহীত হইয়াছে। নট-কুলচূড়া-মণি বাবু গিরীশচন্দ্র ঘোষ "রামদাদা" শিরোনামে রামবাবুর উদ্দেশে যে একটী ক্ষুদ্র প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন, তাহাও এই পুস্তিকায় মুদ্রিত হইয়াছে। এই পুস্তিকা পাঠ করিয়া পাঠকমণ্ডলী আমাদের শ্রদ্ধাস্পদ মহাত্মা রামচন্দ্রকে কতক পরিমাণে চিনিতে পারিবেন ইহাই আমাদের আশা। মহাত্মার প্রিয়শিষ্য শ্রীযুক্ত কালিপদ বসু এই পুস্তিকার সঙ্কলন কর্ত্তা। ভূমিকার স্বাক্ষর দর্শনে আমরা ইহা জানিতে পারিয়াছি। স্বাক্ষর আছেঃ—"যোগবিনোদ," মহাত্মা রামচন্দ্র আদর করিয়া কালিপদকে ঐ উপাধি প্রদান করিয়াছিলেন।

চৈতন্য লাইব্রেরীর পঞ্চদশও ষোড়শ বার্ষিক বিবরণী।—ইংরাজী ১৯০৩। ১৯০৪ অব্দের রিপোর্ট। ১৯০৩ অব্দে ১৩২৩৩ খণ্ড পুস্তক সংগৃহীত ছিল। তন্মধ্যে ১০৪০৯ খানি বাঙ্গালা, ২৮২৪ খানি ইংরাজী; প্রস্তাবিত বর্ষে ১৩২৯২ হইয়াছে। তন্মধ্যে ১০৫৭৬ খানা বাঙ্গালা, ২৭১৬ খানা ইংরাজী।

চৈতন্য লাইব্রেরী এই ষোড়শ বৎসরে অনেক কার্য্য করিয়াছেন। সাহিত্য-সেব গণকে যথেষ্ট উৎসাহ দিতেছেন। ভাল ভাল প্রবন্ধ লেখকেরা যথা যোগ্য পুরস্কার লাভ করিতেছেন, আমরা এই চৈতন্য লাইব্রেরীর কায়মন বাক্যে দীর্ঘ জীবন কামনা করি।

আমিষ নিরামিশ।—শ্রীমতী প্রজ্ঞাসুন্দরী দেবী প্রণীত আদিব্রহ্ম সমাজ যন্ত্রে মুদ্রিত মূল্য ২৲ দুই টাকা। শ্রীমতী আমাদের জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়ীর কন্যা; তাঁহার পিতৃদেবের উৎসাহে তিনি রন্ধন কার্য্যে সুশিক্ষিতা হইয়াছেন, বর্ত্তমান পুস্তকে এতদ্দেশীয় কতকগুলি খাদ্য প্রস্তুত করিবার প্রণালী লিপিবদ্ধ আছে। প্রণালীগুলি সুন্দর, এ খণ্ডে কতকগুলি নিরামিশ খাদ্য প্রস্তুতের পদ্ধতি আছে ভবিষ্যৎ খণ্ড আমিষ রন্ধনের প্রণালী থাকিবে, ভূমিকা মধ্যে গ্রন্থকর্ত্রি এইরূপ অঙ্গিকার রাখিয়াছেন বৎসরের কোন্ মাসে কোন কোন দ্রব্য ভোজনে উপকার এ পুস্তকে তাহারও উল্লেখ আছে এতাদৃশ্য পুস্তকের দ্বারা হিন্দু সংসারের অনেক উপকার হইবে আমরা এইরূপ আশা করি। রন্ধন নিপুণাসম্ভ্রান্ত বঙ্গ মহিলার হস্তে এইরূপ পুস্তক প্রস্তুত হওয়াতে আমরা পুস্তক পাঠে যার পর নাই আনন্দিত হইলাম।

পীড়িদর পীঢ়ী।—নবাবিস্কৃত ভারতের ইতিহাস, শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম, এ, ইহার আবিস্কার করিয়াছেন। ধুন্ধার রাজ্যের অন্তর্গত "সবাই" সবাই মাধোপুরের একবৃদ্ধ ব্রাহ্মণের নিকটে দেবনাগর অক্ষরে লিখিত কতকগুলি হিন্দী পুঁথি ছিল পণ্ডিত নগেন্দ্রনাথ সেই সকল পুঁথির মধ্য হইতে এইখানি নির্ব্বাচন করিয়া মূল ও অনুবাদ প্রকাশ করিয়াছেন। জোড়াসাঁকো ঠাকুর বংশীয় বিদ্যোৎসাহী বন্ধু প্রবর শ্রীযুক্ত বাবু ঋতেন্দ্রনাথ ঠাকুর এই পুস্তক প্রকাশের প্রধান সহায় ও পৃষ্ঠপোষক স্মরনাতীত কালাবধি সত্যাপ্রিয় ভারতে আর্য্য ইতিহাসের আদর এই পুস্তক তাহার প্রমাণ দেখাইয়া দিতেছে এতৎ পাঠে সত্য ও ইতিহাসিক জ্ঞান লাভ হইবে আমরা ইহা গৌরব করিয়া বলিতে পারি বাবু ঋতেন্দ্রনাথ ও নগেন্দ্র নাথ উভয়েই আমাদের ধন্যবাদের পাত্র ঐতিহাসিক গবেষণার গুণে নগেন্দ্রনাথ বিলাতের রাজকায় সাহিত্য সমিতির সভ্যপদ প্রাপ্ত হইয়াছেন তাঁহার দ্বারা আমরা ভারতীয় ইতিহাসের আর অধিক গুড়তত্ত্ব জ্ঞাত হইবার আশা করি। মূল্য ৸৹ বার আনা এই পুস্তকে মোগল বাদসাহগণের ছবি আছে।

সুভাবসঙ্গীত।—শ্রীহরদেব চট্টোপাধ্যায় বিরচিত। আলোচনা করিয়া দেখা গেল, সুভাব সঙ্গীত নামটি সার্থক হইয়াছে, কিন্তু দু একটি গীতে কবিত্ব লালিত্যের কিছু অভাব দৃষ্ট হইল।

REGISTERED No. C. 284.

[... বর্ষ।] ১৩১২ সাল। ভাদ্র, [২য় সংখ্যা।

হিন্দুধর্ম্ম ও সমাজের মুখপত্র

জন্মভূমি

(সচিত্র মাসিক-পত্রিকা ও সমালোচনী)।

বিষয়	পৃষ্ঠা	লেখক
১। তর্পণ	৪১	শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ কবিরত্ন।
২। মা আসিতেছেন	৪৭	শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রমোহন বসু।
৩। বর্ত্তমান কনোজ ও বালাপীর	৪৯	শ্রীযুক্ত ধর্ম্মানন্দ মহাভারতী।
৪। তেত্রিশ কোটি দেবতা	৫৪	শ্রীযুক্ত মোক্ষদাচরণ ভট্টাচার্য্য।
৫। সহানুভূতি	৫৭	শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রকুমার রায়।
৬। অদ্বৈতমতের সমালোচনা	৬১	শ্রীযুক্তআশুতোষ দেব এম, এ।
৭। গীত	৬৫	,, ,,
৮। ভুল (পদ্য)	৭৩	শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র বিদ্যারত্ন।
৯। আবাহন	৭৪	শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র স্মৃতিভূষণ।
১০। অশ্রু মুছাও	৭৬	,, ,,
১১। পূজা-প্রসঙ্গে	৭৭	শ্রীযুক্ত তারকনাথ মুখোপাধ্যায়।
১২। সমালোচনা	৮৩	,, ,,

লেখকগণের মতামতের-জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন।

জন্মভূমি-কার্য্যালয়।

শ্রীনরেন্দ্রনাথ দত্ত দ্বারা প্রকাশিত।

৩৯ নং মাণিক্ বসুর ঘাট ষ্ট্রীট,

কলিকাতা।

[বার্ষিক মূল্য ১৷৹ দেড় টাকা।] [নগদ মূল্য ৴১০ দশ পয়সা।

শ্রীল শ্রীমন্মহারজাধিরাজ কাশ্মীরাধিপতি তথা শ্রীল শ্রীযুক্ত মহারাজা ধিরাজ
বর্দ্ধমান-প্রদেশাধিপতি বাহাদুরের অনুমোদিত ও অনুজ্ঞাত সুপ্রসিদ্ধ

কবিরাজ শ্রীযুক্ত বিনোদলাল সেন মহাশয়ের

আদি-আয়ুর্ব্বেদ ঔষধালয়।

১১৬ নং লোয়ার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।

কুন্তলবৃষ্য তৈল জগ
অমূল্য ও অতুলনীয়—মস্তি
স্নিগ্ধকর ও স্মৃতিশক্তি বর্দ্ধক—
কেশকলাপের কান্তিপ্রদ
খালিত্য ও পালিত্যনা
অদ্বিতীয়। কেশের কমনীয়
কান্তি বৃদ্ধি করিতে, চিত্তের
নিত্যপ্রফুল্লতা অটুট রাখিতে
কুন্তলবৃষ্যের তুলনা নাই
ইহা অনুপম্ আদি ও অকৃত্রি
স্নিগ্ধগুণে কুন্তলবৃষ্যের সমতু
কোন তৈলই এ পর্য্য
আবিষ্কৃত হয় নাই।

বর্ত্তমান ভারতের প্রধা
ধর্ম্মসংস্কারক, শান্তি-সুখ-সন্তৃপ্ত
বিলাসভোগ বিমুক্ত আধ্যাত্মিক উৎকর্ষের সমুচ্চ সোপানে সমাসীন—পূজ্যপা
শ্রীমহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর বলিয়াছেন—“যে কুন্তলবৃষ্য তৈল এতদিন আমাকে
রক্ষা করিল, আজ তাহাকে পরিত্যাগ করিতে পারি না।”

কুন্তলবৃষ্য—সাহিত্যসেবিগণের মহোপকারক, কারণ ইহাতে মেধা ও স্মৃ
বৃদ্ধি হয়, চিন্তাশীলতা ও ভাবুকতা নবীভূত ও স্ফুরিত হয়।

এক শিশির মূল্য ১৲ টাকা প্যাকিং ও ডাকমাশুলাদি পাঁচ আনা।

উপহার—কুন্তলবৃষ্যের প্রত্যেক গ্রাহক তৈলের সঙ্গে একখানি করিয়া
সুন্দর চিত্র উপহার পাইবেন।

সতর্কীকরণ।—দুষ্ট লোকেরা বড়ই জাল করিতেছে; গ্রাহকগণ সাবধান:
আমাদের ঔষধালয় ভিন্ন কোথাও “কুন্তলবৃষ্য” কিনিবেন না, কিনিলেই
প্রতারিত হইবেন।

কবিরাজ শ্রীআশুতোষ সেন চিকিৎসক।

“জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী”

(সচিত্র মাসিক পত্র ও সমালোচনী।)

১৪শ বর্ষ। | ভাদ্র, ১৩১২ সাল। | ২য় সংখ্যা।

তর্পণ।

লেখক—শ্রীচন্দ্রনাথ কবিরত্ন।

অপর পক্ষ আসিয়াছে। সনাতন ধর্ম্মাবলম্বী ব্যক্তি মাত্রেই তর্পণের আয়োজনে মগ্ন হইয়াছেন। যে ব্যক্তি নিত্য ধর্ম্মানুষ্ঠানের কোন কর্ম্মই করেন না, তিনিও আজ ভাগিরথী তীরে উপবেশন করিয়া নিজে মন্ত্র পাঠে অসমর্থ বলিয়া পুরোহিতের নিকট কর জোড়ে মন্ত্র পাঠ করিয়া অপর পক্ষের তর্পণ কার্য্য সমাধা করিতেছেন। সকলের প্রাণেই দৃঢ় বিশ্বাস, বৎসরান্তে এই অপর পক্ষে পিতৃগণ স্ব স্ব বংশধরগণের নিকট হইতে এই জলাঞ্জলি গ্রহণ করিবার জন্য মর্ত্ত্যলোকে আগমন করেন, সনাতন ধর্ম্মাবলম্বীগণের প্রাণে ইহাই ধ্রুব বিশ্বাস; এই বিশ্বাস

আছে, বলিয়াই অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম পালনে হিন্দু অপরপক্ষ-তর্পণ কার্য্য সমাধা করিয়া থাকেন।

তর্পণ আমাদের ধর্ম্মানুষ্ঠানের নিত্যকর্ম্ম দীক্ষিত ব্যক্তির সন্ধ্যাহ্নিকের ন্যায় পিতৃপুরুষগণের আশীর্ব্বাদ প্রার্থনায় তাঁহাদের—স্মরণার্থ ব্রাহ্মণ শূদ্র সকলেরই তর্পণ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। পিতৃপুরুষদিগের প্রীত্যর্থ পিতৃ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া যে জলাঞ্জলি প্রদান করা হয়, তাহাকেই তর্পণ বলে। কৃষ্ণতিল তুলসীপত্র কুশা সংমিশ্রণে পবিত্র জল দান করাই হিন্দু শাস্ত্রের ব্যবস্থা। পবিত্র কুলে জন্ম গ্রহণ করিয়া নাস্তিক্য বুদ্ধি হেতু যিনি তর্পণ না করেন, জলার্থী পিতৃপুরুষগণ তাঁহার রুধির পান করেন, ইহারও শাস্ত্রীয় প্রমাণ আছেঃ—

নাস্তিক্য ভাবাদয়শ্চাপি ন তর্পয়তি বৈ সুতঃ।
পিবন্তি দেহরুধিরং পিতরো বৈ জলার্থিনঃ॥

তর্পণ নয় প্রকার প্রণালীতে বিভক্ত যথাঃ—দেব-তর্পণ, মনুষ্য-তর্পণ, ঋষীতর্পণ, দিব্য-পিতৃ-তর্পণ, যমতর্পণ, পিতৃতর্পণ, যমতর্পণ পিতৃতর্পণ, ভীষ্ম-তর্পণ, রাম-তর্পণ এবং লক্ষ্মণ তর্পণ। এই ব্যবস্থানুসারে তর্পণ করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

মহাত্মা শঙ্খ বলিয়াছেন,—সৌবর্ণ, রাজত ওড়ম্বর পাত্র, বা খড়্গনির্ম্মিত পাত্র দ্বারা পিতৃতীর্থ স্পর্শ করতঃ উদক দান করিবে যথা ঃ—

সৌবর্ণেন তু পাত্রেণ রাজতৌড়ুম্বরেণ চ।
খড়্গেন শঙ্কুনা বাপ্যুদকং পৈত্র স্পৃশন্ দদেৎ॥

তর্পণকালে নিম্নলিখিত তীর্থগুলি স্মরণ করা কর্ত্তব্য। যথা ঃ—

ওঁ কুরুক্ষেত্রং গয়াগঙ্গা প্রভাস পুষ্করাণি চ।
তীর্থান্যেতানি পুণ্যানি তর্পণকালে ভবন্তিহ॥

তৎপরে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর এবং প্রজাপতিকে অগ্রে তৃপ্তি করিবার জন্য পাঠ করিয়া এক এক বার জলাঞ্জলি দিবে ঃ—

ওঁ ব্রহ্মা তৃপ্যতাং, ওঁ বিষ্ণু স্তৃপ্যতাং, ওঁ রুদ্র স্তৃপ্যতাং, ওঁ প্রজাপতি স্তৃপ্যতাং। ব্রহ্ম তৃপ্তি হউন ইত্যাদি।

ঋষিগণ সাধারণ তৃপ্তিকে বড় সুখকর মনে করিয়া দেবতা, যক্ষ, নাগ, গন্ধর্ব্ব, অপ্সরা, অসুর, ক্রূরজীব, সর্প, সুপর্ণজাতীয় পক্ষী, বৃক্ষ, কুটিলগামী জীব, পক্ষী, বিদ্যাধর, জলচর, খেচর, নিরাহার জীব, পাপরত এবং ধর্ম্মরত যত প্রকার জীব আছে—ইহাঁদের তৃপ্তির জন্য দেবতীর্থের দ্বারা নিম্নলিখিত মন্ত্রে এক অঞ্জলি জল প্রদান ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। যথা ঃ—

ওঁ দেবা যক্ষাস্তথা নাগা গন্ধর্ব্বাপ্সরসাসুরাঃ। ক্রূরাঃ সর্পাঃ সুপর্ণাশ্চ তরবো জিহ্মগাঃ খগাঃ। বিদ্যাধরা জলাধারা স্তথৈবাকাশগামিনঃ। নিরাহারাশ্চ যে জীবাঃ পাপে ধর্ম্মে রতাশ্চ যে। তেষামাপ্যায়নায়ৈতদ্দীয়তে সলিলং ময়া।

এই তৃপ্তির উদ্দেশ্য অতি মহৎ। সকলকেই যদি আমি তৃপ্তি করিতে পারিলাম, তাহা হইলে আমার আর বিপদের আশঙ্কা কি?

তৎপরে দর্শনশাস্ত্রবিৎ কতকগুলি আচার্য্যের তৃপ্তির জন্য শাস্ত্রতর্পণ ব্যবস্থা করিয়াছেন। ইহাঁরা সাত জন ব্রহ্মার মানস-পুত্র। সাংখ্য শাস্ত্রের আদি আচার্য্য কপিল; আসুরি এবং বোঢ়ু তাহার শিষ্য এবং আসুরির শিষ্য পঞ্চশিখাচার্য্য, সনাতন পিতৃগণের অতিথি। এজন্য ইহাদের তর্পণ করা ব্যবস্থা আছে। পশ্চিম মুখ হইয়া ইহাদের তর্পণ করিতে হয় এবং যজ্ঞোপবীত মালার ন্যায় করিয়া ধারণ করা কর্ত্তব্য।

"ওঁ সনকশ্চ সনন্দশ্চ তৃতীয়শ্চ সনাতনঃ।
কপিলশ্চাসুরিশ্চৈব বোঢ়ুঃ পঞ্চশিখস্তথা॥
সর্ব্বে তে তৃপ্তিমায়ান্তু মদ্দত্তেনাম্বুনা সদা।"

সনক, সনন্দ, সনাতন কপিল, আশুরি, বোঢ়ু? এবং পঞ্চশিখ আচার্য্যগণ সকলে আমার প্রদত্ত জলে তৃপ্তি লাভ করুন।

এখন তোমরা যজ্ঞোপবীতকে যথাভাবে রাখিয়া পরম পবিত্র ঋষির তর্পণ করিবে।

স্বায়ম্ভুব মনুর পিতা বিরাট এবং পিতামহ ব্রহ্মা; তদনুসারে ব্রহ্মলোক পিতামহ বলিয়া খ্যাত। মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, প্রচেতা, বশিষ্ঠ, ভৃগু, ও নারদ ইহাঁদের নাম প্রজাপতি বা আদিম ঋষি। এই আদিম ঋষিগণ হইতে চতুর্দ্দশ মনুর উৎপত্তি হয়। প্রজাপতিগণ ও মনুবর্গ প্রজাসৃষ্টির নিমিত্ত ব্রহ্মার মানস অনুসারে স্বায়ম্ভুব মনুর নিকট পুত্রত্ব স্বীকার করেন; এজন্য তাঁহাদিগকে ব্রহ্মার মানসপুত্র ও বলিয়া থাকে। এই ঋষিগণ হইতে সমস্ত প্রাণীর সৃষ্টি হইয়াছে, সুতরাং তাঁহারা পিতৃলোক বলিয়া প্রসিদ্ধ। তাঁহাদের আত্ম তৃপ্তির জন্য আমাদের তর্পণ করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। এজন্য নিম্নলিখিত মন্ত্রে এক এক অঞ্জলি জল প্রত্যেককে দান করিতে হয়। যথা ঃ—

ওঁ মরীচিস্তৃপ্যতাং, ওঁ অত্রিস্তৃপ্যতাং, ওঁ অঙ্গিরাস্তৃপ্যতাং, ওঁ পুলস্ত্য পুলহ স্তৃপ্যতাং, ওঁ ক্রতু স্তৃপ্যতাং, ওঁ প্রচেতা স্তৃপ্যতাং, ওঁ বশিষ্ঠস্তৃপ্যতাং, ওঁ ভৃগু স্তৃপ্যতাং, ওঁ নারদ স্তৃপ্যতাং। অর্থাৎ মরীচি ঋষি তৃপ্তিলাভ করুন,

অত্রি-ঋষি তৃপ্তিলাভ করুন, ইত্যাদি। পূর্ব্বমুখ হইয়া দৈবতীর্থ দ্বারা ইহাদের তর্পণ করাই বিধি।

এইক্ষণ তোমরা যজ্ঞোপবীতকে দক্ষিণ স্কন্ধে রাখিয়া দক্ষিণাস্য হইয়া অগ্নিষ্বত্তাদি পিতৃগণের উদ্দেশে পিতৃতীর্থ দ্বারা জলাঞ্জলি প্রদান কর। অঙ্গুষ্ঠ এবং তর্জ্জনীর মধ্যস্থানকে পিতৃতীর্থ বলে।

অগ্নিষ্বাত্ত, দেব ও বিপ্রগণের, সৌম্য, বিপ্রগণের, হবিষান্ত ক্ষত্রিয়গণের, উষ্মপা, বিপ্রগণের, সুকালিন, শূদ্রগণের, বর্হিষদ মানব, যক্ষ, রাক্ষস, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর, উরগ, সুপর্ণ এবং দৈত্যগণের, আজ্যপা বৈশ্যদিগের পিতৃলোক বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে। ইহাঁরা মরীচি, অত্রি প্রভৃতি ঋষিগণের সন্তান। ইহাঁরা মহেন্দ্রলোকে বাস করেন এবং মানবগণের পূজনীয়। ইহাঁদের দেহ মাতৃপিতৃ-সংযোগাধীন উৎপন্ন নহে—পূর্ব্বার্জ্জিত ধর্ম্মপ্রভাবে সমুৎপন্ন। ইহাঁদিগকে জলাঞ্জলি দ্বারা তৃপ্তি করিতে পারিলে আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। এজন্য শাস্ত্র আমাদিগকে উপদেশ দিতেছেন,—হে অগ্নিষ্বাত্ত পিতৃগণ, এই সতিল জল প্রদান করিতেছি, তৃপ্তি লাভ করুন। ইত্যাদি প্রকারে প্রত্যেক ঋষি, তৃপ্তি-লাভ করুন, আমরা সকলেই তাঁহাদের আশীর্ব্বাদপ্রার্থী, তাঁহারা সন্তোষের সহিত আমাদের প্রতি একবার দৃষ্টি করিলে আমাদের অমঙ্গল আর কিছুই থাকে না।

এইক্ষণ যম-তর্পণের কথা বলা যাইতেছে। যম চতুর্দ্দশ প্রকার। আমরা ইহলোকে যে সমস্ত কার্য্য করি, যমই আমাদের সেই কর্ম্মের সাক্ষী। কারণ নিম্নলিখিত মন্ত্রে যমতর্পণ করিবে। মৃত্যুর পরেই আমরা যমসদনে নীত হই। ইহাঁর কার্য্যবিশেষে এক একটী নাম হইয়াছে। এ কারণ বলিতে হয়,—

ওঁ যমায় ধর্ম্মরাজায় মৃত্যবেচান্তকায় চ।
বৈবস্বতায় কালায় সর্ব্বভূতক্ষয়ায় চ।
ওড়ম্বরায় দধ্নায় নীলায় পরমেষ্ঠিনে।
বৃকোদরায় চিত্রায় চিত্রগুপ্তায় বৈ নমঃ॥

এই মন্ত্র তিন বার পাঠ করিয়া তিন অঞ্জলি জল দিবে।

এখন পিতৃগণকে আবাহন করিয়া পিতৃ-তর্পণ করিতে হইবে। আগচ্ছন্তু মে পিতর ইমং গৃহ্নন্ত্বপোঽঞ্জলিং। অর্থাৎ পিতৃগণ আগমন করুন, আমার এই অপোঞ্জলি গ্রহণ করুন। ইহাকে পিতৃতর্পণ বলে, এবং প্রথমে জন্মদাতা পিতৃদেবকে :—

বিষ্ণু রোম অমুক গোত্র পিতঃ অমুক দেব শর্ম্মন্ তৃপ্যতামেতৎ সতিলোদকং তস্মৈ স্বধা। অর্থাৎ অমুক গোত্র পিতঃ অমুক দেব শর্ম্মন্ তৃপ্তিলাভ করুন, এই সতিল জল আপনাকে দিতেছি। এইরূপে তিন বার তর্পণ করিতে হইবে এবং এই রীতিতে পিতামহ, প্রপিতামহ, মাতামহ, প্রমাতামহ, বৃদ্ধ প্রমাতামহ, মাতা, পিতামহী, প্রপিতামহীর তর্পণ করিবে। মাতামহী, প্রমাতামহী, বৃদ্ধ প্রমাতামহীর তর্পণ এক বার করিয়া করিবে। ভ্রাতা, পিতৃব্য, মাতুল, শ্বশুর, পিতৃসখা, প্রভৃতি সকলের যথাসম্ভব এক এক বার করিয়া তর্পণ করা কর্ত্তব্য।

ভীষ্মতর্পণ। বীরকেশরী মহাত্মা ভীষ্ম দারপরিগ্রহ করেন নাই। তিনি অপুত্রক। এজন্য শাস্ত্র ব্যবস্থা করিলেন, যে তাঁহার তৃপ্তির জন্য সকলেই তর্পণ করিবে, তিনি জগতের অনেক কার্য্য করিয়াছেন।

মন্ত্র যথা :—

বৈয়াঘ্রপদ্যগোত্রায় সাংকৃতিপ্রবরায় চ।
অপুত্রায় দদাম্যেতৎ সলিলং ভীষ্মবর্ম্মণে॥

অর্থাৎ বৈয়াঘ্র পদ্য গোত্র সাংকৃতি প্রবর ক্ষত্রিয় জাতি অপুত্র ভীষ্মকে এই জল প্রদান করি। তার পর প্রণাম করিবার সময় তাহাকে বলা হইতেছে—হে ভীষ্ম! তুমি শান্তনুতনয় বীর সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয়; এই জল দ্বারা তুমি পুত্র-পৌত্রোচিত ক্রিয়া প্রাপ্ত হও। যথা :

ভীষ্মঃ শান্তনব বীরঃ সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয়ঃ।
আভিরদ্ভিরবাপ্নোতু পুত্রপৌত্রোচিতাং ক্রিয়াম্॥

এইক্ষণ দেখা যাইতেছে যে, কি জন্য মহাত্মা ভীষ্মের তর্পণ করিতে হয়, তাহা বিবেচনা করিলে সহজেই উপলব্ধি হইবে। কেহ বলেন, ব্রাহ্মণপক্ষে ভীষ্মতর্পণ যুক্তি নহে। একথা প্রশস্ত নহে। বান্ধব, অবান্ধব, অথবা যাঁহারা জন্মান্তরে বান্ধব ছিলেন, তাঁহাদের তৃপ্তি দান করিতে শাস্ত্র অবজ্ঞা করেন নাই; এজন্য—

যে বান্ধবাঽবান্ধবা বা যেঽন্য জন্মনি বান্ধবাঃ।
তেতৃপ্তিমখিলাং যান্তু যে চাস্মত্তোয়াকাঙ্ক্ষিণঃ॥

অর্থাৎ যাহারা আমার বান্ধব অথবা অবান্ধব অথবা যাঁহারা জন্মান্তরে আমার বান্ধব ছিলেন, যাঁহারা আমার প্রদত্ত জল আকাঙ্ক্ষা করেন, তাঁহারাও তৃপ্তিলাভ করুন। ইহা বলিয়াও তৃপ্তিদানে সুখী হইতে পারি নাই, এজন্য বলিতেছি :—

আব্রহ্ম ভুবনাল্লোকা দেবর্ষি মুনিমানবা,
তৃপ্যন্তু পিতরঃ সর্ব্বে মাতৃ মাতা প্রভৃতয়ঃ।

অতীত কুলকোটীনাং সপ্তদ্বীপনিবাসিনাং।
ময়া দত্তেন তোয়েন তৃপ্যন্তু ভুবনত্রয়ং॥

অর্থাৎ ব্রহ্মা হইতে জগতের যত লোক, দেবতা, মনুষ্য ঋষি এবং অগ্নিস্বত্তাদি পিতৃগণ, পিতৃ পিতামহাদি, মাতামহাদি এবং মাতা প্রভৃতি সকলে তৃপ্তিলাভ করুন। কেবল এক জন্মের পিতৃ পিতামহ প্রভৃতি বলিয়া কথা কি, পূর্ব্ব পূর্ব্ব কোটী জন্মে;—আবার বলি, কেবল আমার নহে—সপ্তদ্বীপ অর্থাৎ জম্বু, প্লক্ষ, শাল্মলি, কুশ, ক্রৌঞ্চ, শাক, এবং পুষ্কর প্রভৃতি দ্বীপনিবাসীদিগের পিতৃপিতামহাদি ও মাতা প্রভৃতি তৃপ্তি লাভ করুন। ইহাতেও যেন তৃপ্তি হইল না, তাই আবার বলি—স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতালস্থিত সকলই আমার প্রদত্ত জলে তৃপ্তি লাভ করুন।—এই বলিয়া একবার বা তিনবার জল প্রদান করিবে। এখনও মনে সন্দেহ আছে, এই জন্য বলিতেছি—আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্তং জগৎ তৃপ্যন্তু অর্থাৎ ব্রহ্ম হইতে তৃণগুচ্ছ পর্য্যন্ত সমগ্র জগৎ তৃপ্তিলাভ করুন। ইহা তিনবার পাঠ পূর্ব্বক তিন অঞ্জলি জল দিবে। জগতে অতৃপ্ত ব্যক্তির গতি নাই। যে ব্যক্তি সন্তপ্ত অথচ অগ্নিসংস্কার হইয়াছে, তাহাকে এবং যাঁহাদের আদৌ অগ্নিসংস্কার হয় নাই, তাঁহাদের কথা একটু স্মরণ করিয়া শাস্ত্রকর্ত্তা বড়ই উদার ভাব প্রদর্শন করাইয়াছেন। এজন্য বলিয়াছেন;—

অগ্নিদগ্ধাশ্চ যে জীবা যেপ্যদগ্ধা কুলে মম।
ভুমৌ দত্তেন তৃপ্যন্তু তৃপ্তা যান্তু পরাং গতিম্॥

অর্থাৎ আমার বংশে যে সকল ব্যক্তি অগ্নি দগ্ধ এবং যাঁহারা অগ্নি পান নাই, তাঁহারা এই ভূমিতে প্রদত্ত জল দ্বারা তৃপ্তি লাভ করিয়া পরম গতি লাভ করুন। বলিয়া এক অঞ্জলি জল দিবে।

জগতে সকলই সকলের; কাহার কেহ নাই, একথা বলিতে পারিব না, তাহা না হইলে, আজ এই প্রীতিকর পূজার ব্যবস্থা থাকিত না। জগৎবাসী জীবসকলই এক; এই একতাভাব ঋষি প্রত্যেক কার্য্যে দেখাইতেছেন। তর্পণ করিয়া উঠিয়া আর একটী কথা মনে পড়িল। তখন আর জলে অবস্থিত নাই, এজন্য কাপড় নিঙ্গাড়িয়া জল অঞ্জলি দিতে বলিতেছি :—

যে চাস্মাকংকুলে জাতা অপুত্রা গোত্রি নো মৃতা।
তে তৃপ্যন্তু ময়াদত্তং বস্ত্র নিষ্পীড়নোদকং॥

অর্থাৎ আমাদের বংশ সম্ভূত যে সকল ব্যক্তি অপুত্রক, জ্ঞাতি সত্ত্বে মৃত, তাঁহারা মৎপ্রদত্ত বস্ত্র-নিষ্পীড়ন (কাপড় নিঙড়ান) জল প্রাপ্ত হইয়া তৃপ্ত হউন।

আহা, কি মধুর, মনোমর কথা—কি পবিত্র অনুষ্ঠান! জগৎবাসী একবার এই সকল মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া ও সকল আত্মীয়ের জন্য পবিত্র সলিল প্রদান করিয়া সুখী হও। তর্পণ শেষ করিয়া আইস সকলে উচ্চ কণ্ঠে বলি :—

পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্ম্মঃ পিতা হি পরমং তপঃ।
পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রিয়ন্তে সর্ব্ব দেবতাঃ॥

পিতৃদেবতা সন্তুষ্ট থাকিলে সকল দেবতাই সন্তুষ্ট থাকেন। এজন্য আবার বলি—পিতৃচরণেভ্যোঃ নমঃ॥

"মা আসিতেছেন।"

লেখক—শ্রীসুরেন্দ্রমোহন বসু।

আহ্বান।

এ অধঃপতিত বঙ্গভূমে আজি এত আনন্দ কল্লোল কিসের? কে আজি সুষুপ্ত প্রাণে সজীবতা আনয়ন করিল? কে আজি বঙ্গীয় প্রকৃতির স্ফূর্ত্তিবিহীন অস্থি কঙ্কালময় দেহে প্রীতি সঞ্চার করিল? মা বুঝি আবার বঙ্গাকাশে উদয় হইবেন। হেমন্তের শোভনীয় সৌন্দর্য্য, শীতের অস্থিভেদী শৈত্য, বসন্তের মনোন্মাদকারী মৃদুমন্দ সমীরণ, গ্রীষ্মের প্রখর প্রতাপ, বর্ষার অবিরল অশ্রুপাত প্রভৃতির সার সংগ্রহে শরৎসখী হাস্য বদনে আবির্ভূতা হইয়াছেন। এ হেন সময়ে জগজ্জননী জগদম্বার পূজা বঙ্গের এক প্রধান উৎসব। বৎসরান্তে আবার মা আসিতেছেন। তাঁহার শুভাগমনে এই দুর্ভিক্ষ-বন্যা-দারিদ্র-দুঃখ প্রপীড়িত বঙ্গদেশে নব প্রাণের সঞ্চার হইবে। তাই আজি সকল যন্ত্রণায় জলাঞ্জলি দিয়া বঙ্গবাসী মায়ের চরণে পুষ্পাঞ্জলি দিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছে। সকলেই যেন আনন্দ-স্রোতে আত্ম সমর্পণ করিয়া উদ্বোধনে উন্মত্ত হইয়াছে। মা অম্বিকে! তোমার আবির্ভাবে অজ্ঞান মোহাচ্ছন্ন হৃদয়ে জ্ঞানালোক সঞ্চার হউক। একবার এ দগ্ধ বঙ্গে পদার্পণ কর। মা দশভূজে! সেই মূর্ত্তিতে দক্ষিণে রমা-গণপতি বামে বাণী-কার্ত্তিকেয়, সিংহ পৃষ্ঠে দশভূজা বেশে দশভূজে দশপ্রকরণ লইয়া মাভৈঃ মাভৈঃ রবে একবার দেখা দাও। মা অভয়ে! তোমার অভয়-বাণী শুনিবার

জন্যই বঙ্গবাসী ঊর্দ্ধনয়নে আকুল প্রাণে একান্ত মনে তোমায় আহ্বান করিতেছি।

অবস্থা।

মা দুর্গতি-হারিণি! উদ্বোধনের সামর্থ নাই। আহ্বানের ক্ষমতা নাই। আধিব্যাধি শোকতাপে সদাই জর্জ্জরীভূত। রোগে শোকে, অভাবে, অনাহারে, অনুতাপে সন্তানগণ জীবন্মৃত প্রায়। সুখ, সন্তোষ, হর্ষ, আনন্দ, সহানুভূতি, স্বাধীনতা একে একে সকলেই সময় বুঝিয়া পরিত্যাগ করিয়াছে। সুফলা শস্যশালিনী বঙ্গভূমি মরুভূমি প্রায় হইয়াছে। শান্তিময় সংসারে এখন সদাই অশান্তি বিরাজ করিতেছে। মা বিপদবারিণি! তোমার সোণার ভারত এখন ছারে খারে যাইতে বসিয়াছে। এ দারুণ জীবন-সংগ্রামের দিনে তুমি বৈ বঙ্গবাসীর আর কে আছে। মা শক্তিরূপিণি! বঙ্গবাসী শক্তি সাধনায় অপারগ বলিয়াই কি আজ এত দুর্দ্দশা। মা সর্ব্ব-শক্তি-প্রদায়িণি! তোমার শক্তিহীন সন্তানের শক্তি সঞ্চার কর। যে উৎসাহে রঘুকুলতিলক শ্রীরামচন্দ্র কাননে বিজয়োৎসব করিয়াছিলেন, সেই উৎসাহে তাঁহারা একবার আদ্যাশক্তির পূজা করুক।

আগমন।

মা বিশ্বজননি! এস মা—এস। মা মা বলিয়া ডাকিলে সন্তপ্ত প্রাণ শীতল হয়। জীবন্মৃত দেহে যেন সঞ্জীবনী সুধা ঢালিয়া দেয়। দুর্ব্বল হৃদয়ে যেন বলের সঞ্চার হয়। স্ফূর্ত্তিবিহীন জীবন যেন উল্লাসে মাতিয়া উঠে। তাই পূজার প্রশস্ত উপায় না জানিলেও বৎসরান্তে শুভ শরৎকালে একবার তোমায় প্রাণ ভরিয়া ডাকিয়া থাকি। মায়ারূপিণি! তোমার মায়ায় মুগ্ধ হইয়া আমরা কি গোলক-ধাঁধার মধ্যেই বাস করিতেছি। তোমার দোলায় আগমনে মড়কই হউক, আর গজে গমনে পৃথিবী জলপূর্ণাই হউক বা বসুন্ধরা শস্যপূর্ণাই হউক বঙ্গবাসীর সে দিকে দৃষ্টি নাই। মত্ত-মাতঙ্গ-ঘাতক মৃগেন্দ্রের সম্মুখে কুরঙ্গকে যেরূপ বিপন্ন হইতে হয়, আমরাও সেইরূপ অনন্ত বিস্তীর্ণ সংসার-সাগরে ভাসমান হইয়া অত্যুচ্চ বিচিমালার দ্বারা ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া প্রশান্ত সংসারে নিয়তই হাবুডুবু খাইতেছি। মা কাত্যায়নি! এ দৃশ্য দেখিবার জন্যই কি সুরথ-প্রথা উপেক্ষা করিয়া অকাল বোধনে তোমার অবির্ভাব? তুমি আসিলে কিন্তু ত্রেতা-যুগের সেই আনন্দময় রামরাজ্য এখন কৈ? বুঝেছি মা! বঙ্গবাসী এখন তোমার

মহোৎসবে তৈর্য্যত্রিকে বিলাস ও উল্লাসে মন মাতাইয়া থাকে। আন্তরীক ভক্তি সেরূপ আর নাই।

উপসংহার।

সম্বৎসরের পর শারদীয় পূর্ণিমার বিজয়োৎসবের দিন পুনরায় আসিতেছে কিন্তু হৃদয় সেই শারদ-শুক্ল-সপ্তমীর মহোৎসবে মাতিল কৈ? মনোমোহন ধূপ দীপের পবিত্র গন্ধ, নব-প্রস্ফুটিত কুসুম-নিচয়ের অপূর্ব্ব সৌরভ কৈ? সেই দনুজদলনীর দশভূজা মূর্ত্তি কৈ? এ যে রণতারা ভীমাকারা মূর্ত্তি, করাল বদনে বিকট হাস্য চারিদিকে রুধির ধারা দেখিতেছি। মা দিগম্বরি! আমরা কি তোমার মুক্তকেশী মূর্ত্তিই দেখিব? মা অন্নপূর্ণে! তুমি কি অন্নহীন অন্নদাসে অন্ন দিতে আসিবে না? মা রুদ্রানি! একবার রুদ্রমূর্ত্তি দূরীভূত কর। একবার হাস্যমুখে আবির্ভূতা হও। আমরা মহিষমর্দ্দিনী দশভূজা মূর্ত্তির প্রকৃত তত্ত্ব অবগত হইয়া মনুষ্য জন্ম সফল করি, নয়নের পিপাসা মিটাইয়া লই। আর মানস-কমল শ্রদ্ধা-তুলসী, ভক্তি-চন্দন, প্রীতি-গঙ্গাজল ও বিল্বদল এবং জ্ঞান-দীপ জ্বালিয়া প্রাণ ভরিয়া হৃদয়ের উল্লাসে তোমার পূজা করি।

বর্ত্তমান কনোজ ও বালাপীর।

লেখক—শ্রীধর্ম্মানন্দ মহাভারতী।

(২য় প্রস্তাব)।

—:o:—

আমরা কনোজের কেল্লা দেখিয়া জুমা মশিদ অভিমুখে গমন করিলাম। ইহা একটি সুদীর্ঘ হল, ইহার প্রাঙ্গণও প্রশস্ত; বিবিধ প্রকার কাচের ঝাড়, লণ্ঠন প্রভৃতিতে ইহা সুশোভিত। এই প্রকাণ্ড মশিদ দর্শন করিয়া আমরা হাট, বাজার, স্কুল, ইন্দারা প্রভৃতি অবলোকন পূর্ব্বক মুসলমান পাড়ায় পৌছিলাম। মকদুম জাঁহানীয়া নামক প্রসিদ্ধ পুরাতন সৌধের নিকট মুসলমানদিগের বসতি, ইহাদের অধিকাংশ পাঠান। সেখ আজিজুদ্দীন, সহদর হোসেন প্রভৃতি কয়েক-

জন মুসলমান ধনবান ও সম্ভ্রান্ত। কনোজে বহু সংখ্যক হিন্দু সওদাগর বাস করেন, আমরা তাঁহাদের কারখানা দর্শন করিয়া পুষ্পোদ্যান সমূহ সুগন্ধির দোকান ও কুঠি সমূহ দেখিতে গেলাম। এই সকল-কুঠিতে গোলাপ, মল্লিকা, জুঁই, চামেলী, হেণা, মেথি, খস্ খস্, পারুল, চন্দন প্রভৃতির আতর ও নির্য্যাস প্রস্তুত হইয়া থাকে। বিবিধ প্রকার ফুল কুসুম এই নগরে প্রাপ্ত হওয়া যায়। ভারতবর্ষে গাজিপুর ও কনোজ এই দুই নগর সুগন্ধির কারখানার জন্য প্রসিদ্ধ। অনেক প্রকারের ফুলেল তৈল এবং উৎকৃষ্ট গোলাপজল, কনোজের প্রায় প্রত্যেক রাস্তা ও গলিতে বিক্রীত হইয়া থাকে। কনোজ নগর গঙ্গাতটে অবস্থিত, কিন্তু নগর হইতে নদী প্রায় তিন মাইল দূরবর্ত্তিনী। এতদঞ্চলে তামাকুর চাষ যথেষ্ট হয়। গাভী ও বলদগুলি প্রায়ই অত্যন্ত দীর্ঘাকার, সবল ও পরিশ্রম পরায়ণ। স্থানে স্থানে বহু সংখ্যক মৃগ ও ময়ূর দেখা যায়। জলবায়ু স্বাস্থ্যকর বলিয়াই বোধ হয়।

কনোজ নগরে অনেকবর্ষ হইতে এক মুসলমান ফকির বাস করেন, তিনি এক্ষণে বৃদ্ধাবস্থায় উপনীত হইয়াছেন। ইঁহার পাণ্ডিত্য দেখিয়া বিস্মিত হইলাম। এই তত্ত্বদর্শী পুরুষ বহুভাষায় পারদর্শী এবং সমগ্র কোরাণ ইঁহার কণ্ঠস্থ। সপ্তাহে একদিন মাত্র দুইখানা রুটী এবং আর একদিন কেবল সামান্য কয়েকটা ফল খাইয়া যাপন করেন, বাকি কয়েক দিবস তিনি উপবাসী থাকেন। মাসের মধ্যে তিন দিবস মাত্র ইনি জলপান করেন এবং এক বৎসরে একদিন স্নান করিয়া থাকেন। ইনি এত বৃদ্ধ বয়সেও চক্ষে চশ্‌মা ব্যবহার করেন না; দন্তগুলি এখনও সবল আছে। ইঁহাকে দেখিলে সুস্থকায় ও বলবান পুরুষ বলিয়া বোধ হয়। সায়াহ্ন-কালে ইনি কৃপা করিয়া আমাকে আর একবার জুম্মা মশিদের নিকটে লইয়া গিয়াছিলেন। দেখিলাম, ঐ মশিদের পার্শ্বে, পুরাকালে হিন্দুরাজাদিগের প্রকাণ্ড পাকশালা ছিল। রাজা সীতা সিংহের শাসন কালে উহা নির্ম্মিত হয়, এ জন্য এখনও উহা "সীতা-রসুই" নামে খ্যাত। মশিদ নির্ম্মিত হইবার অনেক বর্ষ পূর্ব্ব হইতে ঐ পাকশালা দৃষ্ট হইয়া আসিতেছে। শুনা যায়, মশ্‌জিদ্ নির্ম্মিত হইবার পর হইতে পাকশালা আর ব্যবহৃত হয় নাই। এই উদার প্রকৃতিক ও বিশ্ব-প্রেমিক মুসলমান ফকির মহাশয় স্বয়ং কহিলেন "মুসলমানেরা যেখানে সুবিধা পাইয়াছে সেই খানেই হিন্দুর মনে আঘাত দিতে ক্রটি করে নাই।" বাস্তবিক, মুসলমানের দৌরাত্মে কত লক্ষ হিন্দু ললনার সতীত্ব নাশ, কত লক্ষ হিন্দু পুরুষের ধর্ম্ম নাশ, কত সহস্র দেবমন্দির, পুস্তকালয় ও ধনাগার ধ্বংস

হইয়াছে, কত রাজ্যের চিহ্ন পর্য্যন্ত লুপ্ত হইয়া গিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। মুসলমানের এখনও বিশ্বাস এই যে ফিরিঙ্গীকে (ইংরাজকে) এবং হিন্দুকে কতল (হত্যা) করিতে পারিলেই মুসলমানের পক্ষে স্বর্গের দ্বার উন্মুক্ত হইবে!! ফলতঃ; মহম্মদের ধর্ম্ম এদেশে বল ও ছল পূর্ব্বক প্রবর্ত্তিত হইবার পর হইতে ভারতের ভাগ্যলক্ষ্মী অন্তর্দ্ধান করিয়াছেন। যবনেরা হিন্দুকে সহস্র বর্ষ কালাধিক ব্যাপিয়া গালি দিয়া আসিতেছে; অনেক অশিক্ষিত, অধার্ম্মিক, অসভ্য, কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞানশূন্য, গো-খাদক "নেড়ে" মুসলমানের তকথাই নাই; কিন্তু যাহারা একটু আধটু লেখা পড়া শিখিয়া সম্বাদ পত্র বা মাসিক পত্র পরিচালন করিয়া থাকে, তাহারাও হিন্দু ভদ্র লোককে সুবিধা পাইলে, ব্যক্তিগত আক্রমণের কূপে নিক্ষেপ করিতে ক্রটি করে না; যখন ডিফ্যামেশন, উকিলের চিঠি অথবা জুতার গুঁতার কথা উঠে, তখনই সেই কাপুরুষ, নির্লজ্জ এবং অসত্যবাদী মুসলমান "কৃপা করিয়া ক্ষমা করুন" বলিয়া ক্রন্দন করিতে থাকে এবং যে হেলমের নেড়ে—সং এর মত করযোড়ে বারম্বার "এবারে রক্ষা করুন, এবারে রক্ষা করুন" কহিয়া চক্ষের জল ফেলিতে থাকে।

কনোজের ব্রাহ্মণ সমাজ অতীব প্রসিদ্ধ ও অতীব পুরাতন। পৃথিবীর যে যে স্থানে কান্যকুব্জ শ্রেণীর ব্রাহ্মণ আছেন তাঁহাদের পূর্ব্ব পুরুষগণের জন্মস্থান কনোজ। এক সময়ে নিজ কান্যকুব্জ নগরে দুই লক্ষ ব্রাহ্মণ বাস করিতেন, এখনও এতদঞ্চলে ব্রাহ্মণের বসতিই অধিক। কান্যকুব্জা নগরী অতীব প্রাচীনা। চন্দ্র বংশীয় পুরুরবার অন্ববায়ে দশম পুরুষে কুশনামা নরপতি জন্ম গ্রহণ করেন। কুশের পুত্র কুশনাভ ও "মহোদয়" নামে নগর বা দেশ স্থাপন করিয়াছিলেন। কুশনাভের একশত কন্যা ছিল। বায়ু কর্ত্তৃক কন্যাগণ কুব্জা হয়। (রামায়ণ বালকাণ্ড ৩২ সর্গ দেখুন)। তাহাতেই "মহোদয়" নগরের নাম কান্যকুব্জ হইয়াছে। "কান্যকুব্জ মিতি খ্যাতং ততঃ প্রভৃতি তৎপুরং।" কুল্লুকভট্ট মহাশয় মনুসংহিতার টীকায় কনোজের উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। কান্যকুব্জ প্রদেশে যখন বীরসিংহ রাজা রাজত্ব করিতেছিলেন তখন বঙ্গদেশে আদিশূর নামে রাজা সিংহাসনে অধিরূঢ় ছিলেন। আদিশূর, বল্লাল সেন, লক্ষ্মণ সেন প্রভৃতি ইহাঁরা বিশুদ্ধ কায়স্থ সুতরাং ক্ষত্রিয়। আদিশূরের শাসনের পূর্ব্বে বঙ্গদেশ ব্রাহ্মণবর্গে পরিপূর্ণ ছিল, কিন্তু নানা কারণে তিনি সেই ব্রাহ্মণ দিগের উপরে অসন্তুষ্ট থাকায় কনোজের রাজা বীর সিংহকে পত্র লিখিয়া কতিপয় বেদাভিজ্ঞ ও সর্ব্বশাস্ত্রবিদ্ ক্রিয়াবান ব্রাহ্মণ প্রার্থনা করেন

"শ্রীমং রাজাদিশূরো ভবদবনিপতি ধর্ম্মরাজো হি শান্তো।
সল্লোকঃ সদ্বিচারৈরদিতিসুতপতিঃ সর্যথাসীৎ তথাসীৎ॥
প্রতাপাদিত্য তপ্তাখিল তিমির রিপু স্তত্ব বেত্তা মহাত্মা।
জিত্বা বুদ্ধাংশ্চকার স্বয়মপি নৃপতি গৌড়রাজ্যান্নিবস্তান॥
পাত্রং প্রপচ্ছ পূতং পরমসুর পদদ্বন্ব পদ্মার্চ্চকোসৌ।
কাসন্তে কাশ্যপীশাঃ ক্রতুকৃতি কুশলাঃ ক্বাপি ক্ষত্রিয়া কুলীনাঃ॥
পাত্র স্তেষামবোচৎ পরিচয়মখিলং ভূপবাক্যাদ্ দ্বিজা স্তো।
কোলাঞ্চস্থাঃ কুরঙ্গা ইব কিল তপসা নৈব কেষামধীনাঃ॥
কোলাঞ্চস্য মহীপতিঃ ক্ষিতিভূজামেকত্রধানঃ প্রধীঃ।
স্বেষ্টে নিম্বমতি মহাশয়তরঃ শ্রীবীরসিংহ স্বভূৎ॥
তদ্দেশ বাসিনঃ সমাধিকৃতিনঃ পাপালিসংহারিণঃ।
সন্তি ব্যবসমাঃ সভাসদ ইতো গৌড়েন্দ্র ভূমীশ্বরাঃ॥
ভূপোদ্ভুদ্ ভবনে স্বচেষ্টিতপরঃ সদ্ ভৃত্য ভার্য্যান্বিতান্।
ভূদেবান্ বৃষলান্ বিচিত্র লিখনৈ রানেতুকামঃ স্বয়ম্॥
পাত্রেণ প্রণব প্রমোদপর চিতাং শ্রীবীরসিংহে লিপিং।
গৌড়ক্ষ্মাপতিরেব পূণ্যসুমতি দূতেন প্রস্থাপয়ৎ॥
সুকৃত সুকৃতসংহাঃ সর্ব্বশাস্ত্রার্থদক্ষা লপিত-হত-বিপক্ষা স্বস্তিবাক্যাঃ শ্রুতিজ্ঞাঃ।
সুজিত সুগত বৃন্দে গৌড়রাজ্যে মদীয়ে দ্বিজকুলবর জাতাঃ সানুকম্পাঃ প্রবান্ত॥
নৃপতি সুকৃতিসারঃ স্বীয় বংশাবতারঃ প্রবলবলবিচারো বীরসিংহোতিবীরঃ।
ময়ি বরসখিতাস্তে ভুমিদেবান্ সক্ষত্রিয়ান্ পুনরপি মমগৌড়ে প্রাপয়ত্বং নিতান্তম্।
মুদা গণ্ডকামাঃ পুরাবাস গৌড়াঃ সমাহায় কোলাঞ্চ দেশং ক্ষিতীশম্॥
নৃপা জ্ঞাঞ্চ লব্ধা সদারাদি ভৃত্যা মহাযোগিন স্তে বভূবঃ সক্ষত্রিয়াঃ।
মহারাজ রাজাদিশূরো মহাত্মা ত্বয়া বীরসিংহস্য মে স্তাদিসখ্যম্।
তবাজ্ঞানুসারাদ্ধি প্রস্থাপব্যামি দ্বিজান্ পঞ্চগোত্রান্ স্বদারাদি ভৃতান্॥

(অনুবাদ)

সুরপতি ইন্দ্র যেমন স্বর্গে রাজত্ব করেন. শ্রীমান্ আদিশুর নরপতি সেইরূপ পৃথিবীতে রাজত্ব করিয়াছিলেন। শাসনে তিনি ধর্ম্মরাজের ন্যায় ছিলেন; সদ্বিচারে তিনি নিতান্ত সৌজন্য প্রকাশ করিতেন। সূর্য্যদেব যেমন তাঁহার উজ্জ্বল কিরণ জালে অন্ধকার সমূহ নষ্ট করেন, তিনি তেমন স্বীয় প্রতাপ প্রভাবে অরাতি-কুল ধ্বংস করিতেন। তিনি তত্বজ্ঞান-সম্পন্ন মহাত্মা ছিলেন এবং স্বয়ংই বৌদ্ধগণকে

পরাভূত করিয়া স্বীয় গৌড় রাজ্য হইতে তাহাদিগকে নিষ্কাষিত করিয়া দিয়াছিলেন। তিনি পরম দেবতার পাদপদ্ম দ্বয় সর্ব্বদাই অর্চ্চনা করিতেন। একদা তিনি তাঁহার ধর্ম্মপরায়ণ ও পবিত্রচেতা পাত্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন, এক্ষণে কোথায় যাগযজ্ঞ ক্রিয়াকুশল ব্রাহ্মণ এবং সদ্বংশজাত ক্ষত্রিয় পণ্ডিত দেখিতে পাওয়া যায়? নৃপতির এই বাক্য শ্রবণ করিয়া পাত্র তাঁহাকে কহিলেন, হে মহারাজ! কান্যকুব্জ দেশের ব্রাহ্মণগণ তপোবলে স্বাধীনচেতা, তাঁহারা তথায় কুরঙ্গের ন্যায় স্বচ্ছন্দে বাস করেন এবং কাহারও অধীন নহেন। সেই কান্যকুব্জ দেশের অধীশ্বর মহারাজাধিরাজ শ্রীবীরসিংহ ধীশক্তি সম্পন্ন উদার প্রকৃতিক ও স্বধর্ম্মনিষ্ঠ। তদ্দেশবাসী ব্রাহ্মণগণ যজ্ঞকার্য্য কুশল, পাপসংহরণক্ষম ও বেদব্যাস তুল্য তেজ-সম্পন্ন। তাঁহারা রাজ সভাতে গমনাগমন করেন। হে গৌড়াধিপতে! আপনি সেই ভূদেবগণকে এখানে আনিবার চেষ্টা করুন। গৌড়াধিপতি নৃপতি ইহা শুনিয়া নিজ রাজ্যে সেই ব্রাহ্মণগণকে ও লিপি-কুশল ক্ষত্রিয় বর্গকে আনয়ন করিবার ইচ্ছায় পাত্রবরের সহিত পরামর্শ করিয়া আনন্দ চিত্তে এই প্রণয়লিপি রচনাপূর্ব্বক, দূত দ্বারা তাহা বীরসিংহ ভূপতির নিকট প্রেরণ করিলেন।—হে বীরসিংহ নরপতে! আমি গৌড়রাজ্যে বৌদ্ধগণকে পরাজয় ও তথা হইতে দূরীভূত করিয়াছি, এক্ষণে ইচ্ছাকরি পূণ্য-কর্ম্ম পরায়ণ সর্ব্বশাস্ত্রবিদ বিপক্ষ-বিজয়ী স্বস্তিবাক্যসংযুক্ত বেদজ্ঞ সদ্বংশজাত ব্রাহ্মণগণ অনুকম্পার সহিত মদীয় এই রাজধানীতে আগমন করেন। আপনি নৃপতি কুলে পুণ্যযশাঃ, স্বীয় বংশের অবতংস স্বরূপ বীরাগ্রগণ্য এবং বল প্রয়োগে ও বিচার কার্য্যে সুদক্ষ। আমি আপনার সহিত সখ্য বন্ধনে অভিলাষী। আপনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক মদীয় গৌড়দেশে কতিপয় ব্রাহ্মণ প্রেরণ করুন এবং তাঁহাদের সঙ্গে যেন কতিপয় ক্ষত্রিয় থাকে।—নরপতি বীরসিংহ আদিশুরের পত্র পাঠ করিয়া তাহা প্রচার করায় কতিপয় মহাযোগী ব্রাহ্মণ নৃপাজ্ঞামতে কান্যকুব্জ দেশ ও তদ্দেশীয় ভূপতিকে পরিত্যাগ করিয়া দারাদি পরিজন ও ক্ষত্রিয় ভৃত্যের সহিত গৌড়দেশে বাস করিবার জন্য আনন্দে তথায় গমন করিতে ইচ্ছা করিলেন। তখন বীরসিংহ নরপতি পত্রোত্তরে লিখিলেন, হে মহারাজাধিরাজ আদিশুর! আপনি মহাত্মা. আপনার সহিত অদ্য আমার প্রথম সখ্য বন্ধন হইল। আমি আপনার আজ্ঞা মতে পঞ্চগোত্রীয় দ্বিজপঞ্চককে প্রেরণ করিলাম, তাঁহারা নিজ নিজ পরিজন ও ভৃত্য লইয়া যইতেছেন। (অনুবাদ সমাপ্ত)

উপরে যে পঞ্চজন ব্রাহ্মণের কথা উল্লিখিত হইয়াছে, তাঁহাদের নাম এই—

ভট্টনারায়ণ, শ্রীহর্ষ, দক্ষ, ছান্দড় ও বেদগর্ভ। ইহাঁদের সহচর ক্ষত্রিয় পঞ্চকের নাম দশরথ, মকরন্দ, বিরাট, কালিদাস ও পুরুষোত্তম। দশরথ বসু গৌতম গোত্রেয় লোক, মকরন্দ ঘোষ সৌকালীন গোত্রেয়, বিরাট গুহ কাশ্যপ গোত্রেয়, কালিদাস মিত্র বিশ্বামিত্র গোত্রেয় এবং পুরুষোত্তম দত্ত মৌদ্গল্য গোত্রের লোক ছিলেন। দক্ষের সঙ্গে দশরথ, ভট্টনারায়ণের সঙ্গে মকন্দ, শ্রীহর্ষের সঙ্গে বিরাট, বেদগর্ভের সঙ্গে কালিদাস এবং ছান্দড়ের সঙ্গে,পুরুষোত্তম বঙ্গদেশে আসিয়াছিলেন এই পঞ্চ ব্রাহ্মণ হইতে বাঙ্গালার কনোজ-ব্রাহ্মণ শ্রেণী সমুদ্ভূত এবং ঐ ক্ষত্রিয় পঞ্চক বর্ত্তমান বঙ্গের কায়স্থ জাতির আদিপুরুষ। ভট্টনারায়ণের গোত্র শাণ্ডিল্য, দক্ষের কাশ্যপ, ছান্দড়ের বাৎস্য, শ্রীহর্ষের ভরদ্বাজ এবং বেদগর্ভের সাবর্ণ গোত্র ছিল।

(ক্রমশঃ)।

তেত্রিশকোটি দেবতা।

লেখক—শ্রীমোক্ষদাচরণ ভট্টাচার্য্য।

জগৎ আর জগদীশ্বর এই দুই লইয়া এই জগতে সাধারণত দুইটি মত চলিয়া আসিতেছে। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ বলেন জগতে আর জগদীশ্বরে সম্পূর্ণ পৃথকত্ব আছে। হিন্দুগণ বলেন জগৎ ও জগদীশ্বর এক। এই দুই মহামতের কোন্‌টি প্রধান এবং কোন্‌টি ক্ষুদ্র তাহা নির্ণয় করা আমাদের পক্ষে বড় কঠিন। এবং প্রয়োজনেরও অভাব। তবে বিচার স্থলে দেখা কর্ত্তব্য যে উভয় মতের কোন সমতা আছে কিনা। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ যে ঈশ্বরকে জগৎ হইতে একে বারে সম্পূর্ণ ভাবে পৃথক্ মনে করেন তাহাও নহে। আবার হিন্দু পণ্ডিতগণ যে ভগবানকে সৃষ্টিকর্ত্তা বলিতে কুণ্ঠিত তাহাও নহে। বস্তুতঃ ঈশ্বর সম্বন্ধে উভয় মতই প্রধান, উভয় মতই সমীচিন ; বাইবেল বলেন যে In Him we live and move and have are bing.

তবে ইহাদ্বারা জগতকে জগদীশ্বর বলা হইল নয়ত কি। আবার হিন্দুরা যখন বলেন যে তিনিই সকল সৃষ্টি করিয়াছেন, তখন তাঁহাকে জগত হইতে বিভিন্ন বোধ করা হইল কৈ। ঈশ্বর বিষয়ে এইরূপ ভাবের মিলন, এইরূপ ভাবের সমতা, পূর্ণভাবে যে থাকিবে তাহার বিন্দু মাত্র সংশয় নাই। যেহেতু তিনি সর্ব্বময়, সর্ব্বরূপ

এবং সর্ব্বাত্মক। এই অপূর্ব্ব মিলনের মধ্যে যে জাতি ঈশ্বরকে যেভাবে ধারণা করিতে স্ব স্ব সমাজে প্রধান্য দিয়াছেন তাহাই সকলের কর্ত্তব্য। হিন্দুরা জগৎ ও জগদীশ্বরকে এক ভাবিতে শাস্ত্রে শত শত উপদেশ দিয়া গিয়াছেন। পাশ্চত্যগণ তাহা করেন নাই। তাই বলিয়া কিন্তু কাহারো মত অবহেলার নয়।

আমাদের ভাবনা করা উচিত যে এই ভাবদ্বয়ের মধ্যে ঈশ্বরের মুর্ত্তিপূজার কোন বিশেষত্ব আছে কি না। যে ব্যক্তি জগতে আর তাঁহাতে এক ভাবিতে পারেন তাহাদ্বারা জড়বস্তু-যোগে ঈশ্বরেরর প্রতিমূর্ত্তি গড়িয়া পূজা করা দোষের নহে। কিন্তু যাহার জ্ঞান ঈশ্বরকে জগৎ হইতে ভিন্ন বুঝিয়াছে. তাহার নিকট জড়বস্তুতে ঈশ্বরজ্ঞান অতীব দোষের। সুতরাং হিন্দুরা যখন শিক্ষা-সংস্কার এবং জ্ঞান দ্বারা তাঁহাতে আর জগতে কোন পার্থক্য বোধ করেন না, তখন হিন্দুর "মূর্ত্তিপূজা" কখনই দোষের হইতে পারে না। জগতই জগদীশ্বরের বিকাশ ; বস্তুত জগত দেখিয়াই ভগবানের রূপগুণ সমস্তই অনুভবে আনিতে হয়। স্মরণ করা উচিৎ যে জগতের রূপ গুণ কিন্তু এক নয়।

এই অনন্ত অসীম জগৎ এক এক সময় এক এক রূপ ধারণ করিয়া থাকে। প্রাতে এক—মধ্যাহ্নে এক—ও স্বায়াহ্নে এক, এইরূপ ভাবে ভিন্ন ভিন্ন সময় ভিন্ন ভিন্ন রূপ। গুণ সম্বন্ধেও তাই। জলের গুণ এক—আগুনের গুণ এক—ও বায়ুর গুণ এক। বস্তুত এক মেঘের কত রূপ। এক জলের কত গুণ। এইরূপ অনন্ত রূপ গুণ লইয়া তবে জগতের সৃষ্টি বিকাশ হইয়া থাকে। সুতরাং জগদীশ্বর যে অনন্ত গুণরূপ-ধারী ইহাও প্রকৃষ্ট সত্য ; তাহার আর দ্বিতীয় সন্দেহ নাই। জগদীশ্বরের মুর্ত্তিকল্পনায় এই জন্যই বহুরূপ গুণের অবতারণা করিতে হয়। নতুবা অসীমকে সসীমে, অনন্তকে সান্তর মধ্যে আনিতে হয়। প্রকৃত মুর্ত্ত পূজায় ঈশ্বর অনন্ত মূর্ত্তিতে বিকাশিত ইহা ধ্রুব সত্য।

এই জন্য হিন্দুদের তেত্রিশকোটি দেবতা। এইজন্যই হিন্দু, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, দুর্গা, কালি, কৃষ্ণ, রাম, গণেশ, লক্ষ্মী, স্বরস্বতী প্রভৃতি মূর্ত্তিকল্পনা করিয়া অনন্ত প্রকৃতিতে অনন্ত পুরুষের ধ্যান করিয়া থাকেন। হিন্দুদিগের মনের উন্মেষি শক্তি—পাশ্চাত্য দার্শনিক যাহাকে Power of comprehensive realisation বলে ইহা আর্য্য হিন্দুগণের নিকট যত পূর্ণাসত্ত, অন্য আর্য্যগণের নিকট তত নহে। বস্তুত হিন্দুর তেত্রিশকোটি দেবতা মানব প্রকৃতির পূর্ণ অভিব্যাক্তি ব্যতীত আর কিছুই নহে। অনন্ত দেবের যেগুণ হিন্দুরা যখন যেভাবে উপলব্ধি করিয়াছেন, তখনি সেই গুণের একটি প্রতিমূর্ত্তি গড়িয়া হৃদয়ের সঙ্গে পূজা করিয়াছেন। পাশ্চাত্য

জাতীর ধর্ম্ম সীমানা বিশিষ্ট বলিয়া তাহারা ঈশ্বরের অনন্ত রূপগুণের উপাসক নহেন ; কিন্তু অতৃপ্ত-ধর্ম্ম পিয়াসী-মানব-মন তাহাতে তৃপ্তি না পাইয়া যখন ঈশ্বরের যে শক্তি-শালী-গুণ উপলব্ধি করিয়াছে, তখনি তাহাতে ডুবিয়া গিয়াছে। এইজন্য পাশ্চাত্য কবি অর্থাৎ মানব জাতীর দ্বিতীয় শিক্ষকগণ সমুদ্র আর পর্ব্বতের বর্ণনে ঐশী শক্তির স্ফুরণ অনুভব করিয়া অবগত হইয়া পড়িয়াছেন। উদাহরণ স্বরূপ রসিক কবি বায়রণের সমুদ্র বর্ণনা আর কোলরিজের মন্ট ব্লাঙ্ক শৈল বর্ণনা উল্লেখ যোগ্য। ইহারা পর্ব্বতে, সমুদ্রে ঈশ্বর-দর্শন করিয়াছেন। ঈশ্বরের গুণ উপলব্ধি করিতে গিয়া দৃষ্ট পদার্থে ঈশ্বর দর্শন পাশ্চাত্য জাতির পক্ষে যেরূপ সহজ হিন্দুর পক্ষে তত নহে। কেননা হিন্দু ঈশ্বরের গুণ বর্ণনা করিতে গিয়া পদার্থকে ঈশ্বর বোধ কখনই করেন নাই।

যে জাতির শাস্ত্রে কোটি কোটি দেবতার সৃষ্টি সে জাতি কখনো কার্য্যে দেবতা সৃষ্টি করে না। অথবা বাহিরে বাহ্য বস্তুতে ঈশ্বর-দর্শন করে না। হিন্দুকবি বাহ্য জগতের যাহা দেখিবার তাহা দেখিয়াছেন—তাঁহার রূপগুণ, আচার ব্যবহার, আকার প্রকার তন্ন তন্ন করিয়া দেখিয়াছেন, কিন্তু তাহাতে কখনো ঈশ্বর দর্শন করেন নাই। অথবা ঈশ্বর অনুসন্ধান করেন নাই। তাহার উদাহরণ জন্য বাল্মীকির সমুদ্র বর্ণন আর মহা কবি কালিদাসের হিমালয়-বর্ণন উল্লেখ করা যায়। হিন্দুগণ তাঁহাতে আর জগতে যখন ভিন্ন বোধ করেন না তখন তাহার নিকট এই অনন্ত বিশ্ব রাজ্যের মধ্যে যত রূপ গুণ আছে তাহা সমস্তই উপলব্ধি করিতে গিয়া জড় পদার্থ-যোগে ঈশ্বর-মুর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া পূজা করাকে সেই গুণের সত্ত্বা অনুভব করা ভিন্ন অন্য কিছুই বুঝায় না। বোধ হয় একথা সকলেই অবগত আছেন যে প্রতিমা-পূজার আহ্বান মন্ত্রে উল্লেখিত আছে যে—হে অনন্ত পুরুষ তোমার যেন এইস্থানে আবির্ভাব হয় এই গুণের যেন বিকাশ হয়। আবার বিসর্জ্জন মন্ত্রের মর্ম্ম এই যে—যখন তোমার গুণের অন্তর্ধান হইল তখন এই জড়-মুর্ত্তিকে জলে হউক, স্থলে হউক নিক্ষেপ করিতে আপত্য কি ? সুতরাং হিন্দুরা অনন্ত জগতের অনন্ত গুণ অনন্ত রূপকে ধ্যান করেন ইহা প্রমাণিত হইল। তাই বলিতেছিলাম তেত্রিশকোটি দেবতা-অবয়ব কল্পিত নয়। উহা অনন্ত পুরুষের অনন্ত মুর্ত্তির ধ্যান, অনন্ত গুণের ধ্যান।

ভাই হিন্দু! পাশ্চত্য শিক্ষার গুণে দেবদেবীর প্রতি আস্থা-শূন্য হইও না। প্রতিমা দেখিয়া মিথ্যা ভাবিও না। তোমার পূর্ব্ব পুরুষের এই অপূর্ব্ব

আবিষ্কারকে বৃথা পুতুল-পূজা বলিয়া উড়াইয়া দিও না। পার যদি তবে হৃদয়ে অনন্ত পুরুষকে অনন্ত রূপগুণময় বলিয়া ভাবিও ; কিন্তু সাবধান ! তাই বলিয়া ইহাকে মুর্খের পুতুল-খেলা আর অজ্ঞানের ধারণা বলিয়া চিন্তা করিও না। নিশ্চয় জানিও এই তেত্রিশকোটি দেবদেবীর উপাসনার মূলে অনন্ত বিরাট বিশ্ব-রূপের বিশ্ব বিজয় রূপগুণ আছে। এই জ্ঞান যদি তোমার শিক্ষা প্রাপ্ত হৃদয়কে অধিকার করিতে পারে তবেই তোমার হিন্দুত্ব, তবেই তোমার মনুষ্যত্ব।

হিন্দুর এই ত্রেত্রিশকোটি দেবতা হিন্দু হৃদয়ের চির উপাস্য। এই জন্য হিন্দুর গৃহে গৃহে দেবদেবীর মঙ্গলময় পূজা পদ্ধতি প্রচলিত।

সহানুভূতি।

লেখক—শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়।

মানব হৃদয়ের শ্যাম-তৃণশষ্প-শোভিত, সুন্দর-সৌন্দর্য্যপূর্ণ ক্ষেত্রমধ্যে বহু সদ্‌গুণাবলীর ভিতরে সহানুভূতি প্রধানতম। সহানুভূতির অভাবে এ সংসার তাপদগ্ধ, ভীষণ মরুভূমি প্রতিম হইত। এই সংসারে, একে অপরের উপকার করিত না। দয়ামায়া এই পৃথিবী হইতে চিরকালের জন্য বিদায় গ্রহণ করিত। সকলে আপনাপন স্বার্থ চিন্তায় সর্ব্বদা ব্যস্ত থাকিত। কারণ সহানুভূতির অভাবে মানব হৃদয়ে দয়া, মায়ার উদ্রেক হয় না। দয়ার অভাবে মানবের পরোপকারপ্রবৃত্তি বলবতী হয় না। পরোপকার না করিলে, অর্থাৎ একে অপরের বিপদ সময়ে সাহায্য না করিলে জগৎ অচল হইত। অতএব সহানুভূতি মানব হৃদয়ে নিহিত সুপ্রবৃত্তি সকলের বিকাশের অনুকূলে অনেক সাহায্য করে। অপর পক্ষে, মানব হৃদয় যদি দয়া, মায়া সহানুভূতি প্রভৃতি শোভন অলঙ্কার সমূহের দ্বারা সুসজ্জিত না থাকে, তবে মানব হৃদয়ের সঙ্গে পশু হৃদয়ের বিশেষ পার্থক্য কোথায় ? কিন্তু অনন্ত করুণাবান অখিল ব্রহ্মাণ্ডের অধিপতি, মানব হৃদয়ে সুপ্রবৃত্তি সমূহের বীজ রোপণ করিয়া এ সংসার, সুখপূর্ণ, শান্তিপূর্ণ করিয়াছেন। এই সুপ্রবৃত্তিসকলের ভিতরে একটী না একটী সকল মানব হৃদয়েতেই অল্প বিস্তর পরিমাণে আপনার প্রভাব স্থাপন করিয়াছে।

সেই জন্যই মানব জাতি—একে, অপরের বিপদ সময়ে হৃদয়ের অভ্যন্তর গহ্বর স্থিত দয়ায় রুদ্ধ প্রস্রবণ মুক্ত করিয়া দেয়, এবং সহাভূতির বীজোৎপন্ন, দয়ায় পরিণতিতে বিপদাপন্ন মানবের বিপদুদ্ধারের জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিয়া, তাহার সুখ দুঃখের অংশ গ্রহণ পূর্ব্বক আপনাকে কৃতার্থ জ্ঞান করে। অবশ্য, পরোপকার প্রবৃত্তি-সম্পন্ন মানব জীবন-সংগ্রামের কর্ম্ম কঠোর ঘাত প্রতিঘাত-পরিপূর্ণ সংসারে সর্ব্বদা দৃষ্টিগোচর হয় না বটে, কিন্তু ঐরূপ প্রকৃতি-সম্পন্ন ব্যক্তি এ জগতে বিরল নহে; কেননা তাহা হইলে সংসার চলিত না।

কিন্তু আমরা সচরাচর আপনাদের অন্তঃকরণেই দেখিতে পাই যে, কোন দুঃখ কাতর ক্রন্দন-পরায়ণ মানবের করুণ ক্রন্দনে, আমাদের হৃদয় স্বতঃই উদ্বেলিত হইয়া উঠে। কি কারণে আমাদের অন্তকরণে ঐরূপ ভাবান্তর উপস্থিত হয়? ইহার উত্তরে বলা যাইতে পারে যে সহমর্ম্মিতা নিবন্ধনই আমাদের হৃদয়ে ঐরূপ অবস্থান্তর উপস্থিত হয়। এবং ইহাই জগতের ধর্ম্ম ও সৃষ্টির বিশেষত্ব এখানে আর একটা প্রমাণ বলা যাইতে পারে। যখন আমরা শ্রবণ করি, যে সাহেবের সবুট পদাঘাতে কোন হতভাগ্য বাঙালীর প্লীহা ফাটিয়া প্রাণটা বাহির বাহির হইয়া গিয়াছে, তখন কি আমাদের শ্বেতাঙ্গপ্রবরের বিজয়-গৌরব-দৃপ্ত বদন-মণ্ডলে পুষ্পচন্দন বৃষ্টি করিয়া সাধু সাধু বলিতে ইচ্ছা করে? তখন কি হৃদয়ের অন্তস্তম গহ্বর হইতে ভ্রাতৃ-নিধন-জনিত শোকাপ্লুত আকুল ধ্বনি নির্গত হয় না? এবং সেই সহমর্ম্মিতা-নিবন্ধন তখন কি আমাদের নিদারুণ শোকে এবং দুঃখে পূর্ণ হইয়া যায় না? এই মর্ম্ম কঠোর মানব জীবনে যদি কোন সুখময় পদার্থ থাকে—তাহা সহানুভূতি। এই স্বার্থ-চিন্তা-মগ্ন সংসারের যদি কিছু বাঞ্ছনীয় থাকে তাহা সহানুভূতি। ইহলৌকিক এবং পরলৌকিক সর্ব্ববিধ সুখলাভ করিবার প্রধান উপায়—সহানুভূতি।

অশোকবনে চেড়ীগণ দ্বারা পরিবেষ্টিতা পতি-বিরহ-ব্যাকুলা, সাধ্বী সতী সীতাদেবীর অবস্থা স্মরণ কর। সেই শত্রু-পুরাবস্থিতা সীতাদেবীরও একজন সহানুভূতি আক্রান্তা সঙ্গিনী জুটিয়াছিল। সে সরমা। সহানুভূতিকোমল হৃদয়া সরমা সীতাদেবীর আত্মকাহিনী শ্রবণ করিয়া, সহমর্ম্মিতা উচ্ছ্বসিত বলিতেছেন:—

"শুনিলে তোমার কথা, রাঘব রমণী
ঘৃণা জন্মে রাজভোগে, ইচ্ছা করে ত্যাজি
রাজ্যসুখ, যাই চলি হেন বনবাসে।"

দ্বাপর যুগের সেই ভীষণ লোকক্ষয়-কারী, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের কথা, বোধ হয় কাহারও স্মরণ পথাতীত হয় নাই—আর কখন হইবেও না। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের প্রাক্কালে পরম শত্রু দুর্য্যোধনকে বহুমিত্রাদির সহিত রণস্থলে যুদ্ধার্থে উপস্থিত দেখিয়া, অর্জ্জুনের হৃদয়ে সহসা সহানুভূতির আবির্ভাব হইল। অর্জ্জুনের মানস-পটের সম্মুখে ভাবীযুদ্ধের মানস-দুঃখ-দায়ক হতাহতের শোণিতাপ্লুত দেহের ভয়ানক দৃশ্য পরিপূর্ণ রণস্থলের অন্তকরণত্রাসী যবনিকা অপসারিত হইয়া গেল। অর্জ্জুন তাহা দেখিয়া ব্যথিত হইয়া আত্মসখা ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন:—

"অপি ত্রৈলোক্যরাজস্য হেতোঃ কিন্নু মহীকৃতে।
নিহত্য ধার্ত্তরাষ্ট্রান্ নঃ কা প্রীতিঃ স্যাজ্জনার্দ্দন॥"

অর্থাৎ "পৃথিবীর কথা দূরে থাকুক, ত্রৈলোক্য লাভ হইলেও, আমি ইহাঁদিগকে বিনাশ করিতে ইচ্ছা করি না। ধার্ত্তরাষ্ট্রদিগকে বধ করিলে, আমাদিগের কি প্রীতি হইবে?

এখানে একটী বক্তব্য আছে। সহানুভূতি সচরাচর কোন মানবের দুঃখের সময় আমাদের হৃদয়কে যেরূপ ভাবে আকর্ষণ করে, মানবের সুখের সময় কখনও আমাদের অন্তকরণকে সেরূপ ভাবে আকর্ষণ করিবে না। ইহার প্রধান কারণ, যাহার সুখ আছে, ঐশ্বর্য্য আছে, তাহার অপরের সহানুভূতির বড় আবশ্যক হয় না। কিন্তু যে দরিদ্র, তাহার বহু অভাব, সুতরাং সেই অভাব-জনিত দুখ আমাদের হৃদয়ের সহমর্ম্মিতাকে আকর্ষণ করে। প্রমাণ স্বরূপ দেখ, নবাব সিরাজদ্দৌলা সুখের সময় আমাদের হৃদয় আকর্ষণ করিতে সক্ষম হয়েন নাই, কিন্তু যখন হতভাগ্য নবাব সিরাজদ্দৌলা ভাগ্য-বিপাকে কারাগারে আবদ্ধ হইলেন এবং পাপিষ্ঠ মীরণ-প্রেরিত অনুচর দ্বারা সিরাজ-দ্দৌলাকে হত্যার উদ্যোগ করা গেল—এবং যখন ঘাতক নবাবকে নিহত করিবার অভিপ্রায়ে—অসি উত্তোলন করিল, তাহার পর সেই তরবারি—

"নামিল যখন
সিরাজের ছিন্ন মুণ্ড চুম্বিয়া ভূতল।
পড়িল, ছুটিল রক্ত স্রোতের মতন
নিবিল গৃহের দীপ; নিবিল তখন
ভারতের শেষ—আশা হইল স্বপন।"

সেই সময় কি সিরাজদ্দৌলার শোচনীয় পরিণাম দর্শনে প্রাণ কাঁদিয়া উঠে না?

মানবান্তঃকরণে যতগুলি সদ্বৃত্তি আছে, তাহার ভিতর সহানুভূতিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। সহানুভূতির বিকাশে অপরাপর বৃত্তি গুলি বিকাশ প্রাপ্ত হয়। সহানুভূতি কেবল আপনার ভালবাসার পাত্রের উপরই ন্যস্ত থাকে না। সহানুভূতি সমভাবে নিখিল-জগতের সমুদয় প্রাণীর উপর অনন্ত করুণা বর্ষণ করে। নতুবা ব্যক্তি-বিশেষের উপর সহানুভূতি বদ্ধ থাকিলে এ জগতে কেহ পর দুঃখ-কাতর হইত না। সুতরাং সহানুভূতির বিশ্লেষণেই সহানুভূতির মাধুর্য্য সমধিক পরিমাণে অনুভূত হইয়া থাকে—নতুবা নহে।

কোন জাতীয় মানবের সমাজের গতি যেরূপ শৃঙ্খলায় সঙ্গে, অথবা যেরূপ অশৃঙ্খলার সঙ্গে পরিচালিত হয়, সেই সমাজে বিতরণশীল মানবের অন্তঃকরণ নিহিত নানারূপ সদ্গুণাবলী ও সেই সমাজের গতির অনুকূলে শৃঙ্খলা অথবা অশৃঙ্খলার সঙ্গে বিকাশ প্রাপ্ত হয়। আমাদের সমাজের এখন যেরূপ অবস্থা, তাহাতে আমাদের অন্তঃকরণ নিহিত বৃত্তি সমূহের ভিতরে সহানুভূতিরই সমধিক পরিমাণে বিকাশ প্রাপ্ত হইবার কথা। তাহাই হইয়াছে। কিন্তু আমি দার্শনিক নই। আমি যে তেমন উপকার প্রদ কোন বিষয়ের বিশদরূপে আলোচনা করিতে পারিব—সে শক্তি নাই। সেই জন্য এদিকে আমাদের দেশের দার্শনিক পণ্ডিতগণের দৃষ্টিপাত হওয়া একান্ত প্রার্থনীয়। আমাদের দেশের স্বল্প-সংখ্যক দার্শনিক পণ্ডিতগণের ভিতরে অনেকেই এ সম্বন্ধে নিয়ম বিষয়ে একান্ত অজ্ঞতা প্রকাশ করিয়াছেন। আগষ্ট কামড্ যথার্থই বলিয়াছেন "Social order was regarded by the ancients as stationary and its theory under this provisional aspect was admirably sketched out by the great Fristotle. The social speculations of antiqu'ty are entirely devoid of the conception of progecss. Their historical feild was too narrow to indicate any continuous movement of Humanity."

আমাদের মনের এমন কোন আভ্যন্তরিক শক্তি আছে, যাহার দ্বারা যাহা জগতের সমুদয় বাধা বিপত্তি অতিক্রম করিয়া—মন-তদভ্যন্তরে নিহিত বৃত্তি-সমূহের স্বাতন্ত্র্যভাব রক্ষা করিতে পারে। তবে দুর্ব্বলান্তঃকরণ ব্যক্তিরা অনেক সময়ে যাহা জগতের প্রলোভনে আকর্ষিত হইয়া স্ব স্ব হৃদয় নিহিত সদ্বৃত্তি সমূহ বিসর্জ্জন করে বটে। কিন্তু সহানুভূতি এই নিয়মের বহির্ভূত। এখন, এস ভাই বাঙ্গালী! এস ভাই মুসলমান! চিরকাল প্রচলিত বিদ্বেষ পরিত্যাগ করিয়া আমরা সহানুভূতি, দয়া, দাক্ষিণ্যাদি দ্বারা পরস্পর, পরস্পরের দুঃখ

বিমোচনে বদ্ধ পরিকর হই—নতুবা আমাদের উন্নতি অসম্ভব। আর তাহা যদি না পারি, তাহা হইলে :—

"কি কাজ বহিয়া এছার জীবনে
কি কাজ রাখিয়া এ নাম ভুবনে।
কলঙ্ক থাকিতে কি ভয় মরণে?
চল সবে মরি পশিয়া জলে।
গলে গলে ধরি, চল সবে মরি
সারি, সারি, সারি, চল সবে মরি
শীতল সলিলে এ জ্বালা পাশরি
লুকাই এ নাম, সাগরতলে।"

অদ্বৈতমতের সমালোচনা।

লেখক—শ্রীআশুতোষ দেব এম, এ,

৩। সৃষ্টি।

আকাশ, বায়ু, তেজ, জল এবং পৃথিবী এই পঞ্চভূত জীবের ভোগের জন্য ঈশ্বরের ইচ্ছায় তমঃ প্রধানা প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন হয়। উক্ত পঞ্চভূতের পঞ্চ সত্বাংশ হইতে যথা ক্রমে শ্রোত্র ত্বক্, চক্ষু, জিহ্বা এবং নাসিকা এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় জন্মিয়াছে। পঞ্চভূতের সম্মিলিত সাত্বিক অংশ হইতে অন্তঃকরণ উৎপন্ন হয়। বৃত্তিভেদে অন্তঃকরণ দ্বিবিধ, সংশয়-বৃত্তি যুক্ত অন্তঃকরণই মন, নিশ্চয় বৃত্তিযুক্ত অন্তঃকরণই বুদ্ধি। উক্ত পঞ্চভূতের পঞ্চ রাজসিক অংশ হইতে যথাক্রমে বাক্, হস্ত, পদ, গুহ্য এবং উপস্থ—এই পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় জন্মিয়াছে। পঞ্চভূতের সম্মিলিত রাজসিক অংশ হইতে প্রাণের উৎপত্তি হইয়াছে। বৃত্তিভেদে প্রাণ পাঁচ প্রকার—প্রাণ, আপন, উদান, সমান, ও ব্যান।

পঞ্চভুত	পৃথক্ সত্বাংশ হইতে	মিলিত সত্বাংশ হইতে	পৃথক্ রজঅংশ হইতে	মিলিত রজঅংশ হইতে
আকাশ	শ্রোত্র		বাক্	

বায়ু	ত্বক্	হস্ত
	[অন্তঃকরণ].	[প্রাণ]
তেজ	চক্ষু	পদ্
জল	জিহ্বা	গুহ্য
পৃথিবী	নাসিকা	উপস্থ

পরমেশ্বর জীবগণের ভোগার্থ অন্নপান প্রভৃতি ভোগ্য এবং ভোগায়তন দেহের উৎপত্তির জন্য আকাশাদি পঞ্চভূতের প্রত্যেকেরই পঞ্চীকরণ করিয়া থাকেন।

সেই পঞ্চীকৃত পঞ্চভূত হইতে ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি হয়, সেই ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্গত চতুর্দ্দশভুবন, ভোগ্যবস্তু ও স্থূল শরীরের উৎপত্তি হইয়া থাকে।

প্রকৃতি।

তমঃপ্রধান — পঞ্চভূত — ব্রহ্মাণ্ড

বিশুদ্ধ সত্ত্বপ্রধান (মায়া) উপহিত চৈতন্য — ঈশ্বর

মলিনসত্ত্বপ্রধান (অবিদ্যা) উপহিত চৈতন্য — জীব

নিম্নে পঞ্চভূতের স্বরূপ অবধারণ করা যাইতেছে:—

ভূত	গুণ
আকাশ	প্রতিধ্বনি **শব্দ**
বায়ু	বীসী (সোঁ সোঁ) শব্দ এবং অনুষ্ণ, অশীত **স্পর্শ**
তেজ	ভুক্ ভুক্ শব্দ, উষ্ণ স্পর্শ এবং **প্রভারূপ**
জল	চুলু চুলুধ্বনি, শীতলস্পর্শ, শুক্লরূপ এবং মধুর **রস**
পৃথিবী	কড়কড়া শব্দ, কঠিন স্পর্শ, নীল শ্বেত প্রভৃতি নানারূপ, মধুর অম্ল প্রভৃতি নানা রস এবং সৌরভ অসৌরভ দ্বিবিধ **গন্ধ**।

শ্রোত্র, ত্বক্, চক্ষু, জিহ্বা এবং প্রাণ—এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় কর্ণ প্রভৃতি স্থূলাবয়বে অধিষ্ঠিত হইয়া যথা ক্রমে শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস এবং গন্ধ গ্রহন করিয়া থাকে। এই সকল ইন্দ্রিয় অতি সূক্ষ্ম সুতরাং কার্য্য দ্বারা অনুমেয়। ইহারা প্রায় বাহ্য বিষয়ে ধাবিত হয়।

কর্ম্ম পঞ্চ প্রকার,—কথন, গ্রহণ গমন, মনোৎসর্গ এবং আনন্দ বিশেষ। কৃষি, বাণিজ্য, সেবা প্রভৃতি যত কর্ম্ম আছে, তাহারা পঞ্চ কর্ম্মেরই অন্তর্গত। বাক্, হস্ত, পদ, স্নায়ু এবং উপস্থ—এই পঞ্চ ইন্দ্রিয় দ্বারা উক্ত পঞ্চকর্ম্ম নির্ব্বাহিত হইয়া থাকে। স্থূলদেহের মুখ প্রভৃতি অবয়বে পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় বর্ত্তমান।

মন উক্ত দশবিধ ইন্দ্রিয়ের অধ্যক্ষ। উহার স্থান হৃদয়ে। উক্ত দশবিধ ইন্দ্রিয়ের সাহায্য ব্যতীত বাহ্যবস্তু গ্রহণে মনের ক্ষমতা নাই বলিয়া তাহাকে অন্তঃকরণ বলা যায়।

ইন্দ্রিয়গণ বিষয় সম্বন্ধ প্রাপ্ত হইলে, অন্তঃকরণ দ্বারাই বিষয়ের গুণ দোষ বিচার হয়। অন্তঃকরণের তিনগুণ-সত্ত, রজঃ এবং তমঃ। এই ত্রিগুণ দ্বারাই ইহা বিবিধ অবস্থা পাইয়া থাকে। বৈরাগ্য, ক্ষমা ঔদার্য্য প্রভৃতি অবস্থা সত্ত্বগুণ হইতে উৎপন্ন; কাম ক্রোধ ইত্যাদি অবস্থা রজোগুণ হইতে উৎপন্ন; আলস্য, ভ্রান্তি এবং তন্দ্রা প্রভৃতি অবস্থা তমোগুণ হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

স্পর্শ শব্দ-স্পর্শাদি যে যে পদার্থে আছে, তৎসমুদয় যে ভূতোৎপন্ন তাহা প্রত্যক্ষ সিদ্ধ। কিন্তু ইন্দ্রিয় অন্তঃকরণ যে ভূত হইতে উৎপন্ন তাহা শাস্ত্র ও যুক্তি দ্বারা অবধারণ করিবে।

এই জগৎ ঈশ্বর কর্ত্তৃক সৃষ্ট এবং জীব কর্ত্তৃক কল্পিত হইয়াছে। সপ্তান্ন ব্রাহ্মণে উল্লিখিত হইয়াছে যে, জীব সাত প্রকার অন্ন সৃষ্টি করিয়াছেন। মর্ত্ত-জীবের জন্য এক অন্ন শস্যাদি দেবতাদিগের নিমিত্ত দুই প্রকার অন্ন দুগ্ধ এবং আত্মার নিমিত্ত তিন প্রকার অন্ন—মন, বাক্য ও প্রাণ, কল্পিত হইয়াছে। শস্য প্রভৃতি অন্ন সমূহ যদিচ শস্যাদিরূপে ঈশ্বরেরই সৃষ্ট, তথাপি জীব জ্ঞান ও কর্ম্মদ্বারা তৎসমুদয়ের অন্নত্ব অর্থাৎ ভোগত্ব স্থাপন করিয়াছে। তৎসমুদয়ের অন্নরূপে সৃষ্টিজীবকৃত। যেমন রমণী পিতৃজন্যা এবং পতিভোগ্যা, সেইরূপ এই জগৎ ঈশ্বর-সৃষ্ট এবং জীবভোগ্য এই দুইভাবে অন্বিত।

মায়াবৃত্তিরূপ জগৎ-সৃষ্টিবিষয়ক ঈশ্বরের যে সংকল্প, তাহাই এস্থলে সৃষ্টি হেতু এবং মনোবৃত্তিরূপ জীবের যে সঙ্কল্প, তাহাই ভোগ সাধন।

বাহ্যবস্তু দুই প্রকার;—বাহ্যদেশে পঞ্চভূতময় এবং অন্তঃকরণে মনোময়। তাহাতে যদিও বাহ্যদেশে দৃশ্যমান্ মাংসময়ী স্ত্রী ভেদ না হউক কিন্তু অন্তঃকরণ বৃত্তিস্থ সেই মনোময়ী স্ত্রী, পত্নী, বধূ, ননন্দা, যাতা, মাতা প্রভৃতি নানা প্রকারে কল্পিত হইয়া থাকে। বাহ্যবস্তু সকল চক্ষুঃ প্রভৃতির নিকটস্থ হইলে বুদ্ধিস্থ প্রমাতৃ চৈতন্য হইতে অন্তঃকরণ বৃত্তি উৎপন্ন হইয়া সেই বস্তুকে অধিকার করত

...দকারে পরিণত হয়, সুতরাং যে বস্তু যেমন বাহ্যদেশে পাঞ্চভৌতিক, সেই বস্তু অন্তঃকরণে তদ্রূপ মনোময় হয়।

পূর্ব্বোক্ত যুক্তি দ্বারা ঘটাদি বিষয় দুই প্রকারে নিরূপিত হইল, অর্থাৎ ভৌতিক ও মনোময়। যেমন বাহ্য মৃন্ময় ঘট ঈশ্বর সৃষ্ট, তদ্রূপ অন্তঃকরণে মনোময় ঘট জীবসৃষ্ট। বাহ্য মৃন্ময় ঘট চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় দ্বারা জ্ঞেয়, এবং অন্তঃকরণে মনোময় ঘট সাক্ষি চৈতন্য দ্বারা প্রকাশিত। অন্বয় ও ব্যতিরেকের দ্বারা অবগত হওয়া যাইতেছে যে মনোময় জগৎ সর্ব্বজীবের সংসার বন্ধনের কারণ। কারণ, মনোময় বস্তুর বিদ্যমানতাতে সুখ ও দুঃখ উৎপন্ন হয়। আর তাহার অবিদ্যমানে সুখ বা দুঃখ কিছুই হয় না।

ঈশ্বর কর্ত্তৃক সৃষ্ট বাহ্য দ্বৈত প্রপঞ্চ অদ্বৈত তত্ত্বজ্ঞানের বিরোধী নহে, বরং তদ্দ্বারাই অদ্বৈত তত্ত্বজ্ঞান হয়, অর্থাৎ গুরু বা শাস্ত্রোপদেশ ব্যতীত কিম্বা দ্বৈত প্রপঞ্চে অদ্বৈত তত্ত্বজ্ঞান কখন হয় না, সুতরাং ইহাকে অপ্রয়োজনীয় বলা যায় না।

জীব কর্ত্তৃক সৃষ্ট মনোময় দ্বৈত প্রপঞ্চ দুই ভাগে বিভক্ত ঃ—শাস্ত্রীয় দ্বৈত এবং অশাস্ত্রীয় দ্বৈত। তাহার মধ্যে অশাস্ত্রীয় দ্বৈত সমুদয় পরিত্যাগ করিয়া, যতদিন অদ্বৈত তত্ত্বজ্ঞান না হয়, ততকাল পর্য্যন্ত শাস্ত্রীয় দ্বৈতের অনুষ্ঠান কার্য্য।

অশাস্ত্রীয় দ্বৈত ও দুই প্রকার—তীব্র ও মন্দ। কামক্রোধাদি মনের দ্বৈত ভাব সকলকে তীব্র বলে, এবং তদ্ভিন্ন অন্য মনোরাজ্য সকলকে মন্দ বলে। ব্রহ্ম জিজ্ঞাসু পুরুষের এতদুভয় নিবারণ করা উচিত।

পরব্রহ্ম অসঙ্গ, আনন্দস্বরূপ ও মায়াবিশিষ্ট ঈশ্বর বিশ্ব-সৃষ্টি কর্ত্তা সেই মায়াবী ঈশ্বর স্বীয় মায়াতে অবরুদ্ধ হইয়া এই সমস্ত বিশ্ব-সৃজন করেন, তিনি পরব্রহ্ম হইতে ভিন্ন ইহা অপরাপর শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে। যেমন সুষুপ্তি অবস্থা ক্রমে স্বপ্নরূপে পরিণত হয়, তদ্রূপ আমি বহু শরীরে প্রবিষ্ট হইব, এই সঙ্কল্পদ্বারা আনন্দময় ঈশ্বরই হিরণ্য গর্ভ হইয়াছেন।

ক্রমিক ও যুগপদুৎপন্ন দ্বিবিধ স্বপ্ন পদার্থের ন্যায় আকাশাদি, ক্রমেই হউক বা এককালীনই হউক, ঈশ্বর হইতে এই জগৎ উৎপন্ন হয়—এই দুই প্রকার সৃষ্টিরই শ্রুতি প্রমাণ আছে। হিরণ্য গর্ভ সূত্রাত্মা বা সূত্রস্বরূপ, সূক্ষ্ম শরীরাখ্য সর্ব্বজীব সমষ্টি, সর্ব্বজীবে অহংজ্ঞান বিশিষ্ট এবং ক্রিয়া জ্ঞানাদি বিশিষ্ট হন। প্রত্যুষকালে বা প্রদোষ কালে অল্প অন্ধকারে আবৃত কোন পদার্থ যেমন অস্পষ্টরূপে প্রকাশ পায়, তদ্রূপ হিরণ্যগর্ভাবস্থাতে এই জগৎ ও অস্পষ্টরূপে দৃষ্ট হয়।

প্রথমাঙ্কুরিত অবস্থাতে কোন শস্য বা শাখা যেমন কোমল থাকে, তদ্রূপ তদবস্থাতে এই জগৎ অতি কোমলরূপে প্রকাশ পায়। অথবা যেমন পণ্ডলিপ্ত ঘটিত চিত্রপট অঙ্ক পাতদ্বারা লাঞ্ছিত হয় তদ্রূপ ঈশ্বর দেহও লিঙ্গ-শরীর সমূহ দ্বারা সর্ব্বাংশে চিহ্নিত হয়। যেমন রৌদ্রোজ্জ্বল পদার্থ সকল ও ফলবান্ ধান্যাদি শস্য স্পষ্টরূপে প্রকাশ পায় তদ্রূপ বিরাট্ অবস্থাতে এই জগৎ অতি স্পষ্টরূপে প্রকাশিত হয়। পুরুষ সূক্তে বিশ্বরূপাধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে, ব্রহ্মাদি স্তম্ভ পর্য্যন্ত সমুদয় বিশ্ব এই বিরাটের অবয়ব।

ঈশ্বর, জীব প্রভৃতি চেতনা চেতনাত্মক এই জগৎ অদ্বিতীয় ব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞানে মায়া-কল্পিত স্বপ্নস্বরূপ ; যেহেতু আনন্দময় স্বরূপ ঈশ্বর এবং বিজ্ঞানরূপ জীব—উভয়ই মায়া দ্বারা কল্পিত এবং তদুভয় হইতে এই সমুদয় বিশ্ব সৃষ্টি হইয়াছে। সৃষ্টি বিষয়ক সংকল্প অবধি সর্ব্ববস্তু অনুপ্রবেশ পর্য্যন্ত সমুদয় ব্যাপার ঈশ্বরের কার্য্য, এবং জাগ্রৎ অবস্থা হইতে মুক্তি পর্য্যন্ত সমুদায় ব্যাপার জীব কর্ত্তৃক কল্পিত হইয়াছে।

গীত।

কীর্ত্তনভাঙ্গা আলেয়া—যৎ।

আমার মাকে কি দেখেছিস্ তোরা বল্ সত্য কোরে,
যাঁর নব নব রূপে নানা রূপে মন হরে।
আমার মা নহে কল্পনা, ঐ দেখ চিন্ময়ী হাস্যবদনা,
প্রেমচক্ষে স্নেহবক্ষে অমিয় ঝরে। (মায়ের)
শ্রীমুখে মধুর হাসি, ওগো নাশে পাপ দুঃখরাশি,
অবিশ্বাস নাস্তিকতা খণ্ডন করে। (হাসি)
রূপে করে জগৎ আলো, মায়ের কোলে শোভে ভক্তদল,
গদ গদ কোমলাঙ্গ আনন্দ ভরে।
আদ্যাশক্তি ভগবতী, রূপে লক্ষ্মী জ্ঞানে সরস্বতী,
একাধারে কত কোটী কোটী রূপ ধরে। (মায়ের)
কিবা শোভা আহা মরি মায়ের বিচিত্র রূপমাধুরী,
প্রসারিত প্রেমবাহু পাপীদের তরে।
(ও রূপ যে দেখেছে, সেই মজেছে জনমের তরে)।
আয় রে ও জগতবাসী, তোরা, দেখে যা এক বার আসি,
জননীর রূপরাশি নয়ন ভরে।

স্বর্গীয় যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু।

অকস্মাৎ আমাদের হৃদয়ে এক দারুণ শোক-শল্য বিদ্ধ হইল। স্বনামখ্যাত সুপ্রসিদ্ধ "বঙ্গবাসী" পত্রের সত্ত্বাধিকারী ও সম্পাদক বাবু যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু ইহ-সংসারে আর নাই! গত ২রা ভাদ্র শুক্রবার রজনী একাদশ ঘটিকার সময়

মধুপুরে প্রাণ ত্যাগ করিয়াছেন! বঙ্গের সকলেই এই নিদারুণ শোক সংবাদ শ্রবণ করিয়াছেন, কলিকাতা নগরবাসী হিন্দু সন্তান মাত্রেই অশ্রু বিসর্জ্জন করিয়া মহাশোক প্রকাশ করিতেছেন। হিন্দু সন্তান বলিলাম,—বলিতে হয়, সেই জন্যই বলা হইল, বাস্তবিক বঙ্গবাসী মাত্রেই মহা-শোকে অভিভূত হইয়াছেন। আর বেশী;—"ইংলিশম্যান" "ষ্টেটস্‌ম্যান" ও "ইণ্ডিয়ান ডেলিনিউস" প্রভৃতি ইংরাজ সম্পাদিত সংবাদ পত্র সম্পাদক মহাশয়েরা স্ব স্ব সম্পাদিত পত্রিকায় যোগেন্দ্র বাবুর বিয়োগ—শোকে আন্তরিক সমবেদনা প্রকাশ করিয়াছেন। স্বদেশবাসীগণের সম্পাদিত ইংরাজী, বাঙ্গালা সমস্ত সংবাদ পত্রে এই মহাশোক সংবাদ বিঘোষিত হইয়াছে। "সাহিত্য সভা" "সাহিত্য পরিষদ" ষ্টার থিয়েটার ও মিনার্ভা থিয়েটারে প্রধান প্রধান প্রতিনিধিগণের দ্বারা সভাসমিতি ও রঙ্গভূমির পরিচালকগণের আন্তরিক শোকোচ্ছ্বাস পরিব্যক্ত হইয়াছে। জষ্টিশ সারদাচরণ মিত্র, রায় বাহাদুর রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, পণ্ডিত কালীপ্রসন্ন কাব্য-বিশারদ, কবিবর অমৃত লাল বসু, বাবু গিরিশচন্দ্র ঘোষ প্রভৃতি স্বদেশ-বন্ধু ও সাহিত্য সেবিগণ যোগেন্দ্র বাবুর সদ্‌গুণাবলীর স্মরণে সমভাবে ক্রন্দন করিয়াছেন।

ক্রন্দনের প্রতিধ্বনি করা দেশবাসীগণের অবশ্যই কর্ত্তব্য, তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই। বাবু যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু এতদ্দেশে মাতৃভাষায় সুলভ সমাচার পত্র প্রচারের প্রথম প্রবর্ত্তক, "বঙ্গবাসীর" বয়স এখন চতুরবিংশতি বর্ষ;—স্বদেশের, স্বজাতির, স্বদেশীয় সাহিত্যের ও স্বদেশীয় ধর্ম্মের উপকার ও উন্নতি কল্পে এই চব্বিশ বৎসর কাল, যোগেন্দ্র বাবু আত্মজীবন উৎসর্গ করিয়া অবিশ্রান্ত যত্ন ও পরিশ্রম করিয়াছেন। তাঁহার চেষ্টায় বাঙ্গালা সংবাদ-পত্র-সংসারে যুগান্তর উপস্থিত হইয়াছে, যোগেন্দ্র বাবুর নিকটে বাঙ্গালা সাহিত্য অপরিশোদ্ধ ঋণে ঋণী, সকলকেই ইহা মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করিতে হইবে। সমাচার পত্রের ভাষা তিনি নূতন ছাঁচে ঢালিয়া গিয়াছেন, তাঁহার কল্যাণে বর্ণজ্ঞান বিশিষ্ট বঙ্গের ছোট বড় সমস্ত লোক সংবাদ পত্র পাঠ করিতে শিখিয়াছেন,—সংবাদ পত্রের উপকারিতা বুঝিয়াছে—"বঙ্গবাসী" হিন্দুধর্ম্মের ও হিন্দুসমাজের প্রধানমুখপত্র;—হিন্দুধর্ম্মের সংরক্ষণ এবং হিন্দুসমাজের উপকার সাধন, এই উভয় কর্ত্তব্য পালনে যোগেন্দ্র বাবু একদিনের জন্যও বিভ্রান্ত অথবা বিচ্যুত হন নাই। হিন্দুসমাজ নানা বিষয়ে তাঁহার দ্বারা উপকৃত হইয়াছে, হিন্দুধর্ম্মের উন্নতি বিধানে তিনি কায় মনে যত্নবান ছিলেন, সুলভ দুর্ল্লভ সংস্কৃত ধর্ম্মগ্রন্থ, কাব্যগ্রন্থ ও বাঙ্গালার কাব্য সাহিত্য অতি বিশুদ্ধ ও পরিষ্কাররূপে মুদ্রিত করিয়া অতি সুলভ মূল্যে

সাধারণের হস্তে অর্পণ করিয়া গিয়াছেন। সহস্র সহস্র মুদ্রা ব্যয়ে প্রকাশিত শাস্ত্র গ্রন্থাবলী তিনি এদেশীয় ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণকে বিনামূল্যে বিতরণ করিয়াছেন, শাস্ত্রগ্রন্থ প্রচারে যোগেন্দ্র বাবুর অক্ষয়কীর্ত্তি হিন্দুসমাজের অস্থিতে অস্থিতে গাঁথা রহিয়াছে, বাঙ্গালা সাহিত্যে সপ্তাহিক "বঙ্গবাসী" দৈনিক সমাচার চন্দ্রিকা" তৎ সাময়িক "জন্মভূমি" ব্যতীত তাঁহার স্ব-প্রণীত রাজলক্ষ্মী, বাঙ্গালী চরিত, কালাচাঁদ ও মডেলভগ্নি প্রভৃতি পুস্তকে তাঁহার ভাষা-নৈপুণ্য, বহুদর্শিতা, রসিকতা ও সমাজ-তত্ত্বজ্ঞানের উজ্জ্বল উজ্জ্বল প্রমাণ পরিস্ফুট হইয়া রহিয়াছে। যাঁহারা ইহ' বুঝিয়াছেন, তাঁহাদিগকে বুঝাইয়া দিবার নিমিত্ত আমাদিগকে অধিক প্রয়াস পাইতে হইবে না।

ধর্ম্ম, সমাজ, সাহিত্য এই তিন বিষয় ব্যতীত যোগেন্দ্র বাবু সাধারণ দেশবাসীর কল্যাণার্থ স্বদেশীয় শিল্প বাণিজ্যাদির উদ্ধারে আন্তরিক অনুরাগ প্রকাশ করিয়াছিলেন। হিন্দু-সংস্কারে যাহাতে কিছু আঘাত লাগে ব্যবস্থাপক সভায় তাদৃশ রাজ-বিধির কোন পাণ্ডুলিপি উপস্থিত হইলে বিশেষ বিশেষ যুক্তি দেখাইয়া বিশেষ যোগ্যতার সহিত তিনি তাহার ভূরি ভূরি প্রতিবাদ করিয়াছেন। হিন্দুসমাজ কদাচ তৎ-কৃত সেই উপকার ভুলিতে পারিবেন না।

এই সকল গুণ ব্যতীত যোগেন্দ্র বাবুর প্রকৃতিতে আরও বহুবিধ সদ্‌গুণ ছিল। পরিচিত, অপরিচিত, ছোট, বড়, সমস্ত লোকের সহিত তিনি সহাস্য বদনে মিষ্ট বচনে প্রিয় সম্ভাষণ করিতেন; ইতর বিশেষ ভাবিয়া কখন তিনি কোন শ্রেণীর লোকের অমর্য্যাদা করেন নাই। তৎ ব্যতীত শ্রীকৃষ্ণের ও প্রভু যিশুখ্রীষ্টের মহৎ উপদেশ অনুসারে গোপনে দানশীলতার পরিচয় দিতে তিনি দৃঢ় ব্রত ছিলেন, কোন প্রকার বিপন্ন দরিদ্র লোকের সাহায্য প্রার্থনা কখন তিনি অপূরণ রাখেন নাই। এমন কি অযাচক বিপদাপন্ন ব্যক্তির উপকারে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া তিনি সাধ্যমত অর্থ দান করিয়াছেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের দৌহিত্র সাহিত্য সম্পাদক শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি মহাশয় শ্লাঘা করিয়া বলিয়াছেন, অযাচকের উপকারে অগ্রসর হইতে বিদ্যাসাগর ও যোগেন্দ্রচন্দ্র ব্যতিরেকে তিনি আর কাহাকেও প্রায় নয়ন গোচর করেন নাই। এ প্রতিষ্ঠা বড় সামান্য গৌরবের পরিচয় দিতেছে না; যোগেন্দ্র বাবুর গুণ গ্রামের পরিচয় আমরা কত বলিব জানি না, ক্ষুদ্র জন্মভূমি পত্রিকার কলেবরে তাহা স্থান দিতে হইলে অতি কম এক বৎসরেও ফুরাইবে না।

১২৬১ সালের পৌষ মাসের ষোড়শ দিবসে শুক্লা দ্বাদশী তিথিতে রবিবাসরে (ইংরাজী ১৮৫৪ সালের ৩০শে ডিসেম্বর তারিখে) বর্দ্ধমান জেলার অন্তঃপাতী

মমারির নিকটবর্ত্তী ইসবা গ্রামে আপন মাতামহাশ্রমে স্বর্গীয় যোগেন্দ্র বাবু জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, বর্ত্তমান ১৩১২ সালের ২রা ভাদ্র শুক্রবার রজনীতে পঞ্চাশ বৎসর বয়সে নশ্বর মানব লীলা সম্বরণ করিলেন! অবশ্যই অকাল মৃত্যু! তাদৃশ উপকারি বন্ধু লোক শতায়ু হইয়া থাকিলেও আমাদের আশা পূর্ণ হইত না। তাঁহার অকাল মৃত্যুতে আমরা মহাশোক-সন্তপ্ত হইয়া তাঁহার অক্ষয় স্বর্গ কামনা ও পরিবারস্থ প্রিয় পরিজন বর্গের দারুণ বিয়োগ শোক অন্তরের সহিত সমবেদনা প্রকাশ করিতেছি।

বাবু যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু স্বাধীন প্রকৃতির লোক ছিলেন। প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কিছু দিন ফাষ্ট আর্ট পরীক্ষার পাঠ্য পুস্তক পাঠ করিয়া তিনি বিদ্যালয় পরিত্যাগ করেন, সেই সময় তাঁহার এক জন আত্মীয় তাঁহাকে চাকরী করিতে অনুরোধ করেন; চাকরীতে তাঁহার প্রবৃত্তি ছিল না। তথাপি সেই আত্মীয়ের অনুরোধে এবং ভূদেব বাবুর ইচ্ছায় তিনি জনাই স্কুলের শিক্ষকতা স্বীকার করিয়াছিলেন; তাহাও বেশী দিন নয়. দুই মাস কি আড়াই মাস মাত্র। অনন্তর ২৬ ছাব্বিশ বৎসর বয়সে তাঁহার অন্যতম সহকারী বন্ধু বাবু উপেন্দ্রনাথ সিংহের সহিত যোগে তিনি "বঙ্গবাসী" পত্রের প্রতিষ্ঠা করেন, কিছু দিন পরে ঐ উপেন্দ্র বাবু স্বতন্ত্র হইয়া যান, উভয়ে একরূপ বিচ্ছেদ ঘটে। বৈষয়িক বিচ্ছেদ থাকিলেও সেই উপেন্দ্রনাথ আজি যোগেন্দ্রচন্দ্রের অকাল মৃত্যুতে আন্তরিক শোকে অভিভূত হইয়াছেন। বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সংবাদ পত্রের আদর্শ স্থল বলিয়া তিনি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতেন। বিয়োগ—সন্তপ্ত আত্মীয় স্বজনের সহানুভূতি জানাইতেছেন, যোগেন্দ্রচন্দ্রের নিন্দাকারী মত-বিদ্বেষী যে দু-একজন আছেন, তাঁহারাও এখন হিংসা বুদ্ধি ভুলিয়া তাঁহার জন্য হায়! হায়, করিতেছেন। এ প্রকার সর্ব্ব-সহানুভূতি প্রাপ্তি সচরাচর ঘটিয়া উঠে না; শত্রু মিত্র উভয় পক্ষের অশ্রু কাহার জন্য এ প্রকারে এক সঙ্গে মিশিতে প্রায়ই দেখা যায় না।

বর্দ্ধমান জেলার অন্তঃপাতী বেড়ুগ্রামে যোগেন্দ্র চন্দ্রের পিত্রালয়। এই বেড়ুগ্রাম পূর্ব্বে অপরিচিত ছিল, যোগেন্দ্র চন্দ্রের অভ্যুদয়ে এই অপ্রসিদ্ধ গ্রাম খানি নূতন শ্রীধারণ করিয়াছে। যোগেন্দ্র বাবু বিবিধ উপকরণে সাজাইয়া বেড়ু গ্রামের শোভা সংবর্দ্ধন করিয়া গিয়াছেন। বেড়ু গ্রাম বলিলে পূর্ব্বে অনেক লোকে চিনিতেই পারিত না, যোগেন্দ্র চন্দ্রের কল্যাণে এই গ্রাম এক্ষণে গৌরবের সহিত বঙ্গপরিচিত হইয়াছে।

যোগেন্দ্র চন্দ্রের তিন পুত্র। জ্যেষ্ঠ শ্রীমান্ বরদাপ্রসাদ বসু,—এক্ষণে উত্তরা-

কারী হইয়া পিতৃ—কীর্ত্তি বজায় রাখিবার ভার স্বীয় মস্তকে ধারণ করিয়াছেন, ঈশ্বর কৃপায় তিনি পিতৃধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া স্বদেশের ও স্বধর্ম্মের উন্নতি সাধনে পূর্ণ মনোরথ হউন এই আমাদের আন্তরিক আশীর্ব্বাদ। বঙ্গবাসী কলেজ প্রতিষ্ঠাতা ও অধ্যক্ষ বাবু গিরীশচন্দ্র বসু এম্‌, এ, স্বর্গীয়যোগেন্দ্র চন্দ্রের জ্যেষ্ঠতাত পুত্র। যোগেন্দ্র চন্দ্রের কীর্ত্তি অটল রাখিতে তিনিও অকপটে যত্নবান থাকুন ইহাও আমাদের প্রার্থনা। নেত্র-বাষ্পে আমাদের দৃষ্টি রোধ হইয়া আসিতেছে, আর অধিক লিখিতে পারিলাম না।

বাবা।

(সামাজিক নক্সা)।

বৃদ্ধ পঞ্চানন ঘোষের পাঁচ পুত্র। রাইচরণ, রাধাচরণ, রামচরণ, শ্যামচরণ, যাদবচরণ। এই পঞ্চপুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠ রাইচরণ, এক পাড়াগাঁয়ের একটা মিশনারী স্কুলে দুই বৎসর কিছু কিছু ইংরাজী পড়িয়াছিল। বর্ণ শিক্ষার পর দুই বৎসরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তিনখানি পুস্তকও সমাপ্ত হয় নাই। তথাপি ইংরাজী-ওয়ালা বলিয়া রাইচরণের মনে মনে অভিমান।

সর্ব্ব কনিষ্ঠ যাদবচরণ এখনও ইংরাজী পড়িতেছে। যাদবের বয়ঃক্রম প্রায় একাদশ বর্ষ। গ্রামের লোকেরা বলাবলি করে, যাদবটি খুব বুদ্ধিমান ছোকরা, আর কিছু দিন পরে এ ছোকরা ইংরাজীতে পরম পণ্ডিত হইবে। পাড়ার কাহার নামে ডাকের চিঠি আসিলে, শিরোনামে যদি ইংরাজী লেখা থাকে, সে যাদবের কাছে পড়াইতে আইসে, যাদব সেগুলি ভগ্নাক্ষরে বানান করিয়া পড়িয়া পড়িয়া দেয়; লোকে তাহার যথেষ্ট সুখ্যাতি করে। যাদবেরও খুব আহ্লাদ হয়,—আহ্লাদের সঙ্গে অহঙ্কারও বাড়ে।

জ্যেষ্ঠ একজন ইংরাজী ওয়ালা, কনিষ্ঠও একজন ইংরাজী নবীশ! দ্বিতীয় তৃতীয় চতুর্থ, এই তিনটি ভ্রাতা ইংরাজী পুস্তক স্পর্শ করে নাই;—সামান্য প্রকার বাঙ্গালা কেতাবতী শিখিয়া রাখিয়াছে মাত্র। সামান্য সামান্য খাতা পত্র লেখা, সামান্য সামান্য হিসাব পত্র রাখা, দাতাকর্ণ, গুরুদক্ষিণা, অক্রুর সংবাদ, মানভঞ্জনের পাঁচালী ইত্যাদি সামান্য সামান্য কবিতা পাঠেই তাহাদের বিদ্যার পরিচয়।

ঘোষ বলিলে সাধারণত গোপ জাতি বুঝায়;—পঞ্চানন ঘোষ গোপ জাতীয়

লেন না:—মকরন্দ বংশীয়-কুলীন কায়স্থ। নিজ গ্রামে তাঁহার একখানি মালদারী আড়ত ছিল; সেই দোকানের উপার্জ্জনেই সংসার চলিত, জ্যেষ্ঠপুত্র রাইচরণ ইংরাজী শিখিয়াছে বলিয়া উক্ত অভিমানে দোকানে বসিত না; মধ্যম, তৃতীয়, চতুর্থ, এই তিন ভ্রাতাও পাড়াগাঁয়ের দোকানকে ঘৃণা করিত; কনিষ্ঠ একটি বালক মাত্র, তাহার কথা স্বতন্ত্র।

সংসারের জন্য বাবাই বিব্রত। বাবা বৃদ্ধ; উপযুক্ত পঞ্চপুত্র থাকিতে সেই বৃদ্ধ বাবা সংসারের সকল কার্য্য করিতেই বাধ্য। বাবা দোকান করিবে, বাবা বাজার করিবে, বাবা মোট বহিবে, বাবা গাই দুইবে, পুকুরে জাল ফেলিয়া মাছ ধরিবে, বাড়ীতে অতিথি কুটুম্ব আসিলে বাবা তাহাদের সেবা করিবে, বাবা স্বহস্তে দুই তিনটি গাইগরুর জাব দিবে, এই প্রকার সকল কর্ম্মেই বাবা;—বৃদ্ধ হইয়াছে বলিয়া বাবা কেবল নারিকেল গাছে উঠিয়া নারিকেল পাড়িতে অক্ষম; সেই একটি কার্য্যে বাবার কিছু ত্রুটি আছে।

কেবল ইহাই নহে। রাইচরণটি ইংরাজী ওয়ালা; মধ্যে মধ্যে কলিকাতায় আসিয়া দেখিয়া যায় গড়ের মাঠে সাহেব বিবিরা বগল ধরাধরি করিয়া হাওয়া খায়;—লোকের মুখে শুনা যায়, সাহেবেরা পিতা মাতাকে পালন করে না;—এক এক বিবি লইয়া স্বতন্ত্র বাস করে; সাহেব বিবিতে ঘোড়ায় চড়িয়া রঙ্গভূমিতে খেলা করে;—এই সকল দেখিয়া শুনিয়া রাইচরণ বৃদ্ধ বাবাকে ভক্তি করিতে চাহে না। কাজে কিছু নহে, অথচ উপযুক্ত জ্যেষ্ঠ পুত্র, সুতরাং রাইচরণ আপনাদের সংসারের কর্ত্তা। বাবার উপরেও রাইচরণ সর্ব্বদা কর্ত্তৃত্ব করে। একটু কিছু ত্রুটী পাইলে (অথবা না পাইলেও) রাইচরণ মুর্খ বলিয়া ঘৃণা করে। কাল-ধর্ম্ম বলিয়া বাবা চুপ করিয়া থাকেন।

মাঝের তিনটি পুত্র কিছুই করে না। সংসারে দহ পড়িয়া গেলেও ফিরিয়া চাহিয়া দেখে না! বাড়ীতে আসিয়া দুই বেলা আহার করে, অবশিষ্ট সময়টা বাহিরে বাহিরে ইয়ারকী করিয়া বেড়ায়। বেশী রাত্রে ঘরে আসিয়া নিদ্রা যায়।

রাইচরণের বিবাহ হইয়াছে। রাইচরণ ইয়ার হয় নাই, কিন্তু একটু একটু সৌখীন্ হইয়াছে। ফরসা ফরসা কাপড় পরা, চিত্র বিচিত্র জামা পরা, লালবাজারের বার্ণিশ করা জুতা পরা, দণ্ডে দণ্ডে চুল ফিরাইয়া বাহার দেওয়া, মাঝে মাঝে পাবপার্ব্বণে তুলায় করিয়া একটু একটু আতর কাণে রাখা, এই রাইচরণের শিক্ষা হইয়াছে, শিক্ষা হইতে হইতে অভ্যাস হইয়া গিয়াছে। বিবি লইয়া

স্বতন্ত্র বাস করা মনে মনে ইচ্ছা, কিন্তু গর্ভধারিণী সংসারে আছেন, সেই খাতিরে সেটা এখন ঘটিয়া উঠিতেছে না।—রাইচরণের গর্ভধারিণীর ভাগ্য ভাল, বৌমা তাঁহাকে ছাড়িয়া যায় না। বৌমার স্বামী বাস্তবিক গর্ভধারিণীকে পূজাভার কি কণ্টক ভাবে, তাহা আমরা জানি না।

দুর্গাপূজা নিকট। আজ কাল সহরের সুগন্ধ জীবীরা পল্লিগ্রামেও স্বদেশজাত আতর গোলাপ ফিরি করিতে যায়। দুর্গা পূজার অগ্রে একদিন দুইজন আতর ওয়ালা রক্ত বস্ত্র মণ্ডিত বাক্স লইয়া পঞ্চানন ঘোষের বাহির বাড়ীতে উপস্থিত হইল। বেলা আন্দাজ এগারটা। রাইচরণ তখন আহার করিয়া বাহিরের চণ্ডীমণ্ডপে বিশ্রাম করিতে করিতে দাশুরায়ের পাঁচালীর চতুর্থ খণ্ড পাঠ করিতেছিল;—সেদিন রবিবার;—চণ্ডীমণ্ডপের বারাণ্ডায় একখানি মাদুর পাতিয়া কনিষ্ঠ যাদবচরণ ভোজনান্তে দুইখানি ইংরাজী পুস্তক লইয়া সোমবারের পড়া মুখস্থ করিতেছিল;—আতর ওয়ালারা চণ্ডীমণ্ডপে উঠিয়া যাদবের বিছানার ধারে বসিল। পাঁচালী খানি মুড়িয়া, রাইচরণ উঠিয়া, গোলাপী, চামেলী, মতিয়া, বেলা, ইত্যাদি পাঁচরকম আতরের পলিতা সুঁখীয়া ভাল মন্দ সৌরভ পরীক্ষা করিতে লাগিল। পরীক্ষা সিদ্ধ হইল না। আতর ওয়ালারা অন্য বাড়ী যাইবার জন্য ব্যস্ত হইতে লাগিল। রাইচরণ বলিল, থামোনা, থাকো না, বাবা আসুক;—যে জানে, সে আসুক, বাবা গেল কোথা?

আতর ওলাদের ঐ কথা বলিয়া, উচ্চকণ্ঠে রাইচরণ ডাকিতে লাগিল, বাবা! ও বাবা! ওহে বাবা!—বাবাটা গেল কোথা (যাদবের দিকে চাহিয়া) ওরে যেদো! দেখে আয়তো, বাবা এতক্ষণ কচ্চে কি? এত ডাকাডাকি কচ্ছি, খাতিরেই আসে না! কালা নাকি! যা!—দেখে আয়!—ডাক্।

দাদার ভয়ে যাদব একবার ছুটিয়া বাড়ীর ভিতর গেল;—ছুটিয়া ফিরিয়া আসিয়া বলিল, খাচ্চে।

কর্কশ স্বরে গর্জ্জন করিয়া রাইচরণ বলিল, খাচ্চে! যখনি ডাকি, তখনি বলে খাচ্চে।—বাবার খাবার জ্বালায় আমি যাব কোথায়!—রাতদিন কেবল খাই-খাই-খাই!—খাচ্চে-খাচ্চে-খাচ্চে! দুধের খোকা যেন! এক দণ্ড না খেলেই পেটে যেন আগুণ লাগে!—ডাক্!

এবারে আর যাদবকে উঠিতে হইল না। একখানি পাঁচ হাতি ধূতি পরিয়া মুখ মুছিতে মুছিতে বাবা আসিয়া চণ্ডীমণ্ডপের সম্মুখে দাঁড়াইলেন। রাইচরণের কণ্ঠে আবার যেন কাঁসি বাজিল। খন্ খন্ স্বরে চীৎকার করিয়া রাইচরণ

বলিল, এতক্ষণ হচ্ছিল কি? তিন ঘণ্টা ডাকাডাকি, খাতির নদারৎ। পোড়াপেটে আগুন জেলে দাও!

কত যেন ভয় পাইয়াই নতমুখে বাবা বলিলেন, দেওয়াই হয়েছে বাবা! ভাত ফেলিয়া উঠিয়া আসিয়াছি! বল তোমার কি দরকার! পূর্ব্ববৎ খন্ খন্ আওয়াজে গর্জ্জন করিয়া রাইচরণ বলিল, বাবা হয়ে যেন মাথা কিনেছেন আর কি! বলি, আতর ওয়ালা কি আমার বাবা খুড়ো, তোমার জন্যে দুঘণ্টা বসিয়া থাকিবে! ভাত ফেলে উঠেছেন! বোয়েই গেল। জারী আবার! আতর দেখ! চেনো বলিয়াই ডাকি, নইলে আমার এইটী! (বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শন)

তলপি তাগাদা গুটাইয়া আতর ওয়ালারা ছুটিয়া পলাইল। বাবাও কাঁপিতে কাঁপিতে বাড়ীর ভিতর চলিয়া গেলেন। রাইচরণের কেনা হইল না। ইংরাজী পুস্তক হস্তে যাদব চরণ হাঁ করিয়া চাহিয়া রহিল। ক্ষুদ্র বালক মনে ভাবিল, বাবা হওয়া এ বাজারে কি দুর্গতি! আমি যদি বাঁচি প্রতিজ্ঞা রহিল, কদাচ কাহারও বাবা হইব না!

ভুল।

লেখক—শ্রীনারায়ণচন্দ্র বিদ্যারত্ন।

আশার ছলনে ভুলি কি কাজ করিনু হায়,
স্বচ্ছ সরোবর ছাড়ি মজি মৃগ-তৃষ্ণিকায়!
অবহেলি মুক্তাফলে, নিরখি, দুর্ব্বার দলে
ভুলিলাম মূঢ় আমি, হিমবিন্দু কলিকায়!
কমলের দলে ভুলি মজি কিংশুক-শাখায়!
করিয়ে প্রেমের আশ, ছি ছি রমণীর দাস,
প্রেমময় যিনি, মূঢ় আমি, ভুলিলাম তায়!

আবাহন।

বর্ষচক্রের আবর্ত্তনে শীত গ্রীষ্মাদি ঋতুচয়ের নিয়মিত পরিক্রমণে সময়-সাগরের সৈকতপুলিনে পদাঙ্ক রাখিয়া আর একটী বর্ষ ধীরে ধীরে ডুবিয়া গেল। অবিরল জলধারাপ্লাবী মেঘদল, কাদম্বিনীর অভ্রভেদী গভীর গর্জ্জন, তীব্রোজ্জ্বল প্রভাময়ী চঞ্চলার তীব্রশিখা এখন শূন্যে—মহাশূন্যে—অনন্ত অম্বরের কোন দূর্লক্ষ্যপ্রান্তে ভাসিয়া গিয়াছে। আজ প্রকৃতি শান্ত, নিস্তব্ধ ও স্তিমিত। গ্রহনক্ষত্রাবলী আজ অবরোধ বিনিক্তন্ম্ হইয়া অখিলবিশ্বহৃদয়ে নিজ নিজ কিরণাবলী প্রতিফলিত করতঃ মহাপ্রকৃতির শোভা পরিবর্দ্ধনে ব্যাপৃত। ধরণী রাণী আজ নিজহৃদয়ে তরঙ্গায়িত শস্যক্ষেত্র মৃদু সমীরান্দোলনে আন্দোলিত করিয়া মানবহৃদয়ে নবশক্তি সঞ্চার করিয়া দিতেছেন। ব্রহ্মাণ্ডের এই নবপরিবর্ত্তনে নূতন অভ্যুত্থানে বিশ্ববাসী প্রাণিমাত্রই আজ মহাপ্রাণময় ও অতীব উৎফুল্ল।

যাঁহার কৃপায়, যাঁহার অনুগ্রহে, আজ এই অনন্ত উৎসবের ধারা বিশ্বমণ্ডলে প্রবাহিত, ধর্ম্মপ্রাণ-হিন্দু এই শুভ শরৎকালে তাঁহারই অর্চ্চনায় প্রবৃত্ত। তাঁহারই উদ্দেশ্যে আজ বঙ্গবাসী দশভূজা অসুরঘাতিনী অনন্ত শাস্ত্রাস্ত্রধারিণী বিঘ্নবিনাশন-সহায়িনী শক্তিধর জননী শিবশক্তিময়ী দুর্গতিহারিণী মহাদুর্গার চরণতলে ভক্তিপুষ্প সমর্পণে সমুৎসুক।

আজ বঙ্গবাসী অধঃপতিত ক্ষুদ্রাদপি, ক্ষুদ্রতম জাতি। আজ তাহার তেজঃ দর্প আত্মাভিমান সাহস পৌরুষ কিছুই নাই। সব অতীতের গর্ভে মিশিয়া গিয়াছে। কিন্তু এক সময় তার শুভদিন ছিল। একদিন এই ভেতো বাঙ্গালী মহাশক্তির অনন্ত করুণায় হৃদয়ে মহাশক্তির পোষণ করিয়াছিল। একদিন এই বাঙ্গালীর বিজয়-পতাকা যাভা, বালী ও সিংহল দ্বীপে পৎপৎ রবে সমুড্ডীন হইয়া ভারতের অনন্ত গৌরবের পরিচয় প্রদান করিয়াছিল। তন্ত্রশাস্ত্রের পর্য্যালোচনায় মহাশক্তির সাধনায় একদিন ইহারাই জগতে শক্তিধরের ন্যায় মহাশক্তি প্রকাশে সমর্থ হইয়াছিল।

আজ আমাদের সে সবই গিয়াছে। কেবল একমাত্র ক্ষুদ্র স্মৃতি-রেখা ব্যতীত আর কিছুই নাই।

ভাই বঙ্গবাসি! তোমরা যেন সে স্মৃতিটুকু বিসর্জ্জন দিও না। সমুদ্রগর্ভে নিমগ্নপোত-আরোহীর পক্ষে ক্ষুদ্র কাষ্ঠখণ্ডের ন্যায় অন্তিমের একমাত্র আশ্রয়, সে স্মৃতিটুকু হৃদয়ক্ষেত্র হইতে উৎপাটিত করিও না। তোমাদের হৃদয়ের সারসর্ব্বস্ব আশা ভরসা সেই মহাশক্তির শক্তিকে যেন বিস্মৃত হইও না।

অশ্রু মুছাও।

মুছাও মা, অশ্রু মুছাও। অশ্রুজলে পৃথিবী প্লাবিত হইয়াছে। আগমনের আনন্দ-উত্তাপে অশ্রু সাগর শুষ্ক কর! শোকাশ্রু মুছাইয়া, প্রেমাশ্রুতে পৃথিবী পূর্ণ কর পরমেশ্বরি!

দারিদ্র্যের তীক্ষ্ণদংশন, দুর্ভিক্ষের দাব দাহ, শোকের আগ্নেয় শৈলমালা সন্তাপের তরল অগ্নিস্রোত! বামে দক্ষিণে, সম্মুখে পশ্চাতে তাকাইয়া দেখ মা! ত্রিনয়নে, তোমার পৃথিবীতে কি ভীষণ তুষানল জ্বলিতেছে! প্রাণী, পতঙ্গবৎ শুষ্কপত্রবৎ সে অনলে পড়িতেছে, আর্ত্তনাদ করিতেছে; "ত্রাহি ত্রাহি" বলিয়া, কত লোকে তোমায় ডাকিতেছে! কত লোকে এই মনুষ্য জীবনের উপর অভিশম্পাত করিতেছে!

পৃথিবীর হৃৎপিণ্ড ফাটিয়া রক্ত ছুটিয়াছে! মনুষ্যদেহের হৃৎ-পদ্মগুলি প্লীহা পিত্তে যক্ষ্মা যকৃতে পূর্ণ! মূলাধার হইতে কুলকুণ্ডলিনী পর্য্যন্ত পাপ-শ্লেষ্মা ব্যাপিয়াছে! মানব-সমাজের মানবদেহের আপাদমস্তক বিষাক্ত ক্ষতময়। মা, তুমি দাঁড়াইবে কোথায়! মনের মধ্যে এমন একটু শুদ্ধ সজীব এমন একটু সুপবিত্র স্থান নাই, এমন একটু নির্ম্মল ও নিরালা জায়গা নাই, যেখানে তোমার সপ্রকাশ প্রতিমা দাঁড় করাইয়া পূজা করিব! তোমার ধরারাজ্যে তোমার দাঁড়াইবার স্থল নাই!! আসিয়াছ যদি মা, বিমানে দাঁড়াও!

পৃথিবীতে পা বাড়াইবে কোথায়! পাপ-পিশাচী নগ্নদেহে সর্ব্বত্র পৈশাচিক নৃত্য নাচতেছে! গৃহীর গৃহে, দেবতার মন্দিরে, সন্ন্যাসীর সন্ন্যাসে রাক্ষসলীলা! মহাপাতক মুখ ব্যাদান করিয়া রহিয়াছে! আসিও না, মা মঙ্গলা এই অমঙ্গলপুরে,—আসিও না, এই অন্ধকার নগরে!

অন্ধকার গর্জ্জে ঐ! অতিভীষণ! আলোক কাঁদে ঐ,—আরও ভীষণ! শঙ্খিনীর সংহার শঙ্খনাদে মহাপ্রাণী অবশ! দুর্গা দুর্গতিনাশিনি! আতঙ্কে অঙ্গ শিহরে! প্রকৃতির সূক্ষ্ম শক্তিনিচয় স্ব স্ব স্থানে সুষুপ্ত, সপ্তপদ্মে প্রাণপুষ্প প্রস্ফুটিত রাখিয়াছেন! পিশাচী প্রাণ উপাড়িয়া, পুষ্প ছিঁড়িয়া পদ্মস্পর্শ করিতে ধাইয়াছে! কোথায় পলাইব! মা, এস এস! রক্ষা কর! তোমার স্বস্থানে সজাগ হও! ভবসংসারে ভুবনেশ্বরী বীজ পুনর্ব্বপন কর!

মা! বিমান হইতে নাম! মহা আগমনে মহাপাতক বিনাশ হইয়াছে! মা, নাম বিমান হইতে! নহিলে এ ক্রন্দন থামিবে না; এ আঁধার ঘুচিবে না, এ আগুন নিবিবে না, এ অশ্রু শুকাইবে না। এক বৎসরের আগুন, এক বৎসরের আঁধার, এক বৎসরের রোদন, এক বৎসরের অশ্রু, পর্ব্বতপ্রমাণ হইয়া রহিয়াছে। মা! তুমি আসিবামাত্র এ সব উড়িয়া যাইবে! নিরঞ্জনের নেত্রনীর আজও নয়নে লাগিয়া আছে! মুছি নাই মা,—কেমনে মুছিব! কি দিয়া মুছিব! কে মুছাইয়া দিবে! এস মা! অশ্রু মুছাও! যে ভ্রান্তিতে এ সকলের সৃষ্টি এবং স্থিতি, সে ভ্রান্তিরূপিণী ভগবতি! সে ভ্রান্তি ভিন্নভাবে বিস্তার করিয়া, সন্তাপ সকল নিমগ্ন কর! এস মা! আবার ভুলাও সম্বৎসরের অশ্রু আবার মুছাও!

সম্বৎসর ধরিয়া বড়ই ক্রন্দন কাঁদিয়াছে মা! তোমার কাঙাল কাঙালিনীরা! তুমি নহিলে কে ইহাদের অশ্রু মুছাইবে,—কে বল এত লোকের এত অশ্রু মুছাইতে পারে! তোমার ছেলে পিলের অশ্রু অন্যে মা মুছাইবেই বা কেন! মা! মুছাও মুছাও,—আগে অশ্রু মুছাও, ঐ অভাগিনীদের। পুত্র-শোকাতুরা জীর্ণদেহ জননীগণ, সারি, সারি, সারি,—তোমার সম্মুখে দাঁড়াইয়া ঐ! অন্ধের যষ্টি ভিক্ষার ঝুলি উহাদের হারাইয়াছে! সংসার-পাথারে, অমাবস্যার আঁধারে, অতিক্ষীণ অতি মৃদু---আলো কবিন্দু উহাদের নিবিয়াছে! আগে মা উহাদের অশ্রু মুছাও! তাহার পর মুছাও! তাহার পর মুছাও ঐ অনাথ-অনাথা অভাগা অভাগী শিশুদের অশ্রু! মা, দুধের বালক জন্মিয়া অবধি কভু দুধের মুখ দেখে নাই; দু'টী ভাতের জন্য পথে পথে ফিরিতেছে; তোমার আগমনে যদি কেহ উচ্ছিষ্ট অন্ন বিলায়, সেই অনুসন্ধানে লোকের দ্বারে দ্বারে ঘুরিতেছে! সর্ব্বাগ্রে উহাদের অশ্রু মুছাও মা! অশ্রু মুছাও উহাদের; ওমা উহাদিগকে ক্রোড়ে কর; তুমি নহিলে কে বল আর উহাদিগকে ক্রোড়ে করিবে; উহারা মাতৃ-ক্রোড় দেখে নাই; কখনও কাহারও ক্রোড় দেখে নাই! মেদিনী-মাতার একমাত্র কঠিন কর্কশ ক্রোড় ব্যতীত আর কোথাও উহাদের স্থান হয় নাই। কেহ উহাদিগকে বক্ষে ধারণ করে নাই। পৃথিবীর পরিত্যক্ত উহারা; আগে মা উহাদিগকে আশ্বস্ত কর। ওমা ভিক্ষা করিতেছি, তোমার কাছে, এবার যেন উহাদের সকলেরই এক একটু কাপড় হয়।

তার পর, মা, অশ্রু মুছাও; অশ্রু মুছাও আর উপহার লও, তোমার ঐ কাঁচা কচি মেয়েগুলির। উপহার লও, উহাদের সিঁথির সিঁদুর, হাতের কঙ্কণ, পাটের সাড়ী! তোমার পায়ে উপহার দিবে বলিয়া বৎসর ধরিয়া অশ্রু সিক্ত করিয়া সাজাইয়া রাখিয়াছে, সোহাগের ডালা, গত পূজার পাটের সাড়ী একটী বারও পরে

ই, ষষ্ঠীর দিনে পরিত; পঞ্চমীর দিনে প্রাতঃকালে পতি প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। দর্পণে দুইবার বই মুখ দেখে নাই। দর্পণ এনে দিয়া, তিনি মোটে, দুই দিন লেন। কাঙালিনী হাতের কঙ্কণ খুলিয়া রাখিয়াছে, তোমার পায়ে পূজা দিবে লিয়া। সিন্দুর পূর্ণ সিন্দুর কৌটা। একবার একবিন্দু সিন্দুর তুলিয়া সীমন্তে িয়াছিল, অঙ্গুলি চিহ্ন এখনও মা সিঁদুরে রহিয়াছে, সীমন্তে সিন্দুর তুলিবার, হায়! েষ অঙ্গুলি-চিহ্ন। অভাগিনী অঙ্গুলির দাগ মুছে নাই; কৌটাটী কাহাকেও ইতে দেয় নাই। ঐ কৌটা ঐ দাগ উহার প্রাণের প্রাণ! কৌটা বরণ দিনে বার করিয়া, অশ্রুজলে স্নান করাইয়া আবার তুলিয়া রাখে। তোমায় আজ খাইবে তোমার পায়ে অঞ্জলি দিবে! ওমা তুমি, বিধবার অর্ঘ্য, বিধবার অঞ্জলি, বিধবার এয়োত্ব উপহার লইবে না কি! ওমা লইও লইও, গোপনে লইও! লোকের অলক্ষ্যে বিধবার অশ্রুজল মুছাইও! দুর্গা-দালানে বিধবার যেতে মানা; সধবা মানা করেন। ওমা বিধবার চোখের জল মুছাও। তোমার পদ্মহস্তের স্পর্শটুকু ছাড়া, ও জল মুছাইবার শক্তি আর কিছুই নাই।

মুছাও মা, অশ্রু মুছাও, মর্ত্তলোকে আবার "মেসমারাইজ" কর। রাঙা রুমালখানি দেখাইয়া, আবার আমাদিগকে ভুলাও। প্রতি বৎসরই মা ভুলাইতে এস, ভুলাইয়া যাও; ভ্রান্তির হাসি হাসাও, আবার সে হাসি কাড়িয়া লইয়া চলিয়া যাও। রাঙা রুমাল দেখিয়া, যেমন খোকা ভুলে, তিনটী দিন তোমার রাঙা চরণ দেখিয়া তেমনি, খোকার মত আমরা ভুলি।

আনন্দময়ীর আগমনের আনন্দ-ইন্দ্রজালে আব্রহ্ম স্তম্ভ পর্য্যন্ত আচ্ছন্ন। এস ভাই অশ্রু মুছাই! এস পরম শত্রু সেখানে থাক, সর্ব্বাগ্রে তোমাদের অশ্রু মুছাই! বুকের ভাঙ্গা হাড় যোড়া দিই; প্রাণের আঘাতে আনন্দের আরোগ্য-প্রলেপ লাগাই! এস এস অশ্রু মুছাই! এস অশ্রু মুছাও!

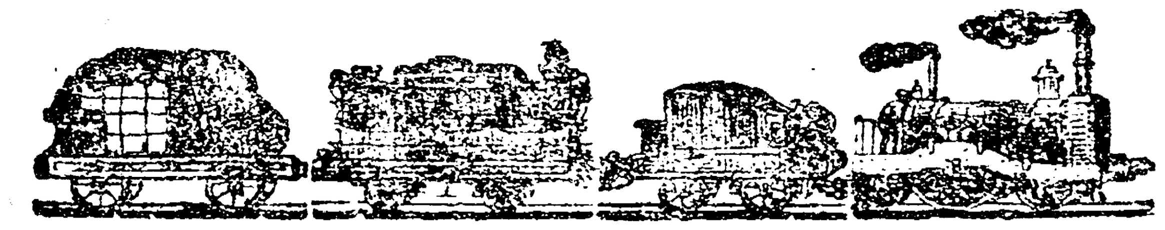

পূজা-প্রসঙ্গে।

লেখক—শ্রীতারকনাথ মুখোপাধ্যায়।

রেলগাড়ীতে গল্প।

গাড়িতে অসম্ভব ভিড়। এক কামরায় যত জন বসিবার কথা, রেল কোম্পানী তাহার প্রায় দ্বিগুণ সংখ্যক আরোহী সচ্ছন্দে ঠেলিয়া দিয়াছেন।

আরোহি নির্ব্বিকার ; অমন কষ্ট কত দিকে হইতেছে, আপন আপন কাজ লইয়াই সকলে ব্যস্ত, এসব দিকে মনোযোগ দিবার অবসর কাহার ? গাড়িতে উঠিয়াই সকলে আপন আপন বক্তব্য বিষয়ে কথা আরম্ভ করিয়া দিয়াছেন। কথা কহিতে পাইলে বাঙ্গালি, (শুধু বাঙ্গালি কেন, প্রাচ্য খণ্ড নিবাসিগণ অথবা সকলেই,) অনেক কষ্ট ভুলিয়া যান। ইহা একটা জাতীয় চরিত্র বটে। এই বেতালপঞ্চবিংশতির দেশে, খবরের কাগজ বিকায় না কেন বিস্ময়ের বিষয় বটে। দারিদ্র্যই বোধ হয় ইহার প্রধান কারণ।

আমার চিন্তা স্রোত সহসা ভাঙ্গিয়া গেল। বাঙ্গালি বিস্তর কথা কহিতে পারে বটে, কিন্তু সে সমস্ত অধিকাংশ স্থলেই সাধারণ শ্রোতৃবর্গের জন্য নহে। সেগুলি প্রায়ই যেন একটু প্রাইভেট প্রকৃতির—যে দুই চারিজনে মিলিয়া গল্প হয় তাঁহাদের জন্যই যাহা একটু কুতূহল রস থাকে, সকলকে বাঁটিয়া দিতে গেলে তাহা ফুরাইয়া যায়। এই কারণেই বা এদেশে খবরের কাগজের তেমন পাঠক জুটে না। সাধারণ ও বহু পাঠকের মন যোগাইয়া লেখা, সকল স্থলেই, বিশেষতঃ বাঙ্গালির পক্ষে বোধ করি একটা বিশিষ্টরূপ আয়াস-সাধ্য কার্য্য। পক্ষান্তরে এরূপ যুক্তি ফলে, এতদ্দেশে খবরের কাগজের সংখ্যাটা খুব অধিক হওয়া উচিত। দু-দশজন পাঠককে লইয়া, এক একটি সংবাদ পত্র মজলিস চালাইতে থাকিবে। মুদ্রণ ব্যয়টা যদি কিছু কম হইত, অথবা চাঁদা করিয়া মজলিসি সভায় তামাক খরচটা তুলিবার মত, পাঠক যদি স্বীয় স্কন্ধে প্রতিপালন ভারটা লইত তাহা হইলেই কিছু সুবিধার বিষয় ছিল। এইরূপ সংবাদ পত্রই এতদ্দেশের উপযোগী। অনুমান হয় ভবিষ্যতে সংবাদ পত্র সমূহ রূপান্তরিত হইয়া ঐরূপ অবস্থায় দাঁড়াইবে। বড় বড় কল কারখানা হইয়া ছোট ছোট দোকান গুলির স্বাধীনতা ঘুচাইয়াছে। বিস্তর বড় বড় কল কারখানা হইলে, ক্রেতার অভাবে তখন আবার সকলকেই নামিয়া ছোট হইতে হইবে। বিস্তর প্রতিদ্বন্দ্বী জুটিলে কোনও সংবাদ পত্রই বহুগ্রাহক সংগ্রহে সক্ষম হইবেন না। যাঁহারা সংসারে ক্রমাগতঃ উন্নতি স্বীকার করেন তাঁহারা এ কথাটায় আস্থা স্থাপন করিবেন না। ইহাঁদের মতে সংসারে দুর্ব্বলের স্থান নাই, প্রবলই সকলকে গ্রাস করিয়া বাঁচিয়া থাকে এবং প্রবলতর কর্তৃক কালে বিনষ্ট হয়। অবস্থা মিলাইয়া দেখিলে, ইহাঁদের কথাতেও পূর্ণ-সম্মতি দেওয়া চলে না।

যাহা হউক যেমন বলিয়াছি, আমার চিন্তাস্রোত সহসা ভাঙ্গিয়া গেল। এক পার্শ্বে ভট্টাচার্য্যাকৃতির এবং ভট্টাচার্য্য প্রকৃতিরও বটে, কয়েকজন বসিয়া-

ছিলেন। ইহাঁদের দু-একটি কথা কাণে গেল। নমস্তস্মৈ নমস্তস্মৈ নমস্তস্মৈ নমোনমঃ। রাজ-পুরোহিত মহাশয়ের, রাজ পুরোহিত হইলে কি হয়, পদোচিত বিদ্যার খোসা বা বহিরাবরণ ছিল না। তাঁহার ছিল ভক্তি ও সচ্চরিত্রাদি রূপ দুইটি প্রধান সম্বল, ব্যাকরণ-জ্ঞানটা কিছু দুর্ব্বল। শ্রীশ্রী৺চণ্ডী মাতাকে উদ্দেশ করিয়া সেইজন্য তিনি অম্লান বদনে "নমস্তস্মৈ নমস্তস্মৈ নমস্তস্মৈ নমোনমঃ!" শব্দে অভিবাদন করিতেছিলেন। দু-একজন দুর্ব্বুদ্ধি, পুরোহিত মহাশয়ের এই অমার্জ্জনীয় মূর্খতা (অমার্জ্জনীয়,—কারণ সাধারণ লোকের বিশ্বাস চণ্ডীপাঠ কালে ভুল হইতে নাই) রাজার গোচরে আনিল। রাজা পুরোহিত মহাশয়ের একটু অপমান করিলেন। রাত্রে রাজার স্বপ্নাদেশ হইল, দেবী তাহার আর পূজা গ্রহণ করিবেন না। মূর্খ রাজা শস্য ফেলিয়া খোসা লইয়াই ব্যস্ত। ব্যাকরণের ভাষায় দেবীর অভিবাদনে "তস্মৈ" শব্দের প্রয়োগ না হইয়া "তস্যৈ" হইবে বটে কিন্তু মূর্খাধম রাজা বুঝিল না যে দেবী নিজে স্ত্রীও নহেন পুরুষও নহেন। তিনি ব্যাকরণের শাসনের বহুদূরে অবস্থিত। পণ্ডিত মহাশয়ের কথা গুলি নিতান্ত মন্দ লাগিল না। কিন্তু তাহা হইলে এই যে আজ কাল কোন স্থলে ব্যাকরণহীন বাঙ্গালা ভাষার ব্যাকরণের ভুল ধরিয়া বাঙ্গালা লেখক-কুলকে সংযত করিবার চেষ্টা হইতেছে, তাহার কি হইবে ?

ভারতে দুর্গোৎসব।

বঙ্গদর্শনে বোধ হয় পাঠ করা গিয়াছিল, বাঙ্গালা ব্যতীত ভারতের অন্যত্র দুর্গোৎসব নাই। কৌতূহলী হইয়া পার্শ্বোপবিষ্ট মান্দ্রাজী বন্ধু ভেঙ্কট সুভিয়া (অর্থ—কৃষ্ণ শিব) শাস্ত্রালু মহোদয়কে ইংরাজিতে জিজ্ঞাসা করিলাম তাঁহাদের দেশে দুর্গোৎসব আছে কি না ? উত্তর শুনিয়া আনন্দিত ও বিস্মিত হইলাম। আছে বৈ কি। নবরাত্রের অনুষ্ঠান হয়। আমাদের দেশের মত মৃন্ময়ী প্রতিমা গঠনের ধূম লাগিয়া যায় না বটে ; কিন্তু ধাতব প্রতিমাদির পূজা হয় এবং নির্দ্দিষ্ট মন্দিরে, পূজা হোম ও পশুবলি অবধি প্রদত্ত হয় কিন্তু ব্রাহ্মণগণ মাংসাহার করেন না। এখানকার মত পূজান্তে প্রতিমা বিসর্জ্জন ও হয় না। দু-একজন বোম্বাই বাসী (অধুনা বাঙ্গালা প্রবাসী) বন্ধুকেও জিজ্ঞাসা কয়িয়া জানিয়াছি তাঁহাদের দেশেও ঐরূপে দুর্গাপূজা হয়। ঢোলপুরের ইতিহাসে দেখিয়াছি তথায়—চণ্ডীপাঠ এবং শাস্ত্রাদির অর্চ্চনা হয়। নেপালেও শুনিয়াছি দুর্গোৎসব আছে। তবেই বাঙ্গালা ব্যতীত অন্যত্র দুর্গোৎসব হয় না—এ ধারণাটি আমাদিগকে পরিত্যাগ

করিতে হইবে। আমার মান্দ্রাজী বন্ধুটিকে খুঁটাইয়া খুঁটাইয়া জিজ্ঞাসা করায় বুঝিতে পারিলাম তথায় দুর্গোৎসব এখানকার মত শ্রেষ্ঠোৎসব বিবেচিত হয় না। "মায়ার" উপাসনা বলিয়া মহামায়ার সাধক সংখ্যা ওসব দেশে কিছু কম। উহারা শিব ও কৃষ্ণেরই প্রধান উপাসক। বৎসর দুই হইল একজন বাঙ্গালী সন্ন্যাসীর সহিত সাক্ষাৎ হয়। তিনি, সেতুবন্ধ রামেশ্বর হইতে নৌকা যোগে লঙ্কাদ্বীপে গমন করেন। তাঁহার রিপোর্টে প্রকাশ তথাকার লোকেরা গণেশ ও কার্ত্তিকের পূজা করে। পিতা মাতাকে ত্যাগ করিয়া কেবল সন্তানের পূজা ভাল কথা নহে। সন্ন্যাসী ঠাকুর সেইজন্য কলিকাতাতে একটি শিবলিঙ্গ গড়াইতে দিয়াছেন। সংকল্প আছে, উক্ত বৌদ্ধ-প্লাবিত দেশে এইরূপে দেবাদিদেব মহেশ্বরের উপাসনা প্রবর্ত্তিত করিবেন। সন্ন্যাসী ঠাকুর ঐখানকারই কোনও লোককে উপাসনার নিয়মাদি শিখাইয়া তাহার হস্তে মন্দিরের সমস্ত ভার অর্পণ করিয়া আসিবেন, এরূপ ইচ্ছাও আমাদের নিকট প্রকাশ করিয়াছিলেন। জানি না তাঁহার এ উদ্যম কতদূর সফল হইয়াছে। যাহা হউক অভ্যাস-ফলে এইরূপ রুচি গঠিত হয়। মায়ার উপাসনা ত নিন্দনীয় নহেই, অধিকন্তু আমরা যতটুকু বুঝিতে পারি, তাহাতে মায়াও সগুণ ঈশ্বরে কোন রূপ প্রভেদ আছে মনে হয় না।

শারদীয়া পূজা কতদিনের ?

আমার আশৈশব বন্ধু শ্রীযুক্ত—পার্শ্বেই বসিয়াছিলেন। ভারতের অন্যত্রও দুর্গাপূজা হয় জানিয়া বিস্তর সন্তোষানুভব করিতেছিলাম বুঝিয়া রঙ্গ দেখিবার জন্য তিনি বলিলেন এই যে এত দুর্গোৎসব, ইহার মূল কোথায়? কৃত্তিবাস কিছু একজন প্রামাণ্য ঋষি নহেন। বাল্মীকির রামায়ণে দুর্গোৎসব নাই। আদিত্য হৃদয় কবচের কথা আছে। রামায়ণ মানিতে হইলে বরং এখন সৌরোৎসব উচিত। দিব্য শরৎকাল; ভগবান্ শ্রীসূর্য্যদেব ও এখন বাদলা ছাড়িয়া দক্ষিণাভিমুখ হইয়াছেন। দুর্গোৎসবটা সূর্য্যদেবের একটা বিদায়োৎসব মাত্র নহে ত ?" কথাটায় প্রাণ কেমন খারাপ হইয়া গেল। এই আগমনীর দিনে যে বিজয়ার নামই করিতে নাই—গোটা উৎসবটা বিদায়োৎসব মাত্র হইতে পারে! বন্ধুবরকে এজন্য কিন্তু কিছু কথা শুনিতে হইল। আশে পাশের লোক তাঁহাকে ছিনাইয়া ধরিল। (খৃষ্টিয়ানদের বক্তৃতা-কালে ইহারা কিছু করে না কেন ?) দেখুন—রামায়ণে যদি না—ই থাকিবে তবে "অকাল বোধন"

নাম হয় কেন ?, এবং এত লোক থাকিতে শ্রীরামচন্দ্রের নামই বা উহাতে জড়িত কেন ? বিজয়া দশমীর বিজয়া নামই বা দিল কে ? কথাগুলি ভাবিবার বিষয় বটে ; আবার মূল-বাল্মীকির রামায়ণে নাই তাহাও সত্য। এরূপ অবস্থায় একজন, যাহা মীমাংসা করিলেন সঙ্গত বোধ হইল। কথক ও পণ্ডিতগণ নানাশাস্ত্র পাঠ করেন। একই ঘটনার কথা বহু বিভিন্ন পুরাণাদিতে পাঠ করা যায়। দৃষ্টান্ত—দুষ্মন্ত-শকুন্তলোপাখ্যান, মহাভারত ও পদ্মপুরাণ উভয়তই আছে। সাবিত্রীর আখ্যানও এইরূপ একাধিক পুরাণে দৃষ্ট হয়। লবকুশের যুদ্ধ জৈমিনী-ভারতে আছে, রামায়ণে নাই। এই সুন্দর নিয়ম ছিল বলিয়াই, কোনও একখানি গ্রন্থ নষ্ট হইয়া গেলেও, আখ্যানটায় অন্য নানা পুরাণ হইতে উদ্ধার সম্ভাবনা আছে। পণ্ডিত ব্যক্তি, কতকটা কর্ত্তব্য বোধে কতকটা বা পাণ্ডিত্য প্রকাশ জন্য, কোনও একটি আখ্যায়িকার বর্ণন আবশ্যক হইলে. তাঁহার যতদূর শক্তি নানাশাস্ত্র মিলাইয়া আখ্যানটির পূর্ণতা সাধন করেন। কৃত্তিবাসও হয় ত তাহাই কারয়াছেন এবং এই জন্যই মূল বাল্মীকির রামায়ণে না থাকিলেও, তাহা যে স্বকপোল কল্পিত মনে করিবার কারণ নাই। চণ্ডীগ্রন্থে কেশরী, মহিষাসুর প্রভৃতির বর্ণনা আছে ; দুর্গাদেবী নামে তিনি পূজিত হইবেন এইরূপ কথাও আছে আর শরৎকালে পূজার কথাও আছে। *

যাহা হউক আমরা এইরূপ মীমাংসাতেই সন্তুষ্ট হইয়াছি। যদি কেহ ইহাতে তর্ক-শাস্ত্র মতে বিস্তর দোষ দেখিতে পান, তিনি না হয় কোনও শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতকে জিজ্ঞাসা করিয়া লইবেন এবং জিজ্ঞাসা-ফলটা আমাদিগকে জানাইলে অন্যায় কার্য্য করিবেন না।

---

* চণ্ডীগ্রন্থের শুম্ভ নিশুম্ভ বধপর্ব্বের শেষাংশে দুটি শ্লোক দেখিতে পাইলাম। এই দুইটাই হয়ত মীমাংসক মহাশয়ের অভিপ্রেত।

"তত্রৈব চ বধিষ্যামি দুর্গমাখ্যং মহাসুরম্।
দুর্গা দেবীতি বিখ্যাতং তন্মেনাম ভবিষ্যতি ॥ ৪৯। ৫০ এবং অন্যত্র
" শরৎকালে মহাপূজা ক্রিয়তে যাচ বার্ষিকী।
তস্যাং মমৈতন্মাহাত্ম্যং শ্রুত্বা ভক্তি সমন্বিতঃ ॥
সর্ব্ববাধা বিনির্ম্মুক্তো ধনধান্য সুতান্বিতঃ।
মনুষ্যোমৎ-প্রসাদেন ভবিষ্যতি ন সংশয় ॥ ১২। ১৩ শ্লোক ॥

স্বস্ত্যয়ন ও মোক্ষমূলর।

শ্রীশ্রীচণ্ডীগ্রন্থের কথা উঠিল, তাই বলিতেছি। চণ্ডীপাঠ-ফলের উপর এক সময়ে এতদ্দেশের লোকের বড় শ্রদ্ধা ছিল এবং এখনও যে, একেবারেই নাই এরূপ বলা যায় না। এই উপলক্ষে গত জুনমাসের "রিভিউ অব্ রিভিউ" পত্রিকা হইতে, মোক্ষমূলর সংক্রান্ত এক অভিনব সংবাদ পাঠক বর্গকে উপহার দিলাম।

প্রফেসার মোক্ষমূলর বহুদিন হইতে পীড়িত। বড় বড় জার্ম্মান্ চিকিৎসক তাঁহার জীবনের জন্য আশঙ্কা করিতে ছিলেন। পীড়ার সংবাদ শুনিয়া তাঁহার কোনও মান্দ্রাজী বন্ধু অত্যন্ত বিচলিত হয়েন। এই মান্দ্রাজী ব্রাহ্মণের পত্রের সারাংশ রিভিউ অব্ রিভিউ পত্রিকায় উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

ব্রাহ্মণ ছাত্রবৃন্দে পরিবৃত হইয়া গীতা পাঠ করিতেছিলেন। মোক্ষমূলর মহোদয়ের পীড়ার সংবাদ শুনিয়া ইঁহারা সকলেই অত্যন্ত অধীর হইয়া পড়েন। অজ্ঞাতসারে তাহাদের চক্ষু হইতে অশ্রুবর্ষণ হইতে লাগিল। অবশেষে সকলে ভগবতীর মন্দিরে মোক্ষমূলরের শুভার্থ স্বস্ত্যয়ন করা স্থির করিলেন। মন্দিরের পুরোহিত কিন্তু কিছুতেই সম্মত হয়েন না—অপরাধ মোক্ষমূলর হিন্দু নহেন। মোক্ষমূলর-বন্ধুরা অনেক করিয়া বুঝাইলেন ; এ জন্মে হিন্দু না হইলেও প্রকৃতি ও শিক্ষা ফলে মোক্ষমূলর মহোদয় একজন আদর্শ হিন্দু ; কিঞ্চিৎ দক্ষিণাধিক্যের লোভ দেখাইলে, অবশেষে পুরোহিত মহাশয় সম্মত হইলেন। তদনুসারে নিশীথ রজনীতে মার নিকট পান, সুপারি, কর্পূর নারিকেল প্রভৃতি পূজা-সম্ভার লইয়া সকলে উপস্থিত হইলেন। পুরোহিত মহাশয় প্রায় একঘণ্টা ধরিয়া মন্ত্রাদি সহকারে মার অর্চ্চনা করিলেন এবং পূজান্তে মোক্ষমূলরের নিকট প্রেরণার্থ কিঞ্চিৎ প্রসাদ প্রদান করিলেন।

মোক্ষমূলর মহোদয় বলিতেছেন ;—

"বিস্ময়ের বিষয় এই—তোমরা যদি ইচ্ছাকর না হয় "আকস্মিক ঘটনা" বলিয়া সন্তুষ্ট থাকিও—সুদীর্ঘকাল বহু বিজ্ঞ সুচিকীৎসকের অধীনে থাকিয়াও উপকার পাই নাই কিন্তু সেই দিন হইতেই আমি আপনাকে সুস্থ বোধ করিতে লাগিলাম। শুনিয়াছি এখন নাকি আমার জন্য ভগবতী-সমীপে প্রার্থনা করা যাইতেছে।"

যাঁহারা কামনাপূর্ণ হৃদয় কিন্তু মুখে নিষ্কাম ধর্ম্মাবলম্বী স্বর্গীয় বটব্যাল মহোদয় তাহাদিগকে মর্কট বৈরাগী, সম্বোধনে অভিহিত করিবেন। যাঁহারা মাতৃ সমীপে "রূপং দেহি, ধনং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি" প্রভৃতি প্রার্থনা করিতে লজ্জা

বোধ করেন না, সন্তানের প্রতি জগন্মাতার এইরূপে স্নেহ নিদর্শনে তাঁহাদের বিশ্বাস ও ভক্তি উত্তরোত্তর দৃঢ়তর হউক।

সমালোচনা।

পত্রাবলী।—স্বর্গীয় বিবেকানন্দ স্বামী যখন আমেরিকায় ছিলেন তৎকালে তাঁহার এদেশস্থ বন্ধুগণকে জ্ঞানোপদেশ দিয়া যে সকল পত্র লেখেন প্রাপ্ত পত্রিকার যে সকল উত্তর দেন সেই গুলি এই পুস্তকে একত্রে সঙ্কলিত ; কলিকাতা "উদ্বোধন" কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত। প্রথম পুস্তিকার প্রারম্ভে যাহা আছে তাহা জগতের সকলেই জানেন, তথাপি ইহুদীকুমার প্রভু যীশুখৃষ্টের শ্রীমুখ হইতে অতি কষ্টের সময়ে যাহা উচ্চারিত হইয়াছিল তাহা উল্লেখ করিয়া স্বামীজি এই মানব দেহের অসারতা দেখাইয়াছেন। উলঙ্গ আসিয়াছি, উলঙ্গ হইয়াই যাইব, এইটুকু মূল উপদেশ। ইহা বুঝিয়া কার্য্য করাই জ্ঞানবান্ মানবগণের অবশ্য কর্ত্তব্য। এই উপদেশ ব্যতীত স্বামীজি আরো অনেক প্রকার মূল্যবান্ উপদেশ রাখিয়া গিয়াছেন. যাহাতে এ দেশের পুং-সমাজ ও নারী-সমাজের প্রকৃত উপকার হয়, একটী বঙ্গ—রমণীর পত্রের উত্তরে তিনি বিশেষরূপে, তাহা নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। এই পত্রাবলী সকলে মনযোগ পূর্ব্বক পাঠ করুন ইহাই আমাদের অনুরোধ। মূল্য ॥০ আট আনা মাত্র।

চরকসার বা জীবনবন্ধু।—শ্রীযুক্ত কবিরাজ অবিনাশচন্দ্র কবিরত্ন চরকসংহিতার মূলাংশের সার সার শ্লোক ও অনুবাদ প্রকাশ করিয়াছেন। চরকসংহিতা আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রের মধ্যে উৎকৃষ্ট ইহা সকলেই স্বীকার করেন ; ইহা কেবল চিকিৎসাবিধির নিয়ামক নহে সংসারে যাবতীয় তত্ত্ব ইহাতে সন্নিবেশিত আছে। পঞ্চভূতে গঠিত মানবদেহ কি কি উপায়ে সুস্থ থাকে, কি উপায় মানব দীর্ঘজীবী হয় জীবনকালের মধ্যে সংসারের মানবগণকে কি কি নিয়ম পালন করিতে হয় এই গ্রন্থে অতিবিষদরূপে তাহা বিবৃত হইয়াছে। কবিরাজ অবিনাশচন্দ্র এই গ্রন্থখানি প্রচার করিয়া মানব সংসারের যথেষ্ট উপকার করিয়াছেন। একস্থানে তিনি ঋষি বাক্য প্রমাণে উল্লেখ করিয়াছেন যে আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে অনভিজ্ঞ লোকেরা প্রকৃতপক্ষে সংসারের কোন প্রকার সুখভোগে সুখী

হইতে পারে না। শারীরিক ও মানসিক শান্তির একমাত্র উপায় আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র, অতএব এই চরকসার গ্রন্থ অভিনিবেশ পূর্ব্বক পাঠ করা সংসারী মানবগণের একান্ত কর্ত্তব্য। কবিরাজ মহাশয় এই উপকারী গ্রন্থখানি প্রকাশ করিয়া আমাদের ধন্যবাদ ভাজন হইয়াছেন। মূল্য সুলভ ;—১৲ এক টাকা মাত্র।

প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের স্থূল মর্ম্ম।—স্বর্গীয় বিজ্ঞান প্রিয় সুপণ্ডিত বাবু হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৭৯৫ শকে এই পুস্তকখানি লিখিয়া ছিলেন সম্প্রতি বাবু ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর ইহা মুদ্রিত করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। বিজ্ঞান বিশারদ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী কর্ত্তৃক এখানি সম্পাদিত, বিজ্ঞান পিপাসু পাঠকেরা এতৎ পাঠে অনেক জ্ঞান লাভ করিতে পারিবেন।

নিকাশ আখেরি বা পরিণাম।—ভূতপূর্ব্ব সুযোগ্য ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট রায় শ্রীযুক্তরামক্ষয় চট্টোপাধ্যায় বাহাদুর ইহার প্রনয়ণ কর্ত্তা। নশ্বর মানব জীবনের কিরূপ পরিণাম এই পুস্তকে সংক্ষেপে তাহা প্রদর্শন করা হইয়াছে পাঠ করিলে প্রাজ্ঞজনের মনে তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হয়, রামাক্ষয় বাবুর সাহিত্যানুরাগ ও রচনা চাতুর্য্য বঙ্গীয় পাঠক সমাজে অবিদিত নাই বিশেষ পরিচয় দেওয়া বাহুল্য "আখেরি" মানব সমাজের চিত্তাকর্ষণ করিতে পারিবে তাহাতে আর সংশয় মাত্র নাই।

দেদার মজা।—শ্রীযুক্ত বিপ্রদাস মুখোপাধ্যায় প্রণীত; মূল্য দশ আনা পূর্ব্বে আমাদের দেশে ধর্ম্মানুষ্ঠানের সঙ্গে সঙ্গে পবিত্র রসিকতা ছিল, অধুনা এই ভঙ্গ বঙ্গে এক প্রকার নূতন রসিকতা আসিয়াছে, তাহাও নূতন নাম "মজা" ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গল্পের দ্বারা বিপ্রদাস বাবু এখনকার দেদার মজা দেখাইয়াছেন, এ সকল মজা দেখিতে বিজ্ঞলোকের মনে বড় কষ্ট হয় যাহাতে পূর্ব্বকালের পবিত্র রসিকতা বঙ্গ সংসারে আবার ফিরিয়া আইসে তাই গ্রন্থকারের ইচ্ছা তিনি এক স্থানে আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছেন বজ্রাহত বৃক্ষ যেমন গজায় না বঙ্গের এখন সেই দশা ঠিক কথা এই কলঙ্ক যাহাতে অপনিত হয় বঙ্গবাসী ভ্রাতৃগণ "দেদার মজা" ছাড়িয়া তৎ বিষয়ে সচেষ্ট হইলে আমরা সুখী হইব বিপ্রদাস বাবুর রসিকতা নির্ম্মল লেখাও অতি সুন্দর। যাহারা এই দেদার মজা পাঠ করিবেন তাঁহারা আমাদের সহিত উপকার পাইবেন, এইরূপ আমাদের বিশ্বাস।

REGISTERED No. C. ২৮৪.

১৪শ বর্ষ।] ১৩১২ সাল। আশ্বিন, [৩য় সংখ্যা।

হিন্দুধর্ম্ম ও সমাজের মুখপত্র

জন্মভূমি

(সচিত্র মাসিক-পত্রিকা ও সমালোচনী)।

বিষয়	পৃষ্ঠা	লেখক
১। উনবিংশ শতাব্দীতে স্ত্রীশিক্ষা	৮৫	শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রচন্দ্র বসু, এম্, এ।
২। পঞ্চ "ম" কার	৯৮	শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রকুমার রায়।
৩। বিজয়া	১০১	
৪। আশার নিরাশ	১০৪	
৫। চন্দ্রশেখরে বঙ্কিমচন্দ্র	১১০	শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্দ্র রাহা, বি, এ।
৬। প্রার্থনা	১১৪	শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র বিদ্যারত্ন।
৭। আঁধার	১১৪	শ্রীমতী চারুভাষিনী গুপ্তা।
৮। কীর্ত্তিমান ও সাধুর কথোপকথন	১১৫	
৯। গীত	১১৬	

লেখকগণের মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন।

জন্মভূমি-কার্য্যালয়।

শ্রীনরেন্দ্রনাথ দত্ত দ্বারা প্রকাশিত।

৩৯ নং মাণিক বসুর ঘাট ষ্ট্রীট,

কলিকাতা।

বার্ষিক মূল্য ১॥০ দেড় টাকা।] [নগদ মূল্য ৵১০ দশ পয়সা।

শ্রীল শ্রীমন্মহারাজাধিরাজ কাশ্মীরাধিপতি তথা শ্রীল শ্রীযুক্ত মহারাজা ধিরাজ
বর্দ্ধমান-প্রদেশাধিপতি বাহাদুরের অনুমোদিত ও অনুজ্ঞাত সুপ্রসিদ্ধ
কবিরাজ শ্রীযুক্ত বিনোদলাল সেন মহাশয়ের

আদি-আয়ুর্ব্বেদ ঔষধালয়।

১১৬ নং লোয়ার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।

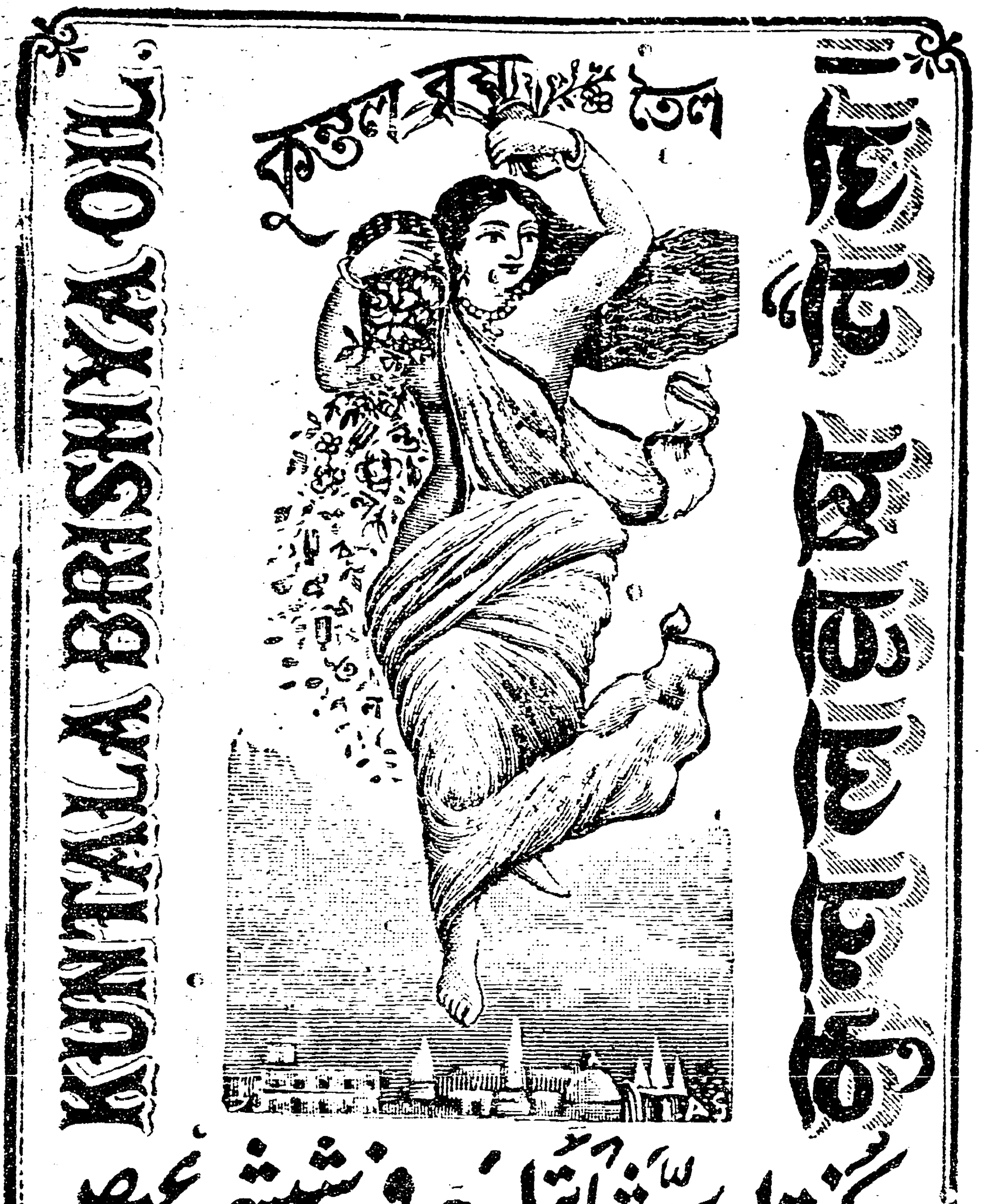

কুন্তলবৃষ্য তৈল জগতে অমূল্য ও অতুলনীয়—মস্তিষ্ক স্নিগ্ধকর ও স্মৃতিশক্তি বৰ্দ্ধক—কেশকলাপের কান্তিপ্রদ—খালিত্য ও পালিত্যনাশে অদ্বিতীয়। কেশের কমনীয়তা কান্তি বৃদ্ধি করিতে, চিত্তের নিত্যপ্রফুল্লতা অটুট রাখিতে কুন্তলবৃষ্যের তুলনা নাই। ইহা অনুপম্ আদি ও অকৃত্রিম্ স্নিগ্ধগুণে কুন্তলবৃষ্যের সমতুল কোন তৈলই এ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই।

বর্ত্তমান ভারতের প্রধান ধর্ম্মসংস্কারক, শান্তি-সুখ-সন্তৃপ্ত বিলাসভোগ বিমুক্ত আধ্যাত্মিক উৎকর্ষের সমুচ্চ সোপানে সমাসীন—পূজ্যপাদ শ্রীমহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর বলিয়াছেন—যে কুন্তলবৃষ্য তৈল এতদিন আমাকে রক্ষা করিল, আজ তাহাকে পরিত্যাগ করিতে পারি না।"

কুন্তলবৃষ্য—সাহিত্যসেবিগণের মহোপকারক, কারণ ইহাতে মেধা ও স্মৃতি বৃদ্ধি হয়, চিন্তাশীলতা ও ভাবুকতা নবীভূত ও স্ফুরিত হয়।

এক শিশির মূল্য ১৲ টাকা প্যাকিং ও ডাকমাশুলাদি পাঁচ আনা।

উপহার—কুন্তলবৃষ্যের প্রত্যেক গ্রাহক তৈলের সঙ্গে একখানি করিয়া সুন্দর চিত্র উপহার পাইবেন।

সতর্কীকরণ।—দুষ্ট লোকেরা বড়ই জাল করিতেছে; গ্রাহকগণ সাবধান; আমাদের ঔষধালয় ভিন্ন কোথাও "কুন্তলবৃষ্য" কিনিবেন না, কিনিলেই প্রতারিত হইবেন।

কবিরাজ শ্রীআশুতোষ সেন চিকিৎসক।

"জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী"

সচিত্র মাসিক পত্র ও সমালোচনী।

১৪শ বর্ষ। | আশ্বিন, ১৩১২ সাল | ৩য় সংখ্যা।

উনবিংশ শতাব্দীতে স্ত্রীশিক্ষা।

লেখক—শ্রীযতীন্দ্রচন্দ্র বসু এম, এ,

[১৮১৯—১৮৫০]।

স্ত্রীশিক্ষা-সম্বন্ধে আজকাল অনেকে অনেক কথা বলিয়া থাকেন। কেহ বলেন স্ত্রীশিক্ষা বিলাসিতার প্রশ্রয় দেয় মাত্র—রমণীদিগের শারীরিক, মানসিক বা নৈতিক উন্নতি-সাধনে কিছু মাত্র সহায়তা করে না। বিপক্ষদল কিন্তু ইহাতে মোটেই রাজী নহেন। স্ত্রীশিক্ষা যে, রমণীগণকে উন্নত করিয়া তোলে না—এ কথা তাঁহারা অস্বীকার করেন।

স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে আলোচনা করিতে হইলে, শিক্ষা কাহাকে বলে, সর্ব্বপ্রথম তাহাই বুঝিতে হইবে। দুর্ভাগ্যক্রমে স্ত্রীশিক্ষা কাহাকে বলে, স্থির করা দুষ্কর। বিবাহোপলক্ষে কন্যার গুণবর্ণনা-কালে আমরা বলিয়া থাকি মেয়েটি বেশ সুশিক্ষিতা—গান জানে, বাজনা জানে, রয়েল রিডার পড়িতে পারে, ইত্যাদি। কন্যাপক্ষীয়দের নিকট এখনও শুনা যায়, পাত্রটি অতি শিক্ষিত। এম, এ, পাশ করিয়াছে, জলপানি পাইতেছে, ইত্যাদি। আবার জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধ বা পুস্তক পাঠ করিয়া আমরা স্বতঃই বলিয়া থাকি—লেখকের কি জ্ঞান, কি শিক্ষা।

তবে শিক্ষা কাহাকে বলিব—গল্প, গান, বাজনা শিখিলে, রয়েল রিডার পড়িতে পারিলে কি "শিক্ষা" হইল, না এম, এ, পাশ করিলেই "শিক্ষা" হইল, অথবা পাণ্ডিত্যপূর্ণ প্রবন্ধ লিখিতে পারিলেই "শিক্ষা" সম্পূর্ণ হইল।

ইহাদের মধ্যে কাহাকে "শিক্ষা" বলা যাইতে পারে তাহা সাব্যস্থ করা দুরূহ ব্যাপার। মানবের শারীরিক, মানসিক, ও নৈতিক উৎকর্ষ সাধনের নামই শিক্ষা। অর্থাৎ যাহা দ্বারা আমাদের শারীরিক, মানসিক ও নৈতিক উন্নতি সাধিত হইতে পারে, তাহাই শিক্ষার প্রকৃষ্ট উপায়। রয়েল রিডার পাঠ করিলে যদি শারীরিক, মানসিক ও নৈতিক উন্নতি সাধিত হয় তবে রয়েল রিডারই শিক্ষার উপায়; এম, এ, পাশ যদি এই ত্রিবিধ সাধন করিতে পারে, তবে—এম, এ পাশই শিক্ষার উপায় বলা যাইবে; আবার জ্ঞানগর্ভ-পুস্তক প্রনয়ণ যদি এই ত্রিবিধ উন্নতি সাধনে সহায়তা করে, তবে পুস্তক প্রণয়ন-শক্তি'শিক্ষার অঙ্গীভূত বলিতে হইবে।

সুতরাং যাঁহারা বলেন স্ত্রীশিক্ষা রমণীদিগের শারীরিক, মানসিক ও নৈতিক উন্নতি সাধনে সহায়তা করে না, তাঁহাদের যুক্তি সত্য বলিয়া গৃহীত হইতে পারে না। কারণ শিক্ষা বলিলেই শারীরিক, মানসিক ও নৈতিক উন্নতি বুঝায়।

কিন্তু পরিতাপের বিষয় এই যে সকলে শিক্ষার এই প্রশস্ত তাৎপর্য্য গ্রহণ করেন না। তাঁহারা শিক্ষার অর্থে মানসিক শিক্ষাই বুঝেন। অর্থাৎ যাহাতে মনের উন্নতি হয়, যাহাতে আমরা স্বতন্ত্র ও নিরপেক্ষ ভাবে চিন্তা করিতে সমর্থ হই, যাহা আমাদিগের চিন্তাশক্তি বৃদ্ধি করায়, তাহাকেই শিক্ষার সহায় বলা যাইতে পারে। আবার কেহ কেহ শিক্ষার অর্থ এমনই সঙ্কীর্ণ করিয়া ফেলিয়াছেন যে কতকগুলি ইংরাজীগ্রন্থের অভিজ্ঞতাকেই শিক্ষা বলিয়া থাকেন।

যাহা হউক, অধুনা আমরা শিক্ষার অর্থে মানসিক শিক্ষাই বুঝিব। যে হেতু শিক্ষার প্রথম অর্থ এমন প্রশস্ত ও অসীম যে তাহার আলোচনা সহজ-সাধ্য হইবে না।

এক্ষণে বঙ্গনারীদিগের মানসিক উন্নতির আবশ্যক কি না বিচার করা যা'ক। কেহ কেহ আশঙ্কা করেন স্ত্রীলোকদিগের মানসিক উন্নতি নৈতিক অবনতির পথ মুক্ত করিয়া দেয়। কেহ বা এ কথা বিশ্বাস-যোগ্য বলিয়া গ্রহণ করেন না।

রমণীর চিন্তাশক্তি বৰ্দ্ধিত হইলে, যখন সে স্বতন্ত্র ভাবে বিচার-কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবে তখন আপনার আদর্শ সে আপনি গড়িয়া লইবে। কোন্ বিষয় ভাল, কোন্ বিষয় মন্দ, কোন্ কার্য্য উচিত, কোন্টা বা অনুচিত, সে আপনি স্থির করিয়া লইবে—কাহারও পরামর্শের অপেক্ষা করিবে না।

প্রবল পুরুষগণের স্বেচ্ছাচারিতা হ্রাস হইবে। এটা অন্যায়, এ কাজটা করা উচিত নহে—এইরূপ তর্ক বিতর্ক স্ত্রীমহল হইতে শুনা যাইবে। কেবল বিবাহিতা নারীর কথাই বা বলি কেন কুমারীগণের কথাই ধরা যাক। গৌরীদানের আর তেমন সুবিধা হইবে না—জননীরা বাল্য-বিবাহে সম্মত হইবেন কি না সংশয়ের বিষয়! চির-কৌমার্য্য প্রথাও প্রচলিত হইবে! শিক্ষিতারমণী বলিবেন "আমরা উদ্বাহ-বন্ধনে বদ্ধ হইব না। মিস্ নাইটিঙ্গেলের ন্যায় আমরা পরার্থে জীবন উৎসর্গ করিব।"

সকলেই যে দেবী হইয়া উঠিবেন এ কথাও বলা যায় না। সকলের প্রকৃতি সমান নহে—কাহারো মন উচ্চগামী, কাহারো নিম্নগামী। সুতরাং কেহ বা জগতের হিতসাধনে নিযুক্ত থাকিবেন, আবার কেহ বা নরকের পথে অগ্রসর হইবেন। প্রতিনিবৃত্ত করিবার চেষ্টা করিলে তাঁহারা যত এ কথা বলিতে পারেন "আমাদের সুখে, আমাদের আমোদে বাধা দিতে তোমরা কে? আমাদেরও ত বুদ্ধিশক্তি আছে?" সুতরাং বেগতিক দেখিয়া আমাদের নিরুত্তর থাকিতে হইবে।

নৈতিক বাঁধন যে পূর্ব্ববৎ প্রবল থাকিবে এমন ও বোধ হয় না। যে দেশে স্ত্রীশিক্ষা প্রবল একবার সেইদিকে দৃষ্টিপাত করা হউক। আমেরিকার কথা নাই বা ধরিলাম, ইংলণ্ডে স্ত্রীশিক্ষার কি ফল দেখা যাক্। সেদেশে পিতামাতার আজ্ঞাতে প্রণয়ীর সহিত প্রণয়িনীর সম্বন্ধ এতই সাধারণ যে তদ্প্রদেশ বাসী ইহা কিছু দোষস্থ মনে করে না। আমাদের সমাজ ব্যভিচারিনীদিগকে যেরূপ ঘৃণা করে ইংলণ্ডের সমাজ সেরূপ করে না। ইংলণ্ড যে নৈতিক চরিত্রের আদর্শমূলক নহে, ভারতবর্ষ যে চরিত্র-বিষয়ে ইংলণ্ড অপেক্ষা কোন কোন বিষয়ে শ্রেষ্ঠতর ইহা বোধ হয় অতি বড় শত্রুও স্বীকার করিবেন।

সুতরাং মানসিক উন্নতি যে নৈতিক অবনতি আনয়ন করে ইহা মিথ্যা বলিবার

যো নাই। যিনি ইহা অস্বীকার করেন আমরা তাঁহার তীক্ষ্ণ বুদ্ধির প্রশংসা করিতে পারি না। কারণ রমণীদিগের স্বাধীন বুদ্ধির পরিচালনার্থে যদি বিস্তৃত পরিসর দেওয়া হয় তবে উন্নতির দিকে যেরূপ স্রোত বহিবে, অবনতির অভিমুখেও সেইরূপ স্রোত প্রবাহিত হইবে। রমণীগণ যেরূপ উচ্চতার সোপানে আরোহণ করিবেন, সেরূপ আবার তাঁহারা নিম্নস্তরে ও অবতরণ করিবেন। আলো ও ছায়ার মত উন্নতি ও অবনতি পরস্পর পরস্পরের পশ্চাদ্ধাবন করিবে। কাজ নাই তবে স্বাধীন বুদ্ধির পরিচালন করিয়া, মানসিক উন্নতি বন্ধ করিয়া দাও।

ইহাই ত প্রাচীন পণ্ডিগণের মত। তাঁহারা ত একথা বরাবরই বলিয়া আসিতেছেন যে অশ্বের রজ্জু শিথিল করিলে সে যেমন স্বেচ্ছাচারী হইয়া উঠে, তদ্রূপ রমণীগণের অধীনতা শৃঙ্খল, শিথিল করিলে, তাহারা স্বেচ্ছাচারিণী হইয়া উঠিবে। ধর্ম্ম ও নীতি মুহূর্ত্ত মধ্যে বিলুপ্ত হইবে।

ইহা কতকটা সত্য। স্ত্রীশিক্ষা রমণীদিগের অধীনতা-পাশ মুক্ত করিয়া দেয় মিথ্যা নহে। তবে আধুনিক শিক্ষিত সম্প্রদায় বলেন রমণীগণের অশিক্ষিত অবস্থাও বড় আশাপ্রদ নহে।

পিঞ্জরাবদ্ধ ব্যাঘ্রের সহিত অথবা বল্গাযুক্ত অশ্বের সহিত, সমাজ-শাসিত নারীর তুলনা অন্যায় হইতে পারে বটে, কিন্তু অসামঞ্জস্য নহে। ব্যাঘ্র বা অশ্বের যেরূপ স্বাধীন শক্তি হরণ করা হইয়াছে, স্ত্রীলোকেরও সেইরূপ স্বাধীন প্রবৃত্তি কাড়িয়া লওয়া হইয়াছে। রমণীগণ বল্গাদ্বারা শাসিত হয় না বটে, কিন্তু তদপেক্ষা কঠিন বন্ধনের দ্বারা তাহারা বদ্ধ। সমাজ তাহাদের সর্ব্বদাই চোখ্ রাঙ্গাইতেছে; প্রচলিত প্রথার রেখামাত্র ব্যতিক্রম হইলে তাহাদিগকে সমাজচ্যুত করা হইবে এইরূপ ভয়প্রদর্শন ও চলিতেছে। আহা! তাহারা যে পিঞ্জরাবদ্ধ নহে এমন ও বলা যায় না। লোহার পিঞ্জর নয় বটে, তবে অন্তঃপুরের বাহিরে পদার্পণ করিবার তাহাদিগের অধিকারই বা কোথায়?

যদি কেহ বলেন পিঞ্জরাবদ্ধ ব্যাঘ্র সাধু হইয়াছে, তাহার নৈতিক উন্নতির লক্ষণ দেখা যাইতেছে, যেহেতু সে আর জীবহত্যা করে না, শিষ্ট শান্তের ন্যায় খাঁচায় বসিয়া থাকে, অথবা বল্গাযুক্ত অশ্বের বাধ্যতা দর্শনে যদি কেহ তাহার নৈতিক উন্নতি সপ্রমাণ করিতে চেষ্টা করেন তবে তাঁহাদিগের বুদ্ধির স্থিরতা সম্বন্ধে অনেকে সন্দিহান হইবেন। সেইরূপ স্ত্রীশিক্ষা উঠাইয়া দিয়া রমণীগণকে পিঞ্জরাবদ্ধ করিয়া যদি কেহ ঘোষণা করেন স্ত্রীলোকেরা নৈতিক উন্নতির

চরমোৎকর্ষ লাভ করিয়াছেন, তাহা হইলে বিশুদ্ধ হাস্যরসের সৃষ্টি হয় মাত্র; তর্কের কোন মীমাংসা হয় না।

আধুনিক পণ্ডিতগণ বলেন যেখানে স্বেচ্ছা বৃত্তির পরিচালনা নাই, সেখানে নৈতিক উন্নতি বা নৈতিক অবনতি বলিয়া কোন কথাই থাকিতে পারে না। যদি কোন বালক পিতার ভয়ে দরিদ্রকে একটি মুদ্রা দান করে, তাহা হইলে তাহার দানশীলতা বা নৈতিক উৎকর্ষতার সম্বন্ধে কোন প্রশংসা করা যায় না; কিন্তু বালকটি যদি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া ভিক্ষুককে একটা পয়সাও দান করে তবে ইহা প্রশংসাই বটে। কার্য্যাবলী স্বপ্রণোদিত না হইলে, 'নৈতিক' আখ্যা লাভ করিতে পারে না।

আমাদের সমাজে নারীগণ কুপথ পরিত্যাগ করিয়া সুপথে ভ্রমণ করিতেছে বটে, কিন্তু তাহাদের আর উপায়ন্তর কোথায়? পতি ভিন্ন অন্য পরপুরুষের সহিত বাক্যালাপ যদি পাপ বলিয়া বিবেচিত হয়, তবে তাহাদের কু-পথে গমন করিবার সুপ্রশস্ত পথই বা কোথায়? পাপের প্রলোভন হইতে তাহারা বহুদূরে বাস করে, সুতরাং পাপের মোহিনীশক্তি তাহাদিগকে মুগ্ধ করিবার অবকাশ পায় না। বিধবাগণ পুনর্ব্বার বিবাহ করে না বটে—কিন্তু কাহাকে বিবাহ করিবে? সমাজের মধ্যে কেহই তাহাকে বিবাহ করিতে সম্মত হইবে না। এত বাঁধাবাঁধি, এত কষাকষি, সমাজের এরূপ কঠিন নিয়মাবলীর মধ্যে, অবস্থান করিয়াও যে কেহ কেহ সুপথ ত্যাগ করিতেছে ইহা বিস্ময়কর বলিতে হইবে।

যাহা হউক, বঙ্গনারীর চরিত্রের উৎকর্ষতা সম্বন্ধে আমাদের কোন দ্বিধা নাই। পাশ্চাত্য ভগ্নীদিগের তুলনায় তাহারা যে পাশবিক বৃত্তি দমন করিতে সমর্থ হইয়াছে সে বিষয়ে কাহারও সন্দেহ নাই। তবে নৈতিক উন্নতি লাভ বিশেষ আবশ্যক।

একথা বলিলে বোধ হয় দোষ হইবে না যে নৈতিক উন্নতি সাধনের জন্য মানসিক উন্নতির আবশ্যক। ন্যায় অন্যায়, উচিত অনুচিত বিচার করিতে শিখিতে হইবে, তবে ত আমরা ন্যায়ের দিকে অগ্রসর হইতে পারিব। অন্ধ হইয়া, অন্যের দ্বারা বাধ্য হইয়া সুপথ গ্রহণ করা ত নৈতিক উন্নতির লক্ষণ নহে।

সুতরাং আজকালের শিক্ষিত-সম্প্রদায়ের মধ্যে, স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে আর কোন তর্ক বিতর্ক উঠে না। ইহার প্রয়োজনীয়তা বোধ হয় সকলেরই হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে। তবে শিক্ষার পরিমাণ ও শিক্ষার প্রণালী লইয়া অধুনা ঘোরতর বাক্‌যুদ্ধ চলিতেছে বটে।

এ তর্কবিতর্কের মধ্যে আমরা প্রবেশ করিব না। বঙ্গপ্রদেশে কিরূপে স্ত্রীশিক্ষা প্রবর্ত্তিত হইল, কিরূপেই বা তাহার ক্রমোন্নতি হইল, এ সম্বন্ধে আলোচনায় আমরা প্রবৃত্ত হইব।

বেশীদিন নহে, শতাব্দী পূর্ব্বে এমন ও কথা শুনা যাইত যে স্ত্রীশিক্ষা বিধাতার অভিপ্রেত নহে। কোন স্ত্রীলোক লেখা পড়া শিখিলে বা লেখা পড়া শিখিতে চেষ্টা করিলে, বিধাতা রুষ্ট হইয়া তাহাকে বৈধব্য যন্ত্রণায় দগ্ধ করেন। তৎকালীন পণ্ডিতেরা স্ত্রীশিক্ষা যে উন্নতি-বিধায়ক নহে, একথা বলিয়াও সন্তুষ্ট থাকিতেন না—ইহা যে সামাজিক অধঃপতনের মূল এইরূপ অভিমতই প্রচার করিতেন। জনসাধারণের ত কথাই নাই; তাহাদের নিকট স্ত্রীশিক্ষা এমনই অসম্ভব, এমনই অলৌকিক যে সে বিষয়ে তাহারা আলোচনাও করিত না। মূর্খ হইয়া তাহারা যে পত্নী কন্যাগণের শিক্ষা লইয়া বিব্রত হইয়া পড়িবে, এইরূপ আশা করা বাতুলতা মাত্র।

কিন্তু দুই একটা অসম্ভব লোক অসম্ভবকেও সম্ভব করিয়া তোলে। দুই একজন স্বাধীন-চেতা জ্ঞানতৃপ্ত পুরুষ কুসংস্কারকে অবজ্ঞা করিয়া, সমাজের শৃঙ্খল ছিন্ন করিয়া পরিবার মধ্যে শিক্ষার প্রচলন করিয়াছিলেন। সমাজ তাঁহাদের একঘরে করিতে চেষ্টা করিত, কিন্তু তাঁহাদের মন-বল এতই প্রবল, তাঁহাদের কর্ত্তব্য-জ্ঞান এমনি তীক্ষ্ণ যে সামান্য সামাজিক নির্য্যাতন তাঁহারা গ্রাহ্য ও করিতেন না। মত্ত অশ্বের ন্যায় তাঁহারা তাঁহাদিগের নির্ব্বাচিত মার্গে গমন করিতেন—ফিরিয়া দেখিবার আবশ্যকতা বোধ করিতেন। রাজা রাধাকান্তদেব ও প্যারীচাঁদ মিত্র ইহাঁদের মধ্যে অগ্রণী। স্ত্রীশিক্ষার পক্ষ সমর্থন করিয়া রাজা রাধাকান্তদেব "স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ক" ও প্যারিচাঁদ মিত্র "বামারঞ্জিকা" নামে দুইখানি পুস্তকও প্রণয়ন করিয়াছিলেন।

কিন্তু সকলের নিকট এইরূপ প্রখর মন বল প্রত্যাশা করা যায় না। গণনায় স্থির হইয়াছে যে সমগ্র ভারতবর্ষে আটকোটি স্ত্রীলোকের মধ্যে, পাঁচ সহস্র মাত্র রমণী লিখিতে পড়িতে জানিতেন।

যাহা হউক, কতকগুলি মহাপুরুষ কুসংস্কার ছিন্ন করিবার জন্য যখন সমাজের সহিত ঘোরতর সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন এমন সময়ে অদৃষ্ট তাঁহাদের সাহায্যার্থে কতিপয় বিদেশী মহাপুরুষকে প্রেরণ করিলেন। এই বিদেশীদল নিঃস্বার্থ ভাবে শিক্ষা প্রচার করিতে ভারতে আসেন নাই বটে, ধর্ম্মপ্রচারই তাঁহাদের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু উদ্দেশ্য যাহাই থা'ক না কেন তাঁহারা যে স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের জন্য প্রভূত চেষ্টা করিয়াছিলেন, ইহা অস্বীকার করিলে আমরা অধর্ম্মে পতিত হইব। তাঁহারাই যে বঙ্গদেশে স্ত্রীশিক্ষার উন্নতির মূল, তাঁহাদের চেষ্টা ও যত্নে যে বঙ্গদেশে স্ত্রীশিক্ষার প্রচলন হইয়াছিল, এ বিষয়ে দ্বিধা করিবার কোন কারণ নাই। কৃতজ্ঞতা ভিন্ন তাঁহাদের ঋণ পরিশোধের আর কোন উপায় নাই।

১৮১৭ খৃষ্টাব্দে, সুপ্রসিদ্ধ রাজা রাধাকান্তদেব, পণ্ডিতাগ্রণী প্যারীচাঁদ মিত্র মহাত্মা ডেভিড হেয়ার ও অন্যান্য কতিপয় পণ্ডিত মিলিয়া স্কুল সোসাইটি নামে এক সভা স্থাপন করেন। এই সভার তত্ত্বাবধানে কতকগুলি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়; প্রথম প্রথম ঐ সকল স্কুলে বালকগণের সহিত বালিকারাও পাঠ করিত। কিন্তু অধিকাংশ সভ্যগণ এ প্রথার বিরোধী হইয়া উঠিলে, বালিকাদিগকে ভিন্ন শিক্ষাগারে প্রেরিত করিবার সঙ্কল্প হইল।

১৮১৯ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় ফিমেল্ জুবেনাইল সোসাইটি (Female Jubenile Society) নামক এক খৃষ্টীয় সমিতি সর্ব্ব প্রথম বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপন করেন।

এইরূপে যখন বঙ্গদেশে স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের চেষ্টা হইতেছিল তখন ইংলণ্ড হইতে ব্রিটিশ্ এণ্ড ফরেন্ স্কুল সোসাইটি (British and Foreign School Society) নামে এক সমিতি বঙ্গদেশে স্ত্রীশিক্ষা প্রবর্ত্তনে যত্নবান হইলেন এবং ১৮২১ খৃষ্টাব্দে মিস্ কুক নাম্নী জনৈক বিদুষী মহিলাকে বঙ্গদেশে স্ত্রীশিক্ষা প্রচলনার্থে প্রেরণ করিলেন। বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপন তাঁহার সম্বন্ধে একটি গল্প প্রচলিত আছে। আশা করি ইহার বিবৃতি পাঠকদিগের নিকট শ্রুতিকঠোর হইবে না।

একদা মিস্ কুক্ ঠন্ঠনের নিকটবর্ত্তী কোন এক বালক-বিদ্যালয়ের কার্য্যাবলী পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিলেন। এই সকল শ্বেতকায়া, শুভ্রবর্ণা সুন্দরীগণ তৎকালে এমনি বিরল ছিল যে সে মূর্ত্তি দেখিবার নিমিত্ত মূঢ় নরনারীদল ছুটিয়া আসিত। সেই ক্ষুদ্র স্কুলগৃহে এক মহতী জনতার সৃষ্টি হইয়াছিল। মিস্ কুক্ দেখিতে পাইলেন একটি ক্ষুদ্র বালিকা সতৃষ্ণ নয়নে তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিতেছে। দ্বিভাষী-প্রমুখাৎ শুনিলেন যে এই বালিকাটি বহুকালাবধি বালকদিগের সহিত বিদ্যাশিক্ষা করিতে আগ্রহ প্রকাশ করে, কিন্তু অধ্যাপকগণ তাহাকে এ বিদ্যালয়ে পাঠ করিতে অনুমতি দেন নাই। মিস্ কুক্ তখনই এই বালিকার শিক্ষাভার গ্রহণ করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন এবং অচিরেই তথায় এক বালিকা—বিদ্যালয় স্থাপিত হইল।

জনতার মধ্যে বর্ষীয়সী রমণীর সংখ্যাই অধিক। তাঁহাদের কৌতূহল-স্পৃহা এতাদৃশ প্রবল যে তাঁহারা মিস্ কুক্‌কে তাঁহার সুদূর ইংলণ্ড প্রদেশ হইতে আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিতে কুণ্ঠিত হইলেন না। যখন তাঁহারা শুনিলেন যে মিস্ কুক্ বঙ্গরমণীদিগের শিক্ষা দান করিতে স্বদেশ, পিতামাতা, আত্মীয় স্বজন ত্যাগ করিয়া ভারতে আসিয়াছেন, তখন তাঁহারা মিস্ কুকের আত্ম-ত্যাগ দর্শনে সাতিশয় মোহিত ও চমৎকৃত হইলেন। বালিকাদিগের শিক্ষার আবশ্যকীয়তা-সম্বন্ধেও প্রশ্ন উত্থাপিত হইল। শিক্ষা বালিকাদিগকে কিরূপে পরিশ্রমী ও সংযমী করিয়া তোলে, কিরূপে গৃহে সুখশান্তি আনয়ন করে ইত্যাদি বিষয় গুলিও মিস্ কুক্ তাঁহাদিগকে বুঝাইয়া দিলেন।

মিস্ কুকের নিঃস্বার্থপরতায় মুগ্ধ হইয়াই হউক, আর বিদ্যাশিক্ষার নূতনত্ব উপভোগ করিবার নিমিত্তই হউক, কলিকাতাস্থ জাতীয় সম্প্রদায়গণ তাহাদের কন্যাদিগকে স্কুলে প্রেরণ করিতে আরম্ভ করিলেন। প্রথম বৎসরে কলিকাতার ভিন্ন ভিন্ন স্থানে কয়েকটি স্কুল স্থাপিত হইল এবং গড়ে ২১৪ জন ছাত্রীর উপস্থিতি দেখা গেল। বাঙ্গালী পণ্ডিতগণই এই সকল স্কুলে শিক্ষা দিতেন। মিস্ কুক্ তত্ত্বাবধান-ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন।

মিস্ কুকের যত্নেও পরিশ্রমে বিদ্যালয়সমূহ পরিপুষ্ট হইতে লাগিল। পর বৎসর ২৪টি স্কুল স্থাপিত হইল এবং চারি শত বালিকার উপস্থিতি দেখা গেল। তৃতীয় বৎসরে ছাত্রীর সংখ্যা আরও বর্দ্ধিত হইল এবং সর্ব্বশুদ্ধ ৩০টি স্কুল স্থাপন করা হইল।

এক্ষণে শিক্ষার প্রণালী সম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক। এ সমুদায় বিদ্যালয়ে পণ্ডিতগণ বালিকাদিগকে বাঙ্গালা লিখিতে ও পড়িতে শিখাইতেন; যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগ প্রভৃতি আঁক ও কষাইতেন, কখন কখন সূচিকর্ম্মও শিখান হইত। বাইবেল-গ্রন্থ অবশ্যই পড়ান হইত, কেন না যীশুখৃষ্টের মহিমা প্রচারই মিশনরী-গণের প্রধান উদ্দেশ্য; এতদ্ভিন্ন বিদ্যাশিক্ষা অধিক দূর অগ্রসর হইত বলিয়া বোধ হয় না। স্কুল-কর্ত্তৃপক্ষগণ ছাত্রীগণকে উৎসাহিত করিবার অভিপ্রায়ে বস্ত্রাদি, খেলনা প্রভৃতি নানাবিধ সামগ্রী উপহার দিতেন। এই সকল প্রলোভনে মুগ্ধ হইয়া যে বালিকারা বিদ্যালয়ে যোগ দান করিত—এ বিষয়ে কাহারও মতভেদ নাই। লেখাপড়া শিখিতে তাহারা বড় আগ্রহ প্রকাশ করিত না। অবশ্য ব্যতিক্রম সকল ঘটনারই থাকে।

দুর্ভাগ্য বশতঃ বালিকাগণ অতি সামান্য যাহা কিছু শিক্ষিত চর্চ্চার অভাবে

কয়েক বৎসরের মধ্যেই সব ভুলিয়া যাইত। মিশনরীদিগের প্রয়াস পণ্ডশ্রম হইত মাত্র।

যাহা হউক বিদ্যালয়ের সংখ্যা বর্দ্ধিত হইলে এক নূতন বিপদ আসিয়া উপস্থিত হইল। মিস্ কুক্ সকল বিদ্যালয়ই কিছু এককালে দেখিতে পারেন না। আজ ১০টা স্কুল দেখিবেন, কাল ১০টা দেখিবেন—এইরূপে তিনি পরিদর্শন-কার্য্য বিভাগ করিয়া লইয়াছিলেন। কিন্তু মিস্ কুক্-নিয়োজিত পণ্ডিতবর্গ তাঁহার অনুপস্থিতে কর্ত্তব্য-কার্য্য অবহেলা করিতে লাগিল এবং শিক্ষার্থিনীদিগকে যথারীতি শিক্ষাদানে বিমুখ হইল। সুতরাং অগত্যোপায় হইয়া মিস্ কুক্ তাঁহার তত্ত্বাবধানে একটি বৃহৎ কেন্দ্রীভূত বিদ্যালয় (Central School) স্থাপনে উদ্যোগী হইলেন। খৃষ্টীয় সমিতি-গণের সাহায্যে হেদুয়ার সন্নিকটে কর্ণওয়ালিস্ স্কোয়ারে ১৮২১ খৃষ্টাব্দে, ১৮ই মে বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত হইল। রাজা বৈদ্যনাথ রায় এই স্কুলগৃহ-নির্ম্মাণার্থে দুই সহস্র মুদ্রা দান করিয়াছিলেন।

কিন্তু এক বিপদ হইতে মুক্ত হইলে আর এক বিপদের সূত্রপাত হইল। দূরবর্ত্তী স্কুলগৃহে বালিকাগণ একাকী আসিতে পারে না। সুতরাং তাহাদের গৃহ হইতে স্কুলে আনয়নার্থে পরিচারিকাদল নিযুক্ত হইল। বালিকার অভিভাবক-গণ কিন্তু এই সকল ভ্রষ্ট-চরিত্রা দাসীগণকে বিশ্বাস করিতে পারিলেন না। ক্রমে ক্রমে ছাত্রীদের সংখ্যা হ্রাস হইতে লাগিল।

খৃষ্টীয় সমিতিদল এবার পল্লীগ্রামে বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপন করিতে সচেষ্ট হইলেন। কিন্তু রাজধানী অপেক্ষা পল্লীগ্রামে কুসংস্কার প্রথা দৃঢ়তর। লেখা-পড়া শিখিলে স্ত্রীলোক বিধবা হয়, জাতি যায়, এইরূপ কুসংস্কার বঙ্গীয় পল্লীবাসি-গণের অন্তরে বদ্ধমূল। কৃষ্ণনগর, বারাসাত, বাঁকীপুর, প্রভৃতি স্থানে তাঁহারা স্কুল স্থাপিত করিলেন বটে, কিন্তু স্কুলসমূহ বিশেষ কার্য্যকারী হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয় না। খৃষ্টানদিগের সহিত বাক্যযুদ্ধের পরিবর্ত্তে পল্লীগ্রাম বাসিগণ বাহুবল প্রয়োগ করিতে কুণ্ঠিত হইল না। অবস্থা বড় আশাপ্রদ নহে দেখিয়া মিশনরীদলকে রণে ভঙ্গ দিতে হইয়াছিল।

অবশেষে দেখা গেল মিশনারীদিগের অদম্য উৎসাহ বিপুল পরিশ্রম এবং অশেষ যত্ন সত্ত্বেও বঙ্গ প্রদেশে স্ত্রীশিক্ষা প্রবর্ত্তিত হইল না। বাঙ্গালার মাটিতে স্ত্রীশিক্ষা ফলিল না। বঙ্গনারীগণ যে তিমিরে সেই তিমিরেই পড়িয়া রহিলেন কারণ কি? কারণের অভাব নাই। বাঙ্গালীরা খৃষ্টীয় ধর্ম্মাবলম্বী-ইংরাজ পুরুষ-চালিত বিদ্যালয়ে কন্যাগণকে প্রেরণ করিতে কুণ্ঠিত হইতেন। তৎকালীন সামাজিক

প্রথা এমনই কঠোর ছিল যে, এমন কি পুরুষেরাও খৃষ্টান সম্প্রদায়ের সহবাসে আসিতে সাহসী হইত না। জাতিচ্যুতের ভয় ত সকলেরই আছে। অপিচ খৃষ্টীয় ধর্ম্মযাজকের প্ররোচনায় কখন কখন বালিকাগণ যে স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিত, এরূপ উদাহরণও বিরল ছিল না। সুতরাং এরূপ দুঃসাহসিক কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে কাহারও সাহসে কুলাইত না।

দ্বিতীয়তঃ, হাড়ী ডোম, চণ্ডাল, মেথর প্রভৃতি নিম্নতম সম্প্রদায়ের বালিকাগণই এই সকল খৃষ্টান পরিচালিত স্কুলে অধ্যয়ন করিত। ছাত্রীদিগের মধ্যে আবার অনেকেই বেশ্যা কন্যা। কলুষিতচরিত্রা কুহকিনীগণ জনসাধারণের মন আকৃষ্ট করিবার অভিপ্রায় বিদ্যা শিক্ষা করিত, এবং তাহাদের কন্যাদের আগ্রহ সহকারে এই সকল বিদ্যালয়ে প্রেরণ করিত। সুতরাং কোন সম্ভ্রান্ত বংশীয় বঙ্গ সন্তান তাঁহার দুহিতাকে এই নীচ সংসর্গে প্রেরণ করিবেন ?

সামাজিক রীতিনীতি ও স্ত্রীশিক্ষার মহা অন্তরায় ছিল। গৌরীদান তৎকালে গৌরবান্বিত বলিয়া বিবেচিত হইত। বালিকাগণ যদি অষ্টম বৎসরে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হয়, তবে তাহাদের পাঠের অবকাশ কোথায় ? শৈশবে সংসার-ধর্ম্মে বালিকারা এমনই ব্যিব্রত হইয়া পড়িত, যে সরস্বতী-দেবীর অর্চ্চনা করা তাহাদের ভাগ্যে ঘটিয়া উঠিয়া না।

আরও একটা নিগূঢ় কারণ দেখা যায় পুরুষগণ তৎকালে সুশিক্ষিত ছিলেন না। তাঁহারা শিক্ষার আবশ্যকীয়তা বুঝিতে পারিতেন না। কাজেই তাঁহারা স্ত্রীশিক্ষা-সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন ছিলেন। স্ত্রীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে যখন সকলে দ্বিধা করিতেন, তখন ইহার প্রচলন সুদূর-পরাহত নহে কি ?

এই সমুদায় কারণে খৃষ্টীয় সমিতির ঐকান্তিক উদ্যম ব্যর্থ হইল। বৈজ্ঞানিকেরা বলেন জগতে শক্তির অপচয় নাই। সুতরাং এক্ষেত্রে শক্তির যে সম্পূর্ণ অপচয় হইয়াছিল এমন অবৈজ্ঞানিক কথা বলা যুক্তিসঙ্গত নহে। তাঁহাদের চেষ্টা সম্যক্ ফলবতী হয় নাই, বটে, কিন্তু তাঁহাদের অধ্যবসায় ও ঐকান্তিকতা কুসংস্কার ছিন্ন করিয়া স্ত্রীশিক্ষার পথ যে সুগম করিয়া দিয়াছিল এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। তাঁহারাই স্ত্রীশিক্ষা বীজ রোপণ করেন; আমরা তাহার ফলভোগ করিতেছি মাত্র।

বেথুন কলেজের নাম বোধ হয় সকলেই শুনিয়াছেন এবং বেথুন কলেজের ছাপমারা প্রকাণ্ড গাড়ীর ঘরঘর শব্দে বোধ হয় কেহ কেহ উত্যক্তও হইয়াছেন। ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে ৭ই মে বেথুন সাহেব কর্ত্তৃক এই বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত

হইয়াছিল বলিয়া ইহা অদ্যাবধি বেথুন কলেজ নামে অভিহিত হইতেছে। এই মহাত্মা স্ত্রীশিক্ষার উন্নতি সম্বন্ধে যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছিলেন। তাঁহার সংক্ষিপ্ত জীবনী বোধ হয় এস্থলে অপ্রসঙ্গিক হইবে না।

১৮০১ সালে স্কটলণ্ডের অন্তঃপাতী স্যালফোর্ড নামক নগরে বেথুন সাহেব জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা, জন ড্রিঙ্কওয়াটার বেথুন (John Drinkwater Bethune) সৈনিক বিভাগে কর্ম্ম করিতেন। তাঁহার মাতা ইলিয়ানর কঙ্গলটন (Elcanor Congltone) সম্ভ্রান্ত বংশীয়া অলৌকিক-ধী-সম্পন্না রমণী ছিলেন! এই গুণবতী ও বুদ্ধিমতী জননী শৈশবেই তাঁহার শিক্ষাভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। প্রাদেশিক বিদ্যালয় পাঠ সমাপান্তে তিনি উচ্চশিক্ষার নিমিত্ত কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রেরিত হন। র‍্যাংলার পরীক্ষায় চতুর্থ স্থান অধিকার করিয়া তিনি বিশ্ববিদ্যালয় ত্যাগ করেন।

তৎপরে তিনি আইন-শিক্ষাতে মনোনিবেশ করিয়াছিলেন আইনপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া Parliamentary Council এর উন্নত পদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। তাঁহার তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও কার্য্যদক্ষতা দর্শনে কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা তাঁহাকে গভর্ণর জেনারেলের ব্যবস্থা-সচিবের পদে মনোনীত করেন। 'বেথুন গণিত শাস্ত্রে ও ব্যবস্থা শাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপন্ন হইলেও সর্ব্বশাস্ত্রে বিশারদ ছিলেন। লাটীন, গ্রীক জার্ম্মাণ, ফ্রেঞ্চ ও ইতালীয়ান এই কয় ভাষা তিনি উৎকৃষ্ট লিখিতে ও বলিতে পারিতেন।' তিনি গ্যালিলিও ও কেপলারের জীবন চরিত রচনা করিয়াছিলেন।

শুনা যায় তিনি অত্যন্ত মাতৃভক্ত ছিলেন। মাতার পরামর্শ ভিন্ন তিনি কোন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতেন না। মাতার আদেশ বাণী তিনি বেদতাবৎ পালন করিতেন। তিনি প্রবীণ অবস্থায়ও জননীর স্মৃতি হৃদয়ে রাখিয়া পূজা করিতেন।

সন্তানের শিক্ষা জননীর উপরই নির্ভর করে। জননী শিক্ষিত হইলে, জননী উন্নতমনা, কুসংস্কার বিবর্জ্জিত হইলে, সন্তানগণও যে শিক্ষিত, উচ্চমনা হইয়া উঠে বেথুন সাহেব তাহার প্রত্যক্ষ উদাহরণ। মাতার আদর্শেই তিনি গঠিত হইয়াছিলেন। তাঁহার মাতা অশিক্ষিতা, বা সঙ্কীর্ণমনা হইলে বেথুন সাহেব এতাদৃশ মহৎ লোক হইতে পারিতেন কি না সংশয়ের বিষয়।

যাহা হউক, ভারতবর্ষে পদার্পন করিয়া বঙ্গনারীর অবনতি দর্শনে তাঁহার হৃদয় কাতর হইল। সৌভাগ্য ক্রমে এ সময়ে তিনি এডুকেশন কাউন্সিলের (Education council এর) সভাপতিরূপে বৃত হন। এই পদে প্রতিষ্ঠিত

হইয়া তিনি এতদ্দেশীয় শিক্ষার উন্নতি সাধনে প্রাণপণে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। বিশেষতঃ বঙ্গনারীগণের উন্নতিকল্পে তিনি বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন।

ইংরাজ সন্তান অভিলাষ পূর্ণ না করিয়া সুস্থির হয় না। তাহাদের মনবল এতই প্রবল, তাহাদের অধ্যবসায় এতই দৃঢ় যে তাহারা সংকল্প কার্য্যে পরিণত না করিয়া নিবৃত্ত হয় না।

বেথুন তাঁহার মনোরথ পূর্ণ করিবার উপায় উদ্ভাবন করিতে লাগিলেন। খৃষ্টীয় সমিতি প্রবর্ত্তিত বিদ্যালয় সমূহ কার্য্যকরী হইতেছে না দেখিয়া তিনি নূতন প্রণালীতে বিদ্যালয় স্থাপন করিতে মনস্থ করিলেন। কিন্তু তিনি বিদেশী; বঙ্গবাসিগণের সহায়তা ব্যতিরেকে কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হওয়া সম্ভবপর নহে, দেখিয়া তিনি সম্ভ্রান্তবংশীয় বাঙ্গালীদের মতামত জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। রসময় দত্ত, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, মদনমোহন তর্কলঙ্কার প্রভৃতি পণ্ডিতগণ সকলেই স্ত্রীশিক্ষা সমর্থন করিয়াছিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্ররোচনাই দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় বালিকা-বিদ্যালয় নির্ম্মানার্থে কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটস্থ ভূমিখণ্ড প্রদান করেন।

অচিরেই তাঁহার মনোভিলাষ পূর্ণ হইল। বেথুন সাহেব ষাটি সহস্র মুদ্রা ব্যয়করিয়া একটি বালিকা বিদ্যালয় নির্ম্মান করিলেন। যাহাতে বিদ্যালয়টি জনসাধারণের মনোমত হয়, সেই হেতু তিনি কয়েকটি নিয়মাবলী প্রচার করিলেন। সম্ভ্রান্তবংশীয়া বালিকা ব্যতীত এস্কুলে অপর কেহ পাঠ করিতে পারিবে না। পুরুষগণ এ বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিবে না। এ বিদ্যালয়ে কোন বিশেষ ধর্ম্মশিক্ষা দেওয়া হইবে না। শিক্ষার্থিনীগণ শকটারোহণে বিদ্যালয়ে যাতায়াত করিবে। মিসেস রিড্‌স্‌ডেল (Mrs. Ridsdale) নাম্নী জনৈক মহিলা অধ্যক্ষরূপে মনোনীত হইল।

বিদ্যালয়টি শিক্ষিত সম্প্রদায়ের যে মনোমত হইয়াছিল তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কলিকাতাস্থ বহু সম্ভ্রান্ত বংশীয় পরিবারগণ তাঁহাদের কন্যাগণকে এই স্কুলে পাঠাইতে কুণ্ঠিত হইলেন না। সহরময় একটা হুলস্থূল পড়িয়া গেল। সকলের মুখে একই কথা; সর্ব্বত্রই এই আলোচনা হইতে লাগিল।

কিন্তু বেথুন সাহেব কলিকাতায় বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া শান্ত হইলেন না, পল্লীগ্রামেও স্ত্রীশিক্ষা প্রচার করিতে উৎসুক হইলেন। কিন্তু হায়! পল্লীগ্রামে তাঁহার চেষ্টা বিফল হইল। তাঁহার উৎসাহে শিক্ষকাগ্রণী, স্বনামধন্য স্বর্গীয় প্যারিচরণ সরকার বারাসতে একটি বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু ইহা অধিককালস্থায়ী হয় নাই।

স্ত্রীশিক্ষার উন্নতি সাধনে তিনি যে কত মুদ্রা অজস্র ব্যয় করিয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। তিনি ধনিসন্তান—গর্ভমেণ্টের নিকট যে বেতন পাইতেন তাহার অধিকাংশই দানধ্যানে ব্যয়িত হইত তাঁহাকে দ্বিতীয় বিদ্যাসাগর বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

বাঙ্গালীর দুরদৃষ্ট বশতঃ এই মহাপুরুষ অকালেই সংসার হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন। ১৮৫১ খৃষ্টাব্দে ১২ই আগষ্ট এই কলিকাতা সহরেই তিনি মানব-লীলা সম্বরণ করেন। মৃত্যুর পর তাঁহার উইলে দেখা গেল যে, তিনি তাঁহার এদেশে সঞ্চিত সমুদায় সম্পত্তি স্ত্রীশিক্ষার উন্নতির জন্য দান করিয়া গিয়াছেন। যেমন ব্রত তেমনি উদ্যাপন।'

যাহা হউক, মহাত্মা বেথুনের আজন্মপোষিত বাসনা বিফল হয় নাই। ধীরে ধীরে, অল্পে অল্পে কুসংস্কার-পাশ ছিন্ন করিয়া বঙ্গদেশে স্ত্রীশিক্ষা অগ্রসর হইতে লাগিল। নিম্নপ্রদত্ত তালিকাপাঠে স্ত্রীশিক্ষার ক্রমোন্নতি সম্বন্ধে পাঠকদিগের মনে একটা ধারণা জন্মিতে পারে:—

বৎসর	বিদ্যালয় সংখ্যা	বালিকা সংখ্যা
১৮৫৯—৬০	৮	১৯৯
৬০—৬১	১৬	৩৯৫
৬১—৬২	১৫	৫৩০
৬২—৬৩	৩৫	১১৮৩
৬৩—৬৪	১১৫	২,৯৩৩
৬৪—৬৫	১৭৪	৪,০৬৪
৬৫—৬৬	২১৭	৫,৫৫৯
৬৬—৬৭	২৮১	৬,৫৩১

অদ্য আমরা এই স্থানেই উপসংহার করিতে ইচ্ছা করি।

পঞ্চ"ম"কার।

লেখক—শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়।

হিন্দুদের উপাসনা প্রণালী বহুবিধ। ধর্ম্মও অনেক শ্রেণীতে বিভক্ত। তন্মধ্যে শাক্ত, শৈব, ও বৈষ্ণব ধর্ম্ম সর্ব্ব প্রধান। এই তিনরূপ ধর্ম্মাবলম্বীদের ভিতরে পরস্পরের সহিত বিলক্ষণ বিরোধ প্রচলিত আছে; এবং সুযোগ পাইলে কেহই পরস্পরকে অপদস্থ করিতে ছাড়েন না। কিন্তু ধর্ম্ম উপলক্ষে এইরূপ বিরোধ যে কেবল হিন্দু ধর্ম্মেই পরিলক্ষিত হয়, তাহা নহে। আবহমান কাল হইতে সর্ব্বপ্রকার ধর্ম্মাবলম্বীদের ভিতরেই এইরূপ বিজাতীয় বিরোধ প্রচলিত হইয়া আসিতেছে, এবং সেই বিরোধ নিবন্ধন বিরোধকারী ধর্ম্মাবলম্বী-দিগের অবলম্বিত প্রত্যেক ধর্ম্মই ক্রমে ক্রমে হীনবল হইয়া পড়িতেছে। খৃষ্টান-দিগের ভিতরে রোম্যানক্যাথলিক, প্রটেষ্টাণ্ট প্রভৃতি নানারূপ শ্রেণী বিভাগ হইয়া গিয়াছে। ইহাদের ভিতরে কিরূপ 'আদায় কাঁচকলায়' সম্বন্ধ তাহা বোধ হয় পাঠকগণের নিকটে অজ্ঞাত নহে। য়ুরোপে কোন রাষ্ট্রে রোম্যান-ক্যাথলিক ধর্ম্মাবলম্বী কোন ব্যক্তি সিংহাসনে উপবিষ্ট হইলে প্রটেষ্টাণ্টদিগের উপর অমানুষিক অত্যাচার করিত আবার প্রটেষ্টাণ্ট ধর্ম্ম বিশ্বাসী কোন ব্যক্তি সিংহাসন প্রাপ্ত হইলে নিরুপায় ক্যাথলিক ধর্ম্মাবলম্বীদের উপরে অবর্ণনীয় অত্যাচার করিত। মুসলমানদের ভিতরেও তাই। তাহারাও দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। ঐ দুই শ্রেণীর নাম—সুন্নী (নিষ্ঠাপরায়ণ) ও শিয়াই। সুন্নী ধর্ম্মাবলম্বী-গণ আবার চারিভাগে বিভক্ত। যথা—হানাফী, শফী, মালিকী ও হাম্বেলী। শিয়াই ধর্ম্মাবলম্বীরা পারস্য-দেশে বাস করে। সুন্নীরা শিয়াইদিগকে ধার্ম্মিক মুসলমান বলিয়াই মানে না—তাহারা বলে—'শিয়াইরা মুসলমান ধর্ম্মাবলম্বী মাত্র। তাহারা প্রকৃত নিষ্ঠাবান্ বা ধার্ম্মিক নহে। সেদিনকার নব্য-ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম দেখ ঐ ধর্ম্মাবলম্বীগণও এই অল্প সময়ের মধ্যে তিনভাগে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছে। ঐ তিনভাগের নাম আদিসমাজ, সাধারণ সমাজ এবং নববিধান সমাজ। এখন সাধারণ সমাজেরই শক্তি ও প্রতিপত্তি বেশী। এক্ষণে আমরা ধর্ম্ম শব্দের অর্থ বুঝিতে চেষ্টা করি।

ধৃ ধাতুর অর্থে ধারণ করা। তাহার উত্তরে কর্ত্তৃবাচ্যে মন্ প্রত্যয় করিয়া ধর্ম্ম ধর্ম্ম শব্দ নিষ্পন্ন করা হইয়াছে। অতএব ধর্ম্মের ব্যাসার্থ হইল 'যিনি

ধারণ করেন।—আরও বিস্তৃতরূপে বুঝিতে হইলে ধর্ম্ম বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ধারণ করেন। পাঞ্চভৌতিক জড় জগতের ধারণ এবং পাঞ্চভৌতিকাতীত অজড় জগতের ধারণ করাই ধর্ম্মের প্রকৃতার্থ। উক্ত ভৌতিক জড় জগতকে এবং ভৌতিকাতীত অজড় জগতকে ধারণ করা সত্যের উপর নির্ভর করে। তাই বিজ্ঞ শাস্ত্রকারগণ বলেন :—

"সত্যং হি তদ্ভূর্দ্ধিহিতং মদেব !"

এখন সকল শ্রেণীর হিন্দু ধর্ম্মাবলম্বীদিগের ভিতরে ধর্ম্মের নামে অন্যায় কার্য্য সকল সমাধা হইয়া থাকে। ঐ সমস্ত কার্য্যের ভিতরে একজনের পরিচয় দিবার জন্যই আজ এই প্রবন্ধের অবতারণা।

তন্ত্রে, শাক্তদিগের ভিতরে সাত প্রকার উপাসনা প্রণালী প্রচলিত দেখিতে পাই—বেদাচার, বৈষ্ণবাচার, শৈবাচার, দক্ষিণাচার, বামাচার, সিদ্ধাচার এবং কৌলাচার। আজ বামাচারীর আচারের পরিচয় দিব। বামাচারীর পঞ্চতত্ত্ব অর্থে পঞ্চ"ম"কার বুঝায়। পঞ্চ"ম"কার গুলি নিম্নলিখিতানুরূপ :—

"মদ্যং, মাসঞ্চ, মৎস্যঞ্চ, মুদ্রা, মৈথুনমেব চ
"ম"কার পঞ্চকঞ্চৈব মহাপাতক নাশনম্।".

শ্যামারহস্য।

মদ্য, মাংস, মৎস্য মুদ্রা ও মৈথুন এই পাঁচটী জিনিষ একত্রীভূত হইয়া পঞ্চ"ম"-কার। যিনি এই পঞ্চ"ম"কার সাধন সমাপ্ত করিতে পারেন—তিনি মহাপাপ হইতে বিমুক্ত হয়েন। শুধু এই কয়টী লইয়া "পঞ্চতত্ত্ব" সাধন করা যায় না। আরও বীভৎস কাণ্ড আছে—সে সমূহের যথাযথ পরিচয় আমরা ভদ্র সমাজে দিতে অক্ষম।

"পঞ্চতত্ত্বং খ-পুষ্পঞ্চ পূজয়েৎ কুলযোষিতম্।
বামাচারো ভবেৎ তত্র বামাভূত্বা যজেৎ পরাম্॥"

এতদর্থ পঞ্চ"ম"কার, খ পুষ্প দিয়া কুলযোষিতকে পূজা করিবে। কুলযোষিত অর্থে নটস্ত্রী, কাপালী, বেশ্যা, রজকী, নাপিতকন্যা, গোপকন্যা এবং মালাকার কন্যা। বামাচারীগণ এই কুলযোষিতদিগকে লইয়া ভৈরবীচক্রে উপবেশনান্তর পঞ্চ"ম"কার সাধন করিবেন।

"সিন্দুর তিলকং ভালে পাণৌচ মদিরাসবং।
কৃত্বা পিবেৎ গুরুধারং তথা দেবীঞ্চ চিন্ময়ীং॥"

ইহার পর মদিরা "পীত্বা, পীত্বা, পুনঃ পীত্বা যাবৎ পতিতো ভূতলে।" তৎপরে করণীয় যাহা, তাহা ভদ্রসমাজে বর্ণনীয় নহে।

এই সকল বীভৎস কাণ্ড কি বাস্তবিকই হিন্দু-ধর্ম্ম-শাস্ত্রানুমোদিত? একথা প্রত্যয় করিতে প্রবৃত্তি হয় না। অনেক বামাচারী শাস্ত্রের কদর্থ বুঝিয়া এই সকল ক্রিয়া সমাধান করিয়া ধর্ম্মকে কালিমাবৃত করিতেছে। পঞ্চ"ম"কারের প্রকৃত অর্থ বিষয়ে যোগিনী তন্ত্র ৬ষ্ঠ পটলে এইরূপ লিখিত আছে :—

"কুণ্ডল্যা মিলনাদিন্দো শ্রবতে যৎ পরমামৃতং।
পিবেদ্ যোগী মহেশানি মহাপানমিদং স্মৃতং॥
পাপপুণ্যং পশুংহত্বা জ্ঞানখড়্গেন শাঙ্করি।
পরমাত্মনি নয়েচ্চিত্তং পলাশীতি নিগদ্যতে॥
মনসা সেন্দ্রিয়ং সর্ব্বং সংযম্যাত্মনি যোজয়েৎ।
মৎস্যাশী সভবেদ্ যোগী মুক্তবন্ধস্তবং প্রিয়ে॥
অশেষ ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ডং পরব্রহ্মণি সংনয়েৎ।
পরশক্ত্যাত্ম সংযোগন বীর্য্যং মৈথুনং মতং॥"

অর্থাৎ আধার স্থিত কুলকুণ্ডলিনী শক্তিকে সকল পদ্ম ভেদ পূর্ব্বক সহস্রদল পদ্মাবস্থিত পরম শিবের সঙ্গে সংযুক্ত করিলে যে পরমামৃত নির্গত হইবে তাহার নাম সুধা বা সুরা অথবা মদ্য। এই মদ্যপান পূর্ব্বক যোগী অমর হয়েন। এবং পরমশিবের সঙ্গে কুলকুণ্ডলিনীর সংযোগকে মৈথুন কহে—ইহা দ্বারা মানব মুক্তি লাভ করেন। জ্ঞানরূপ খড়্গ দিয়া পাপ পুণ্যরূপ পশু হনন পূর্ব্বক, পরমাত্মাতে চিত্ত আবদ্ধ করাই মাংস তত্ব। সমস্ত ইন্দ্রিয়কে মনের সঙ্গে সংযত করিয়া আত্মাতে যুক্ত করার নাম মৎস্য তত্ব। অশেষ ব্রহ্মাণ্ডকে পরব্রহ্ম বলিয়া ধারণা করা—মুদ্রা তত্ব। এবং কুলকুণ্ডলিনীর সঙ্গে পর শক্তির সংযোগের নাম—মৈথুন।

অতএব কি করিয়া বলিব যে মদ্যপান এবং স্ত্রীসম্ভোগ ভিন্ন সাধনা সিদ্ধ হয় না? বিশেষ অপর এক তন্ত্রে লিখিত আছে যে :—

"সিদ্ধমন্ত্রী ভবেদ্বীরো নবীরো মদ্যপানতঃ।"

নিরুত্তর তন্ত্র। ১০ম পটল।

এত প্রমাণ সত্বেও শাস্ত্রের প্রকৃত মহিমাকে—কদর্থ দ্বারা আবরিত করিয়া ধর্ম্মকে বিকৃত আকারে সমাজের সম্মুখে তুলিয়া ধরা—বিবেকানুমোদিত কার্য্য নহে।

বিজয়া।

মা! মা! মা!—মা নাই! তিনটি দিনের মত সকল জ্বালা ভুলিয়া, সকল বেদনা বিস্মৃত হইয়া জগজ্জননীর চরণাম্বুজে আত্ম-সমর্পণ করিতেছিলাম,—সহসা নবমীর নিশি পোহাইয়া গেল। চকিত নয়নে চাহিয়া দেখিলাম, মা নাই ধীরে ধীরে ভৈরবী রাগিণীর মধুর পর্দ্দায় উঠিয়া বিজয়ার করুণ সঙ্গীত মর্ম্মস্পর্শ করিল। নয়ন বিস্ফারিত করিয়া, আবার চণ্ডীমণ্ডপের দিকে চাহিয়া দেখিলাম, মা নাই! মৃণ্ময়ী প্রতিমা নিস্তেজ করিয়া, জগৎ সংসার পরিশূন্য করিয়া ও জীবন শ্মশান-ঘোরে সমাচ্ছন্ন করিয়া মহামায়া অন্তর্দ্ধান করিয়াছেন। হৃদয় আবার শতভারে অবনমিত হইল, কালের কঠোর কুলিশাঘাত আবার শিরায় অনুভূত হইতে লাগিল। তারস্বরে সমুচ্চকণ্ঠে গগন মেদিনী বিকম্পিত করিয়া ডাকিলাম মা! মা!! মা! মা নাম প্রতিধ্বনিত করিয়া জড়জগৎ উত্তর করিল, মা নাই!

মা নাই,—মা নাই? তবে কাহার বিজয়া? কাহার জয়োৎসবে তবে এত আনন্দ-উল্লাস? মহাকালের? না। ঐ শুন, লহরে লহরে সুস্বর পরিস্ফুট করিয়া ভক্ত কহিতেছেন "মায়ের বিজয়া; দৈত্যকুলদলনী মহাকাল-বিজয়িনী মায়ের বিজয়া।" অতএব আমাদেরও বিজয়া। "মা আমাদের, আমরা মায়ের"। মা নাই বলিয়াই মায়ের বিজয়া! মা যে ইচ্ছাময়ী, লীলাময়ী,—তাই তাঁর বিজয়া। মা যে সৃষ্টিসাধিনী স্থিতি কারিণী, প্রলয়োৎপাদিনী!—তাই তাঁর বিজয়া! মা যে রঙ্গময়ী, জগন্ময়ী চিদানন্দময়ী,—তাই তাঁর বিজয়া। তাঁর ত নিত্যই বিজয়া,—দণ্ডে দণ্ডে, পলে পলে, ক্ষণে অনুক্ষণে তাঁর বিজয়া। তবে এ বিজয়া আবার কেন? এ বিজয়ার প্রয়োজন আছে। অনুক্ষণই তিনি আপন বিজয়া আপনি করিয়া থাকেন,—আমরা কৈ তাহাতে যোগ দিই না! বলির ছাগের ন্যায় হন্তার আনন্দবর্দ্ধন করিমাত্র; তাঁর কাল ও যুগমাহাত্ম্যের যুপকাষ্ঠে আপনাদিগকে সমর্পন করিয়া তাঁর বিজয়ার করণ হই মাত্র, আমরা ত কখনও তাঁর বিজয়ার উপভোগ করি না!

অতএব আমাদের জন্যই আমরা তাঁর বিজয়া করি। আমরা অনর্থকে পরমার্থ সার করিয়া, আর নরকের মহাকুণ্ড সৃষ্টি করিয়া, তাহাতেই কৃমি কীটের মত সম্বৎসরকাল হিলি-বিলি করিয়াছি। কেবলমাত্র তিনটি দিনের ভাগ্যবানের

জন্য চৈতন্য-সঞ্চার হইয়াছিল। তিনটি দিন মাত্র মা আনন্দময়ি! নামে গগন-পবন মুখরিত করিয়া আমরা আত্মাকে পবিত্র ও পরিষ্কৃত করিয়াছি। তাই সবাহ্যাভ্যন্তরে শুচি হইয়া আবার মা নামের মহামৃত পানে উন্মত্তান্তঃকরণে এই তিনটি দিনের জন্যই বিজয়োৎসবে মত্ত হই। এই তিনটি দিন মা-নামের মোহ-মন্ত্রে মুগ্ধ হইয়া,—দ্বেষ-হিংসা অভিমান পরিবর্জ্জন করিয়া, আমরা পবিত্র হইয়াছি। সম্বৎসরে আমাদের এমন দিন আর আসিবে না। তাই এই পূত-কলেবরে শুচিস্মিত প্রফুল্ল বদনে, আত্মীয়, অনাত্মীয়, শত্রু মিত্র, উচ্চ নীচ স্নিগ্ধাস্নিগ্ধ, পরিচিতাপরিচিত সর্ব্বসাধারণকেই আলিঙ্গন করিয়া পরম আপ্যায়িত হই। আজ বিশাল জগতী-তলে আমরা কাহাকেও শত্রু বলিয়া জানি না। আজ আমরা কেবল জানি ও মানি, এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের এই সমগ্র চরাচরের, জগৎ-সাম্রাজ্যের একজন সম্রাট আছেন তাঁহারই অনন্ত মহিমাবলে আমরা সকল সম্প্রদায়, সকল সমাজ, হিন্দুনামে একাঙ্গীভূত হইয়া তাঁহারই একতম শাসনের সুখাস্বাদ করিতেছি। এই অনুভূতি লইয়াই আমরা বিজয়ার আলিঙ্গন ও সম্ভাষণে প্রবৃত্ত হই। এই মনেভাব সংগূঢ় রাখিয়া আমরা 'কোলাকুলি'র সৎক্রিয়ায় সর্ব্বসাধারণকে সম্পূজিত করি।

বিজয়ার মহোৎসবে উন্মত্ত হইয়াছি, হৃদয়ে কিন্তু শান্তি নাই। তবে কি মায়ের পূজা হয় নাই? হৃদয়াভ্যন্তর হইতে কে যেন বলিতেছে, "না—মায়ের পূজা হয় নাই।" অধম অকৃতী সন্তান আমরা মায়ের পূজা করিব বলিয়া কতই আড়ম্বর করিলাম, কিন্তু বাস্তবিক পূজা করিলাম কৈ? আত্মীয় স্বজন, স্ত্রী-পুত্র পরিবারবর্গের পূজা করিয়া যথেষ্ট আত্মপূজা করিয়াছি, কিন্তু বরাভয়দায়িনী জগদ্ধাত্রী দুর্গার পূজা করিলাম কৈ? ঐ শত সহস্র কোটী কোটী কণ্ঠের বিকট আর্ত্তনাদে গগন মেদিনী বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে। ঐ ব্যাধি-বিপত্তি-অন্নাভাবে লক্ষ লক্ষ জীবের জীবন প্রদীপ নির্ব্বাণ হইতেছে। আতুর অনাথগণকে আশ্রয় দান করিয়া, পিপাসিতের প্রাণ রক্ষা করিয়া ও বুভুক্ষুকে অন্নমুষ্টি বিতরণ করিয়া কুলকুণ্ডলিনী জগজ্জননীর পূজা করিলাম কৈ? এত উদ্যোগে এমন আন্তরিক অনুরাগে ও অন্নদার পূজা অপ্রসন্ন রহিয়া গেল! দুর্গতিনাশিনীর পদ প্রান্তে নিপতিত থাকিয়া ও সেবা করা হইল না! মহামায়ার পূজার জন্য চিত্ত চঞ্চল হইয়াছিল না? তবে কি আদ্যশক্তির চরণ ধ্যান করিতে পারিয়াছি? তাহাতেই বা কেমন করিয়া আশ্বস্ত হই? ভক্তি-সঞ্চয় ত হয় নাই! এখনও ষড়্‌রিপুর দুর্দ্দাম আক্রমণে হৃদয় মুহ্যমান হইতেছে, তবে ভক্তি পূজাই বা করিলাম

ক? মায়ের পূজার সমস্ত আয়োজন ও সকল উদ্যোগ আড়ম্বর ব্যর্থ হইয়া য়াছে। তাই বিজয়ার আনন্দ কোলাহলে নিমগ্ন থাকিলেও প্রাণের ভিতর মন হাহাকার উঠিতেছে।

নব্যসিদ্ধিদাতা গণপতির স্মরণ লইয়া দশমীর এই আমোদ প্রমোদের প্রথম অবকাশেই সিদ্ধিপান করিয়াছিলাম। মহামায়ের পূজা হয় নাই বলিয়া যতই প্রাণ ব্যাকুল হইয়া উঠিল ততই মোহ-ঘোরে আচ্ছন্ন হইতে লাগিলাম। ক্রমশঃ কল্পনার প্রশস্ত প্রাঙ্গনে শারদীয় উৎসব আবার নববৎ প্রতিভাত হইল। সেই মঙ্গুলি আরতির ঘটা। ধূপ-ধূনা-গন্ধ-পুষ্পের সৌরভে যেন জগৎ সংসার তেমনই আমোদিত। মায়ের সেই ভুবনমোহিনী জ্যোতির্ম্ময়ী মূর্ত্তিতে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডটা যেন তেমনই আলোকিত। পুলকে শরীর কণ্টকিত হইয়া উঠিল। অমনি বিজয়-স্মৃতি মনে পড়িল। আবার পরমানন্দে মুঞ্জুরিত হইয়া হৃদয় নাচিয়া উঠিল,—বাহুদ্বয় প্রসারণ করিয়া সকলকে আলিঙ্গন করিতে লাগিলাম। সকলে সমস্বরে উচ্চকণ্ঠে তান ধরিয়া তুলিল। সঙ্গে সঙ্গে প্রতিধ্বনি প্রতি শব্দ করিল মা! মা! মা!

সম্বৎসর বাঁচিয়া থাকিয়া বিজয়ার কোলাকুলি করিতে পাইলেই আমাদের চরম সুখী তাই হিন্দু আমরা, মাকে বিদায় দিবার সময় প্রার্থনা করিয়াছি যেন আবার এক বৎসর পরে এমনই হাসিতে হাসিতে মায়ের নাম করিয়া কোলাকুলি করিতে পারি। এমন সুখ আর আমাদের জীবনে নাই শত ঝঞ্ঝাবাতে হৃদয় সংক্ষুব্ধ হইতেছে, তথাপি সম্বৎসরপরে বিজয়ার কোলাকুলি করিতে পাইলে আমাদের প্রাণে আহ্লাদ ধরে না! তাই আমাদের বিজয়ার, আশার এত কুহক!

আমরা জন্মভূমির পাঠক মহোদয়গণকে যথাযোগ্য প্রণাম, নমস্কার ও আশীর্ব্বাদ জ্ঞাপন করিতেছি। নমস্ত গুরুজনবর্গ আশীর্ব্বাদ করুন, যেন আগামী বৎসর এমনই হাসিতে হাসিতে সকলকে অভিবাদন করিতে পারি।

শ্রীশ্রীদুর্গায়ৈ নমঃ ॥

আশায়-নিরাশ।

(১)

বিশ্ববিদ্যালয়ের একরাশ পুস্তক-ভার মাথা হইতে নামাইয়া, মা সরস্বতীর নিকট হইতে চির-বিদায় গ্রহণ করিয়া, হরনিবাস গ্রামের ইংরাজী স্কুলের Head master এর পদ গ্রহণ পূর্ব্বক, পিতামাতার স্নেহাশ্রু জলে অভিষিক্ত হইয়া কর্ম্মস্থলে গমন করিলাম। তখন, আমার জীবনের শোভন প্রভাতকাল তখন শরীরে বল, মনে সাহস, এবং অধ্যবসায়, দু-কুল প্লাবিনী, তরঙ্গাভিঘাত চঞ্চলা বেগবতী স্রোতস্বিনীর মতন আমার সেই নবীন জীবনের উপর দিয়া বহিয়া যাইত।

হরনিবাস গ্রামখানি, প্রকৃতির রম্য সৌন্দর্য্যের ক্রোড়ে পালিতা। গ্রামের চরণতল বিধৌত করিয়া শ্রোতাভিঘাত প্রখরা, তরঙ্গিণী, শ্যামল-রজনী আচ্ছাদিত উভয় তীর-মধ্যবর্ত্তিনী হইয়া, অশ্রান্ত কলতান গাহিতে গাহিতে, নাচিতে নাচিতে বহিয়া যাইতেছে। তরঙ্গিণীর নাম লক্ষ্মীনদী। গঙ্গার একটী শাখা। লক্ষ্মীনদীর তট-ভূমিস্থিত একখানি ছোট বাঙ্গালা বাসস্থান-রূপে মনোনীত করা গেল। কর্ম্মকঠোর জীবন সংগ্রামের ঘাত-প্রতিঘাত পূর্ণ অশান্তিদায়ক জনশঙ্খ-বিক্ষুব্ধ কোলাহল মুখরিত কলিকাতা নগর হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া, প্রকৃতির মন-মোহনকর নগ্ন-সৌন্দর্য্য-মগ্ন, শ্যামল-তৃণপুষ্প-তরুরাজি নীলা লাবণ্য স্বভাবের বাসন্তী-শ্রী-শোভনীয় এই শান্তিপূর্ণ, সুখপূর্ণ নির্জ্জনতাময় গ্রামের আশ্রয়ে আসিয়া, আশ্বস্থিয় নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিলাম। বাসায় একজন ঠিকা ব্রাহ্মণ এবং একজন ঠিকা পরিচারিকা আমার সমস্ত কাজ সমাপন করিয়া দিয়া, সন্ধ্যার পূর্ব্বেই বিদায় গ্রহণ করিত। আর আমি সমস্ত দিন বিদ্যালয়ে ছাত্রগুলিকে গাধা পিটিয়া ঘোঁড়া করিয়া তুলিবার জন্য অনর্থক চেষ্টা করিয়া অবশেষে শ্রান্তদেহে বিফল মনোরথ হইয়া বাসায় প্রত্যাগমন করিতাম। একটু বিশ্রামান্তরে লক্ষ্মী-নদীর তীরে শান্তিদায়ক নির্ম্মল বায়ু সেবনাকাঙ্ক্ষায় বাসা হইতে আবার বাহির হইয়া পড়িতাম এবং সন্ধ্যান্ধকার আচ্ছাদিত হইলে পুনরায় বাসায় প্রত্যাবৃত্ত

হইয়া, আহারাদি সমাপন করিয়া বক-পক্ষ-শুভ্র-শয্যায় আশ্রয় গ্রহণ পূর্ব্বক অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত সাহিত্য চর্চ্চা এবং সাহিত্য সেবায় ব্যাপৃত থাকিতাম। তদনন্তরে নিদ্রাদেবীর অর্চ্চনায় মন নিবিষ্ট করিতাম। ইহাই আমার দৈনন্দিন কার্য্য বিবরণী।

(২)

পাঠকগণকে এখানে বলা আবশ্যক যে, গল্প এবং কবিতা লেখা রোগটা আমার হৃদয়ে, আবাল্য হইতে প্রবল। আমি অনেক গুলি মাসিক পত্রের নিয়মিত লেখক। হরনিবাস গ্রামে আসিয়া আমার রচনার বেগ দ্বিগুণ পরিমাণে বাড়িয়া গেল। যাহা হউক এই নির্জ্জনপল্লী প্রকৃতির ক্রোড়ে তিনটা মাস জলস্রোতের মতন কাটিয়া গেল। গ্রীষ্মের দীর্ঘ অবসর উপস্থিত হইল। গত তিনমাস কালের ভিতরে হরনিবাস গ্রামের নব্য-যুবক এবং বালকবৃন্দের উপরে আমি অনেকখানি প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলাম। সকলে সন্ধ্যাকালে আমার বাসাতে আসিয়া সংবাদ পত্র এবং মাসিক পত্রাদি পড়িত এবং পত্রিকা গুলির ভিতরস্থিত আমার নাম স্বাক্ষরিত রচনাগুলি, আমাকে, তাহাদের চোখে খুব মহিয়সী করিয়া তুলিত। কেহ কেহ আমার এমনি ভক্ত হইয়া পড়িল যে, তাদের চোখে আমি যেন ঈষা, মুষা এবং চৈতন্যের অপেক্ষাও অধিকতর মহত্তর হইয়া উঠিলাম।

যাহা হউক, আমাদের সমবেত চেষ্টার ফলে অনতিবিলম্বেই গ্রামের ভিভরে "স্বদেশহিত সাধিনী সমিতি" নামধেয় একটা সভা সংস্থাপিত হইল। সকলের ইচ্ছানুসারে আমিই সভার সম্পাদক মনোনীত হইলাম। দেশহিত-রূপ মহোত্তোদ্দেশ্য প্রণোদিত হইয়া বহুযুবক এবং বালক আমাদের সভায় যোগদান করিল। আমাদের বক্তৃতা এবং প্রবন্ধ পাঠাদির কলরোলে ক্ষুদ্র হরনিবাস গ্রাম থরহরি কম্পায়মান হইয়া উঠিল। কিছুদিনের ভিতরেই, আমার সম্পাদকতায় "স্বদেশহিত সাধিনী-পত্রিকা" নাম্নি একখানি মাসিক হরনিবাস গ্রাম হইতে নিয়মিত রূপে প্রকাশিত হইতে লাগিল। খুব বেগে লেখা চলিতে লাগিল। বলিতে কি গ্রামের ভিতরে যেন একটা মহা হুল স্থুল পড়িয়া গেল। কিন্তু গ্রামের প্রাচীন মহোদয়েরা আমার দ্বারা তাঁহাদের এক চেটিয়া প্রতিপত্তির নাশ আশঙ্কায় ক্ষীণ-কণ্ঠে নানারূপ অনুযোগ আরম্ভ করিলেন। কিন্তু আমাদের উৎসাহে, অধ্যবসায়ে বক্তৃতার স্রোতে এবং সিগারেটের ধুমে, তাঁহাদের ক্ষীণকণ্ঠ কোথায় ডুবিয়া গেল আমাদের কাজ অপ্রতিহত গতিতে চলিতে লাগিল।

কিন্তু হায়! বঙ্গদেশের দুর্ভাগ্য! মানুষ গড়ে আর দেবতায় ভাঙ্গে। আমাদের সভার কাজ অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছে, এমন সময়ে কোথা হইতে একটা প্রলয়ের ঝটিকা বহিয়া আমাদের সভা, বক্তৃতা, প্রবন্ধ পাঠ এবং সিগারেটের কুণ্ডলী আকৃতি ধূম কোথায় উড়াইয়া লইয়া গেল! সেই বলিতেছি।

(৩)

গ্রীষ্মের ছুটিটা কলিকাতায় উপভোগ করিবার জন্য বাড়ী হইতে দুই তিনবার চিঠি আসিয়াছিল। কিন্তু সভার কাজ কর্ম্ম তখন খুব জোরে চলিতেছিল, তাই বাড়ীতে উত্তর পাঠাইলাম বড় ব্যস্ত আছি, এখন যাইতে পারিব না। উত্তর পাইয়া আত্মীয়গণ আর আমাকে বেশী পীড়াপীড়ি করিলেন না। যাহা হউক, ইতিমধ্যে প্রণয়দেবতা তাঁহার অলক্ষ্য বাসস্থান হইতে কুলধনু উদ্যত করিয়া বোধ হয়, আমার প্রতি সন্ধান করিতেছিলেন।

শ্রীমতী প্রীতিদেবী সাক্ষরিত এক একটা কবিতা প্রতি মাসেই সুরেনের অন্তচর্ত্তিতায়, আমাদের পত্রিকার কার্য্যালয়ে নিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল, এবং প্রতি মাসেই কবিতা গুলি কবিকাননে' স্থান পাইতে লাগিল। সুরেনের পিতা একজন 'নব্য তন্ত্রাবলম্বী' ব্যক্তি ছিলেন। তিনি নিজে এম, এ উপাধিধারী এবং সরকারের অবসর প্রাপ্ত পেন্সনভোগী ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট। মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত।' সুরেনেরা ভাই-বোনে দুইটী মাত্র। তারই বোনের নাম প্রীতিদেবী। সুরেনের মুখে শুনিতে পাইতাম, তার পিতা আমার এই সকল দেশহিত-বিষয়ক মহৎ কাজের জন্য আমাকে খুব প্রশংসা করিতেন। শুনিয়া আমি ভারি আত্মপ্রসাদ লাভ করিতাম।

(৪)

হঠাৎ এক দিন সুরেন আসিয়া আমাকে জানাইয়া দিয়া গেল আজ সন্ধ্যাকালে তাহাদের বাড়ী আমার নিমন্ত্রণ রহিল। বৈকালে বেশভূষা করিয়া মহেন্দ্রবাবুর বাড়ীতে নিমন্ত্রণ রক্ষার জন্য উপস্থিত হইলাম।

মহেন্দ্র বাবু নিচেয় ঘরে চেয়ারের উপর বসিয়া, কি পড়িতেছিলেন, আমাকে দেখিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন, আমি তাঁহাকে নমস্কার করিলাম। তিনি আমার দিকে একখানা চেয়ার ঠেলিয়া দিয়া, বলিলেন—'বসুন।'

আমি চেয়ারখানার উপরে আপনার দেহভার অর্পণ করিয়া, মহেন্দ্র বাবুর হস্তস্থিত বই খানার দিকে দৃষ্টিপাত করিলাম। সেখানি মৎসম্পাদিত মাসিক-পত্রিকা। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—'কি পড়িতেছেন?'

মহেন্দ্র বাবু চশমার ভিতর দিয়া আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন—'আপনার লেখা—'উন্নতি।' তার পর পত্রিকাখানা সম্মুখস্থ টেবিলের উপর রাখিয়া, চশমা-খানা রুমাল প্রান্ত দ্বারা মার্জ্জনা করিতে করিতে বলিলেন—

'আপনার বাড়ী কলিকাতায়?'

আমি কহিলাম—'আজ্ঞা হাঁ।'

"পিতার নাম?"

"শ্রীনরেন্দ্রনাথ সেন গুপ্ত।"

"বৈদ্য?"

"আজ্ঞা হাঁ।"

তিনি আর কিছু না বলিয়া অন্য দিকে চাহিলেন। তার পর মহেন্দ্র বাবুর সঙ্গে আমার স্বদেশ বিষয়ক অনেক কথাবার্ত্তা হইল। ফলে মহেন্দ্র বাবু আমাদের দেশহিত সাধিনী-সভার বিশিষ্ট সভ্য শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হইয়া পড়িলেন এবং প্রতিমাসে ৫৲ টাকা করিয়া দর্শনী দিতে স্বীকৃত হইলেন।

এমন সময়ে সুরেন আসিয়া বলিল—নলিনী বাবু! চলুন—আহারের উদ্যোগ হইয়াছে।' তার সঙ্গে বাড়ীর ভিতরে প্রবিষ্ট হইলাম। মহেন্দ্র বাবুর বাড়ীখানা বিলাতী ফ্যাসানে সজ্জিত। সমস্ত গৃহতল ম্যাটিং দ্বারা আবৃত। ঘরের দেওয়ালে বড় বড় অয়েল পেনটিং এবং বিলাতী স্বীকারের চিত্র সকল বিলম্বিত বাড়ীখানির অন্দরে প্রবেশ করিলে মোহিত হইয়া যাইতে হয়। মহেন্দ্র বাবু আমার আহারের জন্য বিরাট আয়োজন করিয়াছেন।

একটী চতুর্দ্দশ কি পঞ্চদশ বর্ষিয়া বালিকা পরিবেশনাদি করিতে লাগিল। বালিকা বড় সুন্দরী। মহেন্দ্র বাবু বলিলেন—'নলিনী বাবু!' ঐটী আমার কন্যা।

আমি কিছু বলিলাম না। আহারাদি সমাপ্ত করিয়া মহেন্দ্র বাবুর বাড়ী পরিত্যাগ করিলাম। সমস্ত পথ চিন্তাভারাক্রান্ত চিত্তে অতিক্রম করিলাম। আমার নয়ন সমক্ষে কেবল দুইটী উজ্জলায়ত আঁখি ভাসিয়া ভাসিয়া উঠিতে লাগিল।

(৫)

বাসায় গিয়া শয্যায় আশ্রয় গ্রহণ করিলাম। শয়ন করিয়া ভাবিতে লাগিলাম—"মহেন্দ্রবাবুর মেয়ের মুখখানি বেশ, না? কেমন বড় বড় চোখ—মন নাক—কেমন রং—যেন দেবী প্রতিমাখানি। অমন সুন্দর সুশ্রীত কখনও

দেখি নাই।” অনেকক্ষণ ধরিয়া এই রকম কত কি যে চিন্তা করিলাম, সে সব আর বলা যায় না তাহা ব্যক্ত করিতে গেলে একখানি ক্ষুদ্র মহাভারত লিখিবার আয়োজন করিতে হয়।

এমন সময়ে গ্রামের খৃষ্টান মিশনরীদের ধর্ম্ম মন্দিরের ঘড়ীটা ঢং ঢং করিয়া বাজিয়া রজনীর গভীরতা জ্ঞাপন করিল।

সে রজনী বড় সৌন্দর্য্যপূর্ণ ছিল। আমি জানালার কাছে উঠিয়া গিয়া লক্ষ্মীনদীর দিকে মুখ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। সমস্ত গ্রামখানি নির্জ্জন হইয়া গভীর সুপ্তির ভিতরে ডুবিয়া পড়িয়াছে। গ্রামের উপরে কে যেন একখানা কৃষ্ণ যবনিকা টানিয়া দিয়াছে। কাছে—দূরে বড় বড় গাছগুলি যেন বিশ্ব-স্রষ্টার অভিসম্পাতে আহত হইয়া দাঁড়াইয়া প্রলয়ের মহাশোকাবহ সঙ্গীত-তানে তাহা ধ্বনি করিতেছে। অনন্ত নীলাম্বরে তারকা মালা বিরাজিত। বহুদূরে—আকাশের কোলে ৩।৪টা নারিকেল গাছ, পাদ্রীদের ভজনালয়ের উচ্চ শীর্ষের পার্শ্বদেশে হেলিয়া পড়িয়াছে। দূরে শ্রুত স্বপ্ন-সঙ্গীতের মতন লক্ষ্মীনদীর অবিরাম কলগীতি কানের কাছে বাজিতেছে। লক্ষ্মীনদীর উর্ম্মি-বহুল বক্ষে জ্যোৎস্না চঞ্চলা বালিকার মতন প্রত্যেক ঢেউগুলির সঙ্গে ক্রীড়া নিরত হইয়া লীলাময়ী উর্ম্মি-শীর্ষ রজতময় করিয়া দিতেছে।

এই প্রবাসে—একাকী এই জ্যোৎস্নাময়, কবত্বপূর্ণ রজনীতে আমার অন্তঃকরণে থাকিয়া থাকিয়া শয্যা-পার্শ্বে আর এক জনের অভাব জাগিয়া উঠিতে লাগিল।

সমস্ত হৃদয় যেন বিশ্ব-প্রকৃতির চরণ-পদ্মে অবলুণ্ঠিত হইয়া আত্ম-নিবেদন করিতে লাগিল। অন্তঃকরণে কেবল ধ্বনিত হইতে লাগিল :—

“এ মধু যামিনী, চাঁদিনী রাতি
সে যদি গো শুধু আসিত !”

(৬)

আজ কাল আমি প্রায় প্রতিদিন মহেন্দ্র বাবুর বাড়ীতে গতায়ত করিয়া বাড়ীর সকলের সঙ্গে পরিচিত হইয়া পড়িয়াছি।

একদিন মহেন্দ্র বাবু কহিলেন—“নলিনী বাবু! প্রীতিকে অনুগ্রহ করিয়া রোজ বৈকালে একটু একটু পড়াইবেন ?”

প্রীতিকে পড়াইতে আমার কোন আপত্তির কারণ ছিল না। আর থাকিলেও বর্ত্তমান ক্ষেত্রে ‘আপত্তির’ আধিপত্য স্থাপনের কোন সুযোগ ছিল না; সুতরাং

আমি মহেন্দ্র বাবুর প্রস্তাবে সম্মত হইলাম এবং তাঁহাকে জানাইয়া দিলাম যে আমি তাঁহার প্রস্তাবানুযায়ী কার্য্য করিতে প্রস্তুত আছি।’

তাহার পর দিন হইতে আমি আমার নবীনা ছাত্রীর শিক্ষার ভার গ্রহণ করিলাম এবং সুরেনের মুখে শুনিলাম যে, তাহার পিতা মাসান্তে ২৫৲ টী টাকা আমাকে পারিশ্রমিক স্বরূপে দিবেন, এরূপ আশা আছে।

কিন্তু আমার ছাত্রীটী আমার সঙ্গে ঠিক শিক্ষকের মতন ব্যবহার করিত না। সে যেন আমাকে তাহারই সমবয়সী মনে করিত। এবং আমার আদেশের অবাধ্যতাচরণ করিত। শিক্ষকের কাছে ছাত্রীর এই ত্রুটী গুরুতর বটে—কিন্তু আমি তথাপি ছাত্রীকে কোন দণ্ড দিতে পারিলাম না! প্রীতি কোন দিন কি খেয়ালের বশে চলিত, তার কোন ঠিকানা ছিল না। একদিন হঠাৎ আমাকে প্রশ্ন করিয়া বসিল “মাষ্টার মহাশয়! এ পৃথিবীতে সর্ব্বপ্রধান সুখ কাহাকে বলা যায় ?”

আমি দেখিলাম—প্রশ্নটী গুরুতর বটে! সুতরাং প্রীতিকে কহিলাম—“কাল বলিব।”

বাঙ্গালাতে পঁহুছিয়া শয্যা আশ্রয় করিয়া ভাবিতে লাগিলাম। ভাবিতে ভাবিতে একখানা কাগজ লইয়া তাহাতে লিখিলাম :—

প্রীতি !

সুখ অনেক রকম আছে। কেহ ধর্ম্মাচরণ করিয়া আনন্দ লাভ করে, সেই আনন্দকেই তাহার জীবনের প্রধান সুখ বলিয়া বিবেচনা করে। আবার কেহ অধর্ম্মাচরণ করিয়া, যে আনন্দ লাভ করে,—সেই আনন্দকেই সুখ আখ্যা প্রদান করে আবার কেহ ইচ্ছানুরূপ কিছু প্রাপ্ত হইলে খুব সুখী হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ দেখ, আমি তোমাকে * * * কত সুখী হই।”

পত্রখানা লিখিয়া ভাবিলাম—“প্রীতিকে চিঠীখানা দিব ? যদি সে রাগ করে—তাহা হইলে ত’ আমার সমস্ত সুখের স্বপন ভাঙ্গিয়া যাইবে। আর যদি না দিই, তা হ’লে কতদিন এই দগ্ধযাতনা বুকে লইয়া থাকিব ? কিন্তু একথা প্রকাশ করিয়া ফল কি ? প্রীতি তার বাপের সম্পূর্ণ অধীন। মহেন্দ্র বাবু যার সঙ্গে প্রীতির বিবাহ দিবেন, তার সঙ্গেই প্রীতির বিবাহ হবে।”

এই রকম নানারূপ চিন্তা করিয়া অবশেষে চিঠীখানা প্রীতিকে দেওয়াই স্থির সাব্যস্ত হইল চিঠীখানা নিজে যাইয়া প্রীতিকে দিয়া আসিলাম।

(৭)

তাহার পরদিন রবিবার। তখন প্রাতঃকাল, হাতে কোন কাজ ছিল না। ইজি-চেয়ারখানায় অর্দ্ধ শয়নাবস্থায় রবীন্দ্র বাবুর "কনিকা" পাঠ করিতেছি আর মধ্যে মধ্যে তরুণ-তপনের পীত কিরণোদ্ভাষিত ছায়ালোকে বিচিত্র শ্যাম ক্ষেত্র প্রসারিত প্রাতঃ-প্রকৃতির দিকে অলস-দৃষ্টিপাতে চাহিয়া দেখিতেছি। এমন সময়ে মহেন্দ্র বাবুর পরিচারক আসিয়া আমার হাতে একখানা চিঠী দিয়া গেল। পত্রের উপরিভাগস্থ লেখা মহেন্দ্র বাবুর। ভাবিলাম কোন বিশেষ কার্য্য-নিবন্ধন হয়'ত আমাকে ডাকিয়া পাঠাইয়াছেন। কিন্তু যখন সমস্ত পত্রখানি পাঠ করিলাম, তখন আমার অন্তঃকরণে ভীষণ আত্ম-গ্লানি আসিয়া উপস্থিত হইল—বুঝিলাম, আমার সোণার ছবি আমি স্বহস্তেই ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছি। পত্রখানি এইরূপ ঃ—"নলিনী বাবু!"

আপনাকে সুচরিত্র ও ভালমানুষ বলিয়া জানিতাম,—আজ সে বিশ্বাস গেল। প্রীতিকে আপনি কাল কি চিঠী দিয়াছিলেন? সেটা কি ভদ্রোচিত কাজ হইয়াছিল? ছিঃ—"

সেই দিনই কাজে জবাব দিয়া দেশে ফিরিলাম!

"চন্দ্রশেখরে বঙ্কিমচন্দ্র।"

(গত বৈশাখ মাসের সাহিত্য-সংহিতায় প্রকাশিত।
শ্রীযুক্ত নৃত্যগোপাল কবিরত্নের প্রবন্ধের)।

প্রতিবাদ। *

লেখক—শ্রীগোবিন্দচন্দ্র রাহা বি, এ,

অরসিকের হস্তে রমণী নিগ্রহ আর অকবির হস্তে কবি-নিগ্রহ এক জাতীয় বিড়ম্বনা। কবিরত্ন মহাশয় কেবল অকবি হইলে বিশেষ ক্ষোভ ছিল না; ...হার পাণ্ডিত্য ভয়াবহ—তাঁহার দুইটী সমালোচনা ("বিষবৃক্ষে বঙ্কিমচন্দ্র" ...ন্দ্রশেখরে বঙ্কিমচন্দ্র") পাঠ করিয়া আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি ...তিনি নভেল পাঠে সম্পূর্ণ অনধিকারী। তাঁহার তৃতীয় এবং সর্ব্বাপেক্ষা ...তর দোষ অসত্য কথার আরোপ। এই দোষটী দেখিয়া মনে হয় তিনি কোন ... অভিসন্ধি বশতঃ লেখনী ধারণ করিয়াছেন, টার্টার দিগের মধ্যে একটী ...কার আছে, যে কোন গুণী ব্যক্তিকে কেহ হত্যা করিলে, নিহত ব্যক্তির গুণ ...শি হত্যাকারীতে সংক্রান্ত হয়। হিন্দুর মধ্যেও কি এই সংস্কার লব্ধ প্রবেশ ...ইল?

প্রবন্ধকার শত মুখে 'চন্দ্রশেখরে'র প্রশংসা করিয়া পরে বলিতেছেন, ...ন্দ্রশেখরে চরিত্র গত অসারত্ব বড়ই মর্ম্ম পীড়া দায়ক।" এই কথা বলিবার ...কিঞ্চিৎ পূর্ব্বেই বলিয়াছেন "এমন (যেরূপ চন্দ্রশেখরে) শব্দ বিন্যাস, এমন ...রিত্র সমাবেশ এমন অলঙ্কার মাধুর্য্য, এমন রস ভাবোজ্জ্বলতা বাঙ্গালাগ্রন্থে ...তীব বিরল।" পাঠক ভূমিকাতেই প্রবন্ধকারের উক্তি—সামঞ্জস্য দেখুন।

অতঃপর প্রবন্ধকার মহাসমারোহ ও আড়ম্বরের সহিত চন্দ্রশেখরের প্রধান ...টী চরিত্রের সমালোচনা করিয়াছেন। প্রথম চরিত্র শৈবলিনী সম্বন্ধে তাঁহার ...ক্ত্য—"শৈবলিনী সর্ব্ব দোষাস্পদ, ব্রাহ্মণের ঘরে কেন কোন ঘরেই এইরূপ ...চরিত্রার অস্তিত্ব বাঞ্ছনীয় নহে। * * * শৈবলিনী বাল্যকাল হইতে প্রতাপে ...নুরক্তা, বিবাহ হইল, অশেষ শাস্ত্রবিশারদ চন্দ্রশেখরকে পতি পাইল, কিন্তু প্রতি-...তনীয়মান পতাকার ন্যায় প্রতাপাতি মুখেই ধাবিত হইল। সে গৃহকার্য্য করে, ...তিসেবাও করে, সঙ্গিনীদের সহিত রঙ্গরস ও করে, কিন্তু মন সেই প্রতাপের ...দিকে, এই জন্যই Foster এর সহিত বিনা বাধায় প্রস্থান। শৈবলিনী বুঝিল, আমি ...জ্ঞাতি কন্যা, সুতরাং প্রতাপকে পাইব না, তাই চন্দ্রশেখরের সহিত বিবাহ। ...রে দেখিল, আরও মন্দ হইল, গুরুপত্নী অতএব প্রতাপকে পাইব না; ...তাই পলায়ন, যদি এইবার প্রতাপকে পাই! কবি না বলিলেও সকলে বুঝিতে ...পারিয়াছিল, শৈবলিনী বারাঙ্গনা নহে, Foster এর উপভোগ্যা হইবার জন্য ...তাহার সহিত যায় নাই। স্পর্শ করা দূরে থাকুক, সম্মুখে দাঁড়াইবার সাধ্যও Foster এর ছিল না। আত্ম সমর্থনের জন্য Foster কে ভয় প্রদর্শন জন্য ছুরী লুকাইয়া রাখিয়াছিল, ছুরীর কোন প্রয়োজন ছিল না। সেই তেজস্বিনী ...মূর্ত্তি দেখিয়া Foster এর মনে ভয় আসিত, অন্যভাব আসিতে পাইত না; ...নই নাহসে ভা করিয়াই সুন্দরীর কথা সুন্দরীর সহপাঠা, সুন্দরী বলিত অবাধ

---

* কবিরাজ শ্রীযুক্তনৃত্যগোপাল কবিরত্ন মহাশয় সংস্কৃত ও বঙ্গ-সাহিত্যে সুপরিচিত সুলেখক, তৎবিরচিত "চন্দ্রশেখরে বঙ্কিমচন্দ্র" ও "বিষবৃক্ষে বঙ্কিমচন্দ্র" শীর্ষক প্রবন্ধদ্বয় পাঠ করিবার অবসর আমাদের দুর্ভাগ্য বশতঃ ঘটিয়া উঠে নাই। কবিরত্ন মহাশয়ের মতের পোষকতায় কোনও মহোদয় বর্ত্তমান প্রতিবাদের যুক্তিপূর্ণ প্রতিবাদ প্রেরণ করিলে তাহা সাদরে গৃহিত ও জন্মভূমিতে প্রকাশিত হইবে। জং সং

নির্গমনোপায় অনায়াসে প্রত্যাখ্যান করিল, তাহার জীবনের প্রধান লক্ষ্য—একমাত্র উদ্দেশ্য প্রতাপ প্রতাপকে পাইবার জন্য সে সব করিতে পারে। সে কামুকী কামুকীর হিতাহিত জ্ঞান নাই, সে অম্লান বদনে অক্ষুব্ধচিত্তে অসঙ্কুচিত ভাবে—ব্রাহ্মণ কন্যা হইয়া—কুলের কুলবধু মীর্ কাশিমের সম্মুখে উপস্থিত হইল। আবার পাগলিনী সাজিয়া নির্ভীক কামুকী শৈবলিনী "ইণ্ডিল মিণ্ডলের" বজরায় উঠিল। সেখান হইতে নিগড়বদ্ধ প্রতাপকে উদ্ধার করিল। তাহার পর যখন অশনিপাত সম প্রতাপের তীব্র প্রত্যাখ্যান বাক্য শ্রবণ করিল, তখন হইতে সেই জীবনের একমাত্র লক্ষ্য প্রতাপকে হৃদয় কন্দর হইতে দূরে নিক্ষেপ করিল। এই সুদীর্ঘ কাল ধরিয়া, যে দেবতাকে হৃদয়াসনে বসাইয়া মানসোপচারে পূজা করিতেছিল, সেইদিন হইতে সেই প্রতাপকে—সেই দেব প্রতিমাকে বিসর্জ্জন দিল।

শৈবলিনীর বিরুদ্ধে প্রথম অভিযোগ সে "দুশ্চরিত্রা" কারণ "বিবাহ হইল, "অশেষ শাস্ত্রবিশারদ চন্দ্রশেখরকে পতি পাইল," তত্রাপি সে তাহার বাল্য-প্রণয়পাত্র প্রতাপকে ভুলিতে পারিল না। বিবাহ বন্ধনে কোন যাদু আছে বলিয়া আমরা জানি না। শৈবলিনী বাল্যকাল হইতেই প্রতাপে বদ্ধভাবা। সমাজ বলপূর্ব্বক তাহাকে প্রতাপ হইতে বিচ্ছিন্ন করিল বিবাহ রজ্জুদ্বারা চন্দ্রশেখরে বাঁধিল—শশ্মানশূর্লে যূপসৎক্রিয়া সম্পাদিত হইল! এমন মিলন জগতে দুর্ল্লভ! বরের বয়স ৩২ বৎসর, কনের বয়স ৮ বৎসর, বর হরকোপানলে অর্দ্ধদগ্ধ মদন (সুন্দরীর উক্তি "বিধাতা তাঁহাকে রাংতা দিয়া সং সাজান নাই" দ্রষ্টব্য,) ক'নে বিকাশোন্মুখ পারিজাত; বর, চলিষ্ণু লাইব্রেরী, ক'নে নিরক্ষরা; কিছুদিন পরে আবার দেখিতে পাই, বর বাচংযম ঋষি, ক'নে রসরঙ্গিনী বর, নির্ব্বাত নিষ্কম্পহ্রদ, ক'নে তরঙ্গময়ী সরিৎ, প্রমা মায়ার প্রেমে আত্মহারা ক'নে যুবতী সুলভ আলিঙ্গন লিপ্সা সমুৎসুকা। ইহার উপর শৈবলিনীর প্রাণ তাহার নিজের নহে, বাল্যেই তাহা প্রতাপ কর্ত্তৃক অপহৃত হইয়াছে। সেই চিত্তচোর দেবমূর্ত্তি প্রতাপ আবার মাঝে মাঝে চন্দ্রশেখরের গৃহে আসিয়া শৈবলিনীকে দেখা দিয়া তাহার প্রেমোন্মাদ দ্বিগুণ করিয়া তোলে। এত অনুকুল অবস্থাতেও শৈবলিনীর প্রেমলতা গজাইল দেখিয়া কবিরত্ন মহাশয় বিস্মিত, স্তম্ভিত, ক্ষুব্ধ। হইবারই কথা!

চন্দ্রশেখর "অশেষ শাস্ত্র বিশারদ"। প্রবন্ধকারের মতে শৈবলিনী তাঁহাকে ভাল বাসিতে বাধ্য। আমরা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করি বৃহস্পতি পত্নী তারা কেন সোমদেবের নিকট প্রাণ, মন, জীবন যৌবন বিকাইয়াছিলেন?

বিবাহ দুইটী প্রাণীকে বন্ধন করে সত্য। কিন্তু কয়স্থলে দুইটী প্রাণ বন্ধন

করে? এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে, তবে কিসে প্রণয় হয়? এ প্রশ্ন অতীব কঠিন। রত্নাবলীকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিবেন "রূপই প্রেমের নিদান। আমি উদয়নের অনিন্দ্যরূপে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাতে আত্মসমর্পণ করিয়াছিলাম।" (Venice) কুসুম ডেস্‌ডিমোনা Disdemona) তাঁহার প্রতিবাদ করিয়া বলিলেন "ও কথা সত্য নহে; গুণই প্রণয়ের কারণ। আমি ভিনিসের শত শত অনলমূর্ত্তি যুবককে উপেক্ষা করিয়া মুর 'ওথেলোকে (Othello) বরমাল্য দান করিয়াছিলাম, কে বলিবে আমার অনুরাগ হীনপদবীগত বা নিষ্প্রভ? আবার স্যাফো (Sapho) বলিবেন তোমরা উভয়েই ভ্রান্তা! রূপে বা গুণে প্রণয় হয় একথা কবির কল্পনা। রূপে বা গুণে বা উভয়ের সমবায়ে প্রণয় হইলে, আমার দশা ও রূপ হইত না। তোমরা জান আমার মত রূপসী বা গুণবতী—কেহই ছিল না, তত্রাপি আমাকে ফেয়ণের (Pheon) প্রেমে বঞ্চিত হইয়া সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়া প্রেমজ্বালা নির্ব্বাণ করিতে হইয়াছিল। পরীর বাণী বলিবেন তোমরা কাপিল-কণাদের সহধর্ম্মিনীর ন্যায় প্রেমের কারণ নির্দ্দেশ করিতেছ। তোমাদিগের কথা শুনিয়া হাসি সম্বরণ করিতে পারিলাম না। আমার নিজের একটী ঘটনা বলিতেছি শুন। আমি একদিন পতনশীল নক্ষত্র আরোহণ পূর্ব্বক ভূতলে আসিয়া কোন কুঞ্জে শয়ন করিয়াছিলাম। একটী গর্দ্দভাকৃতি পুরুষের বিকট গান শুনিয়া আমার নিদ্রাভঙ্গ হইল। জাগিবা মাত্র আমার প্রেম-পারাবার উচ্ছলিত হইল। আমি সেই গর্দ্দভের মুখে শত শত চুম্বন বৃষ্টি করিলাম।

এই স্থলে বক্তব্য হিন্দু বিবাহ পদ্ধতির নিন্দা করা আমাদিগের উদ্দেশ্য নহে। আমাদিগের বিশ্বাস জগতের অন্য যাবতীয় বিবাহ প্রণালী অপেক্ষা হিন্দু বিবাহ প্রণালী উৎকৃষ্ট।

(ক্রমশঃ)

প্রার্থনা।

লেখক—শ্রীনারায়ণচন্দ্র বিদ্যারত্ন।

এমনসুন্দর ধরা ফুলফলে সাজিয়া!
তা দেখে হৃদয় মোর কেন উঠে জ্বলিয়া?
এ ধরণী এর শোভা অনিমিক দেখিয়া,
স্থির ত হৃদয় নয় শান্তিসুধা পড়িয়া!
জননী ভগিনীভ্রাতা আত্মজনে দেখিলে,
প্রসার হৃদয় মোর কেন নাহি উথলে?
কেন সদা মন প্রাণ হুহু ক'রে পুড়িয়া,
প্রাণপাখী যেতে চায় নিত্য কেন উড়িয়া!
তাই বলি জগদীশ, কৃপাদৃষ্টি করিয়া,
শান্তিসুধা হৃদে মোর দেও দেও ঢালিয়া।
অহঙ্কার বড় মনে তার ফল ফলিল,
ক্ষম নাথ পদতলে অভাগিনী পড়িল।
কহিব মনের কথা পদযুগ ধরিয়া,
এ পোড়া চক্ষের জলে অবিরত ভাসিয়া।
তুমি নাথ বলবল অশ্রু দিয়া মুছিয়া,
বল বল ভালবাসা দিবে মোরে শিখায়ে,
শুষ্ক হৃদি মন ল'য়ে কত কাল রহিব।
এ যন্ত্রণা তাহে আর কতকাল সহিব।
হৃদয়ের বড় জ্বালা দেখ প্রভু আসিয়া,
রাখ রাখ অভাগারে প্রেম সুধা ঢালিয়া।

———

আঁধার।

লেখিকা—শ্রীমতীচারুভাষিণী গুপ্তা।

আঁধার বিজন পথে একেলা যেতেছি চলে।
কে আছে পিছন হ'তে ফিরাইবে আয় বলে॥
মনে পড়ে একবার ক্ষণপ্রভা চমকিয়া।
মোর এ আঁধার রাশি দেহে আরো বাড়াইয়া॥
আশার বাতিটী আমি চেয়েছিনু জ্বালিবার।
প্রবল পবনে তাহা হলোনা হলোনা আর॥
"যাইওনা ফির"-বলে কেহ ডাকিবে না মোরে।
দুইটী স্নেহের কথা কহিবে না স্নেহস্বরে॥
আর কেহ নাহি মোর—ফিরায়ে নিকটে নিয়া।
স্নেহমাখা করে দিবে অশ্রুবারি মুছাইয়া॥
শতেক অনল তাপে পুড়িয়া গিয়াছে হিয়া।
জুড়াবে কে বল মোরে স্নেহামৃত বরষিয়া॥
বিহর আর কিবা ফল যেতেছি যাইব চলে।
ফিরাবার কেহ নাই ডাকিবে যে "আয়" বলে॥

———

কীর্ত্তিমান ও সাধুর কথোপকথন।

—:*:—

কীর্ত্তিমান।—কত কর্ম্ম করিয়াছি, দেখ দেখি ভাই।
সাধু।—আমি কি করেছি কর্ম্ম, দেখিতে না পাই॥
কী।—মন্দ কর্ম্ম করেছ যা, তাতো মনে আছে।
সা।—সদা ভাবি আমি তাহা ভুলে যাই পাছে॥
কী।—কৃত কর্ম্ম স্মরণ তবে তো ভাল বটে।
সা।—মন্দ কর্ম্ম স্মরি যেন আর নাহি ঘটে॥
কী।—পুণ্য কার্য্য ভাবিলে সে পুণ্যের উদয়।
সা।—না করিয়া পুণ্য কীর্ত্তি স্মরিলে কি হয়॥
কী।—সুবিস্তার অন্তর পবিত্র তবু গণি।
সা।—কর্ম্ম বিনা মন শুদ্ধ হয় না অমনি॥
কী।—যাতে যার মন থাকে সেই তাহা পারে।
সা।—আমি মাত্র চাহি সিদ্ধিদাতা বিধাতারে॥

কী।—বিধাতা না দিলে শক্তি কার কিবা হয়।
সা।—আমি করি তাঁর কর্ম্ম আমার তো নয়॥
কী।—সুকীর্ত্তি যে করে, সে মরে না কভু আর।
সা।—সে থাকে না ; থাকে ধর্ম্ম ; এই জানি সার॥
কী।—স্থায়ী ধর্ম্ম কর্ম্ম যেই কীর্ত্তি বলি তাকে।
সা।—কীর্ত্তি অংশ লয়পায় ; ধর্ম্ম অংশ থাকে॥
কী।—বড় বড় কীর্ত্তি গেলে আর থাকে কিবা ?
সা।—কুটীরে কুটীরে ধর্ম্ম জাগে রাত্রি দিবা॥
কী।—ধর্ম্মের কি ক্ষয় গ্লানি নাহি হয় আর।
সা।—পুনশ্চ উদয়ে তার দ্বিগুণ বিস্তার।
কী।—তবে কি হে যশ কীর্ত্তি একান্ত অগণ্য।
সা।—অধম অক্ষম হৈতে কীর্ত্তিমান্ ধন্য॥
কী।—বড়ত্ব কিসেতে তবে ?—কহিলে বিস্তর।
সা।—আমি কিছু নয়, বল। বড় সে ঈশ্বর॥

গীত।

ঝিঁঝিট—আড়াঠেকা।

তরঙ্গে নাচিয়ে কোথা, চলেছ ভানু নন্দিনী।
বৃকভানু সুতা কাঁদে, তব তটে তরঙ্গিনী॥
তুমি আমি এইখানে, খেলিতাম কানুসনে,
যমুনা লো আজি কেনে,
ছুটিতেছ একাকিনী॥
সেদিন গিয়েছ ভুলে, নাচিছ তরঙ্গ তুলে,
আমি পড়িয়ে অকূলে, ভাসি স্বজনী ঃ—
যমের ভগিনী তুমি, কৃষ্ণ বিরহিনী আমি,
হব তব অনুগামি,
আমারে কর সঙ্গিনী॥

REGISTERED No. C. 284.

… বর্ষ।] ১৩১২ সাল। কার্ত্তিক, [৪র্থ সংখ্যা।

হিন্দুধর্ম্ম ও সমাজের মুখপত্র

জন্মভূমি

(সচিত্র মাসিক-পত্রিকা ও সমালোচনী)।

বিষয়	পৃষ্ঠা	লেখক
১। পরমকল্যাণ গীতা	১১৭	শ্রীমদ্ শিবনারায়ণ স্বামী।
২। ভৈরবী (গল্প)	১২১	... ...
৩। গীত	১৪০	শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।
৪। ধূলাখেলা	১৪২	শ্রীযুক্ত কুমুদরঞ্জন মল্লিক।
৫। আয়ুর্ব্বেদ সমালোচনা	১৪৩	শ্রীযুক্ত তারানাথ চক্রবর্ত্তী।
৬। ধন	১৪৭	শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র বিদ্যারত্ন।
৭। মৃত্যুর-প্রতি	১৪৮	শ্রীমতী চারুহাসিনী গুপ্তা।
৮। বর্ত্তমান কনোজ ও বালাপীর	১৫০	শ্রীযুক্ত ধর্ম্মানন্দ মহাভারতী।
৯। ব্রজাঙ্গনা	১৫৪	শ্রীমতী জ্যোৎস্নাময়ী ঘোষ।
১০। চন্দ্রশেখরে বঙ্কিমচন্দ্র	১৫৫	শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্দ্র রাহা, বি, এ।

লেখকগণের মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন।

জন্মভূমি-কার্য্যালয়।

শ্রীনরেন্দ্রনাথ দত্ত দ্বারা প্রকাশিত।
৩৯ নং মাণিক বসুর ঘাট ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

বার্ষিক মূল্য ডাঃ মাঃ সমেত ১৷৷০ দেড় টাকা। — প্রতি সংখ্যার নগদ মূল্য ৵১০ পয়সা।

সন্দর্ভ-সংগ্রহ।—১ম ভাগ, ডাক্তার শ্রীহেমচন্দ্র সেন, এম-ডি, প্রণীত
স্বরোদয়, ব্যায়াম, যোগশাস্ত্র প্রভৃতি সম্বন্ধীয় পুস্তিকা। মূল্য—৵০ আনা।
শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় ২০১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট কলিকাতা।

শ্রীল শ্রীমন্মহারজাধিরাজ কাশ্মীরাধিপতি তথা শ্রীল শ্রীযুক্ত মহারাজা বিরাজ
বর্দ্ধমান-প্রদেশাধিপতি বাহাদুরের অনুমোদিত ও অনুজ্ঞাত সুপ্রসিদ্ধ

কবিরাজ শ্রীযুক্ত বিনোদলাল সেন মহাশয়ের

আদি-আয়ুর্ব্বেদ ঔষধালয়।

১১৬ নং লোয়ার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।

কুন্তলবৃষ্য তৈল জগ
অমূল্য ও অতুলনীয়—
স্নিগ্ধকর ও স্মৃতিশক্তি বর্দ্ধক
কেশকলাপের কান্তিপ্র
খালিত্য ও পালিত্য
অদ্বিতীয়। কেশের কমনীয়
কান্তি বৃদ্ধি করিতে, চির
নিত্যপ্রফুল্লতা অটুট রাখিতে
কুন্তলবৃষ্যের তুলনা নাই
ইহা অনুপম্ আদি ও অকৃত্রিম
স্নিগ্ধগুণে কুন্তলবৃষ্যের সমতু
কোন তৈলই এ পর্য্যন্ত
আবিষ্কৃত হয় নাই।

বর্দ্ধমান ভারতের প্রধা
ধর্ম্মসংস্কারক, শান্তি-সুখ-সন্তুষ্ট
বিলাসভোগ বিমুক্ত আধ্যাত্মিক উৎকর্ষের সমুচ্চ সোপানে সমাসীন—পূজ্যপাদ শ্রীমহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর বলিয়াছেন—যে কুন্তলবৃষ্য তৈল এতদিন আমাকে রক্ষা করিল, আজ তাহাকে পরিত্যাগ করিতে পারি না।"

কুন্তলবৃষ্য—সাহিত্যসেবিগণের মহোপকারক, কারণ ইহাতে মেধা ও স্মৃতি বৃদ্ধি হয়, চিন্তাশীলতা ও ভাবুকতা নবীভূত ও স্ফুরিত হয়।

এক শিশির মূল্য ১৲ টাকা প্যাকিং ও ডাকমাশুলাদি পাঁচ আনা।

উপহার—কুন্তলবৃষ্যের প্রত্যেক গ্রাহক তৈলের সঙ্গে একখানি করিয়া সুন্দর চিত্র উপহার পাইবেন।

সতর্কীকরণ।—দুষ্ট লোকেরা বড়ই জাল করিতেছে; গ্রাহকগণ সাবধান; আমাদের ঔষধালয় ভিন্ন কোথাও "কুন্তলবৃষ্য" কিনিবেন না, কিনিলে প্রতারিত হইবেন।

কবিরাজ শ্রীআশুতোষ সেন চিকিৎসক।

"জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী"

(সচিত্র মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী।)

১৪শ বর্ষ। | কার্ত্তিক, ১৩১২ সাল। | ৪র্থ সংখ্যা।

পরমকল্যাণ গীতা।

লেখক—শ্রীমদ্ শিবনারায়ণ স্বামী।

গুরুত্যাগ।

অনেকের সংস্কার আছে যে যদি কেহ জ্ঞান প্রাপ্তির জন্য কোনও ব্যক্তি বিশেষকে গুরু বলিয়া গ্রহণ করেন, তাহা হইলে তাঁহাকে ছাড়িয়া অপর কাহাকেও গুরুরূপে গ্রহণ করিতে পারিবে না, যদি কেহ করে তাহা হইলে তাহাকে গুরুত্যাগী বলিয়া ঘৃণা করে। কিন্তু লোকের বুঝা উচিত যে যখন পরমাত্মাই একমাত্র গুরু, এবং তাঁহা ব্যতীত আর কেহ নাই, তখন কি প্রকারে গুরুত্যাগ করা সম্ভবে?

যিনি পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতি স্বরূপকে গুরুরূপে গ্রহণ করিয়াছেন, তিনি যে যাহার নিকট উপদেশ লউন না কেন, তাহাতেই পরমাত্মা গুরুই আবির্ভাব অঙ্গীকার করেন। তাঁহার পক্ষে কোনও কালে কোন প্রকারে গুরুত্যাগ সম্ভবে না। আর যাহারা কেবল মাত্র ব্যক্তির উপরে গুরুভাব স্থাপনা করেন, তাহাদিগের পক্ষে গুরুত্যাগ সম্ভবে। শাস্ত্রে নিয়ম আছে যে বহু বহু গুরু গ্রহণ করিতে পারা যায়। যথা—

মধুলব্ধা যথা ভৃঙ্গি পুষ্পাৎ পুষ্পান্তরং ব্রজেৎ।
জ্ঞানং লব্ধাতথা শিষ্যা গুর্ব্বাৎ গুর্ব্বান্তরং ব্রজেৎ॥

যেমন মধু মক্ষিকা মধু পাইবার জন্য এক পুষ্প হইতে অন্য পুষ্পে গমন করে, তেমনি জ্ঞান লাভ করিবার জন্য শিষ্য এক গুরু হইতে অন্য গুরুর নিকটে গমন করে। এই গুরুভাব একমাত্র পরমাত্মাতেই অটলভাবে থাকে। বাহ্যিক ভাবে দৃষ্টি করিলে যেখানে জ্ঞান সেইখানেই গুরু। অতএব এই উপদেশ প্রদান কার্য্যে কোনও ব্যক্তি বা সম্প্রদায়কের একাধিপত্য নহে। কি স্ত্রী কি পুরুষ, যিনি সাধন বা বিনি ওঁকার মন্ত্র জপ প্রণালী অবগত আছেন, বা হইবেন তিনি আপন পুত্র কন্যা মাতা পিতা, ভ্রাতা, ভগিনী, স্বামী, স্ত্রী, প্রতিবাসীদিগকে নির্ভয়ে উত্তমরূপে শিক্ষা প্রদান করিবেন। ইহাতে কোন নিষেধ নাই। কারণ মনুষ্য মাত্রেই জ্ঞান প্রাপ্তির ও জ্ঞানদানের অধিকারী। ইহাতে কোনও প্রকার ব্যক্তিগত ভাব নাই। যেমন যদি কাহারও পুত্রের পিপাসা হয় এবং পিতা জলের অনুসন্ধান জানিয়া পুত্রকে বলিয়া দেয়, তাহা হইলে পুত্র পিতার নির্দ্দেশ অনুসারে জলপান করিয়া তৃপ্তি লাভ করিবে।

গায়ত্রীর অর্থ।

ওঁভূঃ, ওঁভুবঃ ওঁস্বঃ ওঁমহঃ ওঁজনঃ ওঁতপঃ ওঁসত্যং ওঁতৎ—
সবিতুর্বরেণ্যম ভর্গো দেবস্য ধীমহি ধিয়োয়োনঃ প্রচোদয়াৎ॥

ওঁ আপোজ্যোতিরসোমৃতং ব্রহ্ম। ইহাই ব্যাহৃতির সহিত পূর্ণ গায়ত্রী। ওঁভূঃ হইতে ওঁ সত্যং পর্য্যন্ত ওঁকারকে সাতবার বলিবার কারণ, একই পূর্ণ পরব্রহ্ম ওঁকার রূপে সাতভাবে প্রকাশ হইয়া জগৎ রূপে বিস্তার হইয়াছেন। যেমন জল মেঘরূপ হইলে, জলেরই নাম মেঘ বলা যায়, কিন্তু স্বরূপতঃ জলই থাকে, উহাতে কোনও উপাধি নাই। সেই প্রকার পরমাত্মা নিরাকার হইতে সাকার হওয়ায় উহাঁর নাম ওঁকার কল্পনা করা হইয়াছে। কিন্তু স্বরূপতঃ

পরমাত্মা—উপাধি বিহীন যাহা তাহাই আছেন। ওঁকারের এই সাত ভাবকে সাত ঋষি, সাত ভূমিকা সাত দেবি মাতা ও সাত বিভক্তি বলে। এবং প্রত্যক্ষ, পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ, চন্দ্রমা, সূর্য্য নারায়ণ জ্যোতি রূপে সাত ভাবে বোধ হইতেছেন। এই সাত হইতে চরাচরের স্থূল সূক্ষ্ম শরীর গঠন হইয়াছে। যথা চক্ষে সূর্য্যনারায়ণ জ্যোতি, কর্ণে আকাশ রূপ, নাসিকা দ্বারে প্রাণ বায়ুরূপ, বাক্য দ্বারে চন্দ্রমা রূপ, নাভিতে অগ্নিরূপ, সর্ব্ব শরীরে রক্ত জল রূপ, এবং হাড় মাংস পৃথিবী রূপে এই পাঁচ তত্ত্বকে পঞ্চভূত নাম কল্পনা করা হইয়াছে। এবং ইহার ভিতর তিন লোক চৌদ্দভুবন বলে, কিন্তু পরব্রহ্মে তিনটী লোকমাত্র এবং চৌদ্দটী মাত্র ভুবন আছে তাহা নহে, পরমাত্মাতে কোটী কোটী ভূমিকা ও লোক আছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। এই সকল কল্পিত সীমা কেবল মাত্র সাধারণ জিজ্ঞাসু লোকদিগকে এক প্রকার বুঝাইবার নিমিত্ত। নচেৎ পরমাত্মার কোনও বিষয়ই সীমাবদ্ধ নহে। যিনি অনাদি অনন্ত, অগম্য, অপার, অসীম, কে কোন কালে তাঁহার কোন বিষয় সীমা করিতে পারিয়াছেন। কিম্বা বাক্যাদির দ্বারায় কে তাঁহার মহিমা বর্ণন করিতে সক্ষম হইয়াছে।

চব্বিশ অক্ষর গায়ত্রীর ভাবার্থ এই যে পাচ তত্ত্ব, পাঁচ কর্ম্মেন্দ্রিয়, পাঁচ জ্ঞানেন্দ্রিয়, ছয় রিপু, ও তিন গুণ। এই সকলের সমষ্টি চব্বিশ অক্ষর গায়ত্রী, এবং জীবাত্মা লইয়া পঁচিশ প্রকৃতি বিরাট ব্রহ্মের শরীর ও চরাচর স্ত্রী পুরুষের সূক্ষ্ম ও স্থূল শরীর, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ, বা সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ, এই তিন গুণে জগৎ রূপ হইয়াছে। এ কারণ গায়ত্রীতে স্ত্রী শব্দ ব্যবহার হইয়াছে ইহাকে তিন ভুবন বলে। ভূঃ শব্দে পৃথিবী লোক, ভুবঃ শব্দে অন্তরীক্ষ লোক, স্বঃ শব্দে স্বর্গলোক। ভূঃ নাভিতে অগ্নিরূপে, ভুবঃ হৃদয়ে চন্দ্রমারূপে, এবং স্বঃ মস্তকে সূর্য্যনারায়ন আত্মারূপে বিদ্যমান রহিয়াছেন।

ওঁভূঃ অর্থাৎ ওঁকার ব্রহ্মই পৃথিবী রূপ, ভুবঃ জলরূপ, স্বঃ অগ্নিরূপ, মহঃ বায়ুরূপ, জনঃ আকাশ রূপ, তপঃ চন্দ্রমা জ্যোতিরূপ, সত্যং সূর্য্যনারায়ণ জ্যোতি রূপে প্রকাশমান রহিয়াছেন।

তৎঅর্থে ত্রিগুণাতীত শুদ্ধ পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতি স্বরূপ। বরেণ্যম্ অর্থে শ্রেষ্ঠ পূজার যোগ্য, ভর্গদেব অর্থে বিরাট ব্রহ্ম সূর্য্যনারায়ণ। ধী অর্থে বুদ্ধি, ব্রহ্ম, মহী অর্থে পৃথিবী. ধিয়ো অর্থে জ্ঞান, যোন অর্থে চরাচরের ইন্দ্রিয় ও জগৎরূপ বিস্তার ভাব। প্রচোদয়াৎ অর্থে প্রেরণ করা। অপোঃ অর্থে জল, জ্যোতি অর্থে চন্দ্রমা

সূর্য্যনারায়ণ রস অর্থে রসনা, ভক্তি প্রেমাদিও জল, অমৃত অর্থে পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতি স্বরূপ পরম জ্ঞানময়।

একমাত্র পূর্ণ পরব্রহ্ম জগৎরূপ-বিস্তার হওয়ায় ইহাতে নানা নামরূপ গুণ প্রকাশ হইয়াছে। এই ব্রহ্ম গায়ত্রী চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ জ্যোতিস্বরূপ বিরাট ব্রহ্মে স্তব এবং শান্তির জন্য তাঁহার নিকট প্রার্থনা আদি জানিবেক। সন্ধ্যা বন্দনার মূল ব্রহ্ম গায়ত্রী, ব্রহ্ম গায়ত্রীর মূল এক অক্ষর প্রণব ওঁকার মন্ত্র এবং ওঁকারের মূল জ্যোতি স্বরূপ চন্দ্রমা- সূর্য্যনারায়ণ বিরাট ব্রহ্ম।

গায়ত্রীর নিষ্কাসিত অর্থ।

বয়ং দীনজনাঃ তৎসবিতুঃ সৃষ্টিকর্ত্তুঃ জ্যোতিঃ স্বরূপ ব্রহ্মণেঃ বরেণ্যং শ্রেষ্ঠং।
স্বয়ং সিদ্ধং ভর্গো বর্চ্চসং বেদোক্তং যৎ জ্ঞানমস্তি,
তদেব তেজসং ধীমহি যো দেবো নোঽস্মাকম্,
ধিয়ঃ শুভ কর্ম্মাণি প্রচোদয়াৎ প্রেরণং কুর্য্যাৎ।

সূর্য্যনারায়ণের তর্পণ মন্ত্র—

ওঁ নমঃ বিবস্বতে ব্রহ্মণে ভাস্বতে
বিষ্ণুত তেজসে শুচয়ে সবিত্রে কর্ম্ম
দায়িনে ইদমর্ঘং ওঁ শ্রীসূর্য্যায় নমঃ।

প্রণাম মন্ত্র—

ওঁ জবা কুসুম সাঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং
মহাদ্যুতিং ধ্বান্তারিং সর্ব্বপাপঘ্নং
প্রনতোস্মি দিবাকরঃ।

ভৈরবী।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

কোথা যাও?

একদা বৈশাখ মাস, পরিণত বসন্ত, তিথি পূর্ণিমা, সময় রজনী এক প্রহর। মালদহ জেলার এক নিবিড় অরণ্য মধ্যে একটি সংকীর্ণ পন্থা। সচরাচর বনপথ যেরূপ সংকীর্ণ হয়, ততটা নহে, অপেক্ষাকৃত কিঞ্চিৎ অধিক প্রশস্ত। সেই কৌমুদী-রঞ্জিত রজনীতে সেই সংকীর্ণ বন পথে আটটি অশ্বারোহী;—চমৎকার রূপ লাবণ্য বিজড়িত পরম সুন্দর নবীন অশ্বারোহী। বসন্ত সমীর রাত্রিকালে অধিক মিষ্ট লাগে, অশ্বারোহীরা সেই মিষ্ট সমীর সেবন করিতে করিতে প্রফুল্ল বদনে প্রফুল্ল-চিত্তে ক্রমে ক্রমে অগ্রসর হইতেছেন, অশ্বেরাও মৃদু কদমে চলিতেছে। আরোহিগণের বীর সজ্জা। বর্ম্মাবৃত বপু নহে, কিন্তু বীরভূষণ অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত, কটিবন্ধে কোষাবদ্ধ তরবারি।

আটজনে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া যাইতে পারিতেছেন না, যাইবার সুবিধাও নাই, পথ সংকীর্ণ; সুতরাং একজন অগ্রগামী, ক্রমান্বয়ে পর্য্যায়ক্রমে আর সাতজন অনুগামী। বীরগুলি ধীরগতিতে যাইতেছেন, আকাশে নেত্র তুলিয়া এক একবার পূর্ণশশী দর্শন করিতেছেন, এক একবার বনস্থলীতে দৃষ্টিপাত করিয়া রজতাভ তরুপত্র শোভা সন্দর্শনে পুলকিত হইতেছেন, বসন্ত বিহঙ্গের সুস্বরগীতলহরী শ্রবণবিবরে প্রবাহিত হইয়া অন্তরাত্মাকে প্রমোদিত করিতেছে, এমন সময় অকস্মাৎ এক মহাবিভ্রাট! কোষমুক্ত খরসান খড়্গধারী প্রায় পঞ্চাশজন বিকটাকার দস্যু ভীমরব করিয়া সম্মুখে উপস্থিত! একজন তাহাদের দলপতি। প্রথম অশ্বের মুখের প্রায় দশহস্ত দূরে ঐ দস্যু দল।

দলপতির যেন রাজ বেশ। কিংখাপের জামাজোড়া গায়, সুরঞ্জিত মুক্তামালা গলায়, বড় বড় বিরবউলী কর্ণমূলে, মণিমুক্তা খচিত জড়াও উষ্ণীষ শিরোদেশে, হস্তে প্রায় তিন হস্ত দীর্ঘ সুতীক্ষ্ণ অসি। সকলেরই হস্তে মুক্ত অসি অসিগাত্রে শশী কিরণ প্রতিফলিত হওয়াতে অসি সমূহ মধ্যে মধ্যে চপলা সম চকমক্ করিয়া উঠিতেছে। অশ্বারোহী বীরেরা নির্ভয় নয়নে সেই ভীষণ দৃশ্য দর্শন করিলেন।

দলের লোকেরা যেখানকার, সেইখানেই দাঁড়াইয়া রহিল, দলপতি স্বয়ং

পদব্রজে অগ্রসর হইয়া আসিল। অশ্বারোহিগণের অগ্রবর্ত্তী অশ্ব সহসা গতিবেগ সম্বরণপূর্ব্বক চমকিত ভাবে দাঁড়াইল প্রথম অশ্বের সম্মুখেই দলপতি দণ্ডায়মান। প্রথম সম্ভাষণ কেবল একটা প্রশ্ন। সগর্জ্জনে দলপতি জিজ্ঞাসিল, "কে তোমরা, কোথায় যাও?" ক্ষণকাল সেই লোকটার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিয়া প্রথম অশ্বারোহী যেন স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন, প্রশ্ন শুনিলেন, কিন্তু উত্তর দিলেন না।

দস্যু সর্দ্দার অস্থির হইয়া পুনর্ব্বার প্রশ্ন করিল, "কে তোমরা? রাত্রিকালে বীর সজ্জা করিয়া অরণ্য পথে কোথায় যাইতেছ!"

এইবার নবীণ বীর পুরুষ মৌনভঙ্গ করিলেন; অতি সংক্ষেপে উত্তর দিলেন, "যোগিনীর আশ্রমে।"

দস্যু।—কোন্ যোগিনী?

বীর।—তাহা জানি না। মোহন সরোবর তীরে তপোবন আছে, সেই তপোবনে একটি যোগিনী আছেন, কেবল তাহাই জানি।

দস্যু।—(চমকিয়া) পূর্ব্বে আর কখনো তাহার সহিত তোমাদের সাক্ষাৎ হইয়াছিল?

বীর।—হইয়াছিল।

দস্যু।—ভৈরবী?

বীর।—তাহাও জানি না। জানি তিনি যোগিনী।

দস্যু।—(অশ্বের মস্তকোপরি খড়্গ নাচাইয়া) সে যোগিনীর সঙ্গে তোমাদের কি সম্বন্ধ?

বীর।—তাহা তোমার জানিবার প্রয়োজন কি?

দস্যু।—বিশেষ প্রয়োজন।

বীর।—আমি বলিব না।

দস্যু।—যাইতে পাইবে না।

বীর।—কেন বাধা দিবে!

দস্যু।—সেই উত্তর। বিশেষ প্রয়োজন।

বীর।—নামকর।

দস্যু।—প্রথম প্রয়োজন তোমাদের অশ্বগুলি, দ্বিতীয় প্রয়োজন তোমাদের পোষাক গুলি, তৃতীয় প্রয়োজন তোমাদের অস্ত্রগুলি।

বীর।—যদি না দি?

দস্যু।—(হাস্য করিয়া, বাঃ! বয়স কম, সাহস বেশী!

বীর।—যদি না দি, তুমি কি করিবে?

দস্যু।—যদি না দাও! উত্তম! ঐ আটটি মস্তক এইখানে রাখিয়া যাইতে হইবে।

সাজ্যাতিক ভয় প্রদর্শনে বীর পুরুষ যেন একটু নরম হইলেন। মুখ শুখাইল না, সাহস কমিল না, তবু যেন একটু নরম হইলেন। মনের ভাব অবশ্য মনে রহিল, রঙ্গভূমির অভিনয়ের অনুকরণে মিনতি করিয়া বলিলেন, "দয়া কর; কামনা করিয়া যোগিনী দর্শনে যাইতেছি, বাধা দিও না। দেখিতেছি এই বনরাজ্যের রাজা তুমি, তোমার কৃপা হইলে নিশ্চয় আমাদের মনোরথ পূর্ণ হইবে, যদি তুমি আমাদের পোষাক গুলি খুলিয়া লও, উলঙ্গ হইয়া ভগবতী যোগিনী সমীপে উপস্থিত হইতে পারিব না। স্বীকার করিতেছি, ফিরিয়া আসিবার সময় এক এক বস্ত্র পরিধান করিয়া, সমস্তই তোমাকে দিয়া, পদব্রজে আমরা চলিয়া যাইব; ক্ষমা কর।

বীর পুরুষ হইয়া এই বীর পুরুষ এমন মিনতি কেন করিলেন, একটু ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইতে হইবে। কে তাহারা যাহারা নিশাকালে বিজনারণ্যে গতিরোধ করে, আকৃতি দর্শনে এবং সর্দ্দারের বাক্য শ্রবণে বীর পুরুষ নিঃসন্দেহ তাহা বুঝিয়াছিলেন; দলে তাহারা বিলক্ষণ পরিপুষ্ট, যুদ্ধ করিয়া অথবা প্রতিবন্ধকতা করিয়া কৃতকার্য্য হইবার সম্ভাবনা অল্প, কৌশলে যদি তাহাদিগকে পরাভূত করিবার উপায় করা হয়, তাহা হইলেই সুবিধা। কিন্তু কি সে কৌশল! বাক্ চাতুরীতে সম্ভবমত সময় গ্রহণ করা। দলপতির সহিত বারম্বার বিনীত ভাবে কথোপকথন করিতেছেন, দলপতি তাঁহাকে বারম্বার কঠোর সম্ভাষণে বিভীষিকা দেখাইতেছে, বুদ্ধিমান্ বীরপ্রবর সেই অবসরের মধ্যে একটিবার মাত্র পশ্চাৎ দিকে চাহিয়া সপ্তসহচরের চতুর্দ্দশ লোচনের সহিত শীঘ্র শীঘ্র মিলন করিয়া লইলেন, দস্যু তাহা দেখিতে পাইল না।

আমাদের অধিক বল, শিকারেরা দুর্ব্বল, সেই অহঙ্কারে বলবানেরা প্রায়ই উন্মত্ত থাকে; বনদস্যুদলের ঐ দলপতি লোকটা সেই অহঙ্কারে মত্ত ছিল, মত্ততাকালে অন্য মনস্কও ছিল প্রায় সম্পূর্ণ অসাবধান। অগ্রবর্ত্তী অশ্বারোহী বীরবর কথা কহিতে কহিতে সে লক্ষণ বুঝিলেন, মনে মনে হাসিলেন, চকিত গতিতে আর একবার পশ্চাদ্দিকে কটাক্ষ পাত করিলেন, সকলেই প্রস্তুত। অগ্রবর্ত্তী আরোহী ইত্যবসরে আপন অশ্বটিকে গুপ্ত কৌশলে

উত্তেজিত করিলেন, সুস্থির অশ্ব সহসা লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক সবেগে অগ্রবর্ত্তী হইল, অসাবধান দস্যু সেই বলবান্ অশ্বের সবেগ গাত্র স্পর্শে প্রায় পাঁচহাত দূরে এক বৃক্ষ গাত্রে ধাক্কা খাইয়া চিৎপাত হইয়া পড়িল, অশ্ব বায়ুবেগে ছুটিল। আটটি অশ্বই সমশিক্ষায় সুশিক্ষিত, প্রথম অশ্বকে অগ্রগামী দেখিয়া অপর সাতটি অশ্বও তৎক্ষণাৎ সমবেগে দৌড়িতে লাগিল, খুরোত্থিত ধূলি রাশিতে বনভূমি অন্ধকার করিয়া ঠিক যেন উড়িয়া চলিল। যেখানে দস্যু দল জমায়েত হইয়াছিল ভীমবেগে সেই স্থল ভেদ করিয়া অশ্বেরা যেন নক্ষত্র গতিতে অদৃশ্য হইয়া গেল। দস্যুদল ছিন্ন ভিন্ন। অশ্বপদাঘাতে ২০।২৫ জন রক্তাক্ত কলেবরে ভূপতিত, অচেতন, তিনজন পঞ্চত্ব প্রাপ্ত, অবশিষ্টেরা বনমধ্যে ইতস্ততঃ বিনিক্ষিপ্ত।

দলপতি আহত হইয়াছিল, কিন্তু চৈতন্য শূন্য হয় নাই, শিকার পলাইল দেখিয়া অতিদ্রুত গাত্রোত্থান পূর্ব্বক মহাক্রোধে পলাতকের উদ্দেশে চিৎকার করিয়া বলিল, কোথা যাও! সেই চিৎকার বাতাসে মিশিয়া কাননভূমে প্রতি-ধ্বনি হইল, কোথা যাও! কেহই উত্তর দিল না।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

পরামর্শ।

অশ্বপদাঘাতে যাহারা মূর্চ্ছিত হইয়াছিল, একটু পরে তাহারা চৈতন্য পাইল; দূরে দূরে যারা নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল, একে একে তাহারাও নিকটে আসিয়া জুটিল, বিষণ্ণ বদনে দলপতি আসিয়া তাহাদের সঙ্গে মিলিল। সকলেই বিষণ্ণ। অরণ্য প্রান্তে খর স্রোত প্রবাহিনী একটি নদী, জন কতক ডাকাতে পূর্ব্ব কথিত তিনটা মৃতদেহ লইয়া সেই নদীর স্রোতে ভাসাইয়া দিয়া আসিল, আনন্দ মুখে দুঃসহ বিষাদ।

নৃশংসাচারে যাহারা অভ্যস্ত, তাঁহাদের বিষাদ অধিকক্ষণ স্থায়ী হয় না; গাত্র বেদনা ভুলিয়া, অপমান ভুলিয়া, বিফলতা ভুলিয়া, অবিলম্বেই তাহারা অদূরস্থ একটা প্রশস্ত ক্ষেত্রে পরামর্শ করিতে বসিল। দলপতি বলিল, ধাবিত

! যেখানে পাও, সেইখানে গিয়া ধর। আমার যেন ঠিক বোধ হইতেছে, তাহারাই তাহারা।

একজন পুরাতন দস্যু বলিল, আমারও তাহাই অনুমান। প্রথম বালকের দেখিয়াই আমার সন্দেহ হইয়াছিল। তাহা না হইলে ও রকম শিক্ষা অপরের হওয়া অসম্ভব। অতি অল্প বয়সে অমন চতুরতা ক্ষত্রিয় রাজকুলেই সম্ভবে। অশ্বগুলির সুশিক্ষা অতি অদ্ভুত।

উদাসীন ভাবে দলপতি বলিল, "ওসব কথা এখনকার নহে, অগ্রে ধরিয়া আন, তাহার পর চতুরতার কথা তুলিও। যোগিনীর আশ্রমে যাইবে। আমি বুঝিতেছি কে সেই যোগিনী। আজমীরের পুষ্কর তীর্থের ভৈরবী। আমার সঙ্গে সেই ভৈরবীর দুইবার সাক্ষাৎ হইয়াছে। তোমরা দুজন কিংবা, না হয় পাঁচজন, আমার নাম করিয়া ভৈরবীর সঙ্গে গিয়া দেখা কর। এবেশে যাইও বীর বেশে যাইও না, শিষ্ট শান্ত গ্রাম্যবেশে সাক্ষাৎ করিও। অস্ত্র অবশ্য সঙ্গে থাকিবে, কিন্তু খুব গোপন; ভৈরবী যেন কিছু জানিতে পারেন না। নিশ্চয় তাহারা সেইখানেই গিয়াছে। শীঘ্র তোমরা যাও। তাহাদের অন্বেষণ কর, কোন লক্ষণে কোন সূত্রে তাহা যেন প্রকাশ না পায় ধরিতেই চাও; তাহাদের না ধরিলে এতদিনের আশা ভরসা সমস্তই অতল জলে তলাইবে। যাও, আর আর বিলম্ব নয়।

উপদেশ মত কার্য্য। পাঁচজন হৃষ্ট পুষ্টদস্যু দূত ছদ্মবেশে ভৈরবী উদ্দেশে তপোবনাভিমুখে যাত্রা করিল। তাহারা চলিল পদব্রজে, শিকারেরা গিয়াছে বায়ুবেগশালী অশ্বে, অশ্বারোহীরা অনেক অগ্রে পৌঁছাইবেন, ডাকাতেরা বিলম্বে পৌঁছিবে, সকলেরই ইহা জানা রহিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

কিসের হাসি!

তপোবনে ভৈরবী। অপরূপ রূপ! মুখখানি যেন প্রফুল্ল শতদল, সেই শত-দলকোলে আকর্ণবিস্তৃত নেত্র দুটি যেন যুগল নীলোৎপল, মস্তকে সুদীর্ঘ চাঁচর কেশ, জটা বাঁধে নাই, তৈল বিরহে আলুলায়িত রুক্ষ কুন্তল উভয় পার্শ্বে পরিক্ষিপ্ত

হইয়া অপূর্ব্ব শোভা বিকাশ করিতেছে, শিরোদেশের পশ্চাৎভাগ হইতে সম্মুখে ললাটফলক পর্য্যন্ত তিন ছড়া পুষ্পমালা নিবদ্ধ, নাসামূল হইতে সীমন্ত পর্য্যন্ত সুদীর্ঘ সিন্দুর তিলক, অঙ্গে গৈরিক আস্তরণ, পরিধানে গৈরিক বসন, গলদেশে লহরে লহরে শ্বেত কুসুমের মঙ্গল মালা বিলম্বিত, মুখখানি হাসি হাসি, বয়স অনুমান একবিংশতি বৎসর।

কুসুম-মাল্য হস্তে ধারণ করিয়া ভৈরবী একখানি চর্ম্মাসনে বসিয়া আছেন, সম্মুখে সহসা আটটী নবীন বীর পুরুষ উপস্থিত। ভৈরবী দাঁড়াইলেন। একে একে আটখানি মুখ দেখিয়া, ভৈরবী এককালে উচ্চ রোলে অট্টহাস্য করিয়া, ঢলিয়া ঢলিয়া পড়িতে লাগিলেন। মৃদু মৃদু হাসিয়া বীর মূর্ত্তিরা সকৌতুকে সমস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি গো, হাসিয়াই যে অজ্ঞান! এত হাসি কিসের!"

হাসিয়া হাসিয়া ভৈরবী বলিলেন, "বাঃ! হোবাবা! বহুত তারিফ! বহুত তারিফ চিনিতেই পারা যায় না! রূপ দেখিয়া প্রাণের হাসি আপনা হইতে আইসে? অবশ্য তাহারা সন্ধান করিবে, সন্ধানে যদি দেখিতে পায়, নিশ্চয়ই তবে জীয়ন্ত রাখিবে না! তবেই ত আমাদের সকল আশা ফুরাইল! তবে আর আমরা!"—

হাস্য করিয়া ভৈরবী বলিলেন, "কিসের কথা বলিতেছ! তোমাদের বিবাহের! হরিবোল! হরিবোল! সে কথা তোমরা কেন ভাব! ভাগ্যের কথা কে জানে! ডাকাতেরা যদি আমার সাতটি ভাইকে কেটে ফেলে, আমি ত আছি, আমি ত বাঁচিব, আমি একাকী তোমাদের আটটি ভগ্নীকে বিবাহ করিব! কেমন, পছন্দ হয় না! কেন হইবে না! ভৈরবী সাজিয়াছি বলিয়া কি সত্য আমি সেই যুবরাজ বিরাজ কুমার নহি? সত্য সত্য তোমরাও আটটি কি সেই কর্ণার রাজ্যের রাজকুমারী নহ? অশ্বারোহী বীরপুরুষ সাজিয়াছ বলিয়া কি আমি তোমাদের পতি হইবার উপযুক্ত হইব না? কেন হইব না! অবশ্য, অবশ্য, অবশ্য! হইব। দিন আসিতেছে, অচিরাৎ আমি স্বরাজ্যে ফিরিয়া গিয়া পিতৃ সিংহাসনে পিতৃ-মুকুট ধারণ করিব। ডাকাতেরা যদি আমার সাতটি ভাইকে কাটিয়া ফেলে, আমি একাকী তোমাদের আট ভগ্নিকে বিবাহ করিব। একা আমি রাজা হইব, তোমরা আট ভগ্নিতে একসঙ্গে রাজমহিষী হইবে, সে সৌভাগ্য কি মন্দ হইবে ভাবিতেছ? ভাগ্যের কথা কে জানে? সব ঠিক হইবে। এখনকার প্রধান কার্য্য ডাকাত নিপাত করা। সে বিষয়ের কিরূপ উপায় করা যায়, তাহাই স্থির কর।"

একটু যেন গম্ভীর ভাব ধারণ করিয়া একটি রাজকুমারী (এ আশ্রমের একটি

...তিথি) কিঞ্চিৎ সন্দিগ্ধভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আচ্ছা রাজকুমার (শ্রীবিষ্ণু!) ...চ্ছা দেব! বনমধ্যে দস্যুদলের দলপতিকে দেখিলাম, লোকটা তো ডাকাতের ...ত দেখায় না। দিব্য সুশ্রী চেহারা, দিব্য লাবণ্যযুক্ত মুখমণ্ডল, দিব্য শ্রীনৃপেন্দ্র ...রূপ বেশভূষা, কিছুতেই ত ডাকাত বলিয়া বোধ হয় না, লোকটা তবে ডাকাতের ...দলপতি কেন?"

ভৈরবী ক্রমাগতই হাসিতেছিলেন, এইবার হঠাৎ গম্ভীর ভাব ধারণ করিয়া মৃদু ...রে বলিলেন, "ঐ কথাই ত কথা। ঐ কারণেই ত আমাদের এমন দুর্দ্দশা! ...রণটা তোমরা জান না, কিন্তু জানিয়া রাখা উচিত দলপতিটি আমার সাক্ষাত ...পিতৃব্য,—আমার স্বর্গগত রাজপিতার সহোদর কনিষ্ঠ ভ্রাতা। আমার পিতাকে নিপাত করিয়া স্বয়ং রাজসিংহাসনে বসিবেন, এইরূপ আকাঙ্ক্ষা ছিল, রাজসভার আট দশজন নিমকহারাম পাণ্ডাও রাজভ্রাতার কুচক্রে যোগ দিয়াছিল, কোন সূত্রে ষড়যন্ত্র প্রকাশ হওয়াতে রাজা সেই দলের সকলকেই রাজ্যসীমা হইতে দূর করিয়া ...ন; বাহিরের শত্রু অপেক্ষা ঘরের শত্রুকে অধিক ভয় করিতে হয়; রাজ্যের প্রধান প্রধান মন্ত্রিরা তদবধি রাজপুরী রক্ষার সুদৃঢ় ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছেন; ...চক্রান্ত করিয়া নির্ব্বাসিত হইয়াও দুষ্ট চেষ্টা সফল করিবার বিস্তর প্রয়াস পাইয়াছিল, কৃতকার্য্য হয় নাই। ভগ্ন উদ্যমও হয় নাই আমার খুড়া মহাশয় রাজ্যের ডাকাত সংগ্রহ করিয়া স্বয়ং দলপতি হন, রাত্রিকালে তাঁহার পোষিত ডাকাতেরা রাজ্যবাসী প্রজালোকের গৃহ লুণ্ঠন করিয়া, কাহারও বা গৃহে অগ্নি দিয়া, জাতিনাশ পর্য্যন্ত আরম্ভ করিয়াছিল। সেই অত্যাচারে সমস্ত প্রজা প্রপীড়িত হইবে, দুর্ব্বল জমিদারকে রাজ্যচ্যুত করিবার সুবিধা হইবে, ইহাই আমার খুড়া মহাশয়ের বাসনা ছিল, তাহাও সিদ্ধ হয় নাই। ভাগ্যের কথা কে বলিতে পারে, কালচক্রে পড়িয়া পিতা আমার পরলোক যাত্রা করিলেন, রাজ্যহিতৈষী প্রাচীন মন্ত্রীগণের মধ্যে পাঁচজন পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হইলেন, আমরা আটটি ভ্রাতা নাবালক রহিলাম। আমাদের আটটিকে প্রাণে মারিয়া দস্যু দলপতি খুড়া মহাশয় অনায়াসে স্বচ্ছন্দে তখন সিংহাসন অধিকার করিতে পারিতেন, সেই আশঙ্কা করিয়া আমাদের জননী অতি কষ্টে অপত্য স্নেহ সঙ্কুচিত করিয়া, আমাদের আটটি সহোদরকে একজন বিশ্বাসী ভাণ্ডারী সমভিব্যাহারে এই বঙ্গদেশে পাঠাইয়া দেন। এ দেশেও আমরা আটজনে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন দেশে অবস্থান করিতেছি। আমাদের অদর্শনে ব্যাধিশয্যা আশ্রয় করিয়া দয়াময়ী জননীও স্বর্গে চলিয়া গিয়াছেন, অবশিষ্ট সুতীক্ষ্ণ মন্ত্রীরা রাজ্য পালন করিতেন। ...ড়া মহাশয় ইচ্ছা করিলে সেই শুভ অবসরে বলপূর্ব্বক রাজ্যাধিকার করিতে

পারিতেন, কিন্তু আমরা চিরদিন বালক থাকিব না, আমরা বাঁচিয়া থাকিয়া বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে তাঁহার সেই রাজ্যভোগ নিরাপদ হইবে না, স্থায়ী হইবে না, ঐ ভাবিয়া তিনি অগ্রে আমাদের আটজনের নিধনসাধনে কৃতসংকল্প হন। আমরা বঙ্গদেশে আসিয়াছি, বঙ্গদেশেই আছি, দলস্থ গুপ্তিচরের মুখে এই সংবাদ জানিতে পারিয়া, আপন দস্যুদলের সহিত এই বঙ্গদেশেই তিনি গুপ্তভাবে আশ্রয় লইয়াছেন। কাননেই নিরন্তর বাস, কেবল রাত্রিকালে স্থানে স্থানে ডাকাতি করিবার জন্য ডাকাতেরা লোকালয়ে প্রেরিত হয়, স্বয়ং তিনি সঙ্গে থাকেন না।

ভৈরবীঠাকুরাণী বোধ হয় আর কিছু বলিতেন, একটি কুমারী সেই মুখে বাধা দিয়া বলিয়া উঠিলেন, "তাহা যেন হইল, কিন্তু লোকেরা যখন শুনিয়া গেল, একটি রাজপুত্র এখানে আছেন, তাঁহাকে ধরিবার জন্য তোমার খুড়া মহারাজ এখানে অবশ্যই আবার ঐ রকম ছদ্মবেশী ডাকাত প্রেরণ করিবেন ; বোধ হয়, ছদ্মবেশেরও প্রয়োজন হইবে না : তবেই ভাব দেখি, এ স্থান আমাদের পক্ষে কি প্রকার নিরাপদ ?

ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া ভৈরবী বলিলেন, "রাত্রি প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে, আজ আর ডাকাত আষ্টে আসিয়া নৃত্য করে। এখন ভাবিয়া দেখ, আমার মুখে কিসের হাসি !

পূর্ব্বের অষ্টস্বর পুনর্ব্বার ফুটিল, "তবে আমরাও হাসি তোমারেও বহুত তারিফ ! তোমারেও ত চিনিতে পারা যায় না।"

ঈঙ্গিতে কর সঞ্চালন পূর্ব্বক ভৈরবী তাঁহাদিগকে তৎসম্বন্ধে নীরব থাকিতে অনুরোধ করিলেন। ভৈরবী আসন গ্রহণ করিলে পর ঐ আটজন অতিথিও ভিন্ন ভিন্ন আসনে উপবিষ্ট হইলেন। অন্য কথা উত্থাপিত হইবার পূর্ব্বে পথের বিবরণের কথা উঠিল। ভৈরবী একটু শিহরিলেন, বসিয়াছিলেন, আবার উঠিলেন, অতিথি গুলিকেও উঠিতে বলিলেন। আদেশ পালন করিতে তাঁহারা পলকমাত্র বিলম্ব করিলেন না। যেখানে ভৈরবীর সহিত তাঁহাদের সাক্ষাৎ হইল, সে স্থানে অল্প প্রশস্ত একখানি পর্ণকুটীর। তাহার দূরে দূরে ছোট বড় আর কতকগুলি কুটীর, উত্তরে, দক্ষিণে, পশ্চিমে সেই সকল কুটীর বিদ্যমান, পূর্ব্ব দিকে আশ্রম নাই, নিবিড় বন। উত্তরের কুটীর গুলিতে সন্ন্যাসীও থাকে, কৃষিজীবি সামান্য অবস্থাপন্ন মেষপালক দরিদ্র লোকেরাও বাস করে। ভৈরবী ঐ অতিথিগণকে লইয়া উত্তর মুখে চলিলেন সেই দিকের একটি প্রাচীন আশ্রমে তাঁহাদিগকে রাখিয়া আপন কুটীরে ফিরিয়া আসিলেন। বলিয়া আসিলেন,

"যতক্ষণ আমি সংবাদ না দি, ততক্ষণ তোমরা এস্থান হইতে বাহির হইও না।" অতিথিরা একজন বৃদ্ধ সন্ন্যাসীর জিম্মায় রহিলেন।

কুটীরে প্রবেশ করিবার অগ্রে ভৈরবীর একটি সতর্কতার কার্য্য। সুসজ্জিত আটটি অশ্ব আটটি বৃক্ষে বন্ধন করা ছিল তিনি স্বহস্তে সেই অশ্বগুলিকে পশ্চিম দিকে লইয়া গিয়া দুইজন মেষ পালকের জিম্মা করিয়া রাখিলেন মেষ পালকেরা ঘোড়াদের গায়ের সাজ পাত খুলিয়া এক প্রকার সেগুলিকে লুকাইয়া রাখিল।

ভৈরবী আশ্রমে আসিলেন। ক্ষণকাল পরেই কুটীর দ্বারে পাঁচজন নূতন অতিথি উপস্থিত হইল। তাহারা কোন্ ভাবের অতিথি, পাঠক মহাশয় হয়ত বুঝিতে পারিলেন, ভৈরবী কিন্তু তাহাদিগকে চিনিতে পারিলেন না। চিনিতে না পারুন, এক প্রকার অনুমান করিয়া লইলেন। অতিথি আসিলে আদর করিতে হয়, গৃহস্থ আশ্রমের ন্যায় সন্ন্যাস আশ্রমেরও এই ধর্ম্ম ; ভৈরবী সেই পাঁচজন আগন্তুককে আদর করিয়া বসাইলের, কি অভিপ্রায়ে আগমন তাহাও জিজ্ঞাসা করিলেন।

পাঁচজনের মধ্যে একজন মুখপাত্র হইল। প্রশ্নের উত্তর দিবার কথা না পাইয়া সেই ব্যক্তি নিজেই প্রশ্ন করিল. "আটজন অশ্বারোহী বীর পুরুষ এ আশ্রমে আসিয়াছে ? তরুণ বয়স. পরম সুন্দর, রাজ পুত্রের মত সজ্জা, আসিয়াছে কি ?"

সুস্পষ্ট ভাব বুঝিয়া ভৈরবী জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমরা তাহাদের কে ?" উত্তর দাতা বলিল, "অনুচর ছিলাম, বনমধ্যে হঠাৎ তাহাদিগকে হারাইয়া ফেলিয়াছি। একবার শুনিয়াছিলাম, এ তপোবনে ভগবতী ভৈরবী দরশনে আসিবে ; আসিয়াছে কি ?"

অল্পক্ষণ চিন্তা করিয়া ভৈরবী যেন স্বগতবাক্যে বলিতে লাগিলেন, "আটজন বীর পুরুষ, রাজ পুত্রের মত সজ্জা, ভৈরবী দর্শনের আশা। কথা তিনটি বেশ, কিন্তু—" আর একটু উচ্চ কণ্ঠে কহিলেন, "রাজ পুত্রই বটে। আটটি নহে, একটি। অনেক দিন আসিয়াছে। কোথায় আছে, তাহা আমি বলিব না। সত্য তোমরা রাজ পুত্রদের অনুচর কি না, তাহাতে আমার সন্দেহ হয়, সেই জন্য বলিব না। সত্য যদি অনুচর হও, একটি রাজ পুত্রও অনেক দিন এখানে আসিয়াছে, এতদিন তত্ত্ব লও নাই কেন ?" অতিথির মুখে আর কথা সরিল না। দুষ্টের দুষ্ট ফিকির ভাসিয়া গেল। পাঁচজনের মুখের ভাব দেখিয়া ভৈরবী তাহাদের মনের ভাব বুঝিয়া লইলেন। ক্ষণ বিলম্বে পূর্ব্ববক্তা একটু কপট হাস্য করিয়া

অধোমুখে বলিল, "আমাদের ভুল হইয়া থাকিবে। এ আশ্রম নয়, অন্য আশ্রমে অন্য ভৈরবীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করা"—

বাধা দিয়া ভৈরবী কহিলেন, "এ তপোবনে অন্য ভৈরবী নাই, আমি মাত্র একাকিনী। তোমরা চলিয়া যাও, আমার তপস্যায় বিঘ্ন করিও না।"

লোকদিগের ইচ্ছা ছিল; তপোবনের অন্য স্থানে অন্বেষণ করিবে, কিন্তু ভৈরবীর শেষকথা শুনিয়া সে ইচ্ছা তাহারা তখনকার মত সম্বরণ করিতে বাধ্য হইল। দলপতির নূতন আদেশের অপেক্ষায় অগত্যা তাহারা তখন চলিয়া গেল, হতাশের পরিতাপে ভৈরবীকে নমস্কার করিল না।

তাহারা চলিয়া গেল, ভৈরবী তখন হাসিতে হাসিতে আশ্রম হইতে বাহির হইলেন। অতিথি গুলিকে যেখানে রাখিয়া আসিয়াছিলেন, সেইখানে উপস্থিত হইয়া পাগলিনীর মত হাসিতে আরম্ভ করিলেন। সে হাস্যের কি কারণ, অতিথিরা তখন তাহা বুঝিলেন না। তাঁহাদিগকে সঙ্গে লইয়া ভৈরবী আপন আশ্রমাভিমুখে অগ্রগামিনী হইলেন। পথে একটি অতিথি হাস্য করিয়া প্রশ্ন করিলেন, "এবার আবার তোমার কিসের হাসি?" ভৈরবী অবিচ্ছেদে হাস্য করিতে লাগিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

ভাগ্যের কথা কে জানে।

আশ্রমে উপস্থিত হইয়া ভৈরবীর সহিত অতিথি গুলির কি কি কথা হইয়াছিল, তাহা শুনা হয় নাই, হাস্যের অবসরে কোন কথা উত্থাপন না করিয়া হাস্য বিরামে একজন অতিথি কিঞ্চিৎ ম্লান মুখে ভৈরবীকে বলিলেন, "আচ্ছা, লোকেরা শুনিয়া গেল, আটটির মধ্যে একটি রাজ পুত্র এখানে আসিয়াছে, আর সাতটি তবে কোথায়, আসিবার সময় নাই, বিজ্ঞ লোকেরা কোটরস্থ পেচকের সহিত দস্যু তস্করের উপমা দেন, দস্যু তস্করেরা সূর্য্যদেবকে বড় ভয় করে, দিনমানে বৃক্ষকোটর হইতে তাহারা বাহির হয় না, হইবেও না, দিবাভাগের মধ্যে তোমাদের নিরাপদের উপায় স্থির করিব, পূর্ব্বেই স্থির করিয়া রাখিয়াছি।"

প্রথমাকুমারী বলিলেন "আমাদের নিরাপদের সঙ্গে সঙ্গে তোমার নিজের

নিরাপদ স্থির করিতে হয়. আমরা নিরাপদে থাকিব তুমি আপদ বেষ্টিত থাকিবে তাহা হইলেই যে বিপদ, সেই বিপদ বর্ত্তমান রহিল, তোমার নিরাপদের কি উপায়?"

ভৈরবী কহিলেন, "আমি ভৈরবী, যেমন আমি আছি, তেমনিই থাকিব, ভৈরবীদের ভয় নাই। দস্যু দলপতির সঙ্গে ইতিপূর্ব্বে দুইবার আমার সাক্ষাৎ হইয়াছিল, এইখানে। তিনি আমাকে চিনিতে পারেন নাই। আজমীরের পুষ্কর তীর্থে আমি থাকি. এই পরিচয় আমি তাঁহার কাছে দিয়াছিলাম তিনি আজমীরে যান নাই।"

কুমারী বলিলেন, "কিছু যেন অসম্ভব বোধ হয়। ভ্রাতুষ্পুত্র তুমি, তোমার পিতার সহোদর ভ্রাতা তিনি, মুখের চেহারা তুমি লুকাইয়া রাখ নাই. তথাপি তিনি তোমাদের চিনিতে পারিলেন না, ইহা কিরূপে বিশ্বাস করি!"

ভৈরবী বলিলেন, "আমি বিশ্বাস করাইব। খুল্লতাত রাজদ্রোহী, সর্ব্বদা তিনি রাজপুরীতে থাকিতেন না। আমাদের সঙ্গে অতি অল্পই দেখা শুনা হইত, বিশেষতঃ রাজাদেশে যখন তিনি নির্ব্বাসিত হন, তখন আমরা ছোট ছোট, আমি জ্যেষ্ঠ, আমার বয়স তখন খুব কম; তখনকার চেহারার সহিত এখনকার চেহারায় মিলন নাই, তাহার উপর নারী বেশ; অনেক দিন পরে চিনিবার সম্ভাবনা অল্প।"

অবনত বদনে ক্ষণকাল কি যেন ভাবিয়া কুমারী কহিলেন, "ঠিক কথা। তোমাদের সঙ্গে তাঁহার যদি চেনা শুনা থাকিত, তাহা হইলে বনপথে অশ্বারোহণে আমাদের দেখিয়া কদাচ তিনি রাজ পুত্র বলিয়া স্থির করিয়া লইতেন না।"

হাস্য করিয়া ভৈরবী একটি দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন। সেই সময় তাঁহার মুখমণ্ডল আরো যেন উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। নীলোৎপল সদৃশ নেত্র দুটিও অকস্মাৎ অধিক সমুজ্জ্বল হইল। একে একে অষ্ট কুমারীর অষ্ট বদন নিরীক্ষণ করিয়া শান্ত স্বরে তিনি বলিলেন, "ডাকাতের দল এই তপোবনে আসুক, ইহাই আমার ইচ্ছা। তপোবনে ধনরত্ন থাকে না. কিসের লোভে ডাকাত আসিবে এ কথাটা ক্ষুদ্র সমস্যা, তৎক্ষণাৎ বুঝিব. কেবল তোমাদের প্রাণ সংহারের চেষ্টা! সে ক্ষেত্রে যাহা যাহা করিতে হয়, আমি তাহা স্থির করিয়া লইব। আগে তোমাদের নিরাপদের ব্যবস্থা করি। অবসর অনেক আছে। এই সবে উষা কাল, প্রভাতী পক্ষীরা প্রভাতী গীত ধরিয়াছে, নক্ষত্র গুলিকে লইয়া নক্ষত্রপতি সুধাকর আকাশ পটের অন্তরালে চলিয়া গিয়াছেন, প্রভাত-পবন ধীরে ধীরে সঞ্চরণ করিয়া

প্রভাতী পুষ্পগুলিকে চুম্বন করিতেছে, নূতন সূর্য্যের উদয়ান্ত পর্য্যন্ত আমাদের অবকাশ।”

কুমারী কহিলেন, “হাঁ, তাহাতো ঠিক, কিন্তু এই অবকাশের মধ্যে তুমি কি করিতে চাও? আমাদের নিরাপদের জন্য এই অবকাশ তোমার পক্ষে কিরূপ সহায়তা করিতে পারে?”

ভৈরবীর প্রশান্ত বদনমণ্ডল প্রফুল্ল হইল। প্রফুল্ল বদনে তিনি বলিলেন, “প্রকৃতির মান রক্ষা করিব। পরিচয়ে যাহা তোমরা সত্য, নূতন সূর্য্যদেবকে তাহাই আমি দেখাইব। প্রশ্ন করিও না, বিস্ময় মানিও না, চপলতা দেখাইও না, তোমাদের রক্ষার ভার আমার মস্তকে সমর্পিত রহিল, তোমরা নিশ্চিন্ত হইয়া থাক, অষ্ট প্রাণের সহিত অষ্ট প্রাণের মিলন কি প্রকারে সাধিত হয়, অচিরেই তাহা তোমরা জানিতে পারিবে।”

রজনী প্রভাত হইল। জবাকুসুমসঙ্কাশ প্রভাত-সূর্য্য পূর্ব্বগগণে সমুদিত হইলেন, সূর্য্য বন্দনা করিয়া ভৈরবী তখন অন্য কার্য্যে ব্যাপৃতা। আয়োজনে বিলম্ব হইল না। স্বর্ণ-বর্ণ পরিত্যাগ করিয়া প্রভাকর যখন রজত বর্ণ ধারণ করিলেন, ভৈরবী ঠাকুরাণী তখন সহাস্য বদনে একটি পেটিকা লইয়া অষ্ট কুমারীর অগ্রে বসিলেন। পেটিকা উন্মুক্ত হইল। অল্পক্ষণের মধ্যেই অষ্ট মূর্ত্তির সঙ্গে অতি চমৎকার রূপান্তর। বীর বেশ বিদূরিত। রক্তবর্ণ বসনে রক্তবর্ণ কাঁচুলিতে অষ্টবপু সমাবৃত; সুকুচিত সুদীর্ঘ কৃষ্ণ কেশ পৃষ্ঠদেশে দোদুল্যমান, রক্ত বাসের উপর কণ্ঠদেশে আবক্ষলম্বিত শুভ্র শুভ্র কুসুম মাল্য, মস্তকেও সুন্দর সুন্দর ফুলের মালা। অষ্টবীর বালক এইখানে অভিনব রূপ লাবণ্যে অভিনব মোহন বেশে সুনবীনা অষ্ট ভৈরবী রূপে শোভা পাইলেন, আপনাদের রূপ দেখিয়া তাঁহারা আপনারাই হাসিয়া হাসিয়া মোহিত হইয়া গেলেন, ভৈরবীও হাস্য করিলেন।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, তপোবনের ধারে ধারে আরো কতকগুলি পর্ণকুটীর। ভৈরবী একবার সেই সকল কুটীরে একে একে প্রবেশ করিয়া, অষ্ট কুমারীর অষ্ট অশ্বকে সন্দর্শন করিয়া, কুটীরবাসীগণের সহিত নির্জ্জনে কি প্রকার মন্ত্রণা করিয়া আশ্রমে ফিরিলেন, নবীনা ভৈরবীরা তাহার নিগূঢ় তত্ত্ব কিছুই জানিতে পারিবেন না। শান্তি নিকেতনে শান্তিদেবী মূর্ত্তিমতী।

তাপস তাপসীর আশ্রমে আহারের যে প্রকার পদ্ধতি, অষ্ট ভৈরবীর সহিত আশ্রম বাসিনী ভৈরবী সেই পদ্ধতি ক্রমে আহার সমাপন করিয়া সঙ্কল্পানুসারে মন্ত্রণা করিতে বসিলেন। মন্ত্রণায় মন্ত্রণায় দিবাকাল অবসান হইল, মন্ত্রণাকারিণী-

[র] মুখের দিকে আড়ে আড়ে চাহিতে চাহিতে ভগবান্ মরীচিমালী পশ্চিমাচলে [অ]স্তমিত হইলেন।

সন্ধ্যা হইল। নীলবর্ণ গগণপট শোভিত করিয়া অসংখ্য তারকামালা মৃদু [মৃদু] হাস্য করিতে লাগিল, প্রণয়নী প্রেমলোলুপ তারাপতি চন্দ্রমা কিঞ্চিৎ বিলম্বে [আ]কাশাসনে সহাস্য হাস্যে দর্শন দিলেন, সুধাংশুর সুধাংশু সংস্পর্শে সেই নিভৃত [বন]স্থলী অল্পে অল্পে প্রভাসিত হইল। কৃষ্ণ পক্ষের প্রতিপদ। গোধূলি সময়টি [অ]ল্প অন্ধকারে আবৃত থাকিয়া পরক্ষণেই নব বধূর ন্যায় ঘোমটা খুলিয়া সর্ব্বাঙ্গ [সু]ন্দরী প্রকৃতি সতী শুভ্র জ্যোতিতে ঢল ঢল করিতে লাগিলেন। বন তরুলতায় [ব]নফুল বিকসিত হইয়া সমীরণ সহযোগে চতুর্দ্দিকে সুগন্ধ বিতরণ করিতে লাগিল। [ভৈ]রবীরা আকাশ পানে চাহিয়া সুধাকরের সুধাময় ছবি অবলোকন করিতে লাগিলেন। তারাদলের সহিত তারানাথের মিলন, অপরূপ শোভা। কতদিনে [ন]ায়িকার সহিত অষ্টনায়কের ঐ প্রকার সুমিলন সংঘটিত হইবে, ভৈরবীদের [ম]নে কেবল তাহাই চিন্তা।

রজনী ক্রমশ অগ্রসর হইতেছে, নক্ষত্র বেষ্টিত প্রতিপদচন্দ্র যেন প্রতিপদেই [ধী]রে ধীরে অগ্রসর হইতেছেন, দেখিতে দেখিতে রাত্রি ছয় দণ্ড। কুটীর হইতে [ব]হির্গত হইয়া কুটীর বাসিনী ভৈরবীরা সম্মুখস্থ সুপ্রশস্ত তৃণাসনে উপবিষ্ট আছেন, দক্ষিণের যে পথ দিয়া তপোবনে প্রবেশ করিতে হয়, সেই পথের দিকে তাঁহাদের [ঘ]ন ঘন দৃষ্টি।

আরও দুই দণ্ড। ইত্যবসরে কাননের দক্ষিণ প্রান্তে অনেক গুলি নর মস্তক নেত্র গোচর হইল। প্রধানা ভৈরবীর নয়নঙ্গিতে সখি ভৈরবীগুলি চপলা গতিতে কুটীরাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া লুক্কায়িতা হইলেন, কেবল ঐ একটি ভৈরবী সেই তৃণক্ষেত্রে ঠিক যেন পাষাণময়ী প্রতিমার ন্যায় অচলা অটলা। [দূ]রদৃষ্ট নরমস্তকগুলি ক্রমে ক্রমে নিকট হইতে লাগিল, দেখিতে দেখিতে ভৈরবী সমীপে প্রায় পঁচিশ জন অস্ত্রধারী মনুষ্য সমাগত।

ভৈরবী অবলা একবার মাত্র দলের দিকে নেত্রপাত করিয়া তিনি বুঝিলেন, কেবল বাজে লোক, কর্ত্তা আইসেন নাই। যাহারা আসিল, তাহাদের অগ্রবর্ত্তী লোকটা ভৈরবীকে জিজ্ঞাসা করিল, “সে রাজ পুত্র কোথায়?”—ভৈরবী উত্তর করিলেন, “আমার কাছে তাঁহার সন্ধান পাইবে না। কল্য যাহা বলিয়াছি, অদ্যও আমার মুখে সেই উত্তর।”

লোকটা পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল, “একটু আগে আর কাহারা এখানে

উপস্থিত ছিল? আমরা আসিতেছি দেখিয়া কাহারা তাড়াতাড়ি পলাইয়া গেল?"

লোকটার মুখের দিকে বিশাল নেত্র নিক্ষেপ করিয়া ভৈরবী কহিলেন, "জিজ্ঞাসা করিবার কাহারও অধিকার নাই, তথাপি আমি তোমাদের অনধিকার চর্চ্চার সমুচিত উত্তর দিব। যাঁহারা এখানে ছিলেন, তাঁহারা আমার। তপোবনের নাম শান্তি-কানন, এ কাননে অশান্তি প্রবেশ করিতে পারে না। যাঁহারা ছিলেন, তাঁহারা শান্তিময়ী বালিকা, নবীন ব্রত চারিণী নবীনা ভৈরবী। তোমাদের এখানে আবার কিসের প্রয়োজন? দলবলে রণসজ্জা করিয়া আসিয়াছ, ইহারই বা কারণ কি?"

লোক উত্তর করিল, "প্রভুর আদেশ, সেই রাজ পুত্রের সন্ধান করিব, আর তাহার সঙ্গী সহচর, কিম্বা সহোদর, কে কোথায় আছে, জানিয়া লইব, তুমি তপস্বিনী, আমরা শুনিয়াছি, তপস্বিনীরা মিথ্যা প্রবঞ্চনা জানেন না, তুমি সত্যবাদিনী হও, রাজ পুত্রকে তুমি কোথায় লুকাইয়া রাখিয়াছ, কর্ত্তার আদেশ, শীঘ্র তাহা বলিয়া দাও।"

ত্বরিতস্বরে ভৈরবী কহিলেন, "দাবী করিয়া কেহ আমার প্রতি কোন প্রশ্ন করিতে পারে, তাহা আমি জানি না। রাজপুত্র এখানে আছেন, কিন্তু কোথায়, তাহা আমি বলিব না। তোমরা যদি আমার মুখে সে তত্ত্ব জানিতে না পার, রাজ পুত্রের সঙ্গে তোমাদের যদি সাক্ষাৎ না হয়, তাহা হইলে তোমরা কি করিবে?"

দলের সমস্ত লোক এককালে সমস্ত তলোয়ার উত্তোলন করিয়া সমস্ত লোকেই সমগর্জ্জনে সমস্বরে বলিল, "তন্ন তন্ন করিয়া এই বনভূমি অন্বেষণ করিব, যদি কেহ প্রতিবন্ধকতা করে, তাহার মস্তক এই বনে রাখিয়া যাইব, ইহাই আমাদের সঙ্কল্প, ইহাই আমাদের কর্ত্তব্য কার্য্য। ভণ্ড ভৈরবী অথবা ভণ্ড তপস্বিনী আমরা গ্রাহ্য করি না। প্রভুর আজ্ঞা।"

গম্ভীর বদনে ভৈরবী জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে তোমাদের প্রভু?"—লোক উত্তর করিল, "প্রয়োজন হইলে তিনি স্বয়ং এখানে উপস্থিত হইতে পারেন। কথায় কথায় একদিন তিনি বলিতেছিলেন, তোমার সঙ্গে তাঁহার দেখা শুনা হইয়াছিল, জানা শুনা আছে, পুনর্ব্বার দেখা করিবার আবশ্যক হইলে পুনর্ব্বার আসিবেন। তিনি আমাদের রাজা, তাঁহাকে তুষ্ট রাখিতে পারিলে এ বনে তোমার কোন ভয় থাকিবে না।

ভৈরবী একবার মুখ ফিরাইয়া কুটীরের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। যে প্রসঙ্গ উপস্থিত হইল, অপর কাহার কর্ণে সে প্রসঙ্গের প্রশ্নোত্তর প্রবেশ না করে, ইহাই তাঁহার ইচ্ছা। আশ্বাস দাতাকে তিনি বলিলেন, "ভয় আমার নাই, তাঁহার নাম করিলেই আমার সমস্ত ভয় দূর হইয়া যায়। আজ তোমরা আসিয়া ভালই করিয়াছ, তোমাদের রাজার সম্বন্ধে গুটি কতক বিশেষ কথা আমার জানিবার অভিলাষ আছে, একটু তফাতে গিয়া তোমাদের মুখে আজ আমি তাহা শুনিব।"

এই বলিয়া ভৈরবী সেই তৃণাসন হইতে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। পূর্ব্বদিকে বন, দীর্ঘ দীর্ঘ তরুরাজি, তরুশিরে নির্ম্মল আকাশ, নির্ম্মল আকাশে নির্ম্মলচন্দ্র, লোকগণকে সঙ্গে লইয়া ভৈরবী সেই বন মধ্যে প্রবেশ করিলেন। বনে একটি সরোবর, দুইধারে বড় বড় প্রস্তর খণ্ড নিপতিত, সেই সকল প্রস্তর খণ্ডে উপবেশন করিয়া ভৈরবী সেই সকল লোকের সহিত গুপ্ত কথোপকথন আরম্ভ করিলেন। যে লোকটার সহিত প্রথমাবধি কথা হইতেছিল, তাহার সঙ্গেই কথা চলিতে লাগিল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

উপসংহার।

যাহার সহিত ভৈরবীর কথা, তাহার নাম লুলুপ্. তাহাদের প্রভুর নাম সিংহ কেতু। লুলুপকে নিকটে বসাইয়া, ভৈরবী জিজ্ঞাসা করিলেন, "আচ্ছা, যে রাজ পুত্রের অন্বেষণ করিতেছ, তাহাকে তোমরা চেন?"

লুলুপ্।—না।

ভৈ।—তবে কিরূপে চিনিবে? আমি যদি আর একজনকে দেখাইয়া দি, তাহাকেই কি লইয়া যাইবে?

লু।—প্রভু বলিয়াছেন, ভৈরবীরা প্রবঞ্চনা করে না, তুমি প্রবঞ্চনা করিবে না।

ভৈ।—(স্বগতঃ) প্রভু তবে আমারে অল্প অল্প বুঝিয়াছেন। (প্রকাশ্যে) উত্তম। আমি তোমাদের সঙ্গে প্রবঞ্চনা করিব না, ইহা তবে তোমাদের নিশ্চয় বিশ্বাস!

লু।—তুমি ঠিক থাকিলেই সে বিশ্বাস নিশ্চয়।

ভৈ।—তবে আমি রাজ পুত্রকে দেখাইয়া দিব, কিন্তু আচ্ছা, ঠিক করিয়া বল দেখি, সিংহ কেতুর অধীনে থাকিয়া যে কাজ গুলি তোমরা করিতেছ, সে গুলি কি তোমাদের খুব ভাল লাগে!

লু।—না লাগিলেও পেটের দায়ে লাগাইতে হয়। আর এক কথা, আমাদের প্রভুকে আমরা বড় ভালবাসি।

ভৈ।—ভালবাসা স্বতন্ত্র কথা, কেবল যদি পেটের দায় বল, সেই পেটের দায় আমি নিবারণ করিতে পারি। যে কার্য্য তোমরা করিতেছ, সে কার্য্য যদি ছাড, সৎপথে যদি থাক, তোমাদের সমস্ত খরচ পত্রের আমি ব্যবস্থা করিয়া দিব।

লু।—(হাস্য করিয়া স্বগত) পণ্ডশ্রম মাত্র! এটা দেখিতেছি আস্ত পাগল! একটা পাগলের সঙ্গে বৃথা এতগুলি বাক্য ব্যয় করিলাম! পাগল হইয়াই ভৈরবী সাজিয়াছে! (প্রকাশ্যে) ভৈরবী তুমি, কেন আমাদের সঙ্গে তামাসা কর! বনবাসিনী তপস্বিনী, এত লোকের সংসারের খরচ পত্র তুমি কিরূপে যোগাইবে?

ভৈ।—আমার যোগবল আছে। দলে তোমরা কতগুলি আছ?

লু।—এখন দুই শত, আবশ্যক হইলে এক হাজার জড় করা যায়।

ভৈ।—তোমাদের প্রভুর দেশেই কি সকল গুলির বাড়ী?

লু।—না, এই দেশের কতকগুলিও আমাদের দলে মিলিয়াছে।

ভৈ।—কোন চিন্তা নাই। সকলকেই আমি সুখী করিব। ও কার্য্যটা তোমরা ত্যাগ কর। ও কার্য্যে বড় পাপ। ভৈরবী আমি, টাকার অভাবে তোমাদের অভাব ঘুচাইতে পারিব না, সে সন্দেহ রাখিও না, ধর্ম্ম সাক্ষ্য করিয়া যদি তোমরা আজ আমার কাছে শপথ কর, যদবধি সময় না আইসে তদবধি গুহ্যতত্ত্ব অতি সাবধানে অপ্রকাশ রাখিবে, তাহা হইলে সত্য পরিচয় প্রদান করি।

ডাকাতেরা শপথ করিল, ভৈরবী ঠাকুরাণী সত্য পরিচয় প্রদান করিলেন, তবু একটু বক্রভাব রাখিলেন। নিজে তিনি কি, সেই কথাটি গুপ্ত রাখিয়া কল্পিত রাজ পুত্রের উদ্দেশেই সত্য পরিচয় ব্যক্ত করা হইল। ডাকাতেরা আর ডাকাতি করিবে না, প্রতিজ্ঞা করিল, দলের সমস্ত লোককে বুঝাইয়া দুষ্কার্য্য হইতে নিরস্ত করিবে, স্বীকার করিল, সানন্দে ভৈরবী তাহাদিগকে মিষ্ট সম্ভাষণে

বিদায় দিলেন, কেবল এইটুকু বলিয়া রাখিলেন যে যদি তোমরা প্রতিজ্ঞা ভঙ্গকর পুনরায় যদি সেই কার্য্যে রত হও, তাহা হইলে ভাল হইবে না। যদিও রাজ্য এখন এক প্রকার অরাজক, রাজ্য লইয়া মোগল পাঠানে মহা যুদ্ধ, তথাপি চোর ডাকাতের শাসন আছে। প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিলে নিশ্চয়ই আমি তোমাদের দলকে দল ধরাইয়া দিব।

ডাকাতেরা চলিয়া গেল, ভৈরবীদেবী আশ্রমে প্রবেশ করিলেন। আশ্রমে রক্ত বসনা অষ্ট-নায়িকা বিরাজিত। দস্যু দৈত্যের ফলাফল বিজ্ঞাপন করিয়া, ভৈরবীদেবী আনন্দ প্রকাশ করিলেন; নবীনা অষ্ট ভৈরবী সেই আনন্দ প্রকাশের প্রকৃত কারণ অনুভব করিতে না পারিয়া, স্থির নেত্রে তাঁহার মুখ পানে চাহিয়া রহিলেন।

ভৈরবী বলিলেন, "অগ্নি হইতে ধুম উত্থিত হইয়া আকাশে মেঘ হইতে বৃষ্টির সৃষ্টি, বৃষ্টির জলে আবার অগ্নি নির্ব্বাপিত হইয়া যায়, অগ্নি তথাপি মেঘোৎপাদনে অযত্ন করে না। মারিতে আসিলেও না মারিয়া যদি আত্ম রক্ষা করিতে পারা যায়, তাহাই উত্তম কল্প। আজ আমি সেই কৌশল অবলম্বন করিয়াছি। রাজভ্রাতা সিংহকেতু আমাদের অষ্ট ভ্রাতার জীবন গ্রহণ করিতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা রহিয়াছেন, বিনা রক্তপাতে আমি তাঁহাকে দমন করিবার উপায় করিয়াছি। ডাকাতেরা আর তাঁহার সঙ্গে সম্বন্ধ রাখিবে না, সিংহকেতু একাকী হইবেন, দুষ্ট বাসনা পূর্ণ করিতে আর তাঁহার ক্ষমতা থাকিবে না। রাজ্যে রাজা নাই, রাজ্ঞী নাই, রাজ পুত্রেরা নিরুদ্দেশ, এই সুযোগ বুঝিয়া, রাজ্য লোভে যদি সিংহকেতু এই সময় একবার দুরাশা পুরণের চেষ্টা করেন, নিশ্চয় রাজধানীতে, বন্দি হইবেন। সমস্ত ব্যবস্থা ঠিক হইয়া আছে। তোমাদিগকে গত রাত্রে যাঁহার কুটীরে রাখিয়া দিয়াছিলাম, তিনি সন্ন্যাসী হইয়াছেন সন্ন্যাসী কিন্তু প্রকৃত সন্ন্যাসী নহেন, তিনি আমার স্বর্গীয় পিতৃদেবের পরম হিতৈষী রাজমন্ত্রী। মাতৃক্রোড় পরিহার করিয়া আমরা যখন দেশত্যাগী হই, সেই সময় একজন বৃদ্ধ ভাণ্ডারী আমাদের সঙ্গে ছিলেন। ঐ সন্ন্যাসী সেই ভাণ্ডারী। আমাদের প্রাণ রক্ষার ভাণ্ডারী। মাসে রাজ্য হইতে এক একবার এক একজন দৃঢ় বিশ্বাসী গুপ্ত চর গোপনে নিশাকালে তাঁহার কাছে আসি। রাজ কার্য্যের সমাচার দেয়, প্রত্যোরে উপযুক্ত উপদেশ লইয়া যায়। সিংহকেতু পরাভূত হইবার পর যাহা যাহা করিতে হইবে, ঐরূপ বন্দোবস্তের দ্বারা সেখানে তাঁহার সমস্ত বন্দোবস্ত ঠিক হইয়া রহিয়াছে।

কুমারীরা প্রবোধিতা হইলেন। দিন গত হইতে লাগিল। ছোট ছোট সাতটি রাজকুমার কোথায়, কুমারীরা একদিন ভৈরবী সমীপে সেই প্রশ্ন উত্থাপন করিলেন। সন্ন্যাসী জানেন, অবসর উপস্থিত হইলেই আটটিতে আমরা এই তপোবনেই একত্র মিলিত হইব।

প্রদেশে আর ডাকাতের উপদ্রব নাই। ভৈরবীর কাছে শপথ পদ্ম হইয়া যাহারা দস্যু বৃত্তি পরিত্যাগ করিল ইতিপূর্ব্বে তৎ প্রদেশের সমস্ত ডাকাতের দল একত্র করিয়া তাহারা আপনাদের দল পরিপুষ্ট করিয়াছিল. প্রধানেরা হস্ত প্রক্ষালন করিলে অধীনেরাও কাজে কাজে হস্ত প্রক্ষালনে বাধ্য হইল। সত্য সত্য সিংহকেতু নিঃসহায় হইলেন একজন ডাকাত মধ্যে মধ্যে ভৈরবীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে, পরামর্শ করে, চরণেও প্রণাম করে। ভৈরবীর পূর্ব্ব অনুমানটি ঠিক দৈববাণীর ন্যায় সিদ্ধ হইল। বিদ্রোহি সিংহকেতু বিদ্রোহি দস্যু দল হইতে বিচ্যুৎ হইয়া ভগ্নান্তঃকরণে ভ্রাতৃ রাজ্য দখল করিতে গিয়াছিলেন, পুরী অরক্ষিত ছিল না, সিংহকেতু প্রবেশাধিকার পান নাই, অমাত্যের আদেশে রক্ষকেরা তাঁহাকে বন্দি করিয়া একটি রমণীয় নাট্য শালায় আবদ্ধ রাখিয়াছে। তাঁহার মনোরঞ্জনের জন্য মধ্যে মধ্যে নৃত্যগীত হয়, দ্বারে কিন্তু অষ্ট প্রহর অষ্ট অষ্ট প্রহরী সিংহকেতু কয়েদ।

তিনমাস অতিত। মালদহের তপোবনে নবচন্দ্র সদৃশ্য আটটি রাজ পুত্র একত্র সম্মিলিত। এতদিন যিনি ভৈরবী ছিলেন, তিনিই সকলের অগ্রজ। কর্ণার রাজ্যের অনেক রকম অবস্থা হইয়া গিয়াছে। যে সময়ের কথা, কর্ণার সে সময়ে একজন রাজার অধিকারে ছিল না, বিরোধ বিপ্লবে খণ্ডে খণ্ডে পাঁচ সাতজন রাজা উপাধী গ্রহণ করিয়াছিলেন। এক খণ্ডের নাম সারদা রাজ্য। পুণ্যবান ভাগবত সিংহ সেই সারদা খণ্ডে রাজত্ব করিতেন, তাঁহার সহদর কনিষ্ঠ ভ্রাতা সিংহকেতু। ভাগবত সিংহের এই আটটি পুত্র জ্যেষ্ঠ যুবরাজ বিরাজকুমার। রূপে গুণে আটটিতেই অভিন্ন। কুমার বিরাজকুমার বঙ্গদেশে ভৈরবী সাজিয়া ছিলেন, বাকী কুমারেরা ভিন্ন ভিন্ন বেশে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন নামে প্রচ্ছন্ন ভাবে ছিলেন।

রাজা ভাগবতের লোকান্তর গমনের পূর্ব্বে ঐ আটটি পুত্রের বিবাহ সূচনা হইয়াছিল। রাজবংশে স্বয়ম্বর প্রথা থাকে, কিন্তু এই আটটি রাজকুমারের পরিণয় সূচনা এক প্রকার দৈব সংযোগ সূচক করনাটের আর একখণ্ডে আর একজন রাজা ছিলেন, তাঁহার নাম নরেশ্বর দেব। সেই নরেশ্বরের আটটি

কন্যা। সারদা রাজ্যের রাজ পুত্রেরা প্রায়ই অবকাশ ক্রমে নরেশ্বরের রাজ্যখণ্ডে বায়ু বিহারে যাইতেন, অবিবাহিত; সে রাজ্যের রাজকন্যারা স্বাধীনা, নরেশ্বরের আটটি কন্যাও রমণীয় ক্ষেত্রে বায়ু বিহারে যান, অবিবাহিতা, এক একদিন অষ্ট রাজকুমারের সহিত অষ্ট রাজকুমারীর পুষ্প কুঞ্জে দেখা হয়, ক্রমে ক্রমে ঘনিষ্টতা হয়, ক্রমে ক্রমে কথা হয়, ক্রমে ক্রমে অনুরাগের সঞ্চার; পরস্পরের প্রতি পরস্পরের নবযৌবন সুলভ প্রেমের অনুরাগ। তাহার পরেই রাজার মৃত্যু, রাজ্য বিভ্রাট, রাজবিদ্রোহ, রাজ পুত্রগণের নির্ব্বাসন, বিষম অনর্থকর ঘটনা। বিবাহ সূচনা কেবল সূচনা মাত্রেই লিপ্ত হইয়াছিল, কিন্তু প্রেম পিপাসী রাজ পুত্রেরা, আর পিপাসিনী রাজকুমারীরা শুভ মিলনের পূর্ব্বেই মনে মনে বিরহ যন্ত্রণা অনুভব করিতেছিলেন; রাজকুমার অপেক্ষা রাজকুমারীরা বরং প্রেমানুরাগ প্রদর্শন পথে অনেক বেশী দূর অগ্রগামিনী। রাজপুত্রেরা ছদ্মবেশে বঙ্গদেশে গুপ্তভাবে অবস্থান করিতেছেন, একটি রাজকুমার ভৈরবী সাজিয়া মালদহের অরণ্যে এক সন্ন্যাসীর সহিত বাস করিতেছেন করনাটে রাজকন্যারা কোন সূত্রে এই সংকল্প প্রাপ্ত হইয়া গোপনে পুরুষ বেশে বঙ্গদেশে আসিয়াছেন, পুরুষ বেশে নারী বেশধারিনীকে প্রেম সম্ভাষণ করিয়াছেন, ইহাতেই তাঁহাদের বেশী অনুরাগের যথেষ্ট পরিচয় হইতেছে।

দিন স্থির হইল। যাত্রা করিবার তিনদিন থাকিতে রাজকুমার বিরাজকুমার একাকী বনপ্রান্তে পরিভ্রমণ করিতেছেন, সন্ধ্যার পূর্ব্বেই একখানি অর্দ্ধচন্দ্র আকাশে নিভাষিত হইয়াছে, বনস্থলে অল্প অল্প আলো পড়িতেছে, এমন সময় একটি লোক আসিয়া তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইল। নিকটস্থ হইয়া দর্শন মাত্র রাজপুত্র চিনিলেন, সেই দস্যু দলের নূতন সাধু লুলুপ কবিভূষণ। স্থান নির্জ্জন সময়টিও সুন্দর, আর কোথাও না গিয়া রাজপুত্র সেইখানেই দাঁড়াইলেন, লুলুপকে বলিলেন, উত্তম সময়ে আসিয়াছ, আমি তোমার জন্য উদ্বিগ্ন ছিলাম; তৃতীয় দিবসের প্রাতঃকালে তুমি তোমার দলের সমস্ত লোক গুলিকে সঙ্গে লইয়া তপোবনে আসিও। আমিই সেই ভৈরবী, এখন আমি করনাটের রাজকুমার বিরাজকুমার। তৃতীয় দিবসের অপরাহ্ণে আমাদের করনাট যাত্রা; প্রাতঃকালে আসিও, সকল গুলিকে সঙ্গে আনিও, সকলেই আমাদের সঙ্গে করনাটে যাইবে; সেখানে আমি তোমাদের সকলকেই এক এক জমিদারী লিখিয়া দিব। এখন বিদায় হও, তৃতীয় দিবস, স্মরণ রাখিও।

লুলুপ বিদায় হইল, রাজ পুত্র আশ্রমে আসিলেন। রাত্রি প্রভাত হইল,

আর একটি রাত্রি আসিল, সেটিও বিদায় হইল, তৎপর দিবস প্রভাতে স্বসৈন লোলুপ আসিয়া তপোবনে দেখা দিল। রাজ পুত্র বলিলেন ওরূপে থাকিলে তপোবন মানাইবে না, তোমরা সকলে সন্ন্যাসী সাজো। আমি এখনো গৈরীক বসন ত্যাগ করি নাই। এই বলিয়া স্বহস্তে তিনি সকলকে নূতন গৈরীক বাস পরাইয়া দিলেন। অপরাহ্নে করনাট যাত্রা। আটটি রাজপুত্র আটটি রাজপুত্রি একটি রাজমন্ত্রি, এক সঙ্গে যাত্রা করিলেন, কুমারীদের অশ্বগুলিকেও বিস্মৃত হইলেন না। অনুচর হইল দুই শত সন্ন্যাসী। যথা সময়ে রাজকুমারেরা স্বরাজ্যে উপস্থিত হইলেন, রাজ কন্যারা পিতৃভবনে গমন করিলেন, রাজমন্ত্রী আপন পদ পুনঃ প্রাপ্ত হইলেন।

কুমার বিরাজকুমার সিংহাসনে বসিলেন, অনুজ সপ্তভ্রাতা সুপ্রসন্ন মনে তাঁহার অনুগত হইয়া রহিলেন। সন্ন্যাসীরা প্রত্যেকে পঞ্চাশ বিঘা পরিমাণ নিষ্কর জমিদারী জায়গীর পাইল। শুভদিনে শুভক্ষণে পূর্ব্ব মনোনীত অষ্টনায়িকার সহিত অষ্টরাজ কুমারের শুভ পরিণয় পরম সমারোহে সুসম্পাদিত হইল। সকলেই সুখী হইলেন। অসুখী সিংহকেতু কারাগারে বাঁচিয়া রহিলেন।

গীত।

লেখক—শ্রীমহেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

খাম্বাজ—একতালা।

(তুমি) পুরুষ কি নারী, কিরূপ তোমারি,
চিনিতে নারিনু আসি' এ ধরায়।
সেবা দেয়, স্থান, কোথা অবস্থান,
কোথা আবাহন, কোথা বা বিদায়।
মূলাধার তুমি অনাদি অনন্ত,
(কিন্তু) মূল কোথা তোমার, কোথা আদি অন্ত,
(আমার) বুদ্ধি নাই ঘটে করি যে তদন্ত,
সুধুই রহিনু জড় প্রায়॥

নানা রূপাধারে, নানা রূপাহারে,
নানা বিধি মতে নানা উপচারে,
সুকঠিন বরতাবলম্বন,
সকলিত দেখি ভাসিয়া যায়ঃ—
(কভু) নিরখি আঁধার নয়ন বরিয়া,
কখন পলক অল্প ফেলিয়া,
কখন অরধ নয়ন করিয়া
করি কত ধ্যান পাইতে তোমায়॥ (কিন্তু পুরুষ কি নারী ইত্যাদি)
বৃহৎ হরমে অনুচ্চ মন্দিরে,
পরণ মণ্ডপে অথবা কুটীরে,
কখন পাথারে বাটীর বাহিরে
কত স্থানে পূজা করি তোমায়ঃ—
বসন্ত শরত দুই ঋত্বাগমে,
দশভূজা হয়ে এস মর্ত্তভূমে,
কভু জল যানে কভু তুরঙ্গমে,
কভু আগমন কর দোলায়॥ (কিন্তু—)
কভু এলোকেশে কৃষ্ণ বর্ণ কায়,
দিগম্বরী রূপে লোল জিহ্বায়,
নরশির মালা পরিয়ে গলায়,
নরকরে করি' কটি আচ্ছাদনঃ—
বাম করে অসি নরমুণ্ড ধরি,
যাম্যে বরাভয়ে দেবে তুষ্ট করি,
চরণ রাখিয়ে পতি বক্ষ পরি,
কালীরূপে তুমি এস ধরায়॥ (কিন্তু—)
হেম সিংহাসন কখন পাতিয়ে,
ফুল শয্যা তাহে যতনে রচিয়ে,
আবীর কুমকুমে সুরঙ্গে রঙ্গিয়ে,
প্রেমে আবাহন্ করিলে তোমায়ঃ—
(তুমি) বিবিধ ভূষণে ভূষিত হইয়ে,
মোহন মুরলী শ্রীকরে ধরিয়ে,

শ্রীমতী রাধারে বামে বসাইয়ে,
বঙ্কিম সুঠামে বস হে দোলায়॥ (কিন্তু—)
এক পক্ষে রাখি তুলসী চন্দন,
জবা বিল্বদল অন্যে অগণন, (আবার)
(আবার) আঁকি এ নাশায় তিলক সুন্দর,
কখন ত্রিপুণ্ড্র ভালে শোভা পায় ঃ—
(আবার) অসিতে বাঁশীতে করি ভেদাভেদ,
(আবার) প্রণয় না হতে ঘটাই বিচ্ছেদ,
(তাই) তম নাশ করি নাশি মতভেদ,
ধরম হীনে রাখ রাঙ্গা পায়॥

ধূলা খেলা।

লেখক—শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক।

মাধবী তলায় আপনার মনে রাণু চপু দুটী বোনে,
খেলিছে পুলকে কত সুখ খেলা মৃন্ময় গৃহ কোণে।
উপরে মাধবী শ্যাম স্নেহ-সম ছায়া দিতেছে গো ঢালি,
পতিত কুসুম বালিকা দুটীরে দিতেছে স্নেহের ডালি।
ফুল্ল প্রজাপতি, শিলিমুখ গণ ললিত লতিকা পরে,
হাসিছে খেলিছে নাচিছে গাইছে আলোকে পুলক ভরে।
নীরবে একাকী শাক পাতা লয়ে করিতেছে রাণু খেলা,
মিছার বাজারে মিছে হাট তরে চপু লয়ে গেছে ডালা।
ধুলি অন্নরাশি রয়েছে সাজান ধুলিময় ধরা পরে,
ফুল তৃণ পাতা মাটীর বাসনে শোভিছে থরে থরে।
দেখিয়া আমারে সচকিতে চাহি হাসি হাসি রাণু বলে,
"খেলিতেছি মোরা মিছামিছি খেলা ধুলায় মাধবী তলে।"
বালিকার কথা শ্রবণ বাহিয়া মরমে পশিল মোর,
জাগাইল যত পুরাতন স্মৃতি ভাঙ্গায়ে ঘুমের ঘোর।

ভাবিলাম এই অবোধ বালিকা সাত বছরের মেয়ে,
জানে এই সব ধুলি খেলা মিছে মোরা দেখিনাক চেয়ে।
অখিল সংসার সবি মিছামিছি, সকলি ধুলার খেলা,
দু দিনের পরে সবি ভেঙ্গে যাবে ফুরাইয়া যাবে মেলা।
ধুলিময় দেহ ধুলায় মিশিবে কিছু নাহি রবে ভবে,
কেন মিছে এত দম্ভ কোলাহল কেন ব্যাকুলতা তবে।
গাছ শুকাইবে পাতা ঝরে যাবে ফুল নীচে যাবে পড়ি,
ধূলার সকলি ধুলায় মিশিবে কেন মিছে বাড়াবাড়ি।

আয়ুর্ব্বেদ সমালোচনা।

লেখক—শ্রীতারানাথ চক্রবর্ত্তী।

জীবনের বিশেষ বিবরণ এবং তাহার হিতাহিত জ্ঞান বিষয়ক শাস্ত্রকেই আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র বলে। মহর্ষি চরক বলিয়াছেন ঃ—

"হিতাহিতং সুখং দুঃখমায়ুস্তস্য হিতাহিতং।
মানবঞ্চ তঞ্চ যত্রোক্তমায়ুর্ব্বেদঃ সউচ্যতে॥" ইতি॥

এইরূপ যৌগিক অর্থের দ্বারা যদিও আয়ুর্ব্বেদ শব্দে যাবতীয় চিকিৎসা শাস্ত্রকেই বুঝাইতে পারে, তথাপি লোক পরম্পরায় রূঢ় শব্দের ন্যায় ইহা কেবল সনাতন-ধর্ম্ম প্রসূত আর্য্য মহর্ষিগণের প্রণীত চরক সুশ্রুত প্রভৃতি চিকিৎসা শাস্ত্রকেই বুঝায়। ইহাও একটি আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রের আদিমত্বের পরিচয় হইতে পারে।

বর্ত্তমান সময়ে আমাদের দেশে আয়ুর্ব্বেদীয়, এলোপ্যাথিক্, হোমিও প্যাথিক্ এবং অবধৌতিক এই চারি প্রকার চিকিৎসা প্রণালী প্রচলিত থাকিলেও সমুন্নত রাজশক্তির সাহায্যে আজ এলোপ্যাথিকই প্রায় সমগ্র ভারতে অর্দ্ধাসন গ্রহণ করিয়াছে। একদিন হেকিমীও ইহার অধিক সৌভাগ্যশালী হইয়া দাঁড়াইয়াছিল।

চিনি দ্বারা যদি রোগ আরোগ্য হয় তবে তিক্ত সেবনের প্রয়োজন নাই। ইহা আমরাও স্বীকার করি। কিন্তু ঐ চিনির পরিণাম ফল অনুসন্ধান করা কি বুদ্ধিমানের কার্য্য নহে? একটি রোগ হঠাৎ নিবৃত্তি করিয়া আজীবন তাহার উপসর্গ ভোগ করাই শ্রেয়স্কর কিম্বা চারিদিন বিলম্বে নিবৃত্তি করাইয়া আজীবন

আরোগ্য লাভ করাই শ্রেয়স্কর? জীবন অমূল্য রত্ন। তাহার উদ্দেশে যে কোন একটি অজ্ঞাত কুলশীল দ্রব্য ব্যবহার করা কি মূঢ়তার কার্য্য নহে? আশা করি আমার এই প্রশ্ন কয়েকটির উত্তর পাঠক পাঠিকাগণ কেবল মুখে মুখে না দিয়া একটুক ব্যবহারিক প্রয়াসও করিবেন। পৃথিবী, জল, বায়ু এই তিনটির সঙ্গে আমাদের দেহের একটি অনির্ব্বচনীয় সম্বন্ধ রহিয়াছে। যেহেতু তাহাদের পরমানুদ্বারাই আমাদের শরীর গঠিত। আমি যে দেশীয় লোক সেই দেশীয় পার্থিব-পরমাণ্বাদিই আমার শরীর ঘটক সুতরাং তাহার সহিত আমার সম্বন্ধ আরও নৈকট্য। যে দেশের প্রকৃতি যেরূপ সে দেশের দ্রব্যগুলিও তৎস্বভাবাপন্ন হইয়া থাকে। সুতরাং এক দেশীয়-দ্রব্য প্রকৃতির সহিত মানবীয় প্রকৃতির সম্বন্ধ অতিশয় নৈকট্য। গ্রীষ্ম প্রধান দেশজাত দ্রব্য তদ্দেশীয় মানবের পক্ষে হিতকর। কিন্তু অন্য দেশীয় মানবের পক্ষে তাহা অসহ্য এবং অনিষ্টকারক হইবে। ইহার উদাহরণ যদি দেখিতে চান তবে একবার ভারতে অজ্ঞাত কুলশীল প্লেগ, ম্যালেরিয়া প্রভৃতি রোগ সমূহেরদিকে দৃষ্টিপাত করুন। যাহারা অদ্যও সম্পূর্ণ রূপে ভারতবাসীর নিকট পরিচিত হইতে পারে নাই। ভরসা করি আজ স্বদেশীর সমাদরের দিনে আপনারা আপনাদের স্বদেশীয় "আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসাটিকেও" একবার স্মৃতিপথে আনিবেন। যক্ষ্মা, মেহ প্রভৃতি দুরারোগ্য রোগ গুলিতে যাহার সাহায্য ভিন্ন উপায়ান্তর নাই।

যে সকল উপাদানের দ্বারা ঔষধ প্রস্তুত হয় সেই প্রত্যেক উপাদানেতেই আংশিক ভাবে সেই ঔষধের গুণ রহিয়াছে। যেহেতু কারণ গুণের দ্বারাই কার্য্য গুণ উৎপন্ন হইয়া থাকে। যে রোগে যে ঔষধটি হিতকর (বিধিমত সেবন করাইতে পারিলে) তাহার উপাদান গুলিও যে সেই রোগের হিতকর হইবে তাহাতে আর সন্দেহ নাই। এই জন্য অনেক স্থলে বটিকা দিতে কোন একটি আবশ্যকীয় দ্রব্যের অভাব থাকিলে ব্যবহার কালে তাহা সহপান রূপে প্রযুজ্য হয়। অনেক সময় অতিভীষণ দুরারোগ্য রোগও বটিকাদির সাহায্য ভিন্ন কেবল দ্রব্য গুণের দ্বারাই আরোগ্য হইতে দেখা গিয়াছে। ঔষধও একটী দ্রব্য সমুহেরই প্রক্রিয়া বিশেষ ঘটিত অবস্থান্তর মাত্র।

বড় লোকেরা একটি অঙ্গুলিমাত্র গরম হইলেও ডাক্তার কবিরাজের উদ্দেশে সহস্র সহস্র টাকা বিসর্জ্জন করিতে কুণ্ঠিত নহেন। কিন্তু অকিঞ্চন গরীব এবং মধ্যবিত্ত লোকদিগের পক্ষে প্রবল দুরারোগ্য রোগেও একবার ডাক্তার কবিরাজ ডাকা যেন যুগান্তর! এরূপ অনেক রোগও আছে যে তাহার অবস্থা দেখিতে

অতি ভয়ানক হইলেও তাহা একটি সাধারণ দ্রব্য গুণের দ্বারা নিবার্য্য। অভিজ্ঞতা থাকিলে সেরূপ স্থলে বিনা অর্থ ব্যয়েও চলিতে পারে। রত্ন প্রসবিনী ভারত ভূমির কোন প্রান্তেও বন্যৌষধির অভাব নাই। আমরা রোগ বিশেষে স্বয়ং পরীক্ষিত অথবা গুরু মুখাৎ জ্ঞাত কতক গুলি দ্রব্যের গুণ এবং তাহার ব্যবহার বিধি প্রকাশ করিব। আশা করি সহৃদয় পাঠক পাঠিকাগণ ইহা একবার পরীক্ষা না করিয়া ক্ষান্ত হইবেন না।

অলাবূ। অলাবূ আর তুম্বী এই দুইটি লাউয়ের আভিধানিক নাম। ইহা দীর্ঘ এবং বর্ত্তুলাকার ভেদে দুই প্রকার। বর্ত্তুলাকার অপেক্ষা দীর্ঘাকায়া অলাবূর স্বাদ অধিক মধুর। হিন্দু শাস্ত্র মতে বর্ত্তুলাকার অলাবূ অখাদ্য। বাঙ্গালায় সর্ব্বত্রই ইহাকে লাউ বলে। আসামে পাণি লাউ বলে। হিন্দীতে কটু, মিঠি, তোম্বী লম্বা লৌআ, গ্রহা লৌআ, ও রামতোরই বলে। মহারাষ্ট্রে দুধ্যাভোংপলা বলে। গুজরাটে দুধীয়ুং ও দুধলুং বলে। কর্ণাটে কড়ং উবলকারি বলে। তৈলঙ্গে তিয়াতু খড়ীকায়া বলে। ফরাসীতে কুহুশিরিন্ কুদুএডরোজ বলে। আরবীতে যুক্তিনেহুলুকরা বলে। ইংরাজীতে Vhitegonrd বলে। ল্যাটিনে Gneurdita lagenaria বলে। ডাক্তারীতে Cagenariavulgaris (ক্যাগেনেরিয়া ভল্‌গেরিস) বলে। উড়িষ্যায় লাউ বলে। ইহা মিষ্ট আহ্লাদজনক পিত্তশ্লেষ্মা নাশক গুরু বৃষ্য, রুচিকারক, এবং এবং ধাতু পুষ্টিকারক। ইহা সর্ব্বত্রই তরকারী রূপে ব্যবহৃত হয়। শীতকালে সর্ব্বত্রই প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। শীত প্রধান স্থানে ইহার বিস্তার আরও অধিক। শরৎকালে জলশূন্য ভূমিতেই ইহা বীজের দ্বারা জন্মে। কচিলাউ দুগ্ধসহ পাক করিয়া খাইলে বীর্য্য বৃদ্ধি হয়। পুরাতন লাউয়ের গাছ ছেদন করিলে তাহা হইতে যে প্রচুর পরিমাণে জল পড়ে সেই জল উন্মাদ রোগীর স্নান পানে বিশেষ হিতকর। পানকালে কিঞ্চিৎ চিনি কিম্বা মিশ্রি সংযোগ করিয়া দিলে, বিশেষ ফল দায়ক হয়। ওলাউঠা রোগে মূত্রবন্ধ হইয়া অনেক রোগী মারা যায়। সেই অবস্থায় ক্ষুদ্র লাউ ফলের মস্তক ছেদন করিয়া তাহাতে কিঞ্চিৎ সোডা সংযোগ করিয়া তাহা দুই তিনবার উত্তম রূপে নাভিতে মর্দ্দন করিলে অচিরেই মূত্র হয় ইহা পরীক্ষিত।

অশোক। হেমপুষ্প, বঞ্জুল, তাম্রপুষ্প কঙ্কেলি পিণ্ডিপুষ্প, গন্ধপুষ্প ও নট এই কয়েকটি অশোকের আভিধানিক নাম। ইহা শীতবীর্য্য. তিক্ত, ধারক বর্ণরঞ্জক, কষায়রস এবং ত্রিদোষ, অপচী, পিপাসা দাহ, ক্রিমি, শোষ, বিষ ও রক্তদোষ নাশক।

ইহা গ্রাম্য বন্য উভয়বিধ জলশূন্য ভূমিতেই জন্মে। বসন্তকালে ইহার প্রচুর পরিমাণে রক্তবর্ণ ফুল জন্মে। বসন্তের শেষ ভাগে বীজ হইতে বহু পরিমাণে চারা জন্মে ইহার শিকড় বহু নিম্নগামী। ইহা বাঙ্গালার সর্ব্বত্রই বিখ্যাত। আসামে ইহাকে অহক বলে। হিন্দুস্থানে অশোগি বলে। মহারাষ্ট্রে অশোক বলে। গুজরাটে আশুপালো বলে এবং রাতাংফুললো বলে। ল্যাটিনে Guatterera Longifolia বলে। ডাক্তারীতে সারাকা ইণ্ডিকা (Saracal indica) বলে। উড়িষ্যাতে অশকা বলে। ইহাতে একটি আশ্চর্য্য রক্তধারক গুণ থাকাতে স্ত্রীলোকদিগের রক্তপ্রদর রোগে ইহার ছালের ক্বাথ বিশেষ উপকারক। রক্তপ্রদরে অশোক পুষ্পের রস ৫ তোলা কিঞ্চিৎ মধুসহ সেবন করিলে অল্প দিনেই বিশেষ উপকার দর্শে বাধক রোগেও ইহার উপকারিতা আছে।

অর্জ্জুন। ককুভ, বীরবৃক্ষ, নদীসর্জ্জ, ইন্দ্রদ্রু বীর ধবল এবং অর্জ্জুন পর্য্যায়ক সমস্ত শব্দ অর্জ্জুন বৃক্ষের আভিধানিক নাম। ইহা শীত বীর্য্য, হৃদয়গ্রাহী ক্ষত, ক্ষয়, বিষ, রক্তদোষ, মেদ দোষ মেহ, ব্রণ এবং কফপিত্ত নাশক। ইহা গ্রাম্য বন্য উভয়বিধ জলশূন্য ভূমিতেই জন্মে। আকার বৃহৎ বৃক্ষটি ধবল বর্ণ। ইহার স্বাভাবিক একটি চিহ্ন এই বৃক্ষটির এক পার্শ্বক্ষত, বিক্ষত। অপর পার্শ্বটি সুন্দর পরিষ্কার। এ বিষয় এরূপ একটি কিম্বদন্তী আছে যে, তৃতীয় পাণ্ডব শ্রীকৃষ্ণ বিরহশোকে ব্যাকুল হইয়া স্বয়ং অর্জ্জুন বৃক্ষরূপ ধারণ করিয়াছেন। ঐ ক্ষত চিহ্নগুলি তাঁহার বক্ষস্থিত শরবিদ্ধ চিহ্ন। স্বাভাবিক অর্জ্জুন বৃক্ষের পত্র হইতে দুই এক বিন্দু জল পড়ে। কিম্বদন্তী বাচকেরা তাহা তাহারই রোদনাশ্রু বলিয়া ব্যাখ্যা করেন। বর্ষাকালের প্রারম্ভেই ইহার পুষ্প হইতে বহুতর ফল জন্মে, এবং তাহা হইতে চারা উৎপন্ন হয়। বাঙ্গালা, আসাম এবং উড়িষ্যাতে ইহা অর্জ্জুন নামেই বিখ্যাত। হিন্দুস্থানে ইহাকে কোহ এবং কৌহ বলে। মহারাষ্ট্রে অর্জ্জুন সাদড়া ও সার ঢোল বলে। কর্ণাটে তাংরেমণ্ডি বলে। গুজরাটে কড়ায়ো বলে। তৈলঙ্গে মট্টিচেট্টু বলে। ডাক্তারীতে Farminalia Arjuna (ফার্ম্মেনেলিয়া) অর্জ্জুন বলে। ইহার বায়ু অতি শীতল এবং পরিষ্কার। অনেক ঔষধি তত্ত্ববিদেরা বাটীর সম্মুখে অর্জ্জুন বৃক্ষ রোপণ করেন। ইহা বহু স্থান ব্যাপক এবং সমুন্নত; সুতরাং একটু দূরে রোপণ করা কর্ত্তব্য।

(ক্রমশঃ)

ধন।

লেখক—শ্রীনারায়ণচন্দ্র বিদ্যারত্ন।

রে ধন রে পদ,
কি কুহক তোর;
এনে বাঁধে তোর ফাঁদে,
অরুণ, বরুণ, চাঁদে,
কেহ হাসে, কেহ কাঁদে
নিত্য তোর তরে।
প্রেমের পরশমণি
তোর আলো—আমি গণি
ধরণী পরে;
তোর তরে ধর্ম্ম ভুলে,
পাপেরে হৃদয়ে তুলে,
প্রেম দিয়ে মন খুলে,
যতন করে।
অজ্ঞানের তুই জ্ঞান,
অমানীর তুই মান,
গুণ হীনে গুণবান
তো বিনে কে করে—
স্বার্থভরা ধরণীরে তুইত ভুলাস্,
অহরহঃ দশদিকে তুইত ঘুরাস্,
তোর কুহকে প'ড়ে ভ্রান্ত লোক না বুঝিতে পারে,
ধর্ম্ম বিনা ধন মান জলবিম্ব অকূল পাথারে।

মৃত্যুর-প্রতি।

লেখিকা—শ্রীমতীচারুহাসিণী গুপ্তা।

মৃত্যু!

কেন বল আকর্ণিয়া তোমার এ নাম,
আতঙ্কে শিহরে উঠে মানব পরাণ?
ও নামে কেন বা ভয়,
কেন বা সকলে কয়,
"মঙ্গল নিদান তুমি"—তোমা মঙ্গল,—
কেন এত ডরে তোমা মানব সকল?

(২)

মানবের চির-বন্ধু তুমি হে মরণ!
কেন বা তোমারে মোরা ডরাই এমন!
তুমি চির প্রেমময়,
কত স্নেহে ও হৃদয়—
পূর্ণিত মোরা তাহাতো বুঝিতে না পারি।
তাই মৃত্যু! ভয়ঙ্কর বলে তোমা ডরি॥

(৩)

জীবনের যত কিছু বাসনা অনল,
নিভায়ে জুড়ায়ে দাও যাতনা সকল।
তুমি চির মুক্তি দাতা,
জীবন-তাপের ত্রাতা,
অসীম করুণা রাশি অন্তরে তোমার।
তুমিই সম্বল শুধু সন্তাপী জনার॥

(৪)

অতুল সৌন্দর্য্যাধার—তুমি হে মরণ!
তোমারি অনন্ত রূপে উথলে ভুবন।
শারদ জ্যোৎস্না রাশি,

বসন্তের ফুল হাসি,
তোমারি ছায়াতে মাখা, তুমিই সকলি।
সমস্নেহে সকলেরে তুমি লহ তুলি।

(৫)

উদার গভীর প্রেম—তোমার মরণ!
ভাবিলে পুলক ভরে শিহরে মরম।
নাহি চাহে কোন জন,
কার' সাধনার ধন,
কেহ সারাপ্রাণে করে তোমারে ধেয়ান।
কেহ গর্ব্বভরে তোমা করে হেয় জ্ঞান॥

(৬)

কেহ আতঙ্কে তোমা ভয়ঙ্কর হেরে।
কেহ ভালবাসে তোমা, কেহ ঘৃণা করে॥
সমস্নেহে সকলেরে,
লহ তুমি যত্ন করে,
চির প্রেমময় মৃত্যু! তোমার নিলয়।
সকলে তোমার কাছে সমভাবে রয়॥

(৭)

শত্রু হোক মিত্র হোক্ ভেদ নাই কোন।
কি প্রেম-প্রবণ-হৃদি তোমার মরণ!
নাহি রাখ কোন আশা,
নাহি চাহ ভালবাসা,
অনন্ত মুক্তির পথ দিতেছ সবারে।
হিংসা, ঘৃণা, গর্ব্ব, কিছু নাহিক অন্তরে॥

(৮)

তুমি হে মরণ! চিরমুক্তির আগার।
অশান্তি গরল যত সবি শেষ কর॥
কঠোর কর্ম্মের শেষ,
নাহি বাসনার লেশ,
চিরশান্তি! চিরমুক্তি তুমিই কেবল।
তুমি শেষ! তুমি স্বর্গ! তুমিই সকল॥

———

বর্ত্তমান কনোজ ও বালাপীর*।

লেখক—শ্রীধর্ম্মানন্দ মহাভারতী।

(তৃতীয় প্রস্তাব।)

—ঃ-*-ঃ—

দ্বিতীয় প্রস্তাবে যে সংস্কৃত শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া অনুবাদ দেওয়া হইয়াছে তাহা মনোযোগ পূর্ব্বক পাঠ করিলে পাঠকেরা অতি সহজে নিম্ন লিখিত সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন। রাজা আদিশুর, বল্লালসেন বা লক্ষণসেন, ইহাদের কেহই বৈদ্য বা ব্রাহ্মণ ছিলেন না; ইহাঁদের কাহারও ধর্ম্ম বিশ্বাস বৌদ্ধমতানুযায়ী ছিলনা ইহাও ধ্রুব সত্য। ইহাঁরা সকলে হিন্দু এবং কায়স্থ ছিলেন। আমরা অকাট্য প্রমাণ দিয়া এ সকল প্রয়োজনীয় কথা স্থিরতর করিতে পারি, কিন্তু বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য অন্যতর, এ কারণ বশতঃ তাহা হইতে ক্ষান্ত রহিলাম। বিশেষতঃ ইতিপূর্ব্বে বহু কৃতী লেখকের দ্বারা এই উক্তি প্রামাণিক বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াগিয়াছে। অনেকের বিশ্বাস, রাজা আদিশুরের সহিত কান্যকুব্জাধিপতির কুটুম্বিতা ছিল; উদ্ধৃত সংস্কৃত শ্লোক মনোযোগ সহকারে পাঠ করিলেই পাঠকেরা বুঝিতে পারিবেন, একথা ভ্রমাত্মিকা; কান্যকুব্জের নরপতিকে আদিশুর যে পত্র লিখিয়াছিলেন তাহাতেই স্পষ্ট বুঝা যায়, আদিশুর তাঁহার অপরিচিত। রাজা আদিশুর কান্যকুব্জাধিপতির নিকট হইতে পঞ্চ ব্রাহ্মণ প্রার্থনা করিয়া পাঠাইয়াছিলেন একথাও ঠিক নহে, তিনি "কতিপয় ব্রাহ্মণ প্রেরণ" জন্য পত্র লিখিয়াছিলেন, কান্যকুব্জের রাজা পঞ্চজন মাত্র পাঠাইয়া দিয়া আদিশুরের অনুরোধ

* এই প্রবন্ধের ১ম ও ২য় প্রস্তাবে মুসলমান ভ্রাতৃবৃন্দের মনো কষ্টদায়ক কোন কোন কথা আছে এইরূপ অভিযোগ আমাদের শ্রুতি গোচর হইয়াছে। শারীরিক অসুস্থতা বশতঃ আমি স্বয়ং উপরোক্ত সময়ে জন্মভূমির প্রুফ সংশোধন করিতে বা দেখিতে পারি নাই। আমাদের বেতনভোগী কর্ম্মচারীর উপর ঐ কার্য্যের ভার অর্পিত ছিল এবং তিনিও শ্রীযুক্ত মহাভারতী মহাশয়ের প্রবন্ধ সংশোধনে সাহসী হন নাই। জাতি বা ধর্ম্ম বিশেষের নিন্দা জন্মভূমির আদৌ উদ্দেশ্য নহে, সে কারণ মুসলমান ভ্রাতৃবৃন্দের নিকট আমাদের বিনীত প্রার্থনা এই যে তাঁহারা উপরোক্ত অবস্থায় এ বিষয়ে আমাদের ত্রুটি গ্রহণ না করেন। জং সং

রক্ষা ও তাঁহার মনস্তুষ্টি বিধান করিয়াছিলেন। পঞ্চজন ব্রাহ্মণের মধ্যে কেবল ভট্টনারায়ণ অবিবাহিত ছিলেন, অবশিষ্ট চারিজন বিবাহিত, কিন্তু কাহারও সহধর্ম্মিণী জীবিতা ছিল না। এই বিপ্র চতুষ্টয়ের মধ্যে কাহারও পুত্র জন্মিয়া ছিল কি না তাহা নিশ্চয় রূপে বলা যায় না, কিন্তু বঙ্গদেশে আসিবার সময় তাহাদের কেহই অপুত্রক আইসেন নাই ইহা ধ্রুব সত্য; অনেকে এ কথায় প্রতিবাদ করিয়াছেন, কিন্তু প্রতিবাদক মহাশয়েরা তাহাদের অভিমত সমর্থন জন্য যে প্রমাণ দেন তাহা সংশয় শূন্য নহে। সেই পুরাকালে রেলওয়ে, তার, ডাকঘর প্রভৃতি ছিল না, পথ দুর্গম ও বিপদাচ্ছন্ন ছিল, এই কারণে পঞ্চ ব্রাহ্মণও তাঁহাদের সহচরগণ ধনুর্ব্বাণ সঙ্গে লইয়া পথাতিক্রম করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, ইহাতে তাঁহাদের ব্রাহ্মণত্বের হানি বা ধৃষ্টতা প্রদর্শন হয় নাই। তাম্বুল চর্ব্বণ ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয়ের পক্ষে নিষিদ্ধ নহে, সুতরাং, তাঁহারা তাম্বুল চর্ব্বণ করিতে করিতে আগমন করিয়াছিলেন বলিয়া অনেকে তাঁহাদের উপরে যে অপবাদ আরোপ করেন তাহাও ভুল। পঞ্চ ব্রাহ্মণের সঙ্গে অপর যে পাঁচজন আগমন করিয়াছিলেন তাঁহারা ভৃত্য নহেন, "সহচর" বলিয়া গণ্য। ইহাঁরা শূদ্র হইলে কনোজের বেদাভিজ্ঞ সাত্বিক ব্রাহ্মণেরা কখনই ইহাঁদিগকে সঙ্গে লইয়া আসিতেন না। এই সহচরেরা বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয় এবং ইহাঁরাই বর্ত্তমান বঙ্গের কায়স্থ কুলের আদি পুরুষ। মৎপ্রণীত 'সিদ্ধান্ত সমুদ্র" গ্রন্থের যে দুইভাগে ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ জাতির ইতিহাস লিখিত ও প্রকাশিত হইবে, পাঠকেরা তাহাতে এই বিষয়ের বিস্তৃত বিবরণ অবগত হইতে পারিবেন।

কনোজ নগরের সর্ব্বপ্রধান দর্শনীয় পদার্থের নাম মকদুম্ জাঁহানীয়া। "প্রদীপ" নামক প্রসিদ্ধ মাসিক পত্রে আমি ইতিপূর্ব্বে মকদুম্ জাঁহানীয়া সম্বন্ধে সুদীর্ঘ প্রবন্ধ লিখিয়াছি, কৌতুহলাক্রান্ত পাঠক মহাশয়েরা তাহা অধ্যয়ন করিলে এই আশ্চর্য্য সৌধের বিবরণ সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা লাভ করিতে পারেন, তথাপি এস্থলে অতি সংক্ষেপে ইহার ইতিবৃত্ত দিতে আকাঙ্ক্ষা করি।

মকদুম্ এক জন মুসলমান দর্ব্বেশ অর্থাৎ সন্ন্যাসী, ইনি যেমন পণ্ডিত তেমনি সাধক ছিলেন। এই তপস্বী পরিব্রাজক পৃথিবীর বহুরাজ্য ও বহুদেশ পরিভ্রমণ করিয়া অবশেষে কনোজ নগরে উপস্থিত হয়েন তথাকার হিন্দু নরপতি ইহাঁর পাণ্ডিত্য, সাধুতা, অলৌকিক ক্ষমতা প্রভৃতি দর্শন করিয়া ইহাঁকে 'জাঁহানীয়া" (বিশ্বপর্য্যটক) উপাধি প্রদান করিয়াছিলেন। এই মহাপুরুষের মৃত্যুর পরে, কান্যকুব্জাধিপতি ইহাঁর সমাধির উপরে একটি স্তম্ভ প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিলেন;

কিছুকাল পরে তত্রত্য হিন্দু ও মুসলমানেরা এবং বিশেষতঃ সম্রাট আলমগীরের রাজকোষ হইতে প্রদত্ত প্রচুর মুদ্রা ব্যয়ে ও বহুলোকের যত্ন ও পরিশ্রমে ঐ সমাধির উপরে যে প্রকাণ্ড এবং রমণীয় সৌধ বিনির্ম্মিত হইয়াছে তাহা "মকদুম্ জাঁহানীয়া" নামেই খ্যাত। এই সুবিশাল ও মনোহর স্মরণসৌধ দেখিবার যোগ্য। যাঁহারা কনোজ অঞ্চলে গমন করেননি, তাঁহাদিগকে ঐ আশ্চর্য্য সৌধ দর্শন করিতে আমি বিশেষ রূপে অনুরোধ করি।

কনোজের দ্বিতীয় দর্শনীয় পদার্থের নাম বালাপীর। অবকাশাভাবে আমি এ পর্য্যন্ত এই প্রবন্ধে বালাপীর সম্বন্ধে কিছুই লিখিতে পারি নাই। এইবারে বালাপীরের বিবরণ দিতেছি। পশ্চিমোত্তর প্রদেশের স্থান বিশেষে বাল নারায়ণ নামে এক ব্রাহ্মণ বাস করিতেন, ইনি পুরোহিত কুলে জন্ম গ্রহণ করেন এবং পৌরহিত্যই ইহাঁর বৃত্তি ছিল। কালক্রমে ইনি নানা শাস্ত্রে পারদর্শী হইয়া সংসারাশ্রম পরিত্যাগ পূর্ব্বক তীব্র বৈরাগ্য সহ সন্ন্যাসাশ্রমকে আশ্রয় করিয়াছিলেন। জীবনের অবশিষ্টাংশ, বালাপীর কনোজ অঞ্চলেই অতিবাহিত করিয়াছিলেন। মকদুম জাঁহানীয়ার ন্যায় তিনিও পৃথিবীর বহুদেশ পরিব্রজন করিয়া নানা বিষয়ে প্রগাঢ় অভিজ্ঞতা উপার্জ্জন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। হিন্দু ও মুসলমান এতদুভয় শাস্ত্রেই বালাপীর অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন। হিন্দু ও মুসলমান এই উভয় ধর্ম্মাবলম্বীর লোকেই তুল্যভাবে এই তাপসবরের সম্মান ও সেবা করিত। কনোজ নগরে ইহাঁর মৃত্যু হইলে, ইহাঁর মৃতদেহকে দাহ করিবার জন্য হিন্দুরা বিশেষ যত্ন করেন, এদিকে মুসলমানেরা তাঁহাকে "ইশলাম পরায়ণ" এবং "হৃদয়ের বিশ্বাস মতে মুসলমান" ভাবিয়া মৃতদেহকে কবরস্থ করিবার জন্য উদ্যোগ করেন। সন্ন্যাসীরা তাঁহাকে সমাধিস্থ করিবার কারণ তথায় দলে দলে একত্রিত হয়। সে সময়ে কান্যকুব্জ নগরের কয়েক ক্রোশ দূরে এক বৈরাগিনী বাস করিত; তাঁহাকে সকলে ঈশ্বরানুগৃহীতা বলিয়া বিশ্বাস করিত এবং তাহার কথা তদঞ্চলের লোকে অতীব অনুরাগ ও শ্রদ্ধাসহ মান্য করিত। অকস্মাৎ ঐ বৈরাগিনী তথায় উপস্থিত হইয়া কহিল "তোমাদের এবম্প্রকার গোলযোগ সকলেরই পক্ষে অমঙ্গলের কারণ; আমি একটা সহজ উপায় নির্ণয় করিয়াছি, তোমরা তাহাতে সম্মত হইয়া তদনুসারে কার্য্য কর। একজন হিন্দু, একজন মুসলমান ও একজন সন্ন্যাসী একটা বৃক্ষের নীচে বসিয়া থাক, আমি তোমাদের তিন জনকেই বস্ত্রাচ্ছাদিত করিব। তাহার পরে একটি শিশুর হাতে একটা ফুল দিয়া কহিব, তুমি এই ফুল তোমার ইচ্ছা মত এই তিন

জনের মধ্যে কাহারও গায়ে নিক্ষেপ কর। যাহার গায়ে ফুল পতিত হইবে তাহার ধর্ম্মের মতে বালাপীরের মৃত দেহের সদ্গতি করা যাইবে।" সকলে এই প্রস্তাবে সম্মতি প্রদান করায় একটা শিশু ফুল লইয়া হিন্দুর মাথায় ফুলটা নিক্ষেপ করিল। বলা বাহুল্য এই সুপ্রসিদ্ধ তাপসবরের মৃতদেহ, হিন্দু মতেই দাহ হইয়াছিল।

হিন্দুমতে বালাজীর মৃতদেহ সৎকার হইল বটে, কিন্তু মুসলমানেরা সেই অসাধারণ পাণ্ডিত্যশালী, সেই অলৌকিক ক্ষমতা পরায়ণ, সেই তপপ্রভাব সমন্বিত মহাপুরুষের মহিমা প্রচার ও গুণানুকীর্ত্তন করিতে পরাঙ্মুখ হইল না। বাস্তবিক এই নির্ম্মলচেতা মহাযোগী সমভাবে এবং অতি আশ্চর্য্য প্রকারে হিন্দু ও মুসলমানের চিত্তকে আকর্ষণ করিয়াছিলেন। প্রকৃত কথা এই যে ভাল লোকেরা সর্ব্বত্র ভাল বলিয়াই পূজিত হয়েন; মন্দের কোথাও মঙ্গল বা সম্মান নাই।

বালাজীর মৃতদেহ যে স্থলে দাহ হইয়াছিল, সে স্থলে কনোজের মহারাজা মহোদয় এক প্রকাণ্ড স্মরণ-সৌধ প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিলেন। কত লক্ষ লক্ষ রৌপ্য মুদ্রা ব্যয়ে, কত ভাস্করের মানসিক ও দৈহিক পরিশ্রমে, কত বলবান্ মজুরের অধ্যবসায়ে এবং কত প্রকার কষ্ট সহিষ্ণুতায় এই সুদৃঢ়, সুপ্রশস্ত ও অতীব মনোহর প্রস্তর সৌধ বিনির্ম্মিত হইয়াছিল তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। এই সুবিশাল স্মরণসৌধ দর্শন করিলে বিস্ময়ে কপোলে হাত দিয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে হয়। এই সৌধ পাথর দ্বারা নির্ম্মিত, অতীব সুদৃঢ়, অত্যন্ত মনোহর এবং নানা প্রকার কারুকার্য্য খচিত। দ্বার সমূহ এবং প্রাঙ্গণও অতিশয় চমৎকার। এই সৌধ সম্বন্ধে যিনি না দেখিয়াছেন, কেবল লেখনী নিসৃত বর্ণনা দ্বারা তাঁহাকে বুঝাইয়া দেওয়া সুকঠিন; স্পষ্ট কথায় বলিতে হইলে এ সকল পদার্থ চক্ষে দেখিবার যোগ্য; কর্ণে শুনিয়া কৌতূহল মিটে না। যাহা হউক, কালক্রমে মুসলমানেরা প্রবল হইয়া উঠিলে হিন্দুর নির্ম্মিত ঐ মনোহর স্মরণসৌধ অধিকার করিয়া লয় এবং তাঁহারাই উহার তত্ত্বাবধান করিতে আরম্ভ করেন। এখন পর্য্যন্ত মুসলমানের হাতেই উহা আছে। মুসলমানেরা বাল নারায়ণকে "পীর" আখ্যায় সম্মানিত করিয়াছিল, অদ্যাপি বালনারায়ণ "বালাপীর" নামেই প্রসিদ্ধ। বালজীর স্মরণ মন্দির "বালাপীর" নামেই প্রখ্যাত।

আমরা কনোজ দর্শন করিয়া রেলওয়ে ষ্টেশনাভিমুখে আসিতে আসিতে আরও অনেক স্থানে অনেক পুরাতন ভগ্ন কীর্ত্তি দেখিয়াছিলাম। ষ্টেশনে

পৌঁছিয়া শান্তি লাভের পরে ভাবিলাম, এক সময়ে হিন্দুর সহিত মুসলমানের কি অপূর্ব্ব সদ্ভাব ছিল! কি সুখ স্মরণীয় প্রীতি ও প্রেম ছিল!!

ব্রজাঙ্গনা।

লেখিকা—শ্রীমতী জ্যোৎস্নাময়ী ঘোষ।

"লে দধি" "লে—দহি," কহি'—মধ্য-দিবাভাগে,
দধি-ভাণ্ড শিরে লয়ে, এই ব্রজধামে
ভ্রমি পথে পথে একা, গোপকুলোদ্ভবা
ব্রজ-নারী; নাম মম রাধাবিনোদিনী।
বিনোদ প্রাণের পতি; আমি প্রিয়তমা
সদা তাঁর; কহ কৃষ্ণ! কহ, কি কারণ
কর বিঘ্ন, কার্য্যে মোর? না জানি কি তুমি।
যাদুকর কিবা! কে তব স্বরূপ জানে?
নাহি তব রূপ গুণ, বর্ণ-জাতি কুল।
নির্গুণ সুবিজ্ঞে কহে; শুনি দ্বিজ-সুত
গোপ-অন্নে পুষ্ট বপু; নাহি পিতৃ স্থির।
কভু বেণু রবে, কভু প্রেম-আলাপনে,
কভু ছলে, কভু কোন কুহক—কৌশলে
মুগ্ধ কর মায়া বলে ব্রজাঙ্গনা-মনঃ।
কল্প-বহির্ভূত তুমি; কু-বাক্য নিপুণ।
বর্ণের অতীত বুদ্ধি; কার্য্য—গোচারণ।
লাভালাভ তুল্য জ্ঞান; মান-অপমান
ভাব দুই একবিধ; ব্রজ-গোপিকার
তিরস্কার কর জ্ঞান প্রেম-উপহার।
নাহি বুঝ ইষ্টানিষ্ট; আছ এক ভাবে
পূর্ব্বাপর,—হেরি আমি না বিচারি' জাতি

হও তার প্রিয়, যেই মজে তব প্রেমে;
সাক্ষী ব্রজ-বাসী। তুমি অধম-তারণ।
কর্ম্মের বিচিত্রগতি! কে পারে বুঝিতে?
তব বাহুবলে কৃষ্ণ! নাহি চলে পদ,
মনঃ নাহি ফিরে তো'মা হ'তে; নাহি পারি
ফিরা'তে বিমুগ্ধ-আঁখি, তব মুখ হ'তে।
বিচলিত প্রাণ অতি;—কেন যে কে জানে!
রোমাঞ্চিত কলেবর; কাঁপে দুরু দুরু
চিত্ত মম, স্মরি' পাছে লোকে মন্দ কয়।
ছাড় পথ, গৃহে যাই, যায় বেড়ে বেলা।
কুলাঙ্গনা আমি; ডরি অপবাদ-ভয়।
কবি কহে—"রাধা-কৃষ্ণ ভিন্ন কভু নয়,
দুই দেহ, এক প্রাণ, অভিন্ন-হৃদয়।

"চন্দ্রশেখরে বঙ্কিমচন্দ্র।"

লেখক—শ্রীগোবিন্দচন্দ্র রাহা বি, এ,

(পূর্ব্ব—প্রকাশিতের পর)।

শৈবলিনী প্রতাপের রূপে মুগ্ধ। রূপে Desdemona ও Pheron ভিন্ন কেনা মুগ্ধ হয়? Thompson বলিয়াছেন, "Beauty force divine" পতঙ্গ রূপে মুগ্ধ হইয়া অনলে জীবনাহুতি দেয়; জগদ্ গুরু আক্‌বর যোধ বাইএর রূপে মুগ্ধ হইয়া নৌরজাহানের দ্বারে তাঁহার উষ্ণীষ তরবারি স্থাপন করিয়া প্রেম ভিক্ষা করিয়াছিলেন। মূর্ত্তিমান ন্যায় জাহাঙ্গীর মেহের উন্নিসার রূপে মুগ্ধ হইয়া সের খাঁকে বধ করিয়া প্রণয় পিপাসা মিটাইলেন। অমর, নর সকলেই রূপের উপাসক। তবে শৈবলিনীর অপরাধ কি? শৈবলিনী এক প্রতাপ ভিন্ন কাহাকেও জানে না। সমাজ তাহাকে দ্বিচারিণী করিয়াছে। এখন বলুন পাঠক কাহার দোষ? প্রতাপ সময় সময়ে কত কৃত্রিম বিবরণ প্রদর্শন করিয়াছেন, তথাপি শৈবলিনীর অনুরাগ অচল, অটল। প্রবন্ধকার বলিবেন এ কথা সত্য

নহে। শৈবলিনী একদিন বলিয়াছিল, "প্রতাপ আমার কে? আমি কেন তাহার জন্য মরিব।" নভেলিষ্ট কেন শৈবলিনীকে দিয়া এ কথা বলাইয়াছেন, প্রবন্ধকার তাহা বুঝেন নাই। নবাঙ্কুরিত প্রেম এবং বিশাল শালে পরিণত প্রেম এ দু'য়ের প্রভেদ দেখানই নভেলিষ্টের উদ্দেশ্য। শৈবলিনী যখন এই কথা বলিয়াছিল তখন সে দ্বিপত্রিতা, পল্লবিতা নহে। তখন বয়স ৮ আট বৎসর মাত্র। কোরক শৈবলিনী এরূপ বলিয়া থাকিলেও ফুল্লফুল শৈবলিনী প্রতাপের জন্য ইন্দ্রের বজ্র বক্ষস্থল পাতিয়া লইতে প্রস্তুত। শৈবলিনী সমাজের চক্ষে যাহাই হউক সে আদর্শ প্রেমিকা। প্রতাপ তাহার উপাস্য দেবতা। সে হৃদয় মন্দিরে প্রতাপকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া সকল কষ্ট সহিয়াছে। বজ্র সম প্রত্যাখ্যান শুনিয়াও উপাস্য দেবে ভক্তি হীন হয় নাই।

শৈবলিনীর বিরুদ্ধে দ্বিতীয় অভিযোগ সে কামুকী সুতরাং বীত লজ্জা। "শৈবলিনী কামুকী" প্রবন্ধকার একথা বলিয়া শিষ্টাচার ও সুরুচির বিরুদ্ধে ঘোর অপরাধ করিয়াছেন। বস্তুতঃ তাঁহার এ কথার বিন্দুমাত্র ভিত্তি নাই। শৈবলিনী প্রেমোন্মত্তা, কামোন্মত্তা নহে। পিঞ্জরের বিহঙ্গী পিঞ্জর ভাঙ্গিলে দেশে দেশে, পর্ব্বতে পর্ব্বতে, কান্তারে কান্তারে, বিচরণ করে, সে আর কাহার ভয় রাখে? প্রেম বলে বলীয়সী শক্তিরূপিনী রমণীর পক্ষে সকলই সম্ভব। বহির্জগতের স্বাধীন বায়ু স্পর্শে মীরকাসিমের সমক্ষে উপস্থিত হওয়া কিম্বা ফষ্টারের বজরায় যাইয়া প্রতাপকে উদ্ধার করা কি ছার!

শৈবলিনীর বিরুদ্ধে তৃতীয় অভিযোগ সে চঞ্চলা, তাহার প্রেমে স্থৈর্য্য নাই। এরূপ অসত্য কথার আরোপ নীতি বিরুদ্ধ। শৈবলিনী দুই একবার প্রতাপকে কাছে আসিতে নিষেধ করিয়াছিল সত্য, কিন্তু সে কি প্রেম অপলাপ? সে হয় অভিমান, না হয় হৃদ্দাহের কিঞ্চিৎ উপশম বাসনা। প্রেম ভুলিবার জিনিস নহে, প্রেমিক কিম্বা প্রেমিকার হৃদয় প্রতিমা বিসর্জ্জন দিবার বস্তু নহে। প্রেমের এমনই ঐন্দ্রজালিক শক্তি যে কোন বিশ্বাস-ঘাতক (Traitor to love) প্রেম ভুলিতে বা হৃদয় প্রতিমাকে, বিসর্জ্জন দিতে ইচ্ছা করিলেও ভুলিতে বা বিসর্জ্জন করিতে পারে না। প্রবন্ধকার কি কখন রাস্তার বালকদিগকে গাইতে শুনেন নাই—

মনে করি ভুলে থাকি, ভোলা নাহি যায় সখি,
যে দিকে ফিরাই আঁখি পাই দেখিতে। (ক্রমশঃ)

———

REGISTERED No. C. 294.

১৪শ বর্ষ।] ১৩১২ সাল। অগ্রহায়ণ, [৫ম সংখ্যা।

হিন্দুধর্ম্ম ও সমাজের মুখপত্র

জন্মভূমি

(সচিত্র মাসিক-পত্রিকা ও সমালোচনী)।

বিষয়	পৃষ্ঠা	লেখক
১। মা	১৫৭	শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রমোহন বসু।
২। প্রেম	১৫৯	শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রকুমার রায়।
৩। যুগলস্বীকার	১৬৩	... ...
৪। হেমন্তকাল	১৭৪	শ্রীযুক্ত সুধনচন্দ্র দে।
৫। নারীজাতির মহত্ব	১৭৯	শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার ঠাকুর এম, এ।
৬। নাদযোগ	১৮৫	শ্রীযুক্ত আশুতোষ দেব এম, এ।

লেখকগণের মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন।

জন্মভূমি-কার্য্যালয়।

শ্রীনরেন্দ্রনাথ দত্ত দ্বারা প্রকাশিত।
৩৯ নং মাণিক বসুর ঘাট ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

বার্ষিক মূল্য ডাঃ মাঃ সমেত ১৷৹ দেড় টাকা। — প্রতি সংখ্যার নগদ মূল্য ৵১০ পয়সা।

সন্দর্ভ-সংগ্রহ।—১ম ভাগ, ডাক্তার শ্রীহেমচন্দ্র সেন, এম-ডি, প্রণীত স্বরোদয়, ব্যায়াম, যোগশাস্ত্র প্রভৃতি সম্বন্ধীয় পুস্তিকা। মূল্য—৵০ আনা।
শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় ২০১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট কলিকাতা।

শ্রীল শ্রীমন্মহারাজাধিরাজ কাশ্মীরাধিপতি তথা শ্রীল শ্রীযুক্ত মহারাজা ধিরাজ
বর্দ্ধমান-প্রদেশাধিপতি বাহাদুরের অনুমোদিত ও অনুজ্ঞাত সুপ্রসিদ্ধ
কবিরাজ শ্রীযুক্ত বিনোদলাল সেন মহাশয়ের

আদি-আয়ুর্ব্বেদ ঔষধালয়।

১১৬ নং লোয়ার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।

কুন্তলবৃষ্য তৈল জগতে অমূল্য ও অতুলনীয়—মস্তিষ্ক স্নিগ্ধকর ও স্মৃতিশক্তি বর্দ্ধক—কেশকলাপের কান্তিপ্রদ—খালিত্য ও পালিত্যনাশে অদ্বিতীয়। কেশের কমনীয়ত কান্তি বৃদ্ধি করিতে, চিত্তে র-নিত্যপ্রফুল্লতা অটুট রাখিতে কুন্তলবৃষ্যের তুলনা নাই ইহা অনুপম্ আদি ও অকৃত্রিম্ স্নিগ্ধগুণে কুন্তলবৃষ্যের সমতুল কোন তৈলই এ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই।

বর্ত্তমান ভারতের প্রধান ধর্ম্মসংস্কারক, শান্তি-সুখ-সন্তৃপ্ত-বিলাসভোগ বিমুক্ত আধ্যাত্মিক উৎকর্ষের সমুচ্চ সোপানে সমাসীন—পূজ্যপাদ শ্রীমহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর বলিয়াছেন—যে কুন্তলবৃষ্য তৈল এতদিন আমাকে রক্ষা করিল, আজ তাহাকে পরিত্যাগ করিতে পারি না।"

কুন্তলবৃষ্য—সাহিত্যসেবিগণের মহোপকারক, কারণ ইহাতে মেধা ও স্মৃতি বৃদ্ধি হয়, চিন্তাশীলতা ও ভাবুকতা নবীভূত ও স্ফুরিত হয়।

এক শিশির মূল্য ১৲ টাকা প্যাকিং ও ডাকমাশুলাদি পাঁচ আনা।

উপহার—কুন্তলবৃষ্যের প্রত্যেক গ্রাহক তৈলের সঙ্গে একখানি করিয়া সুন্দর চিত্র উপহার পাইবেন।

সতর্কীকরণ।—দুষ্ট লোকেরা বড়ই জাল করিতেছে; গ্রাহকগণ সাবধান; আমাদের ঔষধালয় ভিন্ন কোথাও "কুন্তলবৃষ্য" কিনিবেন না, কিনিলেই প্রতারিত হইবেন।

কবিরাজ শ্রীআশুতোষ সেন চিকিৎসক।

"জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী"

(সচিত্র মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী।)

১৪শ বর্ষ। | অগ্রহায়ণ, ১৩১২ সাল। | ৫ম সংখ্যা।

"মা"।

লেখক—শ্রীসুরেন্দ্রমোহন বসু।

জননী জন্মভূমিশ্চ।
স্বর্গাদপি গরীয়সী!!

"মা" অক্ষরটি কি অমৃতময়। এমন সুধাময় অক্ষর কে সৃজন করিয়াছে? সন্তান মায়ের নিকট এই শব্দ একবার উচ্চারণ করিলে তাঁহার হৃদয়তন্ত্রী যেন বাজিয়া উঠে—তাঁহার মন আনন্দে নাচিতে থাকে। যদি প্রকৃত দয়াপূর্ণ ও সরলতাপূর্ণ স্থান কোথাও থাকে, সে কেবল মায়ের প্রাণ। যদি স্বেচ্ছানুরূপ

আজ্ঞাধীনতা, শান্তিজনক শুশ্রূষা সদয়ভাবপূর্ন সহায়তা, অকৃত্রিম সহানুভূতি কোথাও থাকে, সে কেবল মায়ের প্রাণ। সংসারের প্রখর তাড়নে বিতাড়িত ও মর্ম্মাহত হইয়া ক্ষণিক শান্তির জন্য প্রাণ যখন ত্রাহি ত্রাহি করে, তখনই আমরা একবার "মা" বলে ডাকিয়া সন্তপ্ত প্রাণ শীতল করি। হৃদয়ের দুর্দ্দমনীয় শোক-বহ্নি যখন হৃদয়ের স্তরে স্তরে প্রধূমিত ও পরিশেষে প্রজ্জ্বলিত হইয়া হৃদয়-মন্দির অধিকার করে, তখন কেবল আমরা একবার "মা" শব্দ উচ্চারণ করিয়া সকল জ্বালার উপশম করি। তাঁহাকে দেখিলেই হৃদয়-মন্দির আপনা হইতেই কোমলতায় পরিপূর্ণ হয়। দুঃখ, যন্ত্রণা, নিরাশা, মনস্তাপ, ভয় প্রভৃতি শত্রুগণের বিভীষিকা একবারে দূরীভূত হইয়া যায়। বিদ্যার্থী ব্যক্তি সমস্ত দিন মানসিক শ্রমে উত্তেজিত হইয়া তাঁহার নিকট শান্তি লাভ করেন। পরসেবক সমস্ত দিন পরের গোলামী করিয়া স্নেহময়ী জননীর নিকট শ্রমজনিত ক্লান্তি দূর করেন। বাণিজ্য, ব্যবসায়ী সমস্ত দিন ক্রয় বিক্রয়ে শ্রান্ত হইয়া, কৃষক স্বকার্য্যে কঠোর পরিশ্রমে অবসন্ন হইয়া তাঁহার নিকট শান্তি লাভ করেন।

মায়ের মমতা ও বাৎসল্যভাব কি অমূল্য ধন! কি রমণীয় পদার্থ!! কম্পাসের কাঁটা যেরূপ সততই একদিকে থাকে, তাঁহার মনও তদ্রূপ সতত সন্তানের দিকে নির্নিমেষ নয়নে চাহিয়া থাকে। জননী যাহা সন্তানকে স্নেহপূর্ব্বক শিক্ষা-দেন, তাহা যেমন সে আহ্লাদের সহিত শিক্ষা করে, তেমন আর কিছুই করে না। তিনি নবীন অরুণ কৈশোর অবস্থায় যে সকল উপদেশ সন্তানের অন্তরে বপন করেন, সেগুলি স্নেহময়ীর মৃত্যুর পরেও জীবনে কার্য্য করে। বাল্যকালে পুরুষের স্বভাব স্নেহময়ী জননীর দ্বারা গঠিত হয়; এবং যৌবন কালে তাহা প্রিয়তমা প্রণয়িণির দ্বারা পরিচালিত হয়। সেই মূল চরিত্রই সংসার-সমুদ্রের ভেলা-স্বরূপ।

অদ্বিতীয় দিগ্বিজয়ী মহাবীর নেপোলিয়ান্ বোনাপার্ট্ (১৭৬৯-১৮২১) সর্ব্বদা বলিতেন, "বালকের ভবিষ্যৎ চরিত্রের উৎকর্ষাপকর্ষ সম্পূর্ণরূপে মায়ের উপর নির্ভর করে"। তিনি নিজে জননীর নিকট যে সকল সদ্‌গুণ লাভ করিয়া-ছিলেন, তাহাদের প্রভাবেই তিনি এত উন্নত হইয়াছিলেন। ইংরাজ কবি জর্জ্জ হারবার্ট্ (১৫৯৩-১৬৩২) বলিয়াছেন, "একজন সুশিক্ষিতা মাতা একশত শিক্ষকের সমান।" এইরূপ জীবনী পাঠ করিলে প্রায়ই জানিতে পারা যায় যে, অধিকাংশ মহাত্মাগণের ভবিষ্যৎ উন্নতি ও মহত্ত্বের বীজ স্নেহময়ী জননীর দ্বারা তাঁহাদের অন্তরে রোপিত হইয়াছিল।

সংসার-সমুদ্রে ঝটিকাহত ব্যক্তির পক্ষে মা-ই একমাত্র উৎকৃষ্ট বন্দর। ইহ সংসারে তিনিই মহাপদার্থ! তিনিই বিপদ সঙ্কুল সংসারের নিরাপদ দুর্গ-স্বরূপ। সংসারের নানা বিভীষিকাপূর্ণ ঘটনাবলীর মধ্যে, তিনিই চালক; এবং তাহাদের সহিত সাহসে সংগ্রাম করিতে উৎসাহ প্রদান করেন। সংসারে জননী অয়স্কান্ত মণির ন্যায়। সূর্য্যের আকর্ষণে যেরূপ সৌর-জগতের গ্রহ নক্ষত্র প্রভৃতি স্ব স্ব স্থানে সুনিয়মে অবস্থিত থাকে, তদ্রূপ মায়ের প্রভাবে সংসার-জগতের সকল বিষয় সুনিয়মে সন্নিবদ্ধ থাকে। সংসারের সমস্ত লোক তাঁহার কার্য্য-কলাপ রীতি-নীতি অনুকরণ করিয়া চলেন।

যে সংসারে মা নাই, তথায় কেবল কলহ, বিবাদ, বিসম্বাদ, দুঃখ, কষ্ট প্রভৃতি দিবানিশি বিরাজ করে। সে সংসার কেবল দুঃখের আগার স্বরূপ॥ সে সংসারে মানবগণ বহু আত্মীয়ের দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকিলেও মনে কিন্তু সুখ পায় না। তিনি নেপোলিয়ানের ন্যায় নামে মাত্র সম্রাট্ হইয়া সুখে থাকিতে পারেন না।

যিনি হৃদয়ের দ্বার উদ্‌ঘাটন করিয়া মায়ের চরণ সেবা করিতে পান, তিনিই যথার্থ সৌভাগ্যশালী মানব। তাঁহার মানব জীবনই সার্থক।—

প্রেম।

লেখক—শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়।

"ALL MANLIND LOVE A LOVER" Emirson.

এই কর্ম্ম-ঘাত-কঠোর অনন্ত জগৎ প্রেমের স্নিগ্ধ জ্যোতিঃ দ্বারা আলোকিত হইয়াছে, নতুবা এই বিশাল জগৎ হইতে দয়া, মায়া ভালবাসা, স্নেহ, প্রীতি, প্রভৃতি সদ্‌গুণরাজি চিরদিনের জন্য বিদায় গ্রহণ করিত। প্রেম মানব হৃদয়কে সরস-স্নিগ্ধ করে। যাহার হৃদয়ে প্রেম অধিষ্টিত আছে এ সংসারে সেই ধন্য। প্রেম এই নিখিল জগতের উপর, অনন্ত করুণা বর্ষণ করে।

সাধারণতঃ, আমরা প্রণয় এবং প্রেমকে একার্থ বাচক বিবেচনা করি, কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। প্রণয়ের যখন চরমোৎকর্ষ সাধন হয়, তখনই, প্রণয়—প্রেমে রূপান্তরিত হয়। অতএব প্রণয়ের যাহা পরিণতি, তাহা প্রেম। কিন্তু এখানেই মতদ্বৈধ ঘটিল না। প্রণয়ের অঙ্কুর কি?

প্রণয়ের অঙ্কুর ভালবাসা। ভালবাসা রূপান্তরিত হইয়া প্রণয়—প্রণয়ের পরিণতিতে প্রেম। কিন্তু এখনও আপত্তি আছে। ঈশ্বরের পদে যে প্রেম, তাহা কি সঞ্জাত? ঈশ্বরের প্রতি প্রেম. ভক্তি সঞ্জাত।

প্রেম স্বর্গীয়। প্রেমের মহিমায় কে জড়িত হয় নাই। রাম, শ্যাম, যদু, মাধব—সকলেই প্রেমের কুহকে পড়িয়াছে।

রাম, হয়ত' বিবাহিত নহে, এ পৃথিবীর কাহারও প্রেমে বা ভালবাসায় সে আবদ্ধ নহে, তথাপি প্রেমের মায়ায় মুগ্ধ। সে ঈশ্বরকে ভালবাসে, অতএব সে প্রেমিক।

শ্যাম, 'ঈশ্বর কেন সৃষ্টি কর্ত্তা হইল' বলিয়া তাঁহাকে অভিসম্পাত করে, কেননা পরমেশ্বর রামকে ধনবান করিয়াছেন, তাহাকে দারিদ্র করিয়াছেন, রাম সুখী, সে অসুখী,—অতএব সে দিবানিশি সৃষ্টিকর্ত্তার প্রতি গালি বর্ষণ করে সে গালি-প্রেমিক?

যদু ভালবাসে পিতা-মাতাকে, তাঁহাদের পদামৃত পান না করিয়া জল গ্রহণ করে না, অতএব যদু প্রেমিক।

এই যে পিতামাতার প্রতি প্রেম, ইহাও ভক্তি মূলক।

মাধব তাহার হৃদয়ানন্দদায়িনীকে প্রাণের সঙ্গে ভালবাসে, তাহাকে এক মূহুর্ত্তের জন্য চোখের আড়াল করিতে পারে না, অতএব মাধব প্রেমিক। এই যে প্রেম, ইহা ভালবাসা-সঞ্জাত।

প্রেম মানব হৃদয়ে সর্ব্বদা বিরাজমান। এক মূহুর্ত্ত-মানব প্রণয়-বিহনে থাকিতে পারে না। প্রণয় এই কর্ম্মঘাত-কঠোর মানব-জীবনের একমাত্র আনন্দ, মানব অন্তকরণের স্নিগ্ধ, সরস, শ্যামল, ক্ষেত্রের একমাত্র শোভন পুষ্প, প্রেম হৃদয়-মরুভূমের একমাত্র ওয়েশীষ।

যে একবার প্রেমে মজিয়াছে, সে দিশাহারা, অন্ধ, ভাল-মন্দ জ্ঞান শূন্য হইয়া উন্মত্তভাবে প্রেমের উদ্দাম শ্রোতে গা ঢালিয়া দেয়। প্রণয়-দেবতা Cupid তাই অন্ধ।

স্বার্থপরতা মূলক যে প্রেম—তাহা প্রকৃত প্রেম হইতে বহুনিম্নে অবস্থিত। কিন্তু এ জগতে নিস্বার্থ-প্রেম কোথায়? এখানে স্বার্থ-সিদ্ধির শত সহস্র বেষ্টনে প্রেম বেষ্টিত, এ প্রেম সর্ব্বদা মানবের সর্ব্বনাশ সাধনের জন্য ছিদ্র অন্বেষণে ব্যস্ত।

প্রেমের মহিমা বুঝিয়াছিলেন, শ্রীচৈতন্য গুরগোবিন্দ, প্রহ্লাদ, ধ্রুব। আর বুঝিয়াছিলেন, খ্রীষ্ট, ঈশা, লুথার, রুষো।

প্রেমের মহিমা বুঝিয়াছিলেন, শকুন্তলা, জগৎসিংহ, তিলোত্তমা, প্রতাপ। রোমিও এবং জুলিয়েট, ফার্দ্দিনান্দ এবং মিরান্দা, পিত্রাকা এবং দান্তে। কনরাদ্ এবং মিদোরা। আদম, দেস্‌দিমোনা এবং গুলনিয়ার।

আর বুঝিয়াছিলেন, আমাদের সীতাসতী। 'পিতৃ প্রেমের পরাকাষ্ঠা দেখাইছেন' বলিলে কাঁহার স্মৃতি আমাদের অন্তকরণে সর্ব্ব প্রথমে জাগরুক হইয়া উঠে? তিনি শ্রীরামচন্দ্র।

রোমিও মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হইয়া যখন সপ্রেম কণ্ঠে জুলিয়েতের মৃতপ্রায় কমনীয় দেহ লতাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"Eyes, look your last;
Arms, take your last embrace and lips, O, you,
The door of breath, seal with a rigth eons kiss.
Here is to my love________________________
________________________Thus with a kiss Idie."

তখনই প্রেমের চরমোৎকর্ষ!

স্বামী কর্ত্তৃক নিদারুণ আঘাতিত হইয়া দেসদিমোনা যখন মৃত্যুকালীন শেষ উক্তি, স্বামীর কলঙ্ক ক্ষালনার্থে সখী এমিলিয়াকে বলিলেন ঃ—

"এমিলিয়া, আমায় কেহ মারে নাই, আমি আপান মরিয়াছি—"

তখনই প্রেমের উচ্চোৎকর্ষ।

জনকনন্দিনী সীতা যখন স্বামী কর্ত্তৃক তপোবনে পরিত্যক্তা হইলেন তখনও তিনি লক্ষণকে বলিয়াছিলেন—আমি এই তপোবনে থাকিয়াও যদি শ্রবণ করি যে, আর্য্যপুত্র কুশলে আছেন—তাহা হইলে আমি স্বর্গীয় সুখ উপভোগী হইব।" এখানে প্রেমের পরিণতি।

আত্ম সংযমী শৈবলিনী-প্রেমে মোহিত প্রতাপ রায়-যুদ্ধস্থলে আহত অবস্থায় পতিত হইয়াও স্বামী রমানন্দকে বলিছিলেন ঃ—

"অদম্য হৃদয়কে বিশ্বাস নাই, আমি চন্দ্রশেখরের নিমিত্ত আত্ম বিসর্জ্জন করিলাম।"

প্রেমের এইরূপ মহান্ আদর্শ বিরল।

প্রেমকে বুঝিয়াছেন এবং চিনিয়াছেন কে? কবি। কবি প্রেমকে উচ্চ মহান্ আসনে বসাইয়া বলেন—

——"মহান্-অম্বর-তলে কোন ঝঞ্জাসনে বসি,
তব মহা প্রেম মন্ত্র জপিছ একান্ত মনে?"

কবি প্রেমকে হৃদয়ের সঙ্গে পূজা করিতে শিখিয়াছেন প্রেম-ই তাঁহার আদর্শ প্রেম ভিন্ন তিনি আর কিছুই জানেন না।

কবি গাহিয়াছেন ঃ—

"মনে গোপনে থাকে প্রেম. যায় না দেখা,
কুসুম দেয় তাই দেবতায়।
দাঁড়ায়ে থাকি দ্বারে, চাহিয়া দেখি তারে
কি বলে' আপনারে দিব তায়!

কবির জীবন বৃথা, কবির সাধনা বৃথা, কবির আদর্শ বৃথা, কবির সকলই ব্যর্থ—যদি কবি হৃদয়ে প্রেম বর্ত্তমান না থাকে।

কবি প্রেমকে চিনিয়াছেন এবং জগৎকে প্রেমের স্বরূপ দেখাইতেছেন, প্রেম শিক্ষা দিতেছেন।

প্রেম যে কেবল মানব হৃদয়েতেই বর্ত্তমান আছে, তাহা নহে ; প্রেম মানাবতর যাবতীয় জীবকুলের ভিতরে বর্ত্তমান আছে। পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গাদি যাবতীয় জীববৃন্দের হৃদয়ে প্রেম বর্ত্তমান। অতএব যে বৃত্তি ভিন্ন কোন জীব-হৃদয়ই গঠিত হয় না সে বৃত্তি সকলের অপেক্ষা মহান্। প্রেম-ই সংসারের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সুখ। যেদিন পৃথিবী হইতে প্রেম বিদায় গ্রহণ করিবে—সেদিন পৃথিবী রসাতলে যাইবে।

প্রেমের উদারতা যে বুঝিতে পারে সে পৃথিবীতে ধন্য হয়। প্রেমের উদারতা বুঝিয়াছিলেন, ঈষা মুষা, শাক্যসিংহ চৈতন্য, লুথার, প্রভৃতি। তাঁহারা জগতের সকলকে প্রেম দান করিতে শিখিয়াছিলেন। তাঁহাদের প্রদত্ত সেই উদার প্রেমের জ্যোতিঃতে সমস্ত মানব হৃদয় আলোকিত—তাই মানবগণ উপরোক্ত মহাপুরুষগণের পূজা করে। যেদিন মানব-হৃদয় হইতে উদার প্রেমের কুশল আলোক বিদায় গ্রহণ করিবে, সেই দিন আঁধার হৃদয় মানববৃন্দ মহাপুরুষ পূজা বিস্মৃত হইবে।

যাহার হৃদয়স্থ প্রেম সর্ব্বদা স্বার্থ চিন্তায় ব্যস্ত; তাহার মতন নীচাশয় এ জগতে আর কে আছে? প্রেম মারাত্মক হয় কখন? যখন পবিত্র প্রেমের যাহার স্থানে কামুকতা পূর্ণ প্রেম স্থান গ্রহণ করে। এইরূপ কামুকতাময় প্রেম-পরিপূর্ণ হৃদয়—সে পিশাচের সহচর, ইন্দ্রিয়ের দাস, পাপী, মহানোচ্চ ভাব তাহার হৃদয়ে বর্ত্তমান থাকে না পৃথিবী সে পাপাত্মায় ভার বহনে অক্ষম হয়।

পার্থিব প্রেম ধর্ত্তব্যের বিষয় নহে তাঁহা ক্ষণভঙ্গুর মানব-জীবনের সঙ্গে লয় প্রাপ্ত হয়।

স্বর্গীয়-বিমল দীপ্তি-পূর্ণ অপার্থিব প্রেমই জগতে কামনার বস্তু। সেই প্রেম-ই ঈশ্বরের মহিমায় উজ্জ্বলীকৃত। যে অপার্থিব প্রেমের সাধনা করে—তাহারই সাধনা সফল।

যুগল স্বীকার।

বঙ্গ রাজ্যের এক প্রান্তর প্রদেশে একখানি গ্রাম। অল্পজনপূর্ণ নিতান্ত ক্ষুদ্র গ্রাম নহে, দ্বিতীয় তৃতীয় শ্রেণীর গণ্ডগ্রাম বলিলেও বলা যায়। গ্রামে পুলিশের থানা আছে, ডাকঘর আছে, গবর্ণমেণ্টের সাহায্যকৃত ইংরাজী বাঙ্গালা বিদ্যালয় আছে; হাট বাজার আছে, ভাড়াটিয়া গাড়ীর আস্তাবল আছে, চৌকিদারি ট্যাক্স ইত্যাদি আদায়ের জন্য একটি মিউনিসিপ্যাল্ আফিস আছে, সর্ব্বোপারি সাত বৎসরের সুপ্রতিষ্ঠিত মুন্সেফি-কাছারী এবং ফৌজদারীতে মহকুমা আছে। বাহ্য শোভা মন্দ নয়।

সেই গ্রামে জয়গোপাল চট্টরাজ নামে এক ব্রাহ্মণ থাকিত। লেখা পড়া অতি সামান্যই জানা ছিল, কিন্তু বুদ্ধিতে আর ফন্দীফিকিরে বিলক্ষণ সুচতুর, বিলক্ষণ ধূর্ত্ত। গ্রামের মহকুমাতে সেই জয়গোপাল প্রথমাবধিই মোক্তারী করিত। শূন্য ভাণ্ড মোক্তারগণের যে প্রকার ফাজিল চালাকী দৃষ্ট হয়, জয়গোপালের স্বভাবে আর নানাবিধ কার্য্যে তাহার একটুও অভাব ছিল না। তাহা ছাড়া, বুদ্ধি প্রভাবে হয়কে নয় করা, নয়কে হয় করা, মিথ্যা নালিশ মিথ্যা সাক্ষী জোগাড় করা, জাল জালিয়াতির দস্তুর মত সুব্যবস্থা করা এবং গরীব মক্কেলের মোকর্দ্দমা ফুরাইয়া লওয়া, ইত্যাদি মাতব্বর মাতব্বর কার্য্যে জয়গোপালের বিলক্ষণ পটুতা, বিলক্ষণ নাম ডাক। প্রথম দিনকতক চালাক মোক্তার বলিয়া তাহার পশার হইয়াছিল, মূর্খলোক এবং চাষালোকে মক্কেল তাহার অনেক জুটিত। শেষটা কিন্তু রক্ষা হইল না; ক্রমাগত মিথ্যা প্রবঞ্চনা প্রকাশ পাওয়াতে পশার নষ্ট হইয়া গেল, সংসারে জয়গোপালের অত্যন্ত কষ্ট হইল। গ্রামে প্রচার ছিল, জগত সংসারে এমন কোন দুষ্কর্ম্ম ছিল না, জয়গোপাল মোক্তারের যাহা অসাধ্য।

জয়গোপালের কষ্ট হইল, একটাও মক্কেল জুটিল না, গ্রামেও মান থাকিল না,

কবি প্রোক্ত এই প্রশংসার ভাজন হইতে পারিতেন কিনা সন্দেহ। স্বভাব কোমল নারী জাতির মুখ প্রোক্ত এইরূপ উৎসাহ বাক্য আর্য্যইতিহাসে বিরল নহে। এইরূপেই একদিন যাজ্ঞসেনী অজ্ঞাত বনবাসবাসি পঞ্চ পাণ্ডুতনয়গণের দুঃখক্লিষ্ট ও দুমর্ণায়মান চিত্তকে আশায় সতেজ উৎসাহে উৎসাহিত করিয়া ছিলেন, যে উৎসাহে উৎসাহিত হইয়া ভুবন বিজয়ী অর্জ্জুন হিমাচলে তপস্যা করিয়া কিরাতরূপী হরকে প্রসন্ন করিয়া পাশুপাত্যাদি দিব্য অস্ত্র লাভ করিয়াছিলেন। পাণ্ডবগণ যখন বনস্থলীর অজ্ঞাতবাসে শৌর্য্যবীর্য্য হারাইয়া নিশ্চেষ্ট ভাবে অবস্থিত তখন দ্রৌপদীর সেই সুকোমল ও ওজস্বী বাক্যের কথা মহাভারত ও ভারবির পাঠকের অবিদিত নাই; তিনি স্বকীয় প্রগল্‌ভতার—

"হিতং মনোহারিচ দুর্ল্লভং বচঃ"

ইত্যাদি বাক্যে ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া র্ভৎসনাচ্ছলে পাণ্ডবগণকে কর্ত্তব্যে উদ্বোধিত করিবার নিমিত্ত বলিয়া ছিলেন :—

ভবাদৃশাঃ শেদধিকুর্ব্বতেরতিং।
নিরাশ্রয়াহন্তহতা মনস্বিতা।"

কিন্তু কেবল র্ভৎসনার কার্য্য হইবার নহে জানিয়া স্ত্রীস্বভাব সুলভ কোমলতা ও প্রেম দেখাইয়া বলিয়াছিলেন,—

প্রত্যাগতস্তাসি কৃতার্থমেব।
স্তনোপ পীড়ং পরিরব্ধু বৃশমা।"

অর্থাৎ "কৃত কৃত্য হইয়া প্রত্যাবৃত্ত হইলে হে পার্থ তোমার পুরস্কার স্বরূপ তোমাকে দৃঢ়ালিঙ্গনে আলিঙ্গিত করিব।"

স্ত্রীরমুখের এই সতেজ সুকোমল বাক্য কেবল হিন্দু বিবাহিতা পত্নীর মুখে সাজে। হিন্দুর বিবাহ Civil Contract নহে; বিবাহে ধর্ম্মের অংশাস্থল এইজন্য জগন্মাতা পার্ব্বতির পরিণয়ে মহাকবি কালিদাস নববধূর বিবাহ কালে বলিয়াছিলেন—

বধূং দ্বিজঃ প্রাহতবৈষ বৎস্তে।
বহ্নির্বিবাহং প্রতিকর্ম্মসাক্ষী।
অনেন ভর্ত্তা সহধর্ম্ম ভার্য্যা।
কার্য্যা ত্বয়ামুক্ত বিচারয়েতি॥"

যখন পুরোহিত নববধূকে "সাম্রাজ্ঞী শ্বশুরেভব ইত্যাদি মন্ত্রে শ্বশুর কুলের মানস রাজ্যের অধিকার দেখাইয়াদেন তখন কোথায় Civil Contract রসাতল হইতে তলাতলে তলাইয়া যায় বলুন দেখি?

পত্নীত্বের এইরূপ গম্ভীর অথচ সুকোমল ভাব হিন্দু যেমন বুঝিয়া ছিলেন এরূপ আর কোন জাতি বুঝিয়াছিলেন বা বুঝিয়াছেন কিনা সন্দেহ।

সত্য এক ও অভ্রান্ত ও সকলেরই সমাধিগম্য সকল দেশের মনীষিগণ যাঁহারা সেই সত্যের উচ্চ সোপানে যাইতে পারেন তাঁহারা সকলেই সেই সত্য উপলব্ধি করিতে পারেন এই জন্যই আমরা মহাকবি স্যেক্ষপীয়রকে পত্নীত্বের এই সুন্দর ভাবগ্রাহী দেখিতে পাই। নৃশংস রাজা অষ্টম হেনেরি তদীয় সহধর্ম্মিনী ক্যাথারিনকে যেরূপে নিম্ন লিখিত ভাবে সম্বোধন করিয়াছিলেন আমরাও সেইরূপ রাজমহিষী শৈব্যাকে রাজা হরিশ্চন্দ্রের মুখে সম্বোধন করাইতে পারি।

"That man i' the world who shall report he has
A better wife, let him in naught be trusted,
For speaking false in that: thou art, alone,
(If thy rare qualities sweet gentleness,
Thy meekness saintlike, wifelike government—
Obeying in commanding and thy parts
Sov' reign and pious else, could speak thee out,)
The queen of earthly queens :"

নাদযোগ।

লেখক—শ্রীআশুতোষ দেব এম, এ,

সধনার সে সকল পথ আছে তাহার মধ্যে নাদযোগ অন্যতম। এই যোগের দ্বারা মনুষ্য সমাধি লাভ করিয়া থাকেন। শরীর হইতে মনকে ভিন্ন করিয়া পরমাত্মার সহিত একীভাবাপন্ন করাকেই সমাধি বলে। এই সমাধির দ্বারা মুক্তি লাভ হইয়া থাকে। যে সাধক পুরুষ সমাধি যোগ সাধন করেন, তাঁহার এইরূপ জ্ঞান জন্মে যে, আমি স্বয়ং ব্রহ্ম, আমি জড় পদার্থ নহি, আমি ব্রহ্ম তুল্য, আমি শোক ভাক্‌ নহি, আমি সচ্চিদানন্দ মূর্ত্তি, আমি স্বভাবতঃ সর্ব্বদাই মুক্ত।

নিম্ন লিখিত ছয়টি পথের মধ্যে যে কোন পথের দ্বারা মনুষ্য সমাধি লাভ করিয়া থাকেন। যথা, ধ্যানযোগ, নাদযোগ, রসানন্দযোগ, লয়সিদ্ধিযোগ, ভক্তি-যোগ এবং রাজযোগ।

অদ্যকার আলোচ্য বিষয় নাদযোগ। তৎসম্বন্ধে সবিশেষ নিম্নে বর্ণিত হইল। নাদশ্রবণ অনেক উপায়ে করিতে পারা যায়। প্রাণায়ামদ্বারা শব্দ শ্রবণ সম্বন্ধে তন্ত্রে উল্লিখিত হইয়াছে যে, অঙ্গুষ্ঠদ্বয় দ্বারা কর্ণদ্বয়, তর্জ্জনীদ্বয় কর্ত্তৃক

রহিল না। একখানা গাড়ীভাড়া করিয়া অনেক দূর চলিয়া গেল কালীঘাট, ভবানীপুরের মত একটা নবসজ্জিত উপনগরে জয়গোপাল উপস্থিত। সেখানে দিব্য একটি গুলজার বাজার। মোক্তারের পোষাক সঙ্গেই আছে, দরকার হইল না, জয়গোপাল সেই বাজারে অগ্রে এক সুট বাবুর পোষাক কিনিল, বস্ত্রাদি রাখিবার জন্য ছোট রকম একটা পোর্টমেন্ট কিনিয়া লইল, আর কিছুই না। নগদ ৫০০ শতটাকা পাল্লায়, তখন আর জয়গোপালকে পায় কে? জয়গোপাল তখন মোক্তার বেশ ছাড়িয়া বাবু বেশ ধরিল; অঙ্গে চোকা চাপকান মস্তকে সামলা, হস্তে পোর্টমেন্ট। সে নগর ছাড়িয়া জয়গোপাল বাবু পদব্রজে অন্যদিকে চলিলেন।

সন্ধ্যার চারিদণ্ড পূর্ব্বে জয়গোপাল একটা গ্রাম্য পথে হাজির। দুই চারিজন পল্লীপথিক ধীরে ধীরে পথ বাহিয়া চলিতেছে, গ্রাম্য লোক, সচরাচর বাবু দেখিতে পায় না, চলিতে চলিতে এক এক বার জয়গোপালের দিকে আড়ে আড়ে কটাক্ষ পাত করিতেছে, আত্ম গরিমায় জয়গোপাল ঈশফের গল্পের কোলাবেঙ্গের মত ফুলিতেছে, এমন সময় সম্মুখে একজন গরীব লোক—শীর্ণ শরীর, জীর্ণবাস, বগলে একটা ছোটরকম পুঁটুলী; চাহিয়া চাহিয়া জয়গোপাল দেখিল, চেনা লোক, বিস্ময়ে হাসিয়া তৎক্ষণাৎ জিজ্ঞাসা করিল, "একে তারাচাঁদ? কিরে তারাচাঁদ! তুই কেন এখানে? কোথায় যাইতেছিস? এখানে তুই কবে এলি?"

যে গ্রামে জয়গোপালের নিবাস, এই তারাচাঁদও সেই গ্রামের লোক। তারাচাঁদ সেখানকার একজন নাপিতের ছেলে। বাল্যাবধি জোয়াচুরী মতলবে বিস্তর লোককে জ্বালাতন করিয়া তারাচাঁদ এখন নানা জ্বালায় গ্রাম ছাড়িয়া বিবাগী হইয়া আসিয়াছে। জয়গোপালের প্রশ্নে তারাচাঁদ উত্তর দিল, "দাদাঠাকুর! দাদাঠাকুর! এই যে দাদাঠাকুর! দিব্যি সাজ সেজেছ দাদা! দেশ ছেড়ে এসে বেশ করেছ ভাই! কপালটা তোমার দিব্যি ফিরে গেছে আমি হতভাগা, দেশে আমার নামে সাতখানা ওয়ারীণ, পেটে ভাত নাই, সেই দুঃখে আমি বিবাগী হয়ে বেরিয়েছি। সন্ন্যাসী হয়ে যাব।"

জয়গোপাল বলিল, "ভালই হইল। ভালই হইবে, আমিও বিবাগী হইয়াছিলাম। কপাল ক্রমে সাতপুরের রাজার দাওয়ানজী হইয়াছি, সনন্দ পাইয়াছি, রাজার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে যাইতেছি। ভালই হইল, ভালই হইল। একাকী যাইতেছিলাম, দেশস্থ লোক সঙ্গী পাইলাম। আয় আমার সঙ্গে। আমার

এই ব্যাগটা হাতে করিয়া লইয়া চল্। বেশী ভারী নয়, কেবল খানকতক কাপড়।"

ব্যাগ হাতে লইয়া তারাচাঁদ অগ্রে অগ্রে চলিল, পশ্চাতে জয়গোপাল। ব্যাগটী লইয়া তারাচাঁদ পাছে পালায়, সেই সন্দেহে জয়গোপাল তাহাকে অগ্রে রাখিয়া আপনি পশ্চাৎ ভাগে প্রহরী হইয়া যাইতে লাগিল। যাইতে যাইতে তারাচাঁদের কক্ষ দেশস্থ পুটুলীটির দিকে জয়গোপালের নজর পড়িল, তীব্রস্বরে জয়গোপাল তৎক্ষণাৎ জিজ্ঞাসা করিল, "কি ভাই তোর বগলে?"

তারা।—চাল্ দাদা ঠাকুর! চাট্টি চাল্।

জয়।—অ্যাঁ? চাল্? তবে নাকি মানুষের ভিতর নাপিত বড় টেক্কা ধূর্ত্ত? বিবাগী হইয়া বিদেশে আসিলে ঘরের চাল আনিয়া ভাত খাইতে হয়, এই বুঝি তোমার বুদ্ধি? এই বুঝি তোমার দেশ বিখ্যাত ধূর্ত্ততা? ফ্যাল্ বেটা ফ্যাল্ পুটুলীটা এখনিই টেনে ফেলে দে! চাল এনেছেন ঘর থেকে, ভাত খাবেন বিদেশে,—ফ্যাল্ বেটা ফ্যাল, এক্ষুণি ফ্যাল্ এক্ষুণি ফ্যাল! বেটা আমার!

তারা।—(কাঁপিয়া) বেটা বল কেন দাদা। ঝক্‌মারী করেছি! ফেলি ফেলি ফেলি! (চাউলের পুটুলীটি দূরে নিক্ষেপ)

জয়।—হাঁ, এই ঠিক! ঐ দেখ্, সম্মুখে এক কড়া কাঁণা কড়ি পড়ে আছে, কুড়াইয়া লইয়া ট্যাঁকে রাখ! অনেক উপকার হবে।

তারা।—(কাণা কড়ি ট্যাঁকে রাখিয়া) হয়েছে দাদাঠাকুর হয়েছে; চল।

জয়।—(আকাশে দৃষ্টিপাত করিয়া) আর এখন কোথা চলবি? সন্ধ্যা হল; পাড়াগাঁ; বাসা মিলবে না; চল্, একটা দোকানে গিয়ে রাত্রি যাপন করা যাক।

রাত্রে আর যাত্রা করা হইল না; দুইজনে ১॥ পয়সার মুড়কী খাইয়া, দোকানীকে আটখানি পয়সা দিয়া, দোকানের একধারে সারা রাত পড়িয়া রহিল, ভোরে উঠিয়া পশ্চিম মুখে হাঁটা দিল। গঙ্গাতীরে উপস্থিত।

সেইখানেই খেয়াঘাট। এক হাঁটু জলে একখানি অনাবৃত ক্ষুদ্র তরণী ভাসিতেছে; এক বৃদ্ধ আর একটি বালক নৌকায় বসিয়া তামাক খাইতেছে। বাবু বেশধারী জয়গোপাল চট্টরাজ প্রতিভাগুণে তাহাদের চেহারা দেখিয়া সিদ্ধান্ত করিলেন, পিতা আর পুত্র।

তীর হইতে প্রশ্ন হইল, "পার করিবে মাঝি? দুইলোক। তারাচাঁদ আর আমি, ও পারে আমাদের বিশেষ দরকার।" নৌকা হইতে উত্তর উঠিল, "দুইলোকে দুই কাহন।"

রাজি হইয়া সহচর তারাচাঁদের সঙ্গে জয়গোপাল বাবু জুতা খুলিয়া এক হাঁটু জল কাদা ভাঙ্গিয়া, তরণী আরোহণ করিলেন; কিঞ্চিৎ কম ক্লেশে তারাচাঁদ পরামানিক তাঁহার অনুগামী।

নৌকাখানি ক্ষুদ্র, মস্তকে ছত্রী নাই, বসিবার উপযুক্ত স্থান নাই, সুতরাং অনুচরের সহিত হনুমানের ন্যায় পা ঝুলাইয়া একখানা সরু তক্তার উপর বসিলেন। গঙ্গা সেখানে বেশী প্রশস্ত; বিশেষতঃ সেদিন তুফান ছিল; বায়ু গতিও প্রতিকূল; স্রোতের গতিও বিপরীত; ক্ষুদ্র গাত্রে ঘন ঘন তরঙ্গাঘাত। তুফানে ক্ষুদ্র তরণীর যেরূপ দশা হয়, জয়গোপালের খেয়া নৌকার অবিকল সেই দশা! জয়গোপাল প্রাণের ভয়ে কাতর হইলেন, তারাচাঁদ সে ভয়টা রাখিল না। জয়গোপাল সাঁতার জানেন না, সেই জন্য ভয়; তারাচাঁদ খুব সাঁতার জানে সেই জন্য নির্ভয়; গঙ্গার তুফানে সাঁতার দিয়া নিস্তার পাইবে কি না; সেটাও তারাচাঁদ ভাবে, তথাপি কিন্তু নির্ভয়।

প্রকৃতির খেলাতে নৌকাখানি যখন মাতালের মত টলিতে টলিতে, হিল্লোলে হিল্লোলে হেলিতে দুলিতে, মধ্য গঙ্গায় গিয়া উপস্থিত হইল, আকাশের মধ্যস্থলে তখন সুপ্রখর সূর্য্য; বেলা দ্বিতীয় প্রহর। তরণী চলিতে লাগিল।

তুফান একটু কামল। বেলা তৃতীয় প্রহরের পর বিপদ গ্রস্ত নৌকাখানি পর পারের পুরাতন ভাঙা ঘাটে গিয়া লাগিল। আপনার আসবাব পত্র লইয়া তারাচাঁদের হস্ত ধারণ পূর্ব্বক, জয়গোপাল বাবু তরণী হইতে কাদাজলে নামিলেন; চক্ষু ঘুরাইয়া, নৌকার দিকে ফিরিয়া, মধুর কণ্ঠে কহিলেন, "মাজি! তোমার ঐ পুত্রটিকে সঙ্গে দাও, দান দিব। চেন তুমি আমাকে? রাজা সুরেশ্বরের দেওয়ান আমি, রাজা অদ্য কিসপুরের বাগানে আসিবেন, তাই আমি সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছি; সঙ্গে এখন দুই কাহনের সংস্থান নাই, বাজারের এক পোদ্দারের দোকান হইতে ধার লইয়া দিয়া দিব, তোমার ভয় নাই; দাও দাও ঐ বালককে আমার সঙ্গে।"

মাঝি রাজি হইল। বালক সঙ্গে লইয়া জয়গোপাল দেওয়ান ক্রমশঃ বাজারের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। দিব্য সুপ্রশস্ত রাস্তা। গঙ্গা হইতে বাজারের প্রবেশ পথ পর্য্যন্ত পরিষ্কার দেখা যায় না। অগ্রে জয়গোপাল, মধ্যে বালক, পশ্চাতে তারাচাঁদ।

একটা বৃক্ষতলে উপস্থিত হইয়া, জয়গোপাল একটু পেছু হটিয়া, জনান্তিকে তারাচাঁদের কাণে কাণে বলিলেন, "দাও না হে, তোমার সঙ্গে যা আছে, তাই

তুমি বাহির করিয়া দাও।—ভাবিয়া চিন্তিয়া তারাচাঁদ সেই কাণা কড়িটি বাহির করিয়া বালকের হস্তে দিল। বালক কাঁদিয়া উঠিল। হাত উচু করিয়া কড়ি কড়াটি দেখাইয়া চীৎকারে চীৎকারে পিতাকে বলিল, "এক কাণা কড়ি, এক কাণা কড়ি!" নৌকায় দাঁড়াইয়া বৃদ্ধ শুনিল, (শুনিল কিংবা বুঝিল, বৃদ্ধই তাহা জানিয়া ছিল) এক কাহন। কাণা কড়ি, তত বড় কথাটা তাহার শ্রবণে অথবা মস্তকে প্রবেশ করে নাই; বৃদ্ধ মাঝি সুতরাং চীৎকার করিয়া বালককে বলিল, "যা দিয়াছে, তাই ভাল; তাই তুই লয়ে আয়।"

মাঝির নবম বর্ষীয় পুত্রটি কাণা কড়ি লইয়া নৌকার দিকে চলিল, অভিনব যাত্রী যুগল অতি শীঘ্র শীঘ্র পদ বিক্ষেপ করিয়া, বাজারের গণ্ডগোল মধ্যে মিশিয়া গেলেন প্রতারিত নাবিক বেচারা আর সেই জুয়াচোর দিগের টিকিও দেখিতে পাইল না।

জয়গোপাল চট্টরাজ লোক মুখে শুনিয়াছিলেন, ঐ স্থানের গঙ্গার ঐ পারে একটা রাজার বাগান আছে, রাজার নাম সুরেশ্বর। সেটা কেবল জয়গোপালের স্বার্থ সিদ্ধির উপায় কল্পনা। রাজাও নয়, বাগান নয়, দেওয়ান নয়, ভুয়াকাণ্ড মাঝির উপদ্রবের আশঙ্কায় তাঁহারা অতিসত্বর সেস্থান ত্যাগ করিবার যোগাড় দেখিলেন। বাজারের আধক্রোশ দূরে একটা ছোট নদী। নদী না বলিয়া শুঁড়ি খাল বলিলেও ভুল হয় না। বৎসরের সকল সময় সেই খালে জল থাকিত না। জয়গোপালের পার হইবার দরকারের সময় একহাত মাত্র জল। তারাচাঁদের হাত ধরিয়া স্বচ্ছন্দে হাটিয়া পার হইয়া জয়গোপাল বাবু উপরে উঠিলেন।

সম্মুখেই দুধারে ছোট ছোট জঙ্গল, মধ্যস্থলে বাঁকা বাঁকা শুঁড়িপথ। দূরে দূরে উভয় পার্শ্বে এক এক জন গরীবের অর্দ্ধভগ্ন পর্ণকুটীর দণ্ডায়মান। সমাজ বাচ্য লোকালয় সে নিকটায় আসলেই নাই, জয়গোপাল তাহা বুঝিতে পারিয়া ক্রমাগত পশ্চিম মুখে চলিলেন নির নাই, আহার নাই, ক্ষুধায় জঠরাগ্নি প্রজ্বলিত পিপাসায় কণ্ঠ শুষ্ক; লোকালয়ে না পৌছিলে প্রতিবিধান হয় না, সেই জন্য লোকালয় অন্বেষণে যাত্রা।

ক্রোশৈক দূরে একটি লোকালয় দৃষ্ট হইল। প্রবেশ করিবার পথের দক্ষিণ পার্শ্বে একখানি মুদী খানার দোকান। যেমন তেমন মুদীখানা নয়, ঘরখানা সত্তর হাত লম্বা চল্লিশ হাত ওসার বাহিরের চারিধারে চওড়া চওড়া টালিগাথা বসিবার আসন। দোকানির নাম রামরঞ্জন মালাকর। গৃহস্থের সূতীকাগার

অবধি শ্মশান ঘাট পর্য্যন্ত নিত্য নৈমিত্তিক ব্যবহার্য্য সমস্ত দ্রব্যই এই দোকানে পাওয়া যায়। এ দোকানে ভদ্র লোকের খুব আদর। গ্রামের সমস্ত লোকই এই দোকান হইতে সমস্ত দ্রব্য গ্রহণ করেন। জয়গোপাল একাকী বাবুবেশে সেই দোকানে প্রবেশ করিলেন; দশমিনিট পরে আর একধারে তারাচাঁদ।

বেলা তৃতীয় প্রহর অতীত হইয়াছে, একটা আশ্রয় পাইয়া জয়গোপালের ক্ষুধা তৃষ্ণা বাড়িয়া উঠিল; স্নান করিবার ইচ্ছা হইল। ঘাট মাঝির কাছে যেরূপ পরিচয় দিয়াছিলেন, এই দোকানীর কাছেও মোক্তার মহাশয় সেইরূপ রাজা, রাজার বাগান, রাজার দেওয়ান ইত্যাদি পরিচয় দিলেন, রামরঞ্জন বেশী খাতির করিল, ব্যস্ত হইয়া শীঘ্র শীঘ্র স্নানের আয়োজনের আদেশ প্রদান করিল। দোকানে চাকর অনেক গুলি, আয়োজনে কিছুমাত্র বিলম্ব হইল না।

নিকটস্থ সরোবরে জয়গোপাল স্নান করিতে নামিলেন। বেলা প্রায় অবসান এমন শেষ বেলায় গ্রাম্য লোকে স্নান করে না, তথাপ স্নানের ঘাটে গলাজলে একটি লোক। গোঁপদাড়ি নাই, মস্তকেও চুল নাই, ব্রহ্মরন্ধ্রের উপর একহাত লম্বা একগোছা টিকি। দেখিয়াই জয় গোপাল সেই মুখ খানি চিনিলেন; চকিত হইয়া জিজ্ঞাসিলেন, "কে হে, বাঁকুরাম! তুমি এখানে কিরূপে আসিলে। কবে আসিলে?"

বাঁকুরাম উত্তর করিল "আর ভাই, কবে আসার কথা কেন জিজ্ঞাসা কর? তুমি যেদিন দেশত্যাগী বৈরাগী, তাহার একদিন পরে আমিও এই পথের পথিক। দেশে আর সে সব কারবার চলেনা, সকলেই সতর্ক, সকলেই গালাগালি করে, নালিশ করিবার ভয় দেখায়, কাজে কাজেই চম্পট। এখানে আসিয়া সন্ন্যাসী হইয়াছি। ঐ যে দোকানের ধারে বটবৃক্ষ, ঐ বৃক্ষতলে ভস্ম মাখিয়া ধূনী জ্বালাই, ভক্ত লোকেরা—বিশেষতঃ স্ত্রীলোকেরা, ডাব, সন্দেস, ক্ষীরছানা, ফল মূল অর্পণ করে, দু-একটি পয়সাও দেয়, ভক্ষণ করিয়া সঞ্চয় করি। সন্ন্যাসী গিরীতে বুজরুকি চাই, জানই তো, সে ফিকির আমি খুব জানি,—কপাল দেখিয়া আগত লোকের ভাগ্য গণনা করি, বন্ধ্যা নারীর সন্তান হইবার ঔষধ প্রদান করি, পতিবিরাগিণী কুলবালাদের পতিসোহাগের উপায় বলিয়া দিই, এই প্রকার পাঁচ রকমে এখানে বেশ ভক্তি পাইয়াছি, একরকম সুখেই আছি। তুমি এখানে কবে আসিয়াছ? চলিতেছে কেমন?

প্রশ্নের উত্তর না দিয়া, হাস্য করিয়া জয়গোপাল জিজ্ঞাসা করিলেন,

"ভৈরবী মিলিয়াছেত?"—তীরের দিকে চাহিয়া বাঁকুরাম একবার হাস্য করিলেন। উভয়ের কথা গুলি অবশ্য চুপি চুপি হইয়াছিল, একথা বাহুল্য।

নবীন সন্ন্যাসীর নাম বাঁকারাম ভট্ট। জয়গোপালের প্রতিবাসী। গ্রামের লোকে ইহাকে বাঁকু ভাট বলিয়া জানে। জয়গোপালের জুয়াচুরী কার্য্যে এইব্যক্তি সহকারী ছিল, জয়গোপালের বিরহেই অকালে সন্ন্যাস। কাণের কাছে একটু সরিয়া গিয়া জয়গোপাল তাঁহাকে বলিলেন, "বেশ হইয়াছে! ঠিক সময়ে বিধাতা তোমাকে এখানে মিলাইয়া দিলেন। বাঁকুদাদা। তোমাকে ভাই আমার একটি উপকার করিতে হইবে।"

এই কথার পর খুব চুপি চুপি কাণে কাণে পরামর্শ। তারা চাঁদ ও দিকে তৈলমাখিয়া সেই সময় ঘাটে আসিয়া উপস্থিত। তারাচাঁদকে দেখিয়া বাঁকু ভাটের মহাবিস্ময়। তিন জনেই একদলের লোক। গা চাটা চাটি হইয়া গেল। তিন জনেই স্নান সমাপ্ত করিয়া তীরে উঠিল। সন্ন্যাসী গেল বৃক্ষতলে, তারাচাঁদের সহিত জয়গোপাল গেলেন মুদীর দোকানে। এইখানে একটু প্রকাশ থাকুক যে, জয়গোপালের সহিত তারাচাঁদের জানাশুনা আছে, কোন লক্ষণে দোকানের লোকেরা তাহা বুঝিতে পারেন নাই।

কাপড় ছাড়িয়া জয়গোপাল সন্ধ্যাহ্নিক করিলেন, জল খাইতে বসিলেন। জল খাওয়া কেবল রসগোল্লা সন্দেশ আর নেয়াপাতী ডাব। আহারে জয়গোপালের বিলক্ষণ পটুতা। দুইসের রসগোল্লা আড়াইসের সন্দেশ, আর ছোটবড় আটটি ডাব তাঁহার সেবায় আসিল। মূল্য পাঁচটাকা, বিশ্বাসের উপর ধার। তারাচাঁদ এক পয়সা মুড়ি মুড়কি খাইয়া একলোটাজল খাইল, তাহাও বিশ্বাসের উপর ধার। দূরে বসিয়া জয়গোপাল দুই তিনবার সঙ্কেতে সঙ্কেতে চক্ষু টিপিলেন, ভরসা পাইয়া তারাচাঁদ তখন তিন পোয়া রসগোল্লা আর একটি ডাব গর্ত্তস্থ করিল। মূল্য এক টাকা এক আনা অবশ্যই ধার।

বাঁকুরাম ও দিকে বটবৃক্ষতলে বসিয়া সর্ব্বাঙ্গে শ্বেতভস্ম মাখিয়া সাধু সন্ন্যাসী সাজিল, জয়গোপাল তাহাকে দুগ্ধ রম্ভা সেবা করাইয়া আসিলেন। এইখানে এই অভিনয়ের আর এক অঙ্ক। জয়গোপালের সঙ্গে একটা অর্দ্ধ ভগ্ন তোরঙ্গছিল, চাবিবন্ধ। চাবি খুলিয়া জয়গোপাল তন্মধ্য হইতে মোক্তারী পোষাক গুলি আর পাঁচশত টাকার এককেতা নোট বাহির করিলেন। তোরঙ্গে আবার চাবি পড়িল। গর্ত্তশূন্য, দোকানদার তাহা জানিল না।

নোটখানি হাতে করিয়া দুলাইয়া জয়গোপাল বলিলেন, "ওহো। ওঃ হোঃ

রাজা হয়তো কল্যই আসিয়াছেন, সঙ্গে অনেক লোক জন। রাজা কেবল নামে রাজা, আমি দাওয়ানজী, আমি সর্ব্বময় কর্ত্তা, রাজার লোকজন আমাকেই বেশী মান্য করে তাহাদের সকলকেই কাপড় দিতে হইবে; সম্মুখে শীত, বেশীবেতনের কর্ম্মচারী গুলিকে শীত বস্ত্র দিতে হইবে; রামরঞ্জন ভায়া, তোমার দোকানে সব আছে, ফর্দ্দ কর, বাছিয়া বাছিয়া কতকগুলি ভাল ভাল কাপড় আমাকে দাও।

রামরঞ্জন ফর্দ্দ করিল। ধুতি সাড়ি চাদর শাল রুমাল বনাত ইত্যাদি বাছিয়া বাছিয়া দিল। সন্দেশ রসগোল্লার দাম ধরিয়া সর্ব্বশুদ্ধ দাম হইল ৩৭০৲টি টাকা। মোক্তারী পোষাক সমেত দুটি গাঁটরী বাঁধিয়া জয়গোপাল প্রহৃষ্ট চিত্তে দোকানীকে বলিলেন, "দাও ভাই, ১৩০টি টাকা আমাকে ফেরত দাও, দুজন মুটে ডাকিয়া দাও শীঘ্র একবার বাগান হইতে ফিরিয়া আসি, আমার তোরঙ্গটি এখানে রহিল, এখনি আসিব, আরও অনেক জিনিষ লইতে হইবে, টাকা ফুরাইতেছে, খাতাঞ্জির দপ্তর হইতে আর কিছু টাকা আনি"

দোকানদার সন্দেহ করিল না, বড়লোক, কেনইবা সন্দেহ হইবে, ১৩০৲ টাকা গুনিয়াদিল, মুটে ডাকিতে বলিল, নোট পাইল না, চাহিলও না। জয় গোপাল প্রস্থান করিতে উদ্যত।

দোকানের একজন লোক সেই সময় তারাচাঁদের কাছে রসগোল্লার সূর্য্যঅস্ত। দামের তাগাদা করিল। যেন চমকিয়া উঠিয়া তারাচাঁদ বলিল, "সে কি! আগাম দু-টাকা দিয়া বসিয়াছি, ডাব রসগোল্লা ১৴০ একটাকা একআনা, তৈল আর মুড়ি মুড়কী দুইপয়স', এই হইল একটাকা দেড় আনা, বাকি সাড়ে চৌদ্দ আনা আম ফেরত পাইব, তাহা না দিবার মতলবেই বুঝি ঐ কথা?

"জুয়াচোর রে জুয়াচোর! কেমন করিয়া ফাঁকিদেয় দেখ! দাবী দেয় দেখ!" এই বলিয়া রামরঞ্জন মালাকর রাজ দেওয়ান জয়গোপালকে মধ্যস্থ মানিল। জয়গোপাল বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "দাও বেটাকে পুলিশে দাও! এখনি দাও! ডাকো চৌকিদার! তুখড় জুয়াচোর দাও পুলিশে! ডাক চৌকিদার! আমি সাক্ষ্য দিব।"

তারাচাঁদ অনেক রকম ধূর্ত্ততা করিল, দোকানদার শুনিল না জুয়াচুরী দাবীতে চৌকিদারে জিম্মা করিয়াদিল, গামছা দিয়া হাত বাঁধিয়া পুলিশের চৌকিদার ধাক্কা দিতে দিতে তারাচাঁদকে থানায় লইয়াগেল। জয়গোপালের পায়ে ধরিল রামরঞ্জন বলিল, "বাবু মহাশয় দেওয়ানজী মহাশয়! রাত্রিকালে বিচার হইবে না, কল্য বিচার। এ রাত্রে আপনার যাওয়া হইবে না, উত্তম ঘর আছে, উত্তম বিছানা আছে, শয়ন

করিয়া থাকুন, সেবার ত্রুট হইবে না, আপনি ভিন্ন আর আমার সাক্ষি নাই, দয়া করিয়া থাকুন, দোহাই!"

জয়গোপাল সেই দোকানে রাত্রিবাস করিলেন প্রভাতে উঠিয়া দোকানীকে বলিলেন, "কাপড় গুলি আমি বাগানে রাখিয়া আসি ঠিক সময় আদালতে উপস্থিত হইব।" দোকানদার আপত্তি করিল না। জয়গোপাল জিনিষ পত্র লইয়া স্বচ্ছন্দে বাহির হইলেন, রাত্রি বাসের ভাড়া স্বতন্ত্র একটাকা নগদ দিবেন বলিয়া গেলেন।

যথা সময়ে আদালত বসিল। পুলিশ চালানী আসামী তারাচাঁদ প্রথম বৈঠকেই হাজির। বাবুবেশে জয়গোপাল আসিয়া হুজুরের সম্মুখে দাঁড়াইলেন। ফরিয়াদীর এজাহার গ্রহনান্তর জয়গোপালের জোবানবন্দী। শপথ করিয়া জয়গোপাল বলিলেন, "জানিনা হুজুর, এরাজ্যের কেমন বিচার, এ দোকানীর কেমন ধর্ম্ম! এই লোকটি সত্য সত্যই দুটী টাকা অগ্রেদিয়াছেন, স্বচক্ষে দেখিয়া, আমার কর্ণ দুটীও স্পষ্ট ঠং ঠং শব্দ শুনিয়াছে, দোকানী বলে মিথ্যাকথা। কাণ্ড-কারখানা দেখিয়া সত্যই বোধ হয় ৫০০৲শত টাকার নোট দিয়া আমি প্রায় একশত টাকার জিনিষ লইয়াছি, এইলোক হয়ত অক্লেসে বলিবে, টাকা পাই নাই।" ——দোকানদার অবাক।

একটু চিন্তা করিয়া হাকিম কহিলেন, "এই ভদ্রলোকটি ছাড়া অন্য কেহ সাক্ষি আছে!" জয়গোপাল বলিলেন, "কেন থাকিবে না, কেন থাকিবে না, সাধু সাক্ষি আছেন। দোকানের পূর্ব্বধারে বটবৃক্ষ মূলে সেই সাধু সন্ন্যাসির পীঠ; তিনি সব দেখিয়াছেন, সব শুনিয়াছেন, সব জানেন।"

সাধুকে হাজির করিবার হুকুম হইল। সাধুকে আনিবার জন্য দুইজন চাপরাসি গেল। হাকিমের তলব। সাধু তখন কি করেণ, পূর্ব্বদিনের অপরাহ্ন স্নান কালীন পরামর্শ মনে ছিল, দোকানের কাছে উঠিয়া গিয়া একজন দোকানীকে বলিলেন, "কোপনী পরিয়া হাকিমের কাছে কিরূপে যাই, তোমাদের বাপু যদি একখানি ভাল কাপড় থাকে, ক্ষানিক ক্ষণের জন্য আমাকে দাও, আসিয়াই ছাড়িয়া দিব।"

বড় দোকান, দোকানীও সসম্পন্ন লোক, তাহার একটি নূতন গরদের জোড় কোঁচান ছিল, দোকানী সেই জোড়টি সাধুকে দিল, গরদ খানি পরিয়া, দোরজা স্কন্ধে ঝুলাইয়া চাপরাসীদের সঙ্গে সাধু বাঁকারাম আদালতে গেলেন, সাক্ষি মঞ্চে দাঁড়াইয়া প্রশ্ন মাত তিনি উত্তর করিলেন, "নারায়ণ, নারায়ণ এমন মোকদ্দমাও

লোকে করে। তাহা জুয়াচুরী, তাহা জুয়াচুরী! ঐ লোকটিও দুটি টাকা দিয়াছে, এই বাবুটিও এক খানা নোট দিয়াছেন চক্ষে দেখিয়াছি, এখন আমার নিজের জন্য আতঙ্ক হইতেছে। গরীব সন্ন্যাসী আসি, একজন ভক্ত আমাকে এই গরদের জোড়াট দান করিয়াছেন, এই অধার্ম্মিক দোকানী পাছে বলে, এই জোড়টিও উহাদের। ইহাই আমার আতঙ্ক! কাজ নাই বাবা, এ জায়গায় আমি থাকিব না, এখনি—এখনি—" বলিতে বলিতে মঞ্চ হইতে নামিয়া চোঁ-চাঁ দৌড়।

সাধু পলাইল, রামরঞ্জনের মোকদ্দমা ডিস্ মিস্ হইয়া গেল, তারাচাঁদ বেকশুর খালাস পাইল, জয়গোপাল হাসিতে হাসিতে বাহির হইলেন, শূন্য গর্ত্ত ভগ্ন তোরঙ্গটা দোকানেই পড়িয়া রহিল, তোরঙ্গ স্বামী তুরঙ্গ গতিতে অন্যদিকে প্রস্থান করিলেন, অন্যদার দিয়া তারাচাঁদও স্বচ্ছন্দে বুক ফুলাইয়া চলিয়া গেল। দোকানদার বেচারা ফ্যাল ফ্যাল করিয়া চাহিয়া রহিল।

যুগল স্বীকারী। পশু স্বীকারী নয়, মানুষ স্বীকারী নয়, টাকা স্বীকারী। মানে হইতেছে, যুগল জুয়াচোর! প্রধান স্বীকারী জয়গোপাল চট্টরাজ, সঙ্গি স্বীকারী তারাচাঁদ। সহকারী ক্ষুদ্র স্বীকারী সন্ন্যাসী বেশধারী বাঁকারাম ভট্ট উহাদের তুলনায় ছিচ্‌কে চোর, অতএব তাহাকে অল্পে অল্পে ছাড়িয়া দেওয়া গেল। যুগল স্বীকারী অল্পক্ষণ পৃথক থাকিয়া গ্রামান্তরে যুগলরূপে মিলন। ইহারা যে, কত স্থানে কত প্রকার নূতন নূতন দাগাবাজী করিয়াছে, সময়ান্তরে তাহা আমরা পাঠক মহাশয়কে শুনাইব।

হেমন্ত কাল।

লেখক শ্রীসুধন চন্দ্র দে।

সুখদা সারদা সতী, শরতের শেষে,
সিঞ্চি সবে শান্তিজল সলিলে প্রবেশে।
সেই শোকে শোকাকুল শরৎ সময়,
দেবীর পশ্চাতে দুঃখে তিরোহিত হয়।
সেই সঙ্গে মানবাঙ্গে দুঃখের সঞ্চার,
ক্রমে উপনিত হয় সুখের বিকার।

যা'দের আলয়ে মার হয় আগমন,
দেবীর বিদায়ে তাঁরা ব্যথিত জীবন।
পান দান ভোজনাদি যাহাদের সনে
ক'রেছি প্রেমানন্দে সেই তিন দিনে,
সমাগত সেইসব প্রিয় বন্ধুজন
নিজ নিজ নিকেতনে করিলে গমন,
সকলে মনের খেদে কাটায় জীবন,
হৃদে বিদ্ধ হয় তীক্ষ্ণ কণ্টক যেমন।
বিদেশে থাকেন যাঁরা ত্যজিয়া ভবন,
চিন্তা মেঘ হৃদাকাশ আচ্ছাদে তখন।
প্রিয়জন কাছে আজ্ঞা লন ক্ষুণ্নমনে
সন্তুষ্ট করেন সবে অমিয় বচনে।
"কেমনে রহিব স্থির বিদেশ ভবনে"
এই চিন্তা দিবানিশি উঠে তাঁর মনে।
ভাই, বন্ধু, দারা সুত ত্যজিয়া স্বজন
অর্থ লাগি দূরদেশে করেন গমন।
এরূপে শরৎকাল দেবীর গমনে,
নীরবে নিভৃত স্থানে যায় ক্ষুণ্নমনে।
ঋতু শূন্য এ সংসার দেখি নারায়ণ-
হেমন্তে আসিতে আজ্ঞা করেন তখন।
হেমন্ত ধরায় আসি, বিধির বচনে,
ব্যাকুল হইল অতি সখার বিহনে।
ইচ্ছাময় ধরাধামে করে বিচরণ,
বিধির নিয়ম বল কে করে খণ্ডন।
মনকে প্রবোধ দেয় রবি দরশনে,
বাড়ে সে বিচ্ছেদ জ্বালা নিশা আগমনে।
সেই শোকে রজনীতে করে সে ক্রন্দন,
শিশির বলিয়া যারে জানে জনগণ।
ইহা দেখি মানবের বিচ্ছেদ অনল
দিবাপেক্ষা রজনীতে হয় যে প্রবল

ভাবনায় শুষ্ককায় হয় যে হেমন্ত,
গিয়াছে প্রাণের বঁধু কে করিবে শান্ত।
নীরস পৃথিবী হয় তাহার কারণ,
লতা, পাতা, ফল, ফুল শুকায় তখন।
প্রভাতে হেমন্ত ছবি চিত্তবিনোদন,
কবির কল্পনাতীত করিতে বর্ণন।
পাতায় পাতায় আর শাখায় শাখায়,
ঝরে শিশিরের বিন্দু কিবা শোভা তায়।
ফল ফুলে দুর্ব্বাদলে যেদিকে নেহারি,
সকলেই দুঃখে যেন ফেলে অশ্রুবারি।
পড়িয়া ভানুর ভাতি শিশির উপর,
ধরে কি অপূর্ব্ব শোভা মনোমুগ্ধকর।
মুকুতার ছড়া-ছড়ি হয় চারি ধারে,
মাঠ ঘাট হাট শোভে মুকুতা নিকরে।
লতা পাতা শাখা আদি মুকুতা মালায়
মোহন মুরতি ধরে ভানুর কৃপায়।
তরুণ অরুণ ক্রমে ঝলসে নয়ন,
হেমরূপ ছাড়ি ধরে রজত বরণ।
চিরবিরহিত প্রিয় বঁধুর দেখায়,
নয়নের জল যথা নয়নে মিশায়,
পূর্ব্বাকাশে প্রিয়জন ভানুর আভায়,
হেমন্তের অশ্রুজল স্বভাবে শুকায়।
হেমন্তে প্রাণ ত শান্ত প্রান্তর শোভায়,
ময়দানে ধান্যগাছ সুন্দর দেখায়।
পবন হিল্লোলে, আহা, দোলে নবকায়,
সবুজ সাগরে যেন তরঙ্গ খেলায়।
মধ্যে মধ্যে ইক্ষু ক্ষেত্র শোভে কি সুন্দর,
সিন্ধুমাঝে ভাসে যেন বোমা মনোহর।
শস্যের বর্দ্ধন দেখি কৃষকের মন
আনন্দ সাগরে মগ্ন হয় অনুক্ষণ।

সর্ব্বজনে সদা ধান্যে সমাদর করে,
ধন্য বটে ধান্য ধন ধরণী ভিতরে।
ধান্য বিনা হাহাকার পূর্ণ এ ভুবন।
ভারত বাসীর হয় ধান্যই জীবন।
মণি, মুক্তা হীরকাদি প্রবাল কাঞ্চন,
ধান্যের নিকটে হয় অতি তুচ্ছধন।
যদি হয় নিরাপদে জনম ইহার,
সকলের হৃদে হয় আনন্দ অপার।
কিন্তু যদি জলভাবে শরীর শুকায়,
চিন্তায় নিমগ্ন সবে, করে হায় হায়।
কৃষক সলিল সিঞ্চে রক্ষিতে তাহার,
সকলে জলের আশে ডাকে দেবতায়।
যদি ঘন বরিষণ হেন কালে করে,
আনন্দ না ধরে আর কৃষক অন্তরে।
নীরদ নিসৃত নীর পেয়ে সুসময়,
কলিতে আরম্ভ হয় ধান্য সমুদয়।
মস্তকে অতুল শোভা করয়ে ধারণ।
মুকুট ভূষণ পরে কনক বরণ।
অবনত মস্তকেতে শিক্ষা দেয় নরে,
সেই শির নত করে, যেই গুণ ধরে।
নয়নের তৃপ্তিকর চিত্তবিনোদন,
স্বর্ণ বর্ণ শস্য খেলে সহ সমীরণ।
মরি মরি কিবা শোভা মনোমুগ্ধ কর;
পরেছে হেমন্ত যেন নব পীতাম্বর।
সুপক্ব হইল কিনা, করিতে ঈক্ষণ,
প্রান্তরে কৃষকগণ যায় অনুক্ষণ।
হেমন্ত কালের শেষে পক্ব এই ধান,
সেই জন্য হৈমন্তিক হয় উপাখ্যান।
কৃষকের মনে মনে হয় কত আশা,
আশার নাহিকো সীমা, অতৃপ্ত পিপাসা।

মনে মনে লক্ষ্য ভাগ করয়ে কৃষক,
"বিক্রয় করিব কিছু, খাইব কতক।"
দলে দলে পাখী সব কলরব করে
উল্লাস অন্তরে গায় সুমধুর স্বরে।
সারস, সরসী, শুক, সাক্ষী, চন্দনা,
কাকাতুয়া কপোতের আনন্দ ধরে না।
আহার কারণ ধায় প্রান্তরে সত্তর,
আনন্দে আহার করে পুরিয়া উদর।
আনি শীষ কাটি কেহ আপন কুলায়
আহার করিতে দেয় আপন ছানায়।
কেহবা শাবক গুলি সঙ্গেতে লইয়া,
উপনীত প্রান্তরেতে উড়িয়া উড়িয়া।
কি প্রান্তরে কি কুলায় কিবা মাতৃস্নেহ,
পরমেশ বিনা একি দিতে পারে কেহ।
মূষিক সঞ্চয় করে আপন ভাণ্ডারে;
রাশি রাশি শীষ কাটি লুকায় গহ্বরে।
ভবিষ্যৎ ভাবনার করিতে মোচন,
পূর্ব্ব হৈতে তারি তরে করে আয়োজন।
নরে উপদেশ দেয় এই জন্তু গণ,
"ভবিষ্যৎ জন্য কিছু কর আয়োজন।"
এসব দেখিয়া তবু ভ্রম অন্ধকারে,
আচ্ছন্ন অছেন কত বুদ্ধিমান নরে।
কৃষক মজুর লয়ে শস্য কাটিবারে,
প্রফুল্ল অন্তরে যায় প্রান্তর মাঝারে।
তুষ্ট হয়ে নত হয়ে কাটে সবে ধান,
কেহবা মনের সুখে কত গায় গান।
কেহ আটী বাঁধে আর কেহ বোঝাবাঁধে,
কেহবা মাথার লয় কেহ লয় কাঁধে।
লইয়ে ধান্যের বোঝা স্বসদনে ধায়,
ঝন ঝন শব্দ হয় কি মাধুরি তায়!

সারি সারি গাদা দেয় কিবা শোভা তার,
দেবের মন্দির যেন অতি চমৎকার।
গো, মেষ, মহিষ ছাগআদি পশুগণে,
উত্তলিত শস্য-ক্ষেত্রে চরে ইষ্টমনে।
বৎস্যগণ মার পার্শ্বে করয়ে কুর্দ্দন,
অন্তরে যাইলে মাতা ডাকে ঘন ঘন।
সন্তান হইতে নাই কোন উপকার,
তথাপি কেমন স্নেহ, বর্ণে সাধ্য কার?
বল হে হেমন্ত বল বল বিবরণ,
কে রচিল এই রূপ রূপ বিমোহন।
কাহার কৃপায় সাজ এরূপ তোমার,
অনন্ত মহিমা প্রকাশ কাহার।
উদ্দেশে প্রণাম করি সে আরাধ্য ধনে,
সুধনের মতি যেন থাকে সে চরণে।

নারী জাতির মহত্ত্ব।

লেখক শ্রীঅক্ষয়কুমার ঠাকুর এম, এ,।

পরমেশ্বরের সৃষ্টি মধ্যে মানবসৃষ্টিই সর্ব্ব প্রধান। তন্মধ্যে আবার মানবীয় পুংজাতি আপনাকে শ্রেষ্ঠতম বলিয়া গণ্য করেন। প্রাণি তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা বলেন যে নিম্ন শ্রেণীস্থ জীব দিগের মধ্যে পুংজাতি সৌন্দর্য্যে ও বীর্য্যে স্ত্রীজাতি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর; কেননা সুন্দর পুচ্ছধারী শিখীর শোভা শিখা পুচ্ছবিহীনা শিখীনীর শোভা অপেক্ষা মনোহর তর বলিয়া স্বীকার করিবেন, অথবা সুবিপুল কেশর রাজি বিশোভিত সিংহের আকৃতি শতসৌন্দর্য্য কেশর বিহীনা সিংহিনীর শোভাকে একান্ত পরাভূত করিয়াছে ইহা কে অস্বীকার করিবেন?

পুংমানবও যে স্ত্রীজাতি অপেক্ষা সুন্দরতর নহেন তাহাই বা কিরূপে বলা যায়? সত্য বটে ভাবুক ও প্রেমিক কবি লিখিয়া গিয়াছেন:

"নলিনী মলিনী দিবসাত্যয়ে।

শশিকলা বিকলা ক্ষণদাক্ষয়ে॥
ইতি বিধি বিদধে রমণী মুখং।
ভবতি বিজ্ঞতমঃ ক্রমশো জনঃ॥"

কিন্তু দিব্য শ্মশ্রু বিরাজিত কিশোর বয়স্ক মানবের মুখশ্রী "সশৈবলা সঙ্গা" পদ্মিনীর ন্যায় নয় কি? আমাদিগের মধ্যে স্ত্রীসৌন্দর্য্য প্রশংসার ভিতরে, আমাদিগের স্ত্রীজাতির প্রতি তোষামোদ প্রিয়তা স্বার্থ প্রভৃতি ভাব অন্তর্নিহিত নাই ইহা কে বলিতে পারে?

সে যাহা হউক, বোধ হয় রমণী হৃদয়ে সৌন্দর্য্যের নিকট পুরুষকে পরাভব স্বীকার করিতে হয়। জগদীশ্বরের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানব চরিত্র গঠনের ভার যে জাতির উপর বিশেষ ভাবে নিহিত সেই স্ত্রীজাতির হৃদয় যে নানা সদ্গুণের আধার হইবে সে বিষয়ে বিচিত্রতা কি? মানব জাতির কথা ছাড়িয়া দিয়া ইতর জন্তুদিগের বিষয় প্রণিধান করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে তাহাদিগের মধ্যে মাতাই সন্তান লালন পালন কার্য্যে নিরত থাকে। অনেক স্থলে এরূপ দেখা যায় যে সন্তান উৎপাদন পর্য্যন্ত পিতার সহিত শিশু জীবের সম্বন্ধ; কোন কোনও স্থলে পুংজাতি স্বীয় শাবককেও অবসর পাইলে ভক্ষণ করিয়া ক্ষুন্নিবৃত্তিতেও পরাং মুখ নহে। মনুষ্যজাতির বিষয়ে প্রণিধান করিলে দৃষ্ট হয় যে আশৈশব মানব শিশুর মাতার সহিত যেরূপ গাঢ়তর ও কোমলতর সম্বন্ধ পিতার সহিত সেরূপ নহে। শৈশবে মাতা যেরূপ সন্তানের অহরহঃ সঙ্গিনী পিতা সেরূপ সাহার্য্যে থাকেন না। শৈশব কাল চরিত্র গঠণের উপযুক্ত সময়; সেই সময়ে, যে সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনাবলী মানব শিশুর অনুভূতির বিষয় হয় তাহাই পরে তাহার চরিত্র গঠনের নিয়ামক হইয়া পড়ে। সেই সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনাবলীর কেন্দ্র স্বরূপিণী শিশুর মাতা বৈ আর কাহাকে অধিক তর জাজ্জল্যতর ভাবে বর্ত্তমান দেখিতে পাই? সত্য বটে সন্তানাদি লালন পালনে পিতার দায়িত্ব অনেক কিন্তু ভাল করিয়া দেখিয়া শুনিয়া আর্য্যঋষিগণ মাতার গুরুত্বই প্রতিপন্ন করিয়া গিয়াছেন; ভগবান্ মনু বলেন,

"গুরুণাঞ্চৈব সর্ব্বেষাং মাতাপরমকোগুরু।
মাতাউচ্চতরাভূমেঃ খাৎ পিতোচ্চতর স্তথা।"

জগতের শীর্ষ স্থানীয় ব্যক্তি বৃন্দের জীবন চরিত পর্য্যালোচনা করিলে ইহাই দেখিতে পাওয়া যায় যে তাঁহাদিগের চরিত্র গঠনে তাঁহাদিগের মাতার আত্যন্তিক সম্বন্ধ ছিল। মহাবীর আলেক জাণ্ডার ও নেপোলিয়নের চরিত্র গঠনে তদীয়

জননীর বিশিষ্ট সহায়তার বিষয় কাহারও অবিদিত নাই।

সত্যবটে কলুষিত হইলে নারীহৃদয় বড়ই নিকৃষ্ট হয় এবং সমাজ স্ত্রীজাতির কলুষিতা বিশেষ ঘৃণার চক্ষে দেখেন। কিন্তু, সমাজের এই জুগুপ্সার ভিতর আমরা কি তৎকর্ত্তৃক নারী হৃদয়ের মহত্ত্ব ও সদ্গুণ শালিতার অস্ফুট প্রতিধ্বনি শুনিতে পাই নাই, তুষার ধবল ক্ষীর পাত্র এক বিন্দু মসীবিন্দুপাতে যেমন দেখায় সেইরূপ স্বভাব সুকুমার নারীহৃদয়ে কলুষ কালিমা বিন্দু সংযুক্ত হইলে জুগুপ্সার নিতান্ত বিষয়ী ভূত হইয়া পড়ে, সমাজও সেইজন্য সেইরূপ চক্ষে স্ত্রীজাতির কলুষতা পুংজাতির কলুষতা অপেক্ষাও মহত্তর বলিয়া মানেন। তথাপি রমণী হৃদয়ের সৌন্দর্য্যের ভাব এতই অধিক যে অনেক স্থলে মানব সমাজ চন্দ্রমার কলঙ্কাপনোদন ব্রতী ভাবুক কবি কালিদাসের ন্যায়!

"ছায়া হি ভূমেঃ শশিনোর্মলত্বে
নারোপিতা শুদ্ধিমতঃ প্রজাভিঃ॥"

এই ভাবের বশবর্ত্তী হইয়া নারী চরিত্রে দোষের ভাগ ত্যাগ করিয়া গুণের ভাগ গ্রহণ করেন। সেই নিমিত্তই আমরা গ্রীক রমণী আস্ পেসিয়া প্রভৃতির প্রশংসাবাদ শুনিতে পাই। পুরুষ কার্য্যক্ষেত্রে নামেন বটে; কিন্তু সেই কার্য্যের পশ্চাদভাগে শক্তিরূপিণী ও কার্য্যান্তর্দর্শিনী রমণীর কোমলাঙ্গুলি সঙ্কেত চালয়িতৃ রূপে বিরাজিত দেখিতে পাওয়া যায়। রমনীর সেই অঙ্গুলি সঙ্কেত কখনও বা মাতৃরূপে কখনও বা ভগ্নীরূপে কখনও বা পত্নী বা সখীরূপে দেওয়া হইয়াছে, ইহা দেখিতে পাওয়া যায়। ফলতঃ, নারীশক্তি প্রবর্ত্তিকারূপে কার্য্যের পশ্চাৎভাগে অবস্থিত না থাকিলে বোধ করি জগতের বহুতর মঙ্গলকর ব্যাপার সংসাধিত হইত কিনা সন্দেহ। ঔপনিষধঋষি—"যেনাহমমৃতা স্যাং তত্তেন কিং কুর্য্যম্" স্ত্রীহৃদয়ের এই সুমধুর প্রশ্ন না শুনিলে বোধ করি "এতস্য বাক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি সূর্য্যাচ ন্দ্রমসৌ বিধৃতে তিষ্ঠতঃ" প্রভৃতি বেদোক্ত কল্প কালস্থায়ী সুমধুর মন্ত্র সকল সেইরূপ ওজস্বিতা ও মধুরতায় মাখাইয়া প্রণয়ন করিতে সমর্থ হইতেন কিনা সে বিষয়ে বিবেচনার স্থল।

আর্য্যেরা রমণী হৃদয়ের মহত্ত্ব বুঝিয়াছিলেন সেই জন্যই তাঁহারা বলিয়া গিয়াছেন—

যত্রনার্য্যস্তু পূজ্যন্তে প্রীয়ন্তেত এ দেবতা"

যতদিন আর্য্যজাতিদিগের ভিতর মহিলাকুলের সম্মান অক্ষুণ্ণ ছিল ততদিন ভারত নিজ গৌরবে মানোন্নত ছিল; আমরা অধঃপতিত ভারত সন্তান এক্ষণে সেই

পুরাণ বিশ্বাস হারাইয়া কষ্টাৎ কষ্টতর দশাগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছি। প্রাচীন গ্রন্থ নিচয়ে স্ত্রীপুত্রাদিতে পুরুষের স্বামিত্ব ঘোষিত আছে বটে, কিন্তু সেই স্বামিত্ব কঠোরতার ভিত্তির উপায় ব্যবস্থাপিত ছিল না। এই স্থলে আমরা পুরাণোক্ত মহাত্মা রাজা হরিশ্চন্দ্রের পত্নী শৈব্যার উপাখ্যান অবতারণা করিয়া আমরা প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

যখন কুশিকনন্দন মহামুনি বিশ্বামিত্র সসাগরা ধরিত্রী দান প্রাপ্ত হইয়াও দক্ষিণার জন্য মহারাজা হরিশ্চন্দ্রকে নিপীড়িত করিতেছিলেন তখন ধন ও রাজ্য হারা রাজার স্বকীয় দেহ ও তাঁহার পুত্র ও শৈব্যা নাম্নী মহিষী ব্যতিরিক্ত নিজস্ব বলিবার আর কিছুই ছিলনা। দক্ষিণা প্রদান কাল অতীত হইয়াছে অথচ দক্ষিণা দিবেন এমন সঙ্গতি আর তাঁহার নাই। ঋষি ও ছাড়িবার পাত্র নহেন। বহু আয়াসে রাজা ঋষিবরকে সেই দিন দিবাবসানের পূর্ব্বে দক্ষিণা দিবেন এই আশ্বাসে ফিরাইলেন —

"ব্রহ্মন্নদ্যৈব সম্পূর্ণোমাসোহম্লান তপোধন।
তিষ্টত্যেতদ্দিনার্দ্ধং বৈতৎ-প্রতীক্ষাস্বমা চিরং॥"

ঋষি ফিরিলেন বটে কিন্তু প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ ও ঋষিশাপাগ্নিভয়ে রাজা মুহ্যমান। রাজার এই দারুণ দুঃসময়ে কে তাঁহার দুঃখের অমানিশান্ধকারে কর্ণধার বিহীন নাবিকের প্রতি ধ্রুবতারার আলোকের ন্যায় আশার ক্ষীণ জ্যোতিঃ বিকিরণ করিয়াছিল? রাজ্ঞী জানিতেন যে তাঁহার ও তাঁহার গর্ভজাত শিশুপুত্রের শরীরের উপর রাজার সম্পূর্ণ অধিকার কিন্তু সেই দুঃসময়ে এইরূপ নিদারুণ কথা কিরূপেই বা রাজাকে শোনাইবেন?

সেইজন্য রাজ্ঞী বলিয়াছিলেন—

"রাজন্ জাতম পত্যং মেইত্যুক্তপ্র-রুরোদহ।"

মহারাজ! "আমার সন্তানোৎপত্তি হইয়াছে" এই কথা বলিয়া আর অধিক বলিতে অক্ষম হইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। রাজা ভাবিলেন রাজ্ঞী তাঁহাকে তাঁহার শিশু কুমার সংবন্ধে কোন কথা বলিতে চাহেন—সেই ভাবিয়া বলিয়া উঠিলেন—

"বিমুক্ত ভদ্রে সন্তাপময়ং তিষ্টতি বালকঃ।
উচ্যতাং বক্তু কামাদি যদ্বাস্বং গজগামিনি॥"

রাজা জানিতেন না যে রাজ্ঞী আত্ম বিক্রয়ের কথা বলিতে চাহেন; রাজার আশ্বাস পাইয়া রাজ্ঞী বলিলেন—

"রাজন্ জাতমপত্যং মে সত্যং পুত্র ফলাঃ স্ত্রিয়ঃ।
সমাং প্রদায় চিত্তেন দেহিবিপ্রায় দক্ষিণাং॥"

"মহারাজ আমার পুত্র সন্তান জন্মিয়াছে পুত্র ও সবেই নারীর সফলতা। এইক্ষণে আমাকে বিক্রয় করিয়া তন্মূল্যে ঋষি দক্ষিণা প্রদান করুন।" এই নিদারুণ বাক্য শ্রবণে রাজা মূচ্ছিত হইয়া পড়িলেন কিন্তু রাজ্ঞী কোমলা হইলেও কর্ত্তব্য বুদ্ধিতে কবি প্রোক্ত:—

"ধ্রুবং বপুঃ কাঞ্চন পদ্মনির্ম্মিতং।
মৃদু প্রকৃত্যাচ সসার মেবচ॥"

দেহধারিণী—রাজার চিত্ত বৈক্লব্য ও কর্ত্তব্য নিষ্ঠা প্রোদ্দীপিত করিবার জন্য বলিলেন,—

"ত্যজ চিন্তাং মহারাজ স্বসত্য মনুপালয়।
শ্মশান বদ্বর্জনীয়ো নরঃ সত্যবিবর্জিতঃ॥
নাতঃ পরতরং ধর্ম্মং বদন্তি পুরুষস্যতু।
যাদৃশং পুরুষ ব্যাঘ্র স্বসত্যঃ পরিপালনং॥
অগ্নি-হোত্রমধীতং বাজানাদ্যাশ্চাখিলাঃ ক্রিয়াঃ।
ভজন্তে তস্য বৈফল্য যস্য বাক্যম বারেণম্॥
সত্যমত্যন্তমুদিতং ধর্ম্মশাস্ত্রেষুধীমতাং।
সপ্তাশ্বমেধা নাহৃত্য রাজসূয়শ্চ পার্থিব।
কৃতিনামচ্যুতঃ স্বর্গাজসত্য বচনাৎ সকৃৎ॥"

"মহারাজ! চিন্তা ত্যাগ করুন ও স্বকীয় সত্য পালন করুন। মানুষ সত্য বহিষ্কৃত হইলে শ্মশানের ন্যায় বর্জ্জনীয় হইয়া উঠে। অয়ি পুরুষ ব্যাঘ্র! স্বসত্য পালন রূপ কর্ম্ম পুরুষের কর্ত্তব্য। যাহার বাক্য মিথ্যা তাহার অগ্নিহোত্র অধ্যয়ন দানাদি অখিল ক্রিয়া নিষ্ফল হইয়া থাকে। সত্যতেই ধীমান্ পুরুষের উদ্ধারের একমাত্র উপায় ও মিথ্যাকেই অকৃতাত্মগণের পতনের হেতু বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। রাজা কৃতি সপ্ত অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়াও একবার মাত্র মিথ্যা বাক্য প্রয়োগ ফলে স্বর্গচ্যুত হইয়াছিলেন।"

রাজার তাৎকালিক মানসিক অবস্থায় তিনি স্বীয় প্রাণত্যাগ করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, সেই সময়ে তাঁহাকে এইরূপে উৎসাহিত না করিলে রাজা:

"অহো দান মহোশীলম হোধৈর্য্য মহোক্ষমা।
অহো সত্যমহো জ্ঞানং হরিশ্চন্দ্রস্য ধীমতঃ॥"

কবি প্রোক্ত এই প্রশংসার ভাজন হইতে পারিতেন কিনা সন্দেহ। স্বভাব কোমল নারী জাতির মুখ প্রোক্ত এইরূপ উৎসাহ বাক্য আর্য্যইতিহাসে বিরল নহে। এইরূপেই একদিন যাজ্ঞসেনী অজ্ঞাত বনবাসবাসি পঞ্চ পাণ্ডুতনয়গণের দুঃখক্লিষ্ট ও ঘুমর্ণায়মান চিত্তকে আশায় সতেজ উৎসাহে উৎসাহিত করিয়া ছিলেন, যে উৎসাহে উৎসাহিত হইয়া ভুবন বিজয়ী অর্জ্জুন হিমাচলে তপস্যা করিয়া কিরাতরূপী হরকে প্রসন্ন করিয়া পাশুপাত্যাদি দিব্য অস্ত্র লাভ করিয়াছিলেন। পাণ্ডবগণ যখন বনস্থলীর অজ্ঞাতবাসে শৌর্য্যবীর্য্য হারাইয়া নিশ্চেষ্ট ভাবে অবস্থিত তখন দ্রৌপদীর সেই সুকোমল ও ওজস্বী বাক্যের কথা মহাভারত ও ভারবির পাঠকের অবিদিত নাই; তিনি স্বকীয় প্রগল্‌ভতার—

"হিতং মনোহারিচ দুর্লভং বচঃ"

ইত্যাদি বাক্যে ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া র্ভৎসনাচ্ছলে পাণ্ডবগণকে কর্ত্তব্যে উদ্বোধিত করিবার নিমিত্ত বলিয়া ছিলেন :—

ভবাদৃশাঃ শেদধিকুর্বতেরতিং।
নিরাশ্রয়াহন্তহতা মনস্বিতা।"

কিন্তু কেবল র্ভৎসনার কার্য্য হইবার নহে জানিয়া স্ত্রীস্বভাব সুলভ কোমলতা ও প্রেম দেখাইয়া বলিয়াছিলেন,—

প্রত্যাগতস্তাসি কৃতার্থমেব।
স্তনোপ পীড়ং পরিরব্ধু বৃশমা।"

অর্থাৎ "কৃত কৃত্য হইয়া প্রত্যাবৃত্ত হইলে হে পার্থ তোমার পুরস্কার স্বরূপ তোমাকে দৃঢ়ালিঙ্গনে আলিঙ্গিত করিব।"

স্ত্রীরমুখের এই সতেজ সুকোমল বাক্য কেবল হিন্দু বিবাহিতা পত্নীর মুখে সাজে। হিন্দুর বিবাহ Civil Contract নহে; বিবাহে ধর্ম্মের অংশাস্থল এইজন্য জগন্মাতা পার্ব্বতির পরিণয়ে মহাকবি কালিদাস নববধূর বিবাহ কালে বলিয়াছিলেন—

বধূং দ্বিজঃ প্রাহতবৈষ বৎস্তে।
বহ্নির্বিবাহং প্রতিকর্ম্মসাক্ষী।
অনেন ভর্ত্তা সহধর্ম্ম ভার্য্যা।
কার্য্যা ত্বয়ামুক্ত বিচারয়েতি॥"

যখন পুরোহিত নববধূকে "সাম্রাজ্ঞী শ্বশুরেভব ইত্যাদি মন্ত্রে শ্বশুর কুলের মানস রাজ্যের অধিকার দেখাইয়াদেন তখন কোথায় Civil Contract রসাতল হইতে তলাতলে তলাইয়া যায় বলুন দেখি?

পত্নীত্বের এইরূপ গম্ভীর অথচ সুকোমল ভাব হিন্দু যেমন বুঝিয়া ছিলেন এরূপ আর কোন জাতি বুঝিয়াছিলেন বা বুঝিয়াছেন কিনা সন্দেহ।

সত্য এক ও অভ্রান্ত ও সকলেরই সমাধিগম্য সকল দেশের মণীষিগণ যাঁহারা সেই সত্যের উচ্চ সোপানে যাইতে পারেন তাঁহারা সকলেই সেই সত্য উপলব্ধি করিতে পারেন এই জন্যই আমরা মহাকবি স্নেক্ষপীয়রকে পত্নীত্বের এই সুন্দর ভাবগ্রাহী দেখিতে পাই। নৃশংস রাজা অষ্টম হেনেরি তদীয় সহধর্ম্মিনী ক্যাথারিনকে যেরূপে নিম্ন লিখিত ভাবে সম্বোধন করিয়াছিলেন আমরাও সেইরূপ রাজমহিষী শৈব্যাকে রাজা হরিশ্চন্দ্রের মুখে সম্বোধন করাইতে পারি।'

"That man i' the world who shall report he has
A better wife, let him in naught be trusted,
For speaking false in that: thou art, alone,
(If thy rare qualities sweet gentleness,
Thy meekness saintlike, wifelike government—
Obeying in commanding and thy parts
Sov' reign and pious else, could speak thee out,)
The queen of learthly queens :"

নাদযোগ।

লেখক—শ্রীআশুতোষ দেব এম, এ,

সধনার সে সকল পথ আছে তাহার মধ্যে নাদযোগ অন্যতম। এই যোগের দ্বারা মনুষ্য সমাধি লাভ করিয়া থাকেন। শরীর হইতে মনকে ভিন্ন করিয়া পরমাত্মার সহিত একীভাবাপন্ন করাকেই সমাধি বলে। এই সমাধির দ্বারা মুক্তি লাভ হইয়া থাকে। যে সাধক পুরুষ সমাধি যোগ সাধন করেন, তাঁহার এইরূপ জ্ঞান জন্মে যে, আমি স্বয়ং ব্রহ্ম, আমি জড় পদার্থ নহি, আমি ব্রহ্ম তুল্য, আমি শোক ভাক্ নহি, আমি সচ্চিদানন্দ মূর্ত্তি, আমি স্বভাবতঃ সর্ব্বদাই মুক্ত।

নিম্ন লিখিত ছয়টি পথের মধ্যে যে কোন পথের দ্বারা মনুষ্য সমাধি লাভ করিয়া থাকেন। যথা, ধ্যানযোগ, নাদযোগ, রসানন্দযোগ, লয়সিদ্ধিযোগ, ভক্তি-যোগ এবং রাজযোগ।

অদ্যকার আলোচ্য বিষয় নাদযোগ। তৎসম্বন্ধে সবিশেষ নিম্নে বর্ণিত হইল। নাদশ্রবণ অনেক উপায়ে করিতে পারা যায়। প্রাণায়ামদ্বারা শব্দ শ্রবণ সম্বন্ধে তন্ত্রে উল্লিখিত হইয়াছে যে, অঙ্গুষ্ঠদ্বয় দ্বারা কর্ণদ্বয়, তর্জ্জনীদ্বয় কর্তৃক

চক্ষুর্দ্বয়, মধ্যমাঙ্গুলিদ্বয় দ্বারা নাসিকাছটী এবং অনামিকা ও কনিষ্ঠাঙ্গুলিদ্বয় দ্বারা মুখমণ্ডল দৃঢ়রূপে রুদ্ধ করিয়া, যদি যোগী বারবার বায়ু সাধন করেন, তাহা হইলে জ্যোতিঃ দর্শন হইয়া থাকে। এই যোগ অভ্যাস করিতে প্রবৃত্ত হইলে ক্রমশঃ নাদ প্রত্যক্ষ হইতে থাকে। উল্লিখিত হইয়াছে যে,—

"মত্তভৃঙ্গ বেণু বীণা সদৃশঃ প্রথমো ধ্বনিঃ।
এবমভ্যাসতঃ পশ্চাৎ সংসারধ্বান্তনাশনম্।
ঘণ্টারব সমঃ পশ্চাৎ ধ্বনির্মেঘোরবোপমঃ॥
ধ্বনৌ তস্মিন্ মনো দত্ত্বা যদা তিষ্ঠতি নির্ভরম্।
তদাসংজায়তে তস্য লয়স্য মম বল্লভে॥"—শিবসংহিতা।

অর্থাৎ, যখন নাদ প্রত্যক্ষ হয়, সে সময় অগ্রে মত্ত ভৃঙ্গ ধ্বনি, বীণা বাদ্য ও বেনু বাদ্য তুল্য ধ্বনি শ্রুত হইয়া থাকে। এইরূপ অভ্যাস করিতে করিতে পরে সংসারান্ধকার নাশক ঘণ্টারব সদৃশ ও মেঘগর্জ্জনবৎ ধ্বনি শ্রবণ গোচর হয়। সাধক যে সময় নির্ভররূপে ঐকান্তিকভাবে সেই ধ্বনিতে চিত্তস্থাপন পূর্ব্বক অবস্থান করেন, সে সময় তদ্দ্বারা তাঁহার লয়ের অবস্থা অর্থাৎ সমাধি উপস্থিত হয়।

আরও উল্লিখিত হইয়াছে যে, যে সময় যোগীর মন উক্ত শব্দে ঐকান্তিকভাবে বিশ্রাম করে, তখন তিনি সমস্ত বাহ্য বস্তু বিস্মৃত হইয়া নাদের সহিত প্রশান্ত হন। এই যোগ অভ্যাস করিলে ত্রিগুণ ও ত্রিগুণের কর্ম্ম সকল জয় করিতে পারা যায় এবং সেই অবস্থায় সাধক সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী হইয়া চিদাকাশে লয় প্রাপ্ত হন। তন্ত্রে উল্লিখিত হইয়াছে যে,—

"নাসনং সিদ্ধ সদৃশং নকুম্ভসদৃশং বলম্।
ন খেচরী সমা মুদ্রা ন নাদ সদৃশো লয়ঃ॥"—শিবসংহিতা।

অর্থাৎ সিদ্ধাসনের তুল্য আসন, কুম্ভক তুল্য বল খেচরী তুল্য মুদ্রা ও নাদ সদৃশ লয় সাধক আর কিছুই নাই।

এই নাদযোগের প্রশংসা করিয়া শঙ্কর বলিয়াছেন যে,—

"সদাশিবোক্তানি সপাদলক্ষ-লয়াবধানানি বসন্তিলোকে।
নাদানুসন্ধানসমাধিমেবং মন্যামহে অন্যতম লয়ানাম্॥"২॥ যোগতারাবলী।

অর্থাৎ সংসারে সদাশিবোক্ত সপাদলক্ষ লয়াবধান বিদ্যমান আছে, কিন্তু ইহাদের মধ্যে নাদানুসন্ধান সহিত সমাধিই অন্যতম ও শ্রেষ্ঠ।

শব্দের সাধন সম্বন্ধে ঘেরণ্ডসংহিতায় উল্লিখিত হইয়াছে যে, রাত্র্যর্দ্ধাংশ অতীত হইলে যে, স্থানে কোন প্রাণীর শব্দ কর্ণ গোচর হয় না, এইরূপ স্থানে সাধক নিজ

হস্তদ্বারা স্বীয় কর্ণ যুগল বদ্ধ করিয়া স্থির ভাব অবলম্বন করিবেন। এইরূপ করিলে সাধক দক্ষিণ কর্ণে নানাবিধ শব্দ শ্রবণ করিবেন, ঐ সকল শব্দ দেহের মধ্যভাগ হইতে সমুত্থিত হইয়া থাকে।

"প্রথমং ঝিঞ্জীনাদঞ্চ বংশী নাদং ততঃ পরম্।
মেঘঝর্ঝরভ্রমরীঘণ্টাকাংসস্ততঃ পরম্।
তুরীভেরী-মৃদঙ্গাদি নিনাদানক দুন্দুভিঃ॥
এবং নানাবিধং নাদং জায়তে নিত্যমভ্যাসাৎ।
অনাহতস্য শব্দস্য তস্য শব্দস্য যো ধ্বনিঃ॥
ধ্বনেরন্তর্গতং জ্যোতিঃ জ্যোতেরন্তর্গতং মনঃ।
তন্মনো বিলয়ং যাতি তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্॥"—ঘেরণ্ড সংহিতা।

অর্থাৎ প্রথমে ঝিল্লীরব, পরে বংশীধ্বনি, তদনন্তর মেঘগর্জ্জন, পরে ঝর্ঝরী নামক বাদ্য শব্দ এবং তৎপরে ভ্রমরের গুন্ গুন্ ধ্বনি শুনিতে পাইবে। অনন্তর যথাক্রমে ঘণ্টা, কাংস্য, তুরী, ভেরী, মৃদঙ্গ আনন্দদুন্দুভি প্রভৃতির শব্দ কর্ণ গোচর হইবে। এইরূপে নিত্য অভ্যাস দ্বারা নানাবিধ নাদ শ্রবণ করা যাইবে। অনাহত শব্দের মধ্যগত জ্যোতিঃ ও জোতির অন্তর্গত মন আছে। সাধকের সেই মন ব্রহ্মে সংযোজিত হইয়া বিষ্ণুর পরম পাদপদ্মে লয় প্রাপ্ত হইয়া যায়।

Madam Blavatsky এই নাদকে Mystic Sound বলিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে এই শব্দ শ্রবণের সাতটী অবস্থা আছে। সাতটী অবস্থায় সাত প্রকার শব্দ শ্রবণ করা যায়। যথা :—

"The first is like the nightingale's sweet voice chanting a song of parting to its mate.
The second comes as the sound of a silver cymbal of the Dhyanis awakening the twinkling stars.
The next is as the plaint melodious of the ocean-sprite imprisoned in its shell.
And this is foleowed by the chant of Vina.
The fifth like sound of bamboo flute shrills in thine ear.
It changes next into a trumpet blast,
The last vibrates like the dull rumbling of a thunder cloud.
The seventh swallows all the other sounds. They die and then are heard no more." The Voice of the Silence.

কপিলদেব যে পাঁচ প্রকার মুদ্রার উল্লেখ করিয়াছেন, তাহার মধ্যে অগোচরী মুদ্রা অন্যতম। স্থিরচিত্তে দক্ষিণ কর্ণে নাদ শ্রবণের নামই অগোচরী মুদ্রা।

মন স্থির করিতে পারিলেই এই নাদ শ্রবণ করা যায়। মনস্থিরের জন্য বিশিষ্ট আচার্য্য বিশিষ্ট প্রকার আসনের ব্যবস্থা করিয়াছেন। সাধকেরা বিশিষ্ট আসনে উপবিষ্ট হইয়া নাদ শ্রবণ করিয়া থাকেন। কিন্তু যাঁহারা মনকে একটু

বশীভূত করিতে শিখিয়াছেন, তাঁহারা যে কোন আসনে অথবা যে কোন অবস্থায় এই নাদ শ্রবণ করিয়া থাকেন।

নাদের সাধন সম্বন্ধে শ্রুতি বলিয়াছেন যে,—

"নাদো দশবিধো জায়তে চিণীতি প্রথমং চিঞ্চিণীতি দ্বিতীয়ং ঘণ্টানাদ স্তৃতীয়ং শঙ্খনাদশ্চতুর্থং পঞ্চমস্তন্ত্রীনাদঃ ষষ্ঠস্তালনাদঃ সপ্তমো বেণুনাদোহষ্টমো মৃদঙ্গনাদো নবমো ভেরীনাদো দশমোমেঘনাদো। নবমং পরিত্যজ্য দশমেবাভ্যসেৎ॥" হংসোপনিষৎ

অর্থাৎ নাদ দশ প্রকারের হইয়া থাকে। যথা চিণ্ শব্দ প্রথম, চিন্‌চিন্ শব্দ দ্বিতীয়, ঘণ্টা নাদ তৃতীয়, শঙ্খনাদ চতুর্থ, তন্ত্রী নাদ পঞ্চম তালনাদ ষষ্ঠ, বেণুনাদ সপ্তম, মৃদঙ্গনাদ অষ্টম, ভেরীনাদ নবম এবং মেঘনাদ দশম। নবম পরিত্যাগ করিয়া সাধক দশম অভ্যাস করিবে।

এই দশ প্রকার শব্দ অভ্যাস করিতে করিতে সাধকের মনের লয় হইয়া থাকে। মনের লয় হইলে আর কোন শব্দ শ্রবণ করিতে পারা যায় না। মনুষ্য যখন এই দশ প্রকার শব্দ শ্রবণ করেন, তখন তাঁহার দশ প্রকার অবস্থা হইয়া থাকে। যথা,—

"প্রথমে চিঞ্চিণী গাত্রং দ্বিতীয়ে গাত্রভঞ্জনম্।
তৃতীয়ে স্বেদনং যাতি চতুর্থে কম্পতে শিরঃ॥
পঞ্চমে স্রবতে তালু ষষ্ঠেহমৃত নিষেবম্।
সপ্তমে গূঢ় বিজ্ঞানং পরা বাচা তথাহষ্টমে।
অদৃশ্যং নবমে দেহং দিব্যচক্ষুস্তথাহমলণম্।
দশমং পরমং ব্রহ্ম ভবেদ্ব্রহ্মাত্মসন্নিধৌ॥"—হংসোপনিষৎ।

প্রথমে অর্থাৎ যখন প্রথম প্রকার শব্দ শ্রবণ করা যায়, তখন গাত্র চিন্ চিন্ করিয়া থাকে। দ্বিতীয় অবস্থায় গাত্র যেমন ভাঙ্গিয়া যাইতেছে এইরূপ বোধ হইয়া থাকে। তৃতীয় অবস্থায় স্বেদ অর্থাৎ ঘর্ম্ম হইয়া থাকে। চতুর্থ অবস্থায় শির সচল কম্পিত হইয়া থাকে। পঞ্চম অবস্থায় তালু হইতে স্রাব হইা থাকে। ষষ্ঠ অবস্থায় অমৃত নিশোষিত হইয়া থাকে। সপ্তম অবস্থায় মনুষ্য গূঢ় বিষয়ে জ্ঞাত হইয়া থাকে। অষ্টম অবস্থায় মনুষ্য দৈববাণী শ্রবণ করিয়া থাকেন। নবম অবস্থায় দেহ অদৃশ্য হইয়া থাকে; তখন মনুষ্য নির্ম্মল হইয়া থাকেন এবং দিব্য চক্ষুলাভ করেন। দশম অবস্থা ব্রহ্মের অবস্থা, মনুষ্য তখন ব্রহ্মের নিকটবর্ত্তী হইয়া থাকেন।

তৎপরে সাধকের কিরূপ অবস্থা হইয়া থাকে, তাহা লক্ষ্য করিয়া শ্রুতি বলিয়াছেন যে—

"তস্মিন্মনো বিলীয়তে মনসি সংকল্প বিকল্পে দগ্ধে পুণ্যপাপে সদাশিবঃ শক্ত্যাত্মা সর্ব্বত্রাবস্থিতঃ স্বয়ং জ্যোতিঃ শুদ্ধোবুদ্ধো নিত্যো নিরঞ্জনঃ শান্তঃঃ প্রকাশত।"

হংসোপনিষৎ

অর্থাৎ, তাহাতে মন বিলীন হইলে সংকল্প বিকল্প বিলীন হইয়া থাকে; পুণ্য পাপ দগ্ধ হইয়া থাকে; মনুষ্য তখন সদাশিব হন, শক্ত্যাত্মা হন সর্ব্বত্র অবস্থিত করেন, স্বয়ং জ্যোতি, শুদ্ধ, বুদ্ধ নিত্য নিরঞ্জন শান্ত হইয়া থাকেন। ইহার নামই মুক্তি।

REGISTERED No. C. 284.

১৪শ বর্ষ।] ১৩১২ সাল। পৌষ [৬ষ্ঠ সংখ্যা।

হিন্দুধর্ম্ম ও সমাজের মুখপত্র।

জন্মভূমি

(সচিত্র মাসিক-পত্রিকা ও সমালোচনী)।

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
১। মাতৃ উপাসনা	শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র নাথ দত্ত	১৮৯
২। চক্রের উপর চক্র	... ...	১৯৭
৩। প্রেত-তত্ত্ব	শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ ঘোষ	২০৩
৪। দিবা অবসান	শ্রীমতী জ্যোৎস্নাময়ী ঘোষ	২০৯
৫। পতি-প্রেমে বঞ্চিতা কামিনী	শ্রীযুক্ত নারায়ণ চন্দ্র বিদ্যারত্ন	২১১
৬। কলিকাতায় যুবরাজ	... ...	২১৪
৭। ৺অবিনাশচন্দ্র কবিরত্ন	... ...	২১৯
৮। সোনার বাংলা	নাট্যাচার্য্য—শ্রীযুক্ত গিরীশচন্দ্র ঘোষ	২২২
৯। অসার সংসার	শ্রীযুক্ত অমর নাথ বসু	২২৫
১০। ছবি	শ্রীযুক্ত কৃষ্ণ চন্দ্র কুণ্ডু বি, এ.	২২৬
১১। সান্ত্বনা	শ্রীমতী চারুশীলা দাসী	২২৬
১২। সমালোচনা	... ...	২২৮

লেখকগণের মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন।

জন্মভূমি-কার্য্যালয়।
শ্রীনরেন্দ্রনাথ দত্ত দ্বারা প্রকাশিত।
৩৯ নং মাণিক বসুর ঘাট ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

বার্ষিক মূল্য ডাঃ মাঃ সমেত ১৷৷০ দেড় টাকা। — প্রতি সংখ্যার নগদ মূল্য ৵১০ পয়সা।

যুবরাজ মহিষী

"জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী"

(সচিত্র মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী।)

১৪শ বর্ষ। পৌষ, ১৩১২ সাল। ৬ষ্ঠ সংখ্যা।

মাতৃ উপাসনা।

লেখক,—শ্রীযতীন্দ্রনাথ দত্ত।

"জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরিয়সী"—এটী চির প্রসিদ্ধ মহাজন বাক্য। মানবগণ জননী জরায়ু হইতে ভূমিষ্ঠ হইয়া অবধি জননীর নিকট যত স্নেহ ও যত উপকার প্রাপ্ত হয়, জগতী-তলে তত আর কাহারও নিকটে প্রাপ্ত হইবার সম্ভাবনা নাই। সুখের অবস্থায়, দুঃখের অবস্থায়, পীড়ার অবস্থায় জননীর তুল্য সম-সুখ-দুঃখ-ভাগিনী ইহ-সংসারে আর দ্বিতীয় নাই।

পাঠক! পীড়ায় জর্জ্জরিত হইয়া শয্যায় ছট্ ফট্ করিতে করিতে কত ঔষধ সেবন করিয়াছ, কিন্তু শান্তিময়ী জননীর স্নেহ সদৃশ শান্তিময় পরম ঔষধ আর

কোথাও প্রাপ্ত হইয়াছ কি ? অসহ্য যন্ত্রণা পাইয়া উন্মাদের ন্যায় রোদন করিতে করিতে মা বলিয়া ডাকিলে যেমন মন প্রাণ শীতল হয়, সেরূপ আর কিছুতেই হয় না। মাতার নিমিত্ত আমরা যেরূপ ব্যাকুল, মাতা সন্তানের জন্য ততোধিক কাতরা।

জননীর গর্ভ হইতে এই নশ্বর জগতে ভূমিষ্ঠ হইবার পর তোমার নয়ন ছিল, কিন্তু বস্তু দর্শনে কিছুই চিনিতে পারিতে না। কর্ণ ছিল, শব্দ শ্রবণ করিয়াছ ভাবার্থ বুঝিতে পারিতে না ; নাসিকা ছিল, কোন দ্রব্যের সুগন্ধ ও দুর্গন্ধ কিছুই অনুভব করিতে পারিতে না। চরণ ছিল, চলিতে পারিতে না ; সমস্ত ইন্দ্রিয়ই জড়বৎ ছিল ; ক্রমে ক্রমে জননীর যত্নে সে অবস্থার পরিবর্ত্তন হইতে থাকে, এক দুই করিয়া দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর, স্রোতস্বতীর জল প্রবাহের মত গত হইতে থাকে, সকলেরই এই অবস্থা। প্রাণী মাত্রই পরিবর্ত্তনশীল জগতে ক্রমে ক্রমে এক অভিনব রাজ্যে পদার্পণ করে।

আমরা যাঁহার উদরে দশ মাস, দশ দিন, বাস করিয়াছিলাম ; যিনি শরীরের রক্তধারা পীযূষরূপে দান করিয়া সন্তানের অমূল্য জীবন রক্ষা করেন, যিনি রজনীতে অনিদ্রায় ও অবস্থা বিশেষে অনাহারে থাকিয়া সন্তানের মঙ্গল কামনা করেন এবং যিনি অসহ্য কষ্টে পতিত হইয়াও সন্তানের মুখ কমল দর্শন করিয়া সমুদয় ক্লেশ ভুলিয়া যান ; যিনি সন্তানের পীড়া হইলে এই নিখিল ব্রহ্মাণ্ড অন্ধকার দেখেন, এবং সন্তানের সুখে যিনি স্বর্গ সুখ লাভ করেন, দুঃখে অবসন্ন হইয়া পড়েন, সংসারে কাহার সঙ্গে তাঁহার তুলনা হয় ? বাক্য স্ফুরণের সময় সুললিত "মা" শব্দটী সর্ব্বাগ্রে উচ্চরিত হইয়া থাকে।

মাতার অপত্যস্নেহের সদৃশ স্বর্গীয় সুখকর সামগ্রী এ জগতে আর দ্বিতীয় নাই। মাতা অপেক্ষা পরম পূজনীয় পৃথিবীতে আর কোথাও নাই। স্বর্গ যে এত বড় উচ্চ স্থান, যাহার পবিত্রতার সীমা নির্দ্দেশ করিতে সক্ষম হওয়া যায় না, মাতা তদপেক্ষাও উচ্চ ও পবিত্র। অর্থাৎ স্বর্গ যে এত উচ্চ ও পবিত্র, মাতা তদপেক্ষাও উচ্চ ও পবিত্র। সন্তান কিসে চির-সুখ স্বচ্ছন্দে থাকে, মাতার সে বিষয়ে সতত চিন্তা ও চেষ্টা ; সন্তান কি খাইতে ভাল বাসে, কি বসন ভূষণ পরিধান করিলে তাহাকে সুন্দর দেখায়, ইত্যাদি চিন্তায় জননী অহোরহঃ ব্যতিব্যস্ত। প্রথমেই বলিয়াছি যে, সন্তান যত কিছু অসহ্য যন্ত্রণায় নিপতিত হউক না কেন, একবার "মা" বলিয়া ডাকিলে তাঁহার শরীর মন যেরূপ পুলকিত ও পরিতৃপ্ত হয়, সেরূপ কোনও বহুদর্শী জ্ঞানী ও মঙ্গলময় মহাপুরুষ দর্শনে হয় কি না সন্দেহ। পরম পিতা পরমেশ্বর সৃষ্টির প্রারম্ভেই পুরুষ ও প্রকৃতি এই

উভয়ের স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র সৃষ্ট করিয়াছেন ; মার্কণ্ডেয় চণ্ডীতে মূলা প্রকৃতি ভগবতীর মাহাত্ম্য বর্ণিত আছে। চণ্ডী বলেন (১), প্রকৃতি শক্তি রূপে, চৈতন্য রূপে এবং মাতৃ রূপে সমস্ত ভূতে অবস্থিতি করিতেছেন। তিনি কোন স্থানে অংশ কোন স্থানে অংশের অংশ রূপে বিভক্ত হইয়া নিখিল জগৎ ব্যাপ্ত হইয়া আছেন। (২) সুতরাং জগতের পুরুষগণ পরমাত্মার দক্ষিণাংশ রূপ পুরুষের এবং স্ত্রীগণ তদীয় বাম অংশ রূপা প্রকৃতির অংশ।

প্রকৃতির তিন গুণ সত্ত্ব রজঃ এবং তমঃ। সত্ত্বগুণ শ্রেষ্ঠ, রজোগুণ মধ্যম, তমোগুণ নিকৃষ্ট, প্রকৃতি সত্ত্বগুণে ঈশ্বরী রজোগুণে মানবী এবং তমোগুণে দানবী সদৃশী।

জননী সর্ব্বগুণে পরমাপ্রকৃতি। সন্তান মাতৃস্নেহ না পাইলে, যত্ন না বুঝিলে, স্তন্য না খাইলে সংসারে তাহার যে কি পর্য্যন্ত দুর্গতি হয়, অবোধ শিশু তাহা হয়ত কিছুই অনুভব করিতে সক্ষম হয় না বটে, কিন্তু প্রাণী মাত্রেই অন্তরে অন্তরে তাহা বুঝিয়া শিহরিয়া উঠে। তাই বলিতে ইচ্ছা হয়, এই বিশাল জগতের মধ্যে কেহ মাতৃভাব শূন্য হইলে তাহার আর সুখ, ঐশ্বর্য্য ও আনন্দের কিছুই থাকে না ; অতএব মাতৃ অর্চ্চনা মনুষ্য মাত্রেরই একান্ত কর্ত্তব্য।

বাল্যকালে জীবনে যে কত আনন্দের আবির্ভাব হয় তাহা বলা যায় না। এমন কি এমন একদিন গিয়াছে, যে দিনে ক্ষুদ্র শিশু আত্মবিস্মৃতিকে আপন সহচরী করিয়া রাখিত। ক্রমে সে দিন চলিয়া যায়, যৌবনে কেবল মাত্র মধুর স্মৃতি টুকু বর্ত্তমান থাকে। পরিবর্ত্তনশীল জগতে কিছু দিন পরে তাহাও আর থাকে না। শিশুকালে সঙ্গী ও সঙ্গিনীদিগের সহিত খেলায় মন এতদূর মাতিয়া উঠে যে ক্ষুধা পাইলেও ক্ষুধা বোধ থাকে না। ক্ষুধায় আহার, পিপাসায় জল এবং যন্ত্রণায় সান্ত্বনা দানে জননী কল্পতরু, তাঁহার নিত্য সেবা ও পূজা করিতে কোন্ পাষণ্ডের না প্রবৃত্তি হয় ?

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গীতার ষোড়শ অধ্যায়ের প্রথমেই বলিয়াছেন, (৩) সম্পদ্ দুই প্রকার ; আসুরী ও দৈবী। অহিংসা, সত্য, অক্রোধ, দয়া, ক্ষমা ইত্যাদি

---

(১) যাদেবী সর্ব্ব ভূতেষু শক্তি রূপেন সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥

(২) কলাংশাংশ সমুদ্ভূতাঃ প্রতি বিশ্বেষু যোষিতঃ।
ব্রহ্ম বৈবর্ত্ত পুরাণ। ১ম অধ্যায়।

(৩) অহিংসা সত্যম ক্রোধ স্ত্যাগঃ শান্তি রপৈশুনং।
দয়া ভূতেষ্বলোলুপ্ত্বং মার্দ্দবং হ্রীরচাপলং।
তেজ ক্ষমা ধৃতিঃ শৌচ মদ্রোহো নাভিমানতা।
ভবন্তি সম্পদং দৈবী মভিজাতস্য ভারত॥ ৩॥

সাত্ত্বিক বৃত্তি সমূহ দৈবী সম্পত্তি; যাঁহার দৈবী সম্পত্তি আছে তিনিই দেবী। সন্তানের প্রতি নিস্বার্থ স্নেহ, মমতা, ক্ষমা, অহিংসাদি ব্যবহার তাঁহার দেব ভাব; সুতরাং তিনি অন্যের পক্ষে মানবী হইলেও সন্তানের নিকট পরমারাধ্যা দেবী। গর্ভস্থ সন্তানের প্রতিও জননীর স্নেহ অসাধারণ। অশ্বথামা অভিমন্যু পত্নী উত্তরার গর্ভস্থিত সন্তান পরিক্ষিৎকে বিনাশ করিবার জন্য ব্রহ্ম অস্ত্র ত্যাগ করেন, তখন উত্তরা ভয়ে বিহ্বলা হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে কহিলেন, "হে নাথ! দ্রোণ পুত্র অশ্বথামা পাণ্ডব বংশ লোপ করিবার মানসে আমার গর্ভস্থ সন্তানকে বিনাশ করিবার জন্য অস্ত্র ত্যাগ করিয়াছেন; আপনি আমার গর্ভস্থ শিশুকে রক্ষা করুন। আমি প্রাণ ত্যাগ করিব ক্ষতি নাই আমার গর্ভস্থ সন্তানের যেন কোন অমঙ্গল না হয়।" অহো! এরূপ স্নেহপূর্ণ বাক্য জননী ভিন্ন আর কাহার মুখ হইতে নির্গত হইতে পারে? এরূপ নিস্বার্থ সুপবিত্র অপার্থিব স্নেহ পৃথিবীতে অতি দুর্লভ।

বৃহদ্ধর্ম্ম পুরাণে ব্যাসদেব বলিয়াছেন, (৪) গর্ভে ধারণ এবং পোষণ করেন বলিয়া মাতা পিতা অপেক্ষা অধিক গুরু। অতএব ত্রিলোক মধ্যে মাতার সমান গুরু নাই, গঙ্গার সমান তীর্থ নাই, বিষ্ণু সদৃশ প্রভু নাই শিবের ন্যায় আর পূজ্য নাই। মাতার সমান আর গুরু নাই; পুরুষ ভার্য্যাকে আশ্রয় করিয়া পুত্ররূপে উৎপন্ন হয়; মাতা পুরুষের নিজেরই পূর্ব্ব বর্ত্তিত্বের আশ্রয়, এই জন্য মাতা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ

(৪) পিতুরপ্যধিকা মাতা গর্ভধারণপোষণাৎ।
অতোহি ত্রিষু লোকেষু নাস্তি মাতৃ সমো গুরুঃ॥ ৩৩॥
নাস্তি গঙ্গাসমং তীর্থং নাস্তি বিষ্ণু সমঃ প্রভুঃ।
নাস্তি শম্ভু সমঃ পূজ্যো নাস্তি মাতৃ সমো গুরুঃ॥ ৩৪॥
পুরুষঃ পুত্ররূপেণ ভার্য্যামাশ্রিত্য জায়তে।
পূর্ব্বভাবাশ্রয়া মাতা তেন সৈব গুরুঃ পরঃ॥ ৩৯॥
মাতরং পিতরঞ্চোভৌ দৃষ্ট্বা পুত্রস্তু ধর্ম্মবিৎ।
প্রণম্য মাতরং পশ্চাৎ প্রণমেৎ পিতরং গুরুম্॥ ৪০॥
মাতা ধরিত্রী জননী দয়ার্দ্র হৃদয়া শিবা।
দেবী ভুবরণী শ্রেষ্ঠা নির্দোষা সর্ব্ব দুঃখহা॥ ৪১॥
আরাধনীয়া পরমা দয়া শান্তিঃ ক্ষমা ধৃতিঃ।
স্বাহা স্বধা চ গৌরী চ পদ্মা চ বিজয়া জয়া॥ ৪২॥
দুঃখহন্ত্রীতি নামানি মাতুরেবৈক বিংশতিম্।
শৃণুয়া চ্ছ্রবয়েন্মর্ত্যঃ সর্ব্ব দুঃখাদ্বিমুচ্যতে॥ ৪৩॥

গুরু। পুত্র এককালে পিতাকে ও মাতাকে এক স্থানে দেখিতে পাইলে অগ্রে মাতাকে প্রণাম করিয়া পশ্চাৎ পিতাকে প্রণাম করিবে। মাতা ধরিত্রী, জননী, দয়ার্দ্রহৃদয়া শিবা, দেবী, ত্রিভুবনশ্রেষ্ঠা, নির্দ্দোষ, সর্ব্বদুঃখহরা, পরমারাধ্যা, দয়া, শান্তি, ক্ষমা, ধৃতি, স্বাহা, স্বধা, গৌরী, পদ্মা, বিজয়া, জয়া, এবং দুঃখহন্ত্রী, মাতার এই একবিংশতি নাম শুনিলে বা শুনাইলে মানব সর্ব্ব দুঃখ হইতে মুক্তিলাভ করে।

মাতার অধিকাংশ আদর্শ সন্তানে বর্ত্তে। মহাকবি বাল্মিকী সীতা দেবী ও লব কুশের চরিত্রে ইহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন। বীরবর নেপোলিয়ান্ নিজের জীবনকে লক্ষ করিয়া বলিয়াছিলেন, "আমি যদি কোন রূপে ভাল এবং মহৎ হইয়া থাকি, সে কেবল আমার মাতার শিক্ষার গুণে।" পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরাও এ বিষয়ের বিশেষ রূপ আন্দোলন করিয়াছেন; স্মাইল সাহেব তাহার Character নামক গ্রন্থে সবিশেষ আলোচনা করিয়া এক প্রকার ইহাই প্রতিপন্ন করিয়াছেন, এবং কোন সুবিখ্যাত ইংরাজ পণ্ডিত ইহাও বলিতে সঙ্কুচিত হন নাই;---It is an established fact that a worthy man has a worthy mother" গুণবতী মাতার গুণবান্ পুত্র হয়, ইহা অখণ্ড সত্য।

মাতা কখন পুত্রের দোষ গ্রহণ করেন না। আমাদের দেশে একটী প্রবাদ আছে, "কুপুত্র যদিচ হয় কুমাতা কখনও নয়।" পুত্র যতই দুরাচার ও পাষণ্ড হউক না কেন মাতা কখনও তাহার প্রতি রোষান্বিতা হন না, যদিচ কখন কখন রোষান্বিতা হইতে দেখা যায় বটে, কিন্তু সে ভাব অধিক ক্ষণ স্থায়ী হয় না, তথাপি স্নেহের ভাবই অধিক।

আমাদের সমাজে এরূপ দৃষ্টান্তের অভাব নাই। প্রতি ঘরে ঘরে এরূপ দৃষ্টান্ত প্রচুর। সংসারে যাঁহার কেহই নাই, তাহার যদি জননী বর্ত্তমান থাকেন, তাহা হইলে সেই ব্যক্তি ধরাধামে স্বর্গ সুখ অনুভব করে। জননীর শ্রীচরণ তুল্য সুখকর শান্তিপূর্ণ স্থান পৃথিবীতে আর দ্বিতীয় নাই। বর্ত্তমান কালে আমাদের দেশে যে সকল আদর্শ স্থানীয় সৎপুরুষ জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, তাহাদের আদ্যোপান্ত জীবনী পাঠ করিলে অবগত হওয়া যায় যে তাঁহারাও বিলক্ষণ মাতৃভক্ত। বৈদিক ধর্ম্ম প্রচারক সাক্ষাৎ শঙ্কর তুল্য ভারত পূজ্য শঙ্করাচার্য্য সুপবিত্র সন্ন্যাস ধর্ম্ম গ্রহণ আকাঙ্ক্ষী হইলেও মাতৃ আজ্ঞা ব্যতীত কঠিন সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণ করিতে পারেন নাই। একদা তিনি কোন বিশেষ কার্য্য উপলক্ষে জননী

সমভিব্যাহারে তরণী যোগে নদী পারে যাইতেছিলেন, সহসা নদী বেগ সহস্র গুণে বর্দ্ধিত হওয়াতে তরণী খানি জল মগ্ন হইল, শঙ্কর তখন জননীকে পৃষ্ঠে লইয়া সাঁতার দিতে আরম্ভ করিলেন। জননীকে লইয়া বহু কষ্টে তীরে উঠিলেন; কিন্তু স্বয়ং জল মগ্ন হইবার উত্তম অবসর বুঝিয়া জননীকে কহিলেন, মাতঃ অনুমতি করুন, আমি সন্ন্যাসী হই; নতুবা এই নদী গর্ভে প্রাণ বিসর্জ্জন করিব। জননী অগত্যা পুত্রকে সন্ন্যাসী হইতে আজ্ঞা প্রদানকরিলেন। মাতৃ আজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া শঙ্করাচার্য্য দণ্ড গ্রহণ পূর্ব্বক পরম হংস অবস্থা প্রাপ্ত হইলেন।

মহারাষ্ট্র ক্ষত্রিয় কুলাবতংস ছাত্রপতি মহাত্মা শিবাজীর পিতৃ-মাতৃ ভক্তি অতুলনীয় ছিল। তিনি স্বয়ং "রাজা" উপাধিধারী হইলেও সর্ব্বজন সমক্ষে প্রকাশ্য রাজপথে পিতার পাদুকাদ্বয় মস্তকে বহন পূর্ব্বক পিতৃ ভক্তির আদর্শ প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। মাতার আদেশও উপদেশ ব্যতীত তিনি কোন কার্য্যই করিতেন না।

প্রাতঃস্মরণীয় পণ্ডিতাগ্রগণ্য স্বর্গীয় মহাত্মা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মাতৃভক্তি শ্রবণ করিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে কর্ম্ম করিবার সময় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের তৃতীয় সহোদরের শুভ বিবাহ সম্বন্ধ স্থির হইয়াছিল বীর সিংহ গ্রাম হইতে তাঁহার জননী পত্র লিখিয়াছিলেন "তুমি অতি অবশ্য অবশ্য আসিবে। মাতৃভক্ত বিদ্যাসাগর আর কি স্থির থাকিতে পারেন? তিনি তৎক্ষণাৎ ঊর্দ্ধতন মার্সেল সাহেবের নিকট ছুটীর জন্য প্রার্থনা করিলেন; কিন্তু সাহেব ছুটী মঞ্জুর করিলেন না। কলেজ হইতে বাসায় আসিয়া রাত্রিকালে তিনি ভাবিলেন আমি না যাইলে মাতৃ আজ্ঞা লঙ্ঘন করা হইবে, ছার চাকরীতে প্রয়োজন নাই কল্যই কর্ম্মে ইস্তফা দিয়া চলিয়া যাইব। ইহাই স্থির করিয়া উদাস মনে সমস্ত রজনী জাগরণ করিলেন। পরদিন প্রাতঃকালে তিনি মার্সেল সাহেবকে গিয়া বলিলেন, "বাটীতে আমাকে যাইতেই হইবে, মাতৃ আজ্ঞা। ছুটী না দেন, কর্ম্ম পরিত্যাগ করিব। ছুটী মঞ্জুর করুন চাকরীর জন্য জননীর আজ্ঞা অবহেলা করিয়া তাঁহার অশ্রুপাত আমি সহ্য করিতে পারিব না।" মার্সেল সাহেব স্তম্ভিত হইলেন! ভাবিলেন অদ্ভুত মাতৃভক্তি! তিনি তৎক্ষণাৎ ছুটী মঞ্জুর করিলেন। ছুটী পাইয়া বিদ্যাসাগর মহাশয় বাসায় আসিলেন, অনাহারে বেলা ৩টার সময় একজন ভৃত্যকে সঙ্গে লইয়া বীরসিংহ গ্রামাভিমুখে যাত্রা করিলেন। আষাঢ় মাস, আকাশ ঘন ঘটায় আচ্ছন্ন, মুষল ধারে বৃষ্টি হইতেছে, পথ ঘাট কর্দ্দমাক্ত, বিদ্যাসাগর মহাশয় কিছুতেই ভ্রুক্ষেপ না করিয়া

মাতৃ উদ্দেশ্যে রুদ্ধশ্বাসে পদব্রজে চলিতে লাগিলেন। সন্ধ্যার সময় ভৃত্যের অনুরোধে পথি মধ্যে তাঁহাকে সেই রাত্রি কৃষ্ণরামপুরের এক দোকানে যাপন করিতে হয়। তখনও বাটীতে পৌছিবার বাকি। রজনী প্রভাত হইবামাত্রই বাহির হইয়া তিনি পুনরায় চলিতে আরম্ভ করিলেন, রাত্রি নয়টার সময় বাটীতে পৌছিলেন। বর তখন বিবাহ করিতে গিয়াছে; মা কিন্তু ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া অনাহারে পড়িয়া আছেন, বিদ্যাসাগর একবার উচ্চকণ্ঠে ডাকিলেন, "মা! আমি এসেছি।" প্রিয় পুত্রের কণ্ঠস্বর বুঝিয়া মা ঘরের বাহিরে আসিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন, তখন কার, মাতা ও পুত্রের অশ্রু বিসর্জ্জন ও করুণ উক্তি অনির্ব্বচনীয়। ধন্য বিদ্যাসাগর! ধন্য তাঁহার মাতৃভক্তি!

পাঠক! জন্‌সন্, জেনারেল ওয়াশিংটন্ প্রভৃতি বিদেশীয় মাতৃভক্তের জীবনী পাঠ করিয়াছেন; কিন্তু বিদ্যাসাগরের মাতৃভক্তি তাহাদের অপেক্ষা অধিকতর উজ্জ্বল। বিদ্যাসাগরের মাতৃভক্তির আরও অনেক পরিচয় আমরা অবগত আছি। রাজা রামমোহন রায়, হাইকোর্টের জজ স্বর্গীয় দ্বারকানাথ মিত্র, স্বধর্ম্ম পরায়ণ স্বর্গীয় ভূদেব মুখোপাধ্যায়, স্বদেশ হিতৈষী সদ্বক্তা স্বর্গীয় রামগোপাল ঘোষ এবং বর্ত্তমান হাইকোর্টের অবসর প্রাপ্ত বিচারপতি স্বধর্ম্মনিষ্ঠ পরম পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের মাতৃভক্তি সর্ব্বজনে সুপরিজ্ঞাত।

মাতার প্রতি ভক্তি করা, ব্যক্তি মাত্রেরই অবশ্য কর্ত্তব্য। মাতা অপেক্ষা স্নেহ ভক্তির আধার দ্বিতীয় নাই। মাতা যেরূপ সন্তানকে ভাল বাসেন, সেরূপ ভাল বাসার আর কেহ নাই। বাল্যকালে আমাদের জীবন মাতার যত্নে ও সদুপদেশে স্নেহ ও ধর্ম্মের দ্বারা পরিপুষ্ট হয়। এ তত্ত্ব জানিয়াও কেহ কেহ বিপথে বিচরণ করে, ইহা যার পর নাই আক্ষেপের বিষয়। সংসর্গ গুণে কেহ কেহ আদর্শ স্থানীয় হন, সংসর্গ দোষে কাহারও কাহারও চিত্ত কলুষিত হইয়া যায়, ইহাই আমাদের সিদ্ধান্ত। এই সংসর্গ শক্তি সহজে বুঝাইবার অভিপ্রায়ে আমরা একটী প্রাচীন উপাখ্যান বলিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করিব। গল্পটী এই:—

একজন পথিক প্রান্তরের প্রবল বাত্যায় উৎপীড়িত হইয়া লোকালয়ের অনুসন্ধান করিতেছিল; পথের অনতিদূরে এক গৃহস্থের গৃহ দর্শন করিয়া প্রাণ রক্ষার্থ তথায় উপস্থিত হইল; দেখিল, বাহিরের ঘরে কেহ নাই। ঘরে জিনিস পত্র দেখিয়া বুঝিল চর্ম্মকারের গৃহ। অগত্যা সেই গৃহেই প্রবেশ করিল। গৃহের এক ধারে পিঞ্জরে একটী শুক পক্ষী ছিল। পক্ষীটী সেই পথিককে দেখিবা মাত্র চক্ষু আরক্ত করিয়া বলিতে লাগিল, "কেরে তুই? বেরও শালা, তুই

চোর, বের," পক্ষী মুখে এই প্রকার কটু বাক্য শ্রবণ করিয়া পথিক তৎক্ষণাৎ সেই গৃহ হইতে বাহির হইল। অনতিদূরে আর একখানি পর্ণকুটীর। পথিক সেই কুটীরের দ্বারে উপস্থিত হইবা মাত্র বাহির হইতেই শুনিতে পাইল, "আহা মহাশয়! আসুন! আসুন! আপনার বড় ক্লেশ হইয়াছে এই কম্বলাসনে উপবেশন করুন, আহা কতই কষ্ট পাইয়াছেন!" পথিক সেই অমৃতাভিষিক্ত বচন শ্রবণ করিয়া গৃহে প্রবেশ করিল; দেখিল একটী শুকপক্ষী। সেই পক্ষী ঐরূপ সুমধুর সম্ভাষণ করিতেছে। চমৎকৃত হইয়া পথিক সেই পক্ষীকে জিজ্ঞাসা করিল, ওহে পক্ষী, আমি অত্যন্ত বিস্মিত হইলাম। তুমি কে? আমি এই মাত্র তোমার মত আরও একটী পক্ষী দেখিয়া আসিতেছি, দেখিতেছি তোমাদের দুইটীরই এক আকৃতি; কিন্তু সেই পক্ষী আমাকে গালাগালি দিয়া তাড়াইল, তিরস্কার করিল। তুমি আমাকে সাদর সম্ভাষণে অভ্যর্থনা করিলে; তোমাদের উভয়ের এ রূপ বিভিন্ন প্রকৃতির কারণ কি? পক্ষী উত্তর করিল, "আমরা উভয়ে এক মাতার গর্ভে জন্মিয়াছি একজন মুনিকুমার আমাকে আনিয়া পালন করিয়াছেন আমি মুনিগণের শিষ্টাচার শিক্ষা করিয়াছি, সেই পক্ষী চর্ম্মকারের গৃহে পালিত হইয়াছে, সেই হেতু তাহার প্রকৃতি ঐ রূপ বিকৃত হইয়া গিয়াছে।

মাতাপ্যেকা পিতাপ্যেকো
মমের তস্য পক্ষিণঃ।
অহং মুনিভিরানীতঃ
স চানীতো গবাশনৈঃ॥
অহং মুনীনাং বচনং শৃণোমি
গবাশনানাং স শৃণোতি বাক্যম্।
ন তস্য দোষো নচমে গুণোবা
সংসর্গজা দোষগুণা ভবন্তি॥

অর্থাৎ হে পথিক! আমারও সেই চর্ম্মকারের গৃহস্থিত পক্ষীর মাতা ও পিতা একই; কিন্তু (দৈব প্রযুক্ত) আমাকে মুনিরা আনিয়াছেন; এবং তাহাকে চর্ম্মকারেরা পাইয়াছে। এদিকে আমি অহর্নিশি মুনিগণের সুমধুর বচন সুধা শ্রবণ করিয়া থাকি। সে কিন্তু চর্ম্মকারের কথাই শুনিয়া থাকে, ইহাতে আপনি আমারও গুণ মনে করিবেন না, এবং সেই পক্ষীটীর ও দোষ মনে করিবেন না, কেন না যাহার যেমন সংসর্গ দোষ গুণ তদনুরূপই হইয়া থাকে।

আমাদের উনবিংশ শতাব্দীতে ধর্ম্ম বা সমাজের কিছু মাত্র শ্রীবৃদ্ধি নাই, কিন্তু দিগ্বিজয়ী নেপোলিয়ান বোনাপার্টকে তাঁহার জনৈক বন্ধু জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন ফ্রান্সকে উন্নত করিতে হইলে কি কি উপকরণ আবশ্যক? ইহার উত্তরে নেপোলিয়ান বলিয়াছিলেন, "কয়েকজন সুশিক্ষিতা মাতা হইলেই ফ্রান্স সমুন্নত হইতে পারে।" আমরাও তাহা সর্ব্বান্তঃকরণে এক বাক্যে স্বীকার করি।

সংসর্গের দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিবার হেতু এই যে, যাঁহারা মাতৃভক্তি পরিশূন্য হইয়া মদগর্ব্বে সংসার ক্ষেত্রে চলিয়া বলিয়া বেড়াইতেছেন, তাঁহাদের সংসর্গে সর্ব্বদা যাঁহারা থাকেন, কাজে কাজেই তাঁহারা মাতৃভক্তি ভুলিয়া যান; যাঁহারা নিরন্তর সৎসঙ্গে বাস করেন, আর্য্য জাতীয় ধর্ম্মানুসারে অবশ্যই তাঁহারা মাতৃপূজা শিক্ষা করিয়া থাকেন। মাতৃপূজা আর্য্য জাতির সনাতন ধর্ম্ম। আমরা আর্য্য সন্তানগণকে স্মরণ করাইয়া দিতেছি, কেহ যেন মাতৃ পূজায় অবহেলা না করেন; অবহেলা করিলে কদাচ মঙ্গল ফল ফলিবে না। *

চক্রির উপর চক্র।

হিমালয়ের সন্নিহিত এক গ্রামের প্রান্তভাগে একটা ক্ষুদ্র অরণ্য সমীপে একখানি পর্ণকুটীর। এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ আর ব্রাহ্মণী সেই কুটীরে বাস করিতেন, ব্রাহ্মণ নিত্য ভিক্ষা করিয়া যাহা কিছু পাইতেন, তাহাতেই উভয়ের অদ্ধাশন হইত কোন কোন দিন অনশনে যাইত।

উদরান্নের কষ্ট পাইলে স্ত্রীজাতি স্বভাবতই প্রায় আপনাদিগের ভাগ্যকে ধিক্কার দিয়া পতিকে লাঞ্ছনা করেন। এই দরিদ্র ব্রাহ্মণীটিও আপনার সুপণ্ডিত পতিকে

* প্রবন্ধটি বিগত ১৩০৬ সাল ২৮শে আষাঢ় তারিখে "কর্ত্তব্য পালন সমিতির" অধিবেশনে পঠিত হয়, এবং পরম পূজ্যপাদ "সোম প্রকাশ" সম্পাদক স্বর্গীয় পণ্ডিত কৈলাসচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম, এ, মহাশয় আগ্রহসহকারে তাঁহার সুসম্পাদিত "সোমপ্রকাশ" সাপ্তাহিক সংবাদ পত্রে গত ১৩০৬ সালের ২রা ও ৯ই শ্রাবণ তারিখের "সোম প্রকাশ" পত্রে প্রকাশিত করেন। এক্ষণে সংশোধিত পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়া জন্মভূমিতে প্রকাশিত হইল।

লেখক।

শত শত লাঞ্ছনা করিতেও ভুলিতেন না। বার বার ভর্ৎসনার পর শেষকালে ব্রাহ্মণী একদিন করাল বদনা মূর্ত্তি ধারণ করিয়া ব্রাহ্মণকে বলেন, "তোমারেও ধিক্, তোমার বিদ্যাকেও ধিক্! সর্ব্বশাস্ত্র পড়িয়া পেটের ভাত যোগাইতে অক্ষম, এমন অসার মানুষ আর এমন অসার শাস্ত্র পৃথিবীতে আছে, ইহা আমি কোথাও শুনি নাই! ঠাকুর! এখন আমার একটি পরামর্শ শ্রবণ কর। শাস্ত্রগুলি পুড়াইয়া ফেল, আর তুমি নিজে মা গঙ্গা। বলিয়া গঙ্গাজলে ঝাঁপ দাও!"

ব্রাহ্মণের সেই দিন অত্যন্ত অভিমান হইল, মহাপ্রাণী ব্যথা পাইল! "ভাগ্যে কি আছে, যদি জানিতে পারি, তবেই ফিরিব, নতুবা এই পর্য্যন্ত" এই শক্ত প্রতিজ্ঞা করিয়া, ব্রাহ্মণ তৎক্ষণাৎ এক জীর্ণ বস্ত্রে, জীর্ণ পর্ণকুটীর হইতে বাহির হইয়া গেলেন। কোথায় গেলেন, কেহই জানিল না, প্রচার হইল নিরুদ্দেশ।

ব্রাহ্মণ ও দিকে বনবাসী হইয়াছেন। পর্ব্বত পদতলস্থ অরণ্যে অরণ্যে ব্রাহ্মণ তখন অনাহারে পরিভ্রমণ করিতেছেন। অত্যন্ত ক্ষুধা হইলে দু-একটি পার্ব্বতীয় বৃক্ষের ফল আহরণ পূর্ব্বক ভক্ষণ করেন, তাহাতেই ক্ষুধা তৃষ্ণা উভয়ই নিবারিত হয়; অধিক পিপাসা হইলে নির্ঝরের জল পান করেন; রাত্রি হইলে একটি গিরীগুহায় শয়ন করিয়া থাকেন।

এই প্রকারে পাঁচ দিন পাঁচ রাত্রি অতিবাহিত। ষষ্ঠ দিবসের প্রাতঃকালে গুহা হইতে বহির্গত হইয়া ব্রাহ্মণ দেখিলেন, সম্মুখে একটি ঋষি। বীণাযন্ত্রে হরিগুণ গান করিতে করিতে সেই ঋষিটি ক্রমশঃ উত্তর মুখে আসতেছেন। ঋষির মূর্ত্তি দর্শন করিয়া ব্রাহ্মণের অন্তরে প্রেমানন্দ উপজিল, আনন্দে বিহ্বল হইয়া ঋষিবরের চরণ বন্দনাভিলাষে স্বয়ং অগ্রসর হইতে লাগিলেন। অল্পক্ষণ পরেই সাক্ষাৎ দ্বিজবর ঋষিবরের চরণ-যুগলে ক্রন্দন করিয়া নিপতিত।

যত্নে কর ধারণ পূর্ব্বক ঋষি তাহাকে উত্তোলন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কি জন্য রোদন কর? ব্রাহ্মণ তদুত্তরে আপনার সমস্ত দুঃখের কাহিনী নিবেদন করিলেন। সংসার বিরাগী ঋষি ব্রতাচারি মহাপুরুষগণের হৃদয় স্বভাবতই দয়ার্দ্র হয়, ব্রাহ্মণের প্রতি ঋষিবরের দয়া হইল।

পরিচয়ে প্রকাশ পাইল, সেই ঋষিটি অপর কেহ নহেন, হরিভক্ত দেবর্ষি নারদ। এই ইষ্টসাধক পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া ব্রাহ্মণ তখন আরও অধিকতর ভক্তি-ভাবে ঋষিবরের চরণে লুটাইয়া পড়িলেন; সকাতর স্বরে কহিলেন, "ঠাকুর! আজ আমার কি সৌভাগ্য! আজ আমার কি শুভদিন, গ্রহদেবতারা আজ

আমার প্রতি কতদূর সুপ্রসন্ন; প্রভাতে উঠিয়াই ভগবানের চরণ যুগল দর্শন করিলাম। হরিপ্রাণ! আমি আপনাকে সাক্ষাৎ হরি বলিয়া জ্ঞান করিতেছি। আপনি আমার একটি উপকার করুন! আপনি কোথায় যাইতেছেন?

দেবর্ষি কহিলেন, "হরিপাদপদ্ম দর্শনাভিলাষে হরিধাম বৈকুণ্ঠে।"—আনন্দে যেন নিত্য করিয়া ব্রাহ্মণ বলিয়া উঠিলেন, "তবেই ঠিক! তবেই ঠিক। আমার উপকার তোমার দ্বারাই হইবে। আপনি আমার সেই উপকারটি করুন। দয়া করিয়া আপনার দয়াময় হরিকে জিজ্ঞাসা করিবেন, আমার ভাগ্যে কি আছে? চির-জীবন কি যন্ত্রণা পাইয়াই মরিব? জন্মাবধি যন্ত্রণা পাইতেছি, উদরান্নের অভাব! এ দশা আর কতকাল রহিবে? কতকাল আর আমি এই পাপ ভরা ধরাধামে বাঁচিয়া থাকিব? এই কয়েকটি কথা আপনি আপনার হরিচরণে নিবেদন করিবেন।

দয়ারসে দেবর্ষির হৃদয় গলিয়াছিল, তৎক্ষণাৎ প্রতিশ্রুত হইয়া ধীরে ধীরে হিমালয় পর্ব্বতে আরোহণ করিলেন। প্রতিজ্ঞা রক্ষার অনুরোধে দেবর্ষি আর একবার সেই অরণ্যে উপস্থিত হইয়াছিলেন; হইয়াই দেখেন, সে ঠিক সেই স্থলে চিন্তিত বদনে সেই দরিদ্র ব্রাহ্মণটি পাদ চারণ করিতেছেন। ব্রাহ্মণের সহিত নারদের কথা হইল। সে সবকথার তাৎপর্য্য এই যে, ব্রাহ্মণ জিজ্ঞাসা করিলেন, বাক্য রক্ষা হইয়াছে কি?

নারদ। সিদ্ধি হইয়াছে, কিন্তু ফল হইতেছে অসিদ্ধি। ঠাকুর বলিলেন, তোমার কেবল পঞ্চাশটি স্বর্ণ মুদ্রা জমা আছে তুমি আরও চল্লিশ বৎসর বাঁচিবে, সেই জমা টাকা একবারে তুমি পাইবে না; শ্রম করিয়াই হউক, ভিক্ষা করিয়াই হউক কিছু কিছু পাইবে মাত্র।

ব্রাহ্মণ।—(ব্যগ্রভাবে) ঠাকুর! দয়া কর! দয়া কর! হরি তোমাকে ভাল বাসেন, তুমি বলিলে নিশ্চয় রাজি হইবেন, সমস্ত জমা মোহরগুলি এক কালে এখনি আমি চাই। তুমি আর একবার গিয়া তোমার হরিকে একবার এই কথাটি বল।

নারদ।—অনুরোধ করিব অবশ্য, কিন্তু কষ্ট পাইবে তুমি।

ব্রাহ্মণ।—বিষয় হইলে ব্যবস্থা হয়। এখন আমার কিছুই নাই, কিসের ব্যবস্থা করিব? যখন কিছু হাতে আসিবে, তখন আবার বৃদ্ধি করিবার অভিলাষ হইবে।

নারদ।—নারায়ণ, নারায়ণ! বিধাতার মনে যাহা আছে, তাহাই হউক!

এই বলিয়া দেবর্ষি নারদ সে স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন।

ব্রাহ্মণ। তৃতীয়বার দেবর্ষির দর্শন প্রতীক্ষায় সেই বনেই অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। তৃতীয় বার দেবর্ষির আবির্ভাব। সেইবারে নারদ বিষণ্ণ বদনে ব্রাহ্মণের হস্তে পঞ্চাশটি স্বর্ণমুদ্রা প্রদান করিলেন।

নারদ বিদায় হইতে চান, ব্রাহ্মণ সেই সময় পাছু ডাকিয়া বলেন, এই টাকা আমি একাকী খাইব না, আমি একটী যজ্ঞ করিব। আপনি যদি দয়া করিয়া পাঁচটী বাছা বাছা দেবতা আর পাঁচ সাতটী বাছা বাছা রাজাকে নিমন্ত্রণ দেন, তাহা হইলেই যজ্ঞ পূর্ণ হয়।

অন্তরে হাসিয়া, নিমন্ত্রণের ভার গ্রহণ করিয়া ধূর্ত্ত চূড়ামণি নারদ সে ক্ষেত্র হইতে বিদায় হইলেন। স্বর্ণ মুদ্রা লইয়া দরিদ্র ব্রাহ্মণ আপন কুটীরাভিমুখে ফিরিলেন। ক্লেশ নাই, ক্লান্তি নাই, ক্ষুধা তৃষ্ণা নাই, আছে কেবল আনন্দ। সত্যই এই ব্রাহ্মণ স্বর্ণ মুদ্রা কখন; নয়ন গোচর করেন নাই, সবগুলি বসনে বাঁধিয়া, দুই হস্তে দুটী ধরিয়া, সারা পথ দেখিতে দেখিতে চলিয়াছেন। সুবর্ণের উপর মুদ্রার সূর্য্য কিরণ প্রতীফলিত হইতেছে, সূর্য্যতেজে স্বর্ণ প্রভা উজ্জ্বল হইয়া ঝকিতেছে, ব্রাহ্মণের নয়নে যেন প্রজ্জলিত হোমাগ্নির ন্যায় বোধ হইতেছে। দেখিতে দেখিতে ব্রাহ্মণ প্রেমানন্দে চলিয়াছেন। জীর্ণ কুটীরে জীর্ণ বসনা দীনাঙ্গীণা ব্রাহ্মণী রহিয়াছেন। ব্রাহ্মণীর অনাহার। ব্রাহ্মণের বাহির হওয়া অবধি ব্রাহ্মণী কিছুই আহার করেন নাই, পানাহার নাই; কুটীর মধ্যে নিরাশনে শয়ন করিয়া আছেন। কুটীর দ্বারে, ব্রাহ্মণ দণ্ডায়মান। আনন্দে কম্পিত গাত্রে উঠিয়া, ব্রাহ্মণী শশব্যস্তে পতির পদ প্রক্ষালন করিয়া দিলেন; ব্রাহ্মণ তাঁহাকে স্বর্ণ মুদ্রা দেখাইলেন। ব্রাহ্মণীর অশ্রুপাত হইল। গিরী কাননের ফল ভক্ষণে এবং গিরী নদীর সুশীতল জল পানে ব্রাহ্মণের দেহ চিত্ত প্রহৃষ্ট, উপবাস ক্লেশে উপবাসিনী ব্রাহ্মণী নিতান্ত পরিক্লিষ্টা, তথাপি পতির হস্তে স্বর্ণ মুদ্রা দর্শনে সে ক্লেশ তিনি ভুলিলেন; পত্নীকে সান্ত্বনা করা উচিত, কিন্তু অন্য প্রকার আনন্দে ব্রাহ্মণ তাহা ভুলিলেন।

যজ্ঞ করিতে ব্রাহ্মণের মন। কুটীরের সংস্কার ভুলিলেন, পত্নীর অনাহার ভুলিলেন, আপনার স্নানাহার ভুলিলেন, মনে রহিল কেবল হরি, মনে রহিল নারদ, মনে রহিল মোহর, মনে রহিল যজ্ঞ। কুটীরের সম্মুখস্থ আবর্জ্জনা পরিষ্কার করিয়া ব্রাহ্মণ স্বহস্তে যজ্ঞ স্থান প্রস্তুত করিলেন। কবে যজ্ঞ হইবে, দিনস্থির হইল। দূরে দূরে দুই এক ঘর প্রতিবাসী ছিল, ব্রাহ্মণ তাহাদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া আসিলেন। যজ্ঞের আয়োজন, নিমন্ত্রিত গণের ভোজনের

আয়োজন এবং দেবগণের ও রাজগণের অভ্যর্থনার আয়োজনে সপ্তাহ অতীত হইল। যজ্ঞবাসর সুপ্রভাত। ইষ্ট যজ্ঞ সমাধা করিয়া ব্রাহ্মণ তখন নিমন্ত্রিত গণের আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

সমস্ত স্বর্ণ মুদ্রাগুলি ব্যয় হইয়া গেল। যজ্ঞে বেশী ব্যয় না হউক, দেবভোগ্য ও রাজভোগ্য উপাদেয় দ্রব্য সংগ্রহ হইতেই সব শেষ। শাস্ত্র প্রমানে নারদ মুনি অন্তর্যামী; যজ্ঞ দিবসে পঞ্চ দেবতাকে আর রাজ স্থানের পঞ্চ নৃপতিকে তিনি নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন; আর আর যাহাদিগকে নিমন্ত্রণ করা উচিত বোধ হইয়াছিল, সে ভার ব্রাহ্মণ স্বয়ং লইয়াছিলেন। যথা সময়ে যজ্ঞস্থলে তাঁহাদের সকলের সমাগম হইল।

নারদের নিমন্ত্রিত পঞ্চ দেবতা—ইন্দ্র চন্দ্র বরুণ পবন কুবের। ব্রাহ্মণের ভক্তি দত্ত ভোগ প্রাপ্ত হইয়া দেবতারা পরম পরিতুষ্ট হইলেন; সমান যত্নে আমন্ত্রিত গণের ভোজ্য সামগ্রী প্রদত্ত হইল; সকলের ভোজন সমাপ্ত হইলে দেবতারা ব্রাহ্মণের অবস্থার বিষয় চিন্তা করিলেন; রাজারাও ক্ষুদ্র একখানি পর্ণকুটীর দর্শন করিয়া বিস্ময়ান্বিত হইলেন। দেবরাজ ইন্দ্র, সাদরে ব্রাহ্মণকে নিকটে আহ্বান করিয়া সুমিষ্ট বচনে জিজ্ঞাসা করিলেন, "দ্বিজবর! এত বড় যজ্ঞ তুমি সমাধা করিলে; তোমার সম্বল কি?"

ব্রাহ্মণ কহিলেন,—"আমার সম্বল নারায়ণ। ভগবান আমাকে পঞ্চাশটি স্বর্ণ মুদ্রা দিয়াছেন সেই অকিঞ্চিৎ কর মুদ্রাগুলি, আমি এই দেব দ্বিজ সেবায়, মহামহিম রাজগণের সেবায় উৎসর্গ করিলাম; আর আমার সম্বল কি? অতপর নারায়ণ যাহা করিবেন; তাহাই হইবে।"

দেবগণের কৃপা হইল। কুবের ব্যতীত সকল দেবতা প্রসন্ন হইয়া ভগবাননিষ্ঠ ব্রাহ্মণকে এক এক বর দিলেন। এক দেবতার বরে বিপ্র দম্পতির যৌবন ফিরিয়া আসিল, এক বরে সেই যৌবন জীবনান্ত পর্য্যন্ত চির-স্থায়ী হইল, এক বরে কুটীর খানি রাজ পুরীতে পরিণত হইল, চতুর্থ বরে দ্বিজ দম্পতির ভগবত ভক্তি পরিবর্দ্ধিত হইল, বৈষয়িক ভাবের সহিত আধ্যাত্মিক ভাবের শুভ সম্মিলন।

দেবগণের সঙ্গে অনুচর আইসে নাই, যক্ষরাজ কুবেরের সঙ্গে কতিপয় যক্ষ আসিয়াছিল। যক্ষরাজ তাহাদের একজনের প্রতি আদেশ করিলেন, "মণিরত্ন উপহারে এই ভগবত ভক্ত ব্রাহ্মণের পূজা কর।"—সে পূজায় কিছু মাত্র বিলম্ব হইল না।

এই বার রাজগণের কার্য্য। এক রাজা এক ছড়া মহামূল্য মতিহার একটী মহামূল্য রত্নাঙ্গুরী ব্রাহ্মণীর সর্ব্বাঙ্গের রত্নালঙ্কার, এক রাজা অতি সুন্দর একটি হিরণ্ময় গড়ুড় পক্ষী এবং এক রাজা বার্ষিক দশ সহস্র মুদ্রা উপসত্বের ভূমি সম্পত্তি নিষ্কর (যায়গীর) প্রদান করিলেন। এই সময় নারদ আসিয়া উপস্থিত।

বীণা যন্ত্রে হরিগুণ গান করিতে করিতে সহাস্য বদনে দেবর্ষি নারদ পরম উল্লাসে ব্রাহ্মণকে কহিলেন, "বিপ্রবর! এই মায়িক সংসারে তুমিই ধন্য! তুমিই যথার্থ ভগবানকে চিনিয়াছ! হরির নাম বিশ্বচক্রী. তুমি সেই বিশ্বচক্রের চক্রের উপর চক্র তুলিয়া দিয়াছ। মহাচক্র বিস্তার করিয়া মহাচক্রী তোমাকে পঞ্চাশ স্বর্ণ মুদ্রা দিয়া প্রতারিত করিতেছিলেন, ভক্তিগুণে তুমি তাঁহাকে পরাজয় করিয়াছ! তুমিই ধন্য! সর্ব্বস্ব ব্যয় করিয়া হরিনামে মহা যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলে সেই ফলে অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিপতি হইলে, দেবতা বরে চির যৌবন লাভ করিলে; এখন কিছু দিন এই পৃথিবীতে যৌবন সুখের সহিত রাজ্য সুখ সম্ভোগ কর, আবার আমি আসিব।"

নারদের সহিত দেবগণ অন্তর্ধান করিলেন, রাজারাও অভিনন্দন করিয়া বিদায় হইলেন, অপরাপর নিমন্ত্রিত বর্গও স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন, দরিদ্র ব্রাহ্মণ রাজ্যেশ্বর হইয়া স্বস্ত্রীক সংসার সুখ উপভোগ করিতে লাগিলেন।

পাঁচ বৎসর অতীত। ব্রাহ্মণের দ্বারে নারদ। দ্বিজ দম্পতি আসিয়া নারদের চরণ বন্দন করিলেন। নারদ কহিলেন, "তোমাদের আশা পূর্ণ হইয়াছে। দ্বিজবর! বাসবের প্রশ্নে সত্যই তুমি বলিয়াছ, তোমার সম্বল নারায়ণ। আর তোমাদের অসার সংসার মায়ায় বিমুগ্ধ থাকিতে হইবে না; ঠাকুর তোমাদের উভয়কে স্মরণ করিয়াছেন। আইস, বৈকুণ্ঠে যাই চল। সংসারের নশ্বর ধনে, নশ্বর গৃহে আর তোমরা স্পৃহা রাখিও না, পরমধন লাভ করিবে চল! এ পুরী অপেক্ষা সুন্দর পুরী সেখানে প্রস্তুত। অনন্ত অক্ষয় পরম পুরী! চল!"

নারদের বাক্যে দ্বিজ দম্পতির সর্ব্বশরীর রোমাঞ্চিত হইল। পুনঃ পুনঃ তাঁহার চরণে লুণ্ঠিত হইয়া তাঁহারা হরি হরি বলিয়া অবিরল প্রেমাশ্রু বর্ষণ করিতে লাগিলেন। হরিভক্তির কি বিচিত্র মহিমা! হরির কৃপায় দরিদ্র ব্রাহ্মণ স্বস্ত্রীক স্বশরীরে বৈকুণ্ঠবাসী হইলেন।

প্রেত-তত্ত্ব।

লেখক—শ্রীবিধুভূষণ ঘোষ।

ভিন্ন ভিন্ন শাস্ত্রীয় বিধানে পরলোক-গত আত্মার ভিন্ন ভিন্ন গতি বিবৃত আছে। তৎ সমস্ত আলোচনা করিয়া সত্য নির্দ্ধারিত করা একেবারে অসাধ্য বলিলেই হয়। কিন্তু তাহা বলিয়া মন নিরস্ত থাকে না। লব্ধ-সংস্কার, বহু-দর্শিতা ও বিবেক মিলাইয়া উহার সত্যতা নির্ণয়ে সচেষ্ট থাকা মানব-প্রকৃতির অভ্যাস। আমরা নিম্নে ২। ৪টা দৃষ্টান্ত বিবৃত করিয়া এতৎ সম্বন্ধে চিন্তা করিতে পাঠকগণকে অনুরোধ করি।

"শোনা কথার" উপর নির্ভর করিয়া দৃষ্টান্ত সংগ্রহ করিলে ২।৪ খান প্রকাণ্ড গ্রন্থ হইয়া পড়ে। ভূ-মণ্ডলে এমন কোন পল্লী নাই, যেখানে ১০৫টী ভৌতিক গল্প পূর্ব্বাপর প্রচলিত না আছে। সে সকল গুলির উপর সম্পূর্ণ আস্থা স্থাপন না করিয়া, তন্মধ্য হইতে এমত দুই একটীর উল্লেখ করিব, যদ্দ্বারা প্রেতাত্মার অস্তিত্ব সম্বন্ধে নিজ বা বিশ্বাসী বন্ধুর প্রত্যক্ষ ঘটনার সমর্থন হয়।

বৈজ্ঞানিকেরা বলেন, সংসারে কোন পদার্থের ধ্বংস নাই, রূপান্তর ঘটে না। যখন জড়ের অবিনশ্বরত্ব নিত্যধর্ম্ম, তখন যে আত্মা বা চৈতন্যকে জড়ের ধর্ম্মই বল, আর স্বতন্ত্র কিছু বলিয়াই ব্যাখ্যা কর, তাহার নাশ হইবে, ইহা সম্ভব কথা নহে। বিশেষতঃ যাহা নাই, ভাষায় তাহার নাম আবহমান কাল বহন করিবে কেন? এক স্থানে নয়, পৃথিবীর সর্ব্ব স্থানেই সর্ব্বশ্রেণী মধ্যে তাহার তুল্য অধিকার! আসল না থাকিলে নকল থাকা সম্ভব নয়। যদি কেহ "অশ্ব-ডিম্ব" বা "আকাশ কুসুম" প্রভৃতির উল্লেখ করিয়া, ইহার প্রতিবাদ করিতে চাহেন, তাঁহাকে বলি, এই কথা গুলি যে অর্থে ব্যবহৃত হইবার জন্য উদ্ভাবিত বা কল্পিত হইয়াছে, চিরকালই তাহারা সেই অর্থে প্রযুক্ত হইতেছে। তাহার ব্যভিচার কোথাও হইয়াছে কি? "অসম্ভব" জ্ঞাপন করিতেই উহাদের ব্যবহার। ধরিতে গেলে, দার্ঢ্য প্রদর্শনার্থ আমরা "পশ্চিমে সূর্য্যোদয়ের" উল্লেখ করি। কোন কোন ভাষায় কোন অঙ্গ-বিশেষের উল্লেখ করিতেও দেখা যায়। সম্ভাবনা বা অস্তিত্ব জ্ঞাপনার্থ উহা প্রযুক্ত হয় না।

আত্মার বিনাশ নাই, আমরা প্রথমতঃ তাহাই দেখাইব। জন্মকাল হইতে বার্দ্ধক্য পর্য্যন্ত যে কয়েকটী দশার মধ্য দিয়া আমরা মৃত্যু দ্বারে উপনীত হই,

তদ্দ্বারা বুঝিতে পারি যে যৌবন কাল পর্য্যন্ত দেহ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, তৎপরে সহস্র পুষ্টিকর দ্রব্য ভোজনেরও আর পূর্ব্ববৎ বৃদ্ধি থাকে না। ক্রমে দৈহিক অবনতি আরম্ভ হয়। ইহা জড়ের প্রাকৃতিক ধর্ম্ম। কিন্তু এই জড় দেহের অভ্যন্তরে এমন একটু সূক্ষ্ম দ্রব্য আছে, যাহা অবিনাশী, দিন দিন শরীরের পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে, সঙ্গে সঙ্গে পার্থিব শিক্ষা ও সংস্কারাদির পরিবর্ত্তন সাধিত হইতেছে। কিন্তু সেই "আমরা" পরিবর্ত্তন কিছু মাত্রও হয় নাই। বাল্যকালের "আমি" যৌবনের "আমি" এবং বার্দ্ধক্যের "আমি" অবিকৃতই আছি। তুমি হয় ত বাল্যকালে দেখিয়া পরে দশ বৎসরান্তে আমাকে চিনিতে পারিলে না, কিন্তু আমি "আমাকে" চিরকালই তুল্যরূপে চিনিয়া আসিতেছি। অবিরাম এত বহিপরিবর্ত্তনে "আমার" কোন পরিবর্ত্তন ঘটে নাই। ইহাই আত্মা বা সেই সূক্ষ্ম পদার্থ। যেমন দশাগত দৈহিক অবস্থান্তরের মধ্যে "আমি" অবিকৃত, সেইরূপ জীর্ণ দেহ পরিত্যাগ অন্তেও আমি অপরিবর্ত্তিত থাকি, সময়ে অবস্থান্তর বা দেহান্তর গ্রহণ করি। জগতের অস্থিরতার সহিত ইহার প্রত্যেক পদার্থের অস্থিরতা, নিত্য ধর্ম্ম বলিয়া প্রতিপাদিত হইতেছে। সেই নিত্য ধর্ম্ম বশতঃ আত্মা শত শত পরিবর্ত্তন দেখাইতে বাধ্য। কিন্তু দেখাইলেও জগৎ যেমন দৃষ্টতঃ স্থির, আত্মাও সেইরূপ আপনার স্থৈর্য্য রক্ষা করে। আপন প্রকৃতি ত্যাগ করে না। ক্রমে শিক্ষা ও জ্ঞান যোগে পুনঃ পুনঃ যাতায়াত দ্বারা সংস্কৃত হইয়া সেই মহা চৈতন্যে বিলীন হয়।

"পুনর্দ্দেহান্তরং যাতি যথা কর্ম্মানুসারতঃ।
অমোক্ষাৎ সঞ্চরেত্যেবং মৎস্য কূলদ্বয়ঃ যথা ॥"

(শিবগীতা)

মীনগণ জলাশয়ের যে কূলে যখন থাকে, তখন সেই কূলের দর্শনীয় হয়, অন্য কূলে অদৃষ্ট থাকে, আত্মাও দেহ-ধারণ করিয়া সংসারে দৃষ্ট হয়, দেহ-ত্যাগান্তে জড়াতীতগণের দর্শনীয় হয়, কিন্তু সংসারে অদৃষ্ট থাকে। এই অদৃষ্ট কালটুকুই মানবগণের চক্ষে প্রেতাত্মা বিকাশের কাল। তৎ কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত সেই সময়ের কোন কার্য্যকে আমরা বুঝিতে পারিলে ভৌতিক কার্য্য বলিয়াই ব্যাখ্যা করি। ফলতঃ সূক্ষ্মবিচারে বলিতে গেলে, সকল কার্য্যই ত ভৌতিক। কেবল অবস্থান্তরে নামান্তর মাত্র। শাস্ত্রাদিতেও ইহাই প্রতিপন্ন হয়। যাহা হউক, আমরা দুই একটী প্রত্যক্ষ ও বিশ্বাস্য ঘটনারই উল্লেখ করিব।

আমার জনৈক বিশ্বাসী বন্ধু ডাক্তারী করেন। আমাদের ন্যায় তাঁহারও ভূতে বিশ্বাস ছিল না। বিবাহের দুই বৎসর পরে শ্বশুরালয় গিয়াছেন, বেলা নাই; বৃষ্টি একেবারে থামে নাই, মেঘাচ্ছন্ন আকাশ। দুর্যোগ বলিয়া সকলেই বারান্দায় বসিয়া নানারূপ খোষগল্প করিতেছেন। ধীরে ধীরে অন্ধকারও আসিয়া মিলিত হইল। একজন হঠাৎ বলিলেন, "কেহ কি শুষ্ক মৃত্তিকা দেখাইতে পারেন?" মুহূর্ত্তেক না যাইতেই একখণ্ড দেয়ালের মাটী তথায় পড়িল! সকলে অবাক! ক্রমে রাত্রি ৯টা হইল, সকলে আহারে উপবিষ্ট, বাহিরে ঘোর অন্ধকার। বন্ধুটীর আহার সর্ব্বাগ্রে শেষ হওয়ায় আচমন করিবার জন্য বারান্দায় আসিলেন। মনে মনে গাত্র-মার্জ্জনীর আকাঙ্ক্ষা করিতেছিলেন, এমন সময় তাহার হাতে সেই অন্ধকার মধ্যে তাহা পড়িল। ভাবিলেন গৃহমধ্য হইতে ত কেহ দিবার নাই। বোধ হয় অন্য দিক্ হইতে প্রয়োজন বুঝিয়াই কেহ দিয়াছেন। কিন্তু পরক্ষণে যখন তাম্রকূট সেবনোদ্দেশে অগ্নি-লাভের চিন্তা করিতেছেন, তখন বারান্দার অপর দিকে অগ্নির পাত্র ঝক্ ঝক্ করিয়া উঠিল! কি আশ্চর্য্য! তিনি ত চাহেন নাই! চাহিতে সঙ্কোচই করিতেছিলেন। গৃহ-মধ্যে শ্বশ্রূ-ঠাকুরাণী তখনও পরিবেশনে রতা। তবে কে দিল? এবার সংশয় জন্মিল।

শয়নাগারে স্ত্রীর মুখে শুনিতে পাইলেন, এক বৎসর ধরিয়া তাহাদের বাটীতে এইরূপ ব্যাপার ঘটিতেছে কিন্তু কোন দিন কোন বিরুদ্ধ কার্য্য হয় নাই, বা কেহ কোন রূপ ভয়ও পায় নাই। সন্ধানে জানিলেন, জনৈক আত্মীয়ের মৃত্যু ঘটনার পর হইতেই ইহা আরম্ভ। ডাক্তার বাবুর বিশ্বাস টলিল। পরে ৺গয়াধামে পিণ্ড-দান করার পর আর কোন দিন কিছুই কেহ দেখে নাই।

লেখকের পঠদ্দশায় তিনি শান্তিপুরে বাসাস্থ দাসীকে "ভূতে পাওয়া" স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেন। সে বিকালে ছাদের উপর বসিয়া সুপারী কাটিতেছিল, এমন সময় কে যেন জল চাহিল, কিন্তু কাহাকেও দেখা গেল না। কিন্তু ঝি নিজে অত্যন্ত পিপাসা বোধ করিল ও এক ঘটী জল পান করিল! একটু পরেই তাহার চক্ষু রক্তবর্ণ হইল, বুক ফাটিয়া যাইতে লাগিল! অবিরত মস্তকে জল-ধারা দেওয়া হয়, উপশম নাই। তখন দর্শকগণের জনৈকের পরামর্শে রোঝা ডাকা হইল। অনেক প্রকার মন্ত্র তন্ত্র, সরিষা বাণ, হলুদ-পোড়া গাত্রে ধরিয়া শেষে কতকগুলি নাম করিতে লাগিল। কিছুতেই নিজের পরিচয় দিতে চাহিল না। পরিশেষে অনেক ধ্বস্তাধ্বস্তিতে নিজের পরিচয় দিয়া আনুপূর্ব্বিক মৃত্যু পর্য্যন্ত বর্ণন করিল। সে কহিল—তাহার জ্বর হয়, রাত্রে ভয়ানক পিপাসা

হইলে স্ত্রী ও পুত্রের নিকট জল চাহে কিন্তু নিদ্রিত থাকায় কেহই তাহাকে জল দেয় না। তখন নিকটস্থ কূপের দড়ীযোগে উদ্বন্ধনে প্রাণ ত্যাগ করে। জাতিতে মুচী নিকটস্থ বৃক্ষে থাকে, ছাদ হইতে দৃষ্টি চলে। স্ত্রী পুত্র প্রভাতের পূর্ব্বেই দেখিয়া জ্বরে মৃত্যু বলিয়া ঘোষণা করে, সুতরাং প্রকৃত ঘটনা সাধারণ্যে অপরিজ্ঞাত। আজ রোগিনীর মুখে এই বৃত্তান্ত শুনিয়া সকলেই বিস্মিত হইল! গোপনানুসন্ধানে প্রতিবর্ণ সত্য প্রতিপন্ন হইল। রোগিণী প্রকৃতিস্থ হইল।

কিঞ্চিদূন পঞ্চাশৎ বৎসর পূর্ব্বে লেখকের স্বগ্রামে একটী আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটে। তদ্দর্শকগণের অনেকেই অদ্যাপি জীবিত থাকিয়া সেই ইতিহাস কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। একটী ব্রাহ্মণ কন্যার প্রকৃতির পরিবর্ত্তন দেখিয়া অনেকানেক রোঝা আনা হইল, কিছুতেই কিছু হইল না। দৈবাৎ পূর্ব্বদেশীয় জনৈক রোঝাকে পাওয়া গেল। তিনি অপরাহ্ন কালে উপস্থিত হইয়া গ্রামস্থ সকলকে প্রাঙ্গণে বসাইলেন। মধ্যস্থলে রোগিনী ও রোঝার আসন। রোগিনী আজ ছুটিয়া তাহার আসনে আসিয়া বসিল! নানারূপ বাক্য কাটাকাটি করিয়া ভূত পরাজিত হইল ও রোঝার আনীত থালী মধ্যে গেল। থালীটার মুখ আঁটিয়া দিলে প্রাঙ্গণে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল! সকলে অবাক্! রোঝা থালীটা লইয়া প্রস্থান করিলেন। রোগিনী যে ভূতের নাম লিখিয়া দেখাইয়াছিল, তাহা প্রকাশ করিতে নিষেধ করায় রোঝা মহাশয় এই মাত্র বলিয়া গেলেন যে তিনিও (ভূত) ব্রাহ্মণ রোঝা, সকলে চিনেন বলিয়া আত্ম-গোপন জন্য অনুরোধ করেন। ভূতের হাতেই তাঁহার মৃত্যু ঘটে।

আর একটী প্রত্যক্ষ ঘটনার উল্লেখ না করিয়া পারিলাম না।—১৩১০ সালে জঙ্গলবাধালের জনৈক নীচ জাতীয়া রমণীকে ভূতে আশ্রয় করিয়াছে বলিয়া শুনিলাম এক অন্ধ রোঝা আনীত হইল। যথাবিধি চেষ্টার পর রোগিনী বলিল—আমি গত বন্যার সময় ডোঙ্গায় বেগবান খাল পার হইতে যাইয়া ডুবিয়া মরি। আমি...গ্রামের...বৈরাগীর পুত্র, বয়স ১৫ বৎসর। আমার নাম... আমার পিতা আমার শোকে মারা গিয়াছেন, মাতা জীবিতা আছেন। আমি এই খাল-ধারেই থাকি। তিন দিন ইহাকে ক্ষমা করিয়াছি, সেদিন আর পারিলাম না। বসু বাটীর বিবাহের বাজনা শুনিয়া শশব্যস্তে বসন সম্বরণ না করিয়া, আহার ত্যাগ করিয়া সেই ভাবেই গিয়া একটি কলাগাছ ঠেস দিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন, আমি তখন সেই গাছেই ছিলাম, লোভ-সম্বরণ করা

অসাধ্য হইল, অঞ্চল ধরিয়া আশ্রয় করিলাম। আমি বেশ সুখে আছি, আমাকে তাড়াইবেন না। আমি তুলসী ও হরিনাম ভালবাসি।" এই সময় একটি জলপূর্ণ কলসী লইতে বলায় তাহার শক্তির অতীত বলিয়া জানাইল। যাহা হউক, রোগিনী আরোগ্য হইল, আমরা তাহার উক্তির সত্যতা প্রমাণের চেষ্টা করিতে যাইয়া যাহা শুনিলাম, তাহাতে একেবারে বিস্মিত হইলাম! তাহার প্রত্যেক কথাই মিলিল!

আমেরিকার কোন সংবাদ পত্রে-রুষজার নিকোলাসের আত্মা একটী ষোড়শী বালার দেহে প্রকটিত হইয়া যেরূপ ব্যক্ত করেন, তাহা উঁহাতে বিবৃত হয়, মৃত্যুর পরেও কিছু দিন যে জাগতিক প্রকৃতি থাকে, ক্রমে পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়, তাহাও তাহাতে বোঝা যায়। ৩।৪ মাসের শিশু সেই পূর্ব্ব সংস্কারের ফলেই হাসে, কাঁদে। পরে বর্ত্তমান সংস্কার যত হৃদয়াধিকার করিতে থাকে, পূর্ব্ব সংস্কার ততই অন্তর্হিত হয়। কথাটা সহজেই বুঝিতে পারি—একস্থানে-বন্ধু বান্ধব লইয়া আছি, অন্যস্থানে বদলী হইলে তথায় যাইয়া প্রথম প্রথম পূর্ব্ব বন্ধুগণের কথা সর্ব্বদা মনে পড়ে, চিত্ত চঞ্চল হয়, ক্রমে নব বন্ধুগণের সম্মিলনে সে ছবি গুলি বিস্মৃতির আবরণে আচ্ছাদিত হয়। এই অজানা স্থানে যাইবার ভয়ে ও বর্ত্তমান বন্ধুগণকে ছাড়িবার মায়ায় বদলীর হুকুম কঠোর বোধ হয় ও প্রতিবাদ করিতে হয়। নিকোলাসেরও সেই অভ্যাস, মৃত্যুর পরেও ছাড়ে নাই; তিনি অশরীরী অবস্থাতেই পূর্ব্ববৎ হুকুম চালাইতে লাগিলেন। কিন্তু কেহ তামিল করিল না! নিজের জনৈক পরিচিত কর্ম্মচারীকে তিনি প্রাণদণ্ড করেন, সে যখন তাঁহাকে বিদ্রূপ করিতে লাগিল! জার মহোদয় ক্রমে ভ্রম বুঝিয়া অনুতপ্ত হইলেন! কিছুদিন মায়াদি মনোবৃত্তি থাকে বলিয়াই হিন্দুগণ পিতামাতার মৃত্যুতে তাঁহাদিগকে শত্রু জ্ঞান করে ও সতর্ক হয়। হিন্দুর শ্রাদ্ধাদি প্রথা নিতান্ত নিরর্থক মনে করিতে নাই। বস্তুত পরকাল-সম্বন্ধে হিন্দুগণ পূর্ব্বাবধি অনেক অগ্রসর হইয়াছিল। অধুনা আমেরিকাতেও এতৎ সম্বন্ধে বিশেষ চেষ্টা ও যত্ন হইতেছে।

বরিশালের জনৈক ব্রাহ্মণ স্বপ্নযোগে স্বীয় বিধবাকন্যাকে অপস্মার রোগের ঔষধ দেন, তাহাতেই সে নিরাময় হয়। জীবিতাবস্থায় অনেক চেষ্টাতেও তাহা পারেন নাই। মৃত্যুকালে কন্যার চিন্তা তাঁহাকে ত্যাগ করে নাই, তাই নির্ম্মুক্ত হইয়াও ঔষধ সন্ধান করিতে হইল। ইহা হইতে এরূপ অনুমান করা অসঙ্গত নয় যে মৃত্যুকালে ভগবানের নাম স্মরণ করা নিতান্ত কর্ত্তব্য। সকল জাতিও সকল সমাজেই মৃত্যুকালে ঐরূপ ব্যবস্থা আছে। হিন্দু সমাজে এমন

উপাখ্যানও প্রচলিত আছে, যাহাতে মৃত্যুকালে অন্যরূপ চিন্তা করিয়া কুফল ফলিয়াছে। এস্থলে ইহাও বলা আবশ্যক, যে সুস্থ দেহে, সুস্থ মনে অভ্যাস না করিলে সে যন্ত্রনা ক্লিষ্ট মুমূর্ষু-সময় শ্রীহরির নাম মনে আসিতে,চায় না। বিকারের ঝোঁকে হয়ত জ্ঞানই থাকে না।

এরূপ শত শত বিবরণ দেওয়া যাইতে পারে। ফলতঃ আত্মা যে অবিনশ্বর ও দেহ-ত্যাগান্তেও পূর্ব্বসংস্কার উহারা যায় না, তাহার ভূরি ভূরি প্রত্যক্ষ প্রমাণ আছে। অধস্তন যোনি হইতে আত্মা ক্রমে উন্নত অবস্থায় উঠিতে থাকে। পূর্ব্ব পূর্ব্ব মন্দ সংস্কার গুলিও ক্রমে সুসংস্কৃত হইয়া জ্ঞানের দিকে অগ্রসর হয়। শেষে পূর্ণ-জ্ঞানে বিরাম।

একটী লোকের মৃত্যু হইলে আত্মীয়গণ সৎকার জন্য শ্মশানে লইয়া গেল। সকলে সেই আয়োজন করিতেছে; এমন সময় সহসা সে চক্ষু মেলিল, সকলে তাহার সেবা শুশ্রূষা করিতে লাগিল। রোগী বাঁচিল, কথা কহিল, "বলিল তাহার খুল্ল-তাত তাহার হাতে চিড়া দিয়া ফিরাইয়া দিয়াছেন।" বাস্তবিকই তাহার হাতে এক মুষ্টী চিড়া রহিয়াছে, দেখা গেল! সংবাদ পত্রে সংবাদটী বাহির হয়। এমন সংবাদ আমরাও দুই একটী জানি। এ সমস্ত কি প্রলাপ বলিয়া কেহ উড়াইতে চাহেন?

এদেশে পারলৌকিক চিন্তাকেই বর্ত্তমান জীবন-ধারণের প্রধান কার্য্য মনে করে, অন্য কোন দেশে কোন ধর্ম্মই তদ্বিষয়ে এত প্রলুব্ধ করে না। যুগ যুগান্তর ধরিয়া আর্য্য মনীষীগণ সেই চিন্তা করিয়াছেন ও করিতে উপদেশ দিয়াছেন। সংসার সুখে জলাঞ্জলি দিয়া বনে বনে কত কঠোর তপশ্চারণ করিয়াছেন, সেই সব মহাপুরুষে সর্ব্ববিদ্যার পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া, ঊর্দ্ধদৈহিক ক্রিয়াকাণ্ডের যেরূপ অনুষ্ঠান করিয়াছেন ও করিতে ব্যবস্থা দিয়াছেন, তাহা নিতান্ত বিকৃত মস্তিষ্কের ফল এরূপ মনে করা ধৃষ্টতা প্রকাশ মাত্র।

অনেকে আপনাদের দৌর্ব্বল্য-জনিত শান্তিহীন চিত্তকে পরকাল, বা জীবাত্মার অবিনশ্বরত্ব উড়াইয়া প্রবোধ দিয়া থাকেন। বাস্তবিক তাহা ভিন্ন, তাঁহাদের প্রায় উপায়ও নাই। আমরা তাঁহাদের তর্ক জালে মুগ্ধ হইয়া আত্ম-বিস্মৃত হইতে নিষেধ করি। বরং সচ্চরিত্রতা রক্ষা করিয়া মানব নামের যোগ্যতা দেখাইবার জন্য সর্ব্বদা,অপনাকে মৃত্যুর দাস, কর্ত্তব্য কার্য্য দ্বারা চিরস্মৃত হইয়াছি জীবনের উদ্দেশ্য, এইরূপ ধারণা রাখা বিধেয় পুনরায় কর্ম্মফল ভোগ করিবার জন্য জীবকে শরীর ধারণ করিয়া সংসারে বিচরণ করিতে হয়, এই বিশ্বাসে ভগবানের উপর

আত্ম-সমর্পণ করিয়া জীবনাতিবাহিত করিলে, মৃত্যুর নামে শিহরিয়া উঠিতে হয় না বা বর্ত্তমান বাসা ত্যাগে কাতর হইতে হয় না।

আমরা যাহা কিছু ভোগ করি, তাহাই যে শেষ, এমন বোধ হয় না; যেন আবার কতবার ঐরূপ ভোগ করিতে হইবে। যে দন্তটি পড়িল, তাহা যেন কতবার পড়িয়াছে, কতবার পড়িবে; আপাততঃ যেন কিছুদিন পিছাইয়া পড়িতে হইল। আত্মার এইরূপ নিত্যধারণা আমাদিগের পুনঃ পুনঃ যাতায়াত জ্ঞাপন করিতেছে না কি? ফলতঃ যাঁহারা এই বিশ্বাসে জ্ঞানান্বেষণে সংসার সুখে জলাঞ্জলি দিয়া কত কঠোর সাধনা করেন, তাঁহারা ভ্রান্ত নহেন। প্রকৃত মনুষ্য। জীবাত্মা অবিনাশী না হইলে, জ্ঞানের সন্ধানে ছোট বড় সকলেই মত্ত হইত না। বা তজ্জন্য সকলেরই স্বাভাবিক ঝোক থাকিত না।

দিবা অবসান।

লেখিকা—শ্রীমতী জ্যোৎস্নাময়ী ঘোষ।

(১)

আষাঢ়ের দীর্ঘ-দিবা অবসান প্রায়।
কোথা হ'তে অন্ধকার,
করিতেছে অধিকার
আলোকের স্থান ক্রমে—আসিয়া ধরায়;
আষাঢ়ের দীর্ঘ-দিবা অবসান প্রায়।

(২)

সন্ধ্যা-সমাগমে খগ পশিছে কুলায়।
ফুট'ছে সাঁজের ফুল;
পুষ্প-প্রাণ ভৃঙ্গ-কুল
প্রদোষ প্রভাবে নারে সম্ভাষিতে তায়;
আষাঢ়ের দীর্ঘ-দিবা অবসান প্রায়।

(৩)

আবরিছে অন্ধকার দিক সমুদায়।
কমল মুদি'ছে আঁখি,
অস্তমিত ভানু দেখি'।
চাহে চক্রবাক্—শোকে—প্রেমের বিদায়,
নিরখি' সুখদ-দিবা অবসান-প্রায়।

(৪)

সন্ধ্যায় শীতল বায়ু মৃদুল বহি'ছে।
ফুটি'ছে কুসুম কলি,
সুশোভিয়া বনস্থলী;
প্রেম-আলিঙ্গনে লতা পাদপে বেড়ি'ছে;
ধরিতে ব্রততী, বৃক্ষ, শাখা প্রসারিছে।

(৫)

মধুচক্র মধুমক্ষি ধায় হৃষ্ট মনে।
মকরন্দ ভার ল'য়ে
আনন্দে অধীর হ'য়ে
সন্ধ্যা সমাগমে ধায় প্রমদা সদনে।
ক্ষান্ত, প্রজাপতি,—পুষ্প-রেণু আহরণে।

(৬)

হাসি'ছে সুধাংশু নভে, নিশা আগমনে।
কৌমুদী ফুটায় জলে,
কৌতুকে কুমুদ-দলে।
পিয়ি'ছে চকোর, সুধা,—চকোরীর সনে।
ভাতিছে বিরল-তারা সাঁজের গগনে।

(৭)

আসে নিশা, দিবা যায়; নিরখি আবার
আসে দিবা পুনর্ব্বার;
পুনঃ নিশা আরবার।
এই মত সুখ-দুঃখ, আসে বারবার;
হাসে কাঁদে—সুখে দুঃখে,—নর অনিবার।

(৮)

(আমি) হাসিয়াছি সুখে; আজি দুঃখে দগ্ধ কায়।
হাসিয়াছি প্রীত মনে,
হাসাইয়া জনে জনে।
(এবে) শান্তি-হারা, সংসারের তীব্র ছলনায়।
সুখ-দিবা-অবসান;—আছি মৃত-প্রায়।

—**—

পতিপ্রেমে বঞ্চিতা কামিনী।

লেখক—শ্রীনারায়ণ চন্দ্র বিদ্যারত্ন।

(১)

ধরণী কেমন এই সুবিস্তৃত রয়েছে।
তদুপরি কত শোভা সমুদিত হয়েছে।
কত তরু কত পাতা
ফুল ফলে কত লতা
দুলে দুলে সমীরণে মৃদু মৃদু নাচিছে
ভাবুকের কাণে কত মন সুখে কহিছে।

(২)

কতদিকে কতফুল আলো ক'রে ফুটেছে
কত অলি তার দিকে ছুটে ছুটে চলেছে,
সৌরভে আকুল করে
ভাবুকের মন হরে,
এ হেন স্বর্গের শোভা কে ভূতলে এনেছে
এত মধু এ সৌরভ কে ইহাতে ঢেলেছে।

(৩)

মনে মনে যত আশা যতদিন করেছি
প্রিয়বস্তু ব'লে যারে হৃদয়েতে বেঁধেছি
যাতে যাতে মন প্রাণ
যতনে করেছি দান
সে আশা সে সব মোর কোথা গেল চলিয়া
কোথায় মিলাল সব বায়ু সনে বহিয়া।

(৪)

এ ধরণী এই শোভা নিত্য আঁখি দেখিছে,
নিত্য তবু মন কেন কেঁদে কেঁদে উঠিছে।
কিছুতে না মজে মন
হুহু করে অনুক্ষণ
এ যাতনা হৃদয়ের কতদিন রহিবে
এ শরীরে দিন দিন কতই বা সহিবে।

(৫)

গভীর মনের ব্যথা কত আর সহিব
মন খুলে এ যাতনা কার কাছে কহিব
কা'রেও না কহিলাম
চেপে চেপে রাখিলাম
এত দিন সব কথা কত যত্ন করিয়া
আর ত পারি না আমি হৃদি যায় ফাটিয়া

(৬)

আশায় বাঁধিয়া বুক মনে মনে ভাবিয়া
কালক্রমে অভাগীর দুখ যাবে ঘুচিয়া
হু হু ক'রে দিন যায়
কিন্তু কি হইল হায়
মুকুলে কুসুম হ'ল, ফুলে ফল ফলিল
গোষ্পদ ভাসিয়া দেখ নদী ব'য়ে চলিল।

(ক্রমশঃ)

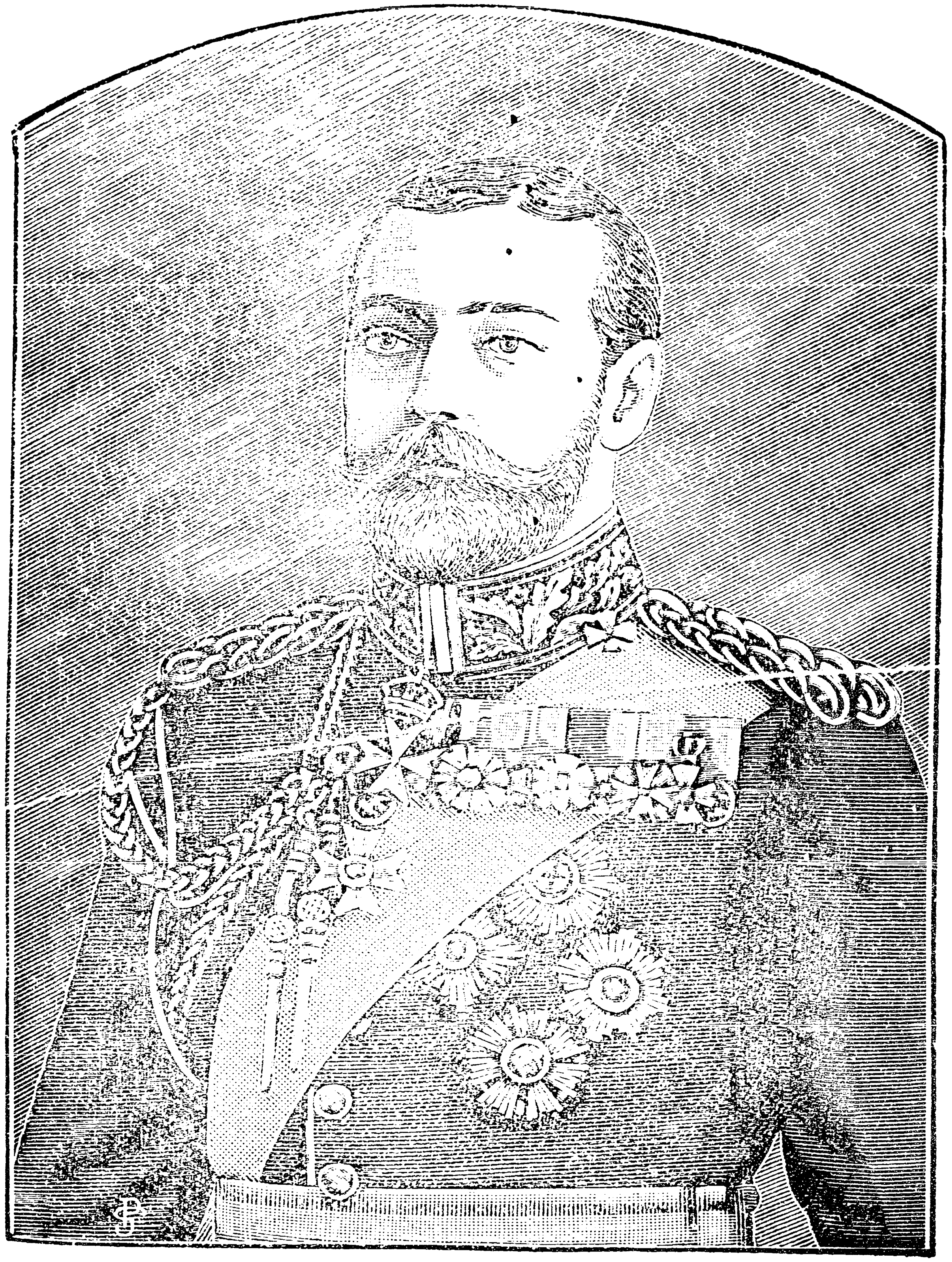

যুবরাজ

কলিকাতায় যুবরাজ।

আমাদের বর্ত্তমান সম্রাট্ সপ্তম এড্ওয়ার্ড বাহাদুরের প্রিয় পুত্র শ্রীযুক্ত যুবরাজ জর্জ ফ্রেডারিক আরনেষ্ট আলবার্ট সস্ত্রীক ভারত ভ্রমণে বহির্গত হইয়াছেন। ভারতের নানাস্থান পরিভ্রমণ করিয়া ২৯শে ডিসেম্বর—১৪ই পৌষ শুক্রবার অপরাহ্নে যুবরাজ দম্পতি মহানগর কলিকাতায় পদার্পন করেন। বেলা তৃতীয় ঘটিকার পর হাবড়া ষ্টেশনে বাষ্পীয় শকট উপস্থিত হয়, ষ্টেশনটি নানা সাজে সজ্জিত হইয়াছিল। যুবরাজ দম্পতি শকট হইতে অবতরণ করিলে ষ্টেশনের সুসজ্জিত প্লাটফরমে বর্দ্ধমান বিভাগের কমিশনার বেলস্ সাহেব, হাবড়ার মাজিষ্ট্রেট ফরেষ্ট সাহেব, কলিকাতার পুলিশ কমিশনার হ্যালিডে সাহেব এবং ইষ্টইণ্ডিয়ান রেলের ট্রাফিক সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট হডলষ্টোন সাহেব সসম্ভ্রমে মহা সমাদরে তাঁহাদিগের অভ্যর্থনা করিলেন, সেই সময় ভাগীরথীবক্ষস্থ প্রধান রণতরী (Flagship) হইতে একত্রিংশ তোপধ্বনি হইল। অনন্তর সস্ত্রীক যুবরাজ মহোদয় সদলে গঙ্গাতীরে উপস্থিত হইয়া "হাবড়া" নামক বাষ্পীয় তরণীতে আরোহণ পূর্ব্বক পরপারস্থ প্রিন্সেপ ঘাটে অবতীর্ণ হন "হাবড়া" ষ্টীমারখানি বিবিধ বর্ণের ধ্বজপতাকায় ও সুন্দর সুন্দর পুষ্প পত্রে সুশোভিত করা হইয়াছিল, সেই তরণরা উভয় পার্শ্বে সুরঙ্গিণ পতাকা শোভিত অপরাপর তরণীশ্রেণী ভাসমান। রাজ কুমার দম্পতি প্রিন্সেপ ঘাটে পদার্পণ করিলে ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গ হইতে রাজাভিবাদন (Royal salute) সূচক একত্রিংশৎ তোপধ্বনি হয়। ঘাটের দালানে অভ্যর্থনা মণ্ডপ স্থাপিত হইয়াছিল। মণ্ডপ ভূমি রক্ত বস্ত্রে আচ্ছাদিত শিরোভাগে চারিটিস্তম্ভের উপর বিচিত্র ঝালরযুক্ত চন্দ্রাতপ মধ্যস্থলে বেদী তাহার উপর দুইখানি সিংহাসন। বঙ্গের লেপ্‌টেনেণ্ট গবর্ণর সার এণ্ড্রু ফ্রেজার, হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি চিফ্‌জষ্টিস্, সার ফ্রান্সিস্ ম্যাকলীন সাহেব, কলিকাতার লর্ড বিশপ এবং কেল্লার প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষ সাহেব ষ্টীমার হইতে যুবরাজ দম্পতিকে সাদরে অভ্যর্থনা করিয়া মণ্ডপ সমীপে আনয়ন করেন, রাজদর্শনাভিলাষী লোক সমুহ চতুর্দ্দিকে পরিব্যাপ্ত। মণ্ডপের দুইধারে আমন্ত্রিত দর্শকবৃন্দের বসিবার দুই সহস্র চেয়ার শ্রেণীবদ্ধ। যুবরাজ দম্পতি মণ্ডপের মধ্যে প্রবেশ করিলে বৃটিশের জয় সূচক জাতীয় বাদ্য বাজিয়া উঠিল, বঙ্গের সরকারী বেসরকারী গণ্য মান্য ব্যক্তি কলিকাতা মিউনি-

সিপালিটির কমিশনরগণ বৈদেশিক রাজ্যের দূত সমূহ পথের উভয় পার্শ্বে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দাঁড়াইলেন। বেঙ্গল গবর্ণমেণ্টের চিফ্‌সেক্রেটারি কারলাইল সাহেব সেই সময় তাঁহাদের সহিত যুবরাজ ও যুবরাজ পত্নীর পরিচয় করিয়া দিলেন। যুবরাজ সকলের সহিত করমর্দ্দন করিয়া আপ্যায়িত করিলেন।

অতঃপর যুবরাজ দম্পতি অভ্যর্থনা মণ্ডপের মঞ্চোপরি উঠিয়া দাঁড়াইলেন, সেই সময় কলিকতা মিউনিসিপালটির ভাইস্ চেয়ারম্যান শ্রীযুক্ত বাবু নীলাম্বর মুখোপাধ্যায় নগরবাসীগণের প্রতিনিধি স্বরূপ হইয়া সুললিত স্বরে এক অভিনন্দন পত্র পাঠ করিলেন। অভিনন্দনের মর্ম্ম এইরূপ :—

"আমরা কলিকাতা মিউনিসিপালিটির চেয়ারম্যান, ভাইস্ চেয়ারম্যান ও কমিশনারগণ অদ্য এই কলিকাতা নগরবাসীগণের প্রতিনিধি হইয়া যুবরাজ মহোদয়ের সংবর্দ্ধনা করিতে অগ্রসর হইয়াছি। আমাদের সম্রাট্ ও সম্রাট্ কুমারের প্রতি অকপট ভক্তি প্রকাশ করিতেছি।

ত্রিশবৎসর পূর্ব্বে বর্ত্তমান সম্রাট্ যখন প্রিন্সঅবওয়েলস্ ছিলেন, সেই সময় তাঁহার ভারতাগমনে আমরা সানন্দে ভক্তি প্রদর্শন করিয়া যে প্রীতি অনুভব করিয়াছিলাম তাহা আজিও আমাদের হৃদয়ে জাগরুক রহিয়াছে।

যুবরাজ! আপনার শুভাগমনে আমাদের সেই অচলা রাজভক্তি আরও দৃঢ়তর হইবে তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই।

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের দ্বিতীয় রাজধানি বলিয়াই মহানগরী কলিকাতা মহা গৌরবান্বিত। এই নগরীর সৌভাগ্য-সমৃদ্ধি ব্রিটিশ শাসনের উপাদেয় ফল। এই ধারাবাহিক নৈতিক ও আর্থিক উন্নতি কেবল কলিকাতাতেই নহে ভারতের সর্ব্বত্রই ইহার প্রচার। সাধারণ হিতকর নানা সৎকার্য্যে, শিল্প বাণিজ্যে, শিক্ষাবিস্তারে এবং আরও নানাপ্রকারে ভারত শাসনতন্ত্রের উদার পরিচয়।

যুবরাজ! কেবল আপনার শুভাগমনেই যে, আমরা আহ্লাদিত তাহা নহে, আমাদের ভবিষ্যৎ রাজমহিষীর পদার্পণে আমরা আজ মহা আহ্লাদিত।

নগরের অধিবাসীবর্গ ভবিষ্যৎ রাজমহিষীকে ভক্তি উপহার স্বরূপ যে রত্ন ভূষণ অর্পণ করিতেছেন, তিনি অনুগ্রহ করিয়া এই উপহার গ্রহণ করিলে আমরা চরিতার্থ হইব। এই উপহারটি যেন আমাদের ভক্তি ও শ্রদ্ধার নিদর্শন স্বরূপ থাকে, ইহাই আমাদের প্রার্থনা।

যুবরাজ এই অভিনন্দন পত্রের যথোচিত উত্তর প্রদান করিয়া নিজ নাম স্বাক্ষর পূর্ব্বক সেই উত্তর পত্রিকাখানি নীলাম্বর বাবুর হস্তে দিলেন, নীলাম্বর বাবুও

একটি রৌপ্য পাত্রে রাখিয়া যুবরাজের হস্তে সমর্পণ করিলেন এবং একছড়া হীরকের হার যুবরাজমহিষীকে উপহার দিলেন, তিনি তৎক্ষণাৎ সেই ছড়াটি আপন গলদেশে ধারণ করিলেন, অমনি চতুর্দ্দিক হইতে আনন্দধ্বনি উত্থিত হইল।

এই সকল কার্য্যের পর যুবরাজ দম্পতি মঞ্চ হইতে অবরোহণ পূর্ব্বক রাজকীয় শকটারোহণে লাট সাহেবের প্রাসাদাভিমুখে চলিলেন।

রাজপথ লোকারণ্য, রেডরোডের উভয়পার্শ্বে নয়ন রঞ্জন পত্র পুষ্প ও বিচিত্র কেতনে পরিশোভিত, হাবড়ার সেতু, পোর্টকমিশনারের আফিস, বেঙ্গল ব্যাঙ্ক, হাইকোর্ট, নিকটস্থ বড় বড় আফিসসমূহ এবং ইডেন উদ্যান প্রভৃতি ধ্বজ পত্র পুষ্প পতাকায় সুসজ্জিত হইয়াছিল।

যুবরাজ দম্পতি গবর্ণমেণ্ট হাউসে যাইতেছেন, আগু পাছু বৃটিশ অশ্বারোহী সৈন্য তৎপশ্চাৎ দ্বাদশটি কামানের গাড়ি তৎপশ্চাৎ লাইট হর্স নামক ভলেণ্টিয়ার সৈন্য, তৎপশ্চাৎ রাজ পুতানার নৃপতি বৃন্দের বংশধরেরা যাঁহারা (Imperial cadet corps) দলভুক্ত হইয়াছেন, বীরসাজে সজ্জিত হইয়া অশ্বারোহণে সম্রাট্ কুমারের সহিত চলিলেন, তৎপশ্চাৎ অশ্বারোহী গোরাসৈন্য শিখ সৈন্য ও গোলন্দাজ সৈন্য প্রভৃতি, দর্শকেরা সসম্ভ্রমে অভিবাদন করিতে লাগিলেন, যুবরাজ দম্পতি সহাস্য বদনে মস্তক অবনত করিয়া প্রত্যভিবাদন করিতে করিতে গমন করিলেন। পথের উভয় পার্শ্বে মধ্যে মধ্যে কেল্লার শিখ ও গোরা বাদ্যকরেরা বাদ্য যন্ত্রাদিসহ দাঁড়াইয়াছিল, শকটের গতির সঙ্গে সঙ্গে বাদ্যধ্বনি করিয়া সৈনিক বৃন্দের ও দর্শক বৃন্দের আনন্দ বর্দ্ধন করিয়াছিল। এই মিছিল যথার্থই এক অপূর্ব্ব দৃশ্য যাঁহারা দেখিয়াছেন, তাঁহাদের মানব জীবন সার্থক হইয়াছে।

যুবরাজের শকট লাটপ্রাসাদের সোপান সমীপে উপস্থিত হইলে, গবর্ণরজেনারল লর্ডমিণ্টো বাহাদুর প্রধান সেনাপতি লর্ড কিচেনার আসাম বঙ্গের নূতন ছোটলাট মিঃ ফুলার তিব্বতের তাসিলামা, ভুটানের টংসাপেনলেপ, সিকিমের মহারাজ এবং অন্যান্য অনেক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি যুবরাজ দম্পতির যথোচিত অভ্যর্থনা করিলেন।

লর্ডমিণ্টো এবং লেডি মিণ্টো সস্নেহ সমাদরে যুবরাজ দম্পতিকে বিশ্রামাগারে লইয়া গেলেন, রাত্রি ৯৷৷০ সময় প্রাসাদের দরবার গৃহে লেভি বসিল। লেভিতে সম্রাটের দুইজন প্রতিনিধি একসঙ্গে উপস্থিত থাকা নিয়ম বিরুদ্ধ তজ্জন্য লর্ডমিণ্টো বাহাদুর সে গৃহে প্রবেশ করেন নাই, সিংহাসনে যুবরাজ উপবিষ্ট হইলে লেভিতে প্রবেশাধিকারী মহানুভব মহোদয়গণ মহাগৌরবে অভিবাদন করিয়া একে একে চলিয়া গেলেন, রাত্রি ১২টার পর লেভিসভা ভঙ্গ হইল।

১৫ই পৌষ শনিবার বেলা ৮॥০ ঘটিকার সময় যুবরাজ সম্রাটের নিজ সেনাদলের সৈনিকগণকে নূতন পতাকা উপহার প্রদান করেন। কলিকাতার ফোর্ট উইলিয়ম্ দুর্গ মধ্যে এই উৎসব ব্যাপার সুসম্পূর্ণ হইয়া ছিল। ঐ সময় লর্ড কিচেনার ও সৈনিক বিভাগের উচ্চ পদস্থ খ্যাতনামা কর্ম্মচারিগণ উপস্থিত ছিলেন। "সম্রাটের নিজ সেনাদল" নামক এই সৈন্যদল পুরাতন এবং লব্ধপ্রতিষ্ঠ। ইহাঁরা বিগত ১৬৮০ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ডে সংগঠিত হয়। গত ১৯০৩ সালে এই সৈন্য সম্প্রদায় মল্টা হইতে কলিকাতার ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গে অবস্থান করিতেছেন। বৈকালে গড়ের মাঠে ঘোঁড়দৌড়, সদস্য পরিবেষ্টিত যুবরাজ সেই ময়দানের মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন। রাত্রে বেলভেডিয়ার প্রাসাদে বঙ্গেশ্বরের ভোজের নিমন্ত্রণ রক্ষণ।

১৬ই পৌষ রবিবার বেলা সাড়ে ১০॥ টার সময় গির্জ্জা মন্দিরে উপাসনা। অপরাহ্ণে শিবপুরের রাজকীয় উদ্যান দর্শন।

১৭ই পৌষ ১লা জানুয়ারী সোমবার প্রাতঃকালে ৯টার সময় সেনাদলের প্যারেড, যুবরাজ মহিষীর পশুশালা দর্শন। অপরাহ্ণে টালিগঞ্জে ঘোড়দৌড়, রাত্রিকালে গবর্ণমেণ্ট হাউসে ভোজ।

১৮ই পৌষ মঙ্গলবার বেলা ১২টার সময় দেশীয় রাজগণের সহিত যুবরাজের সাক্ষাৎ। বেলা ১।টার সময় কুচবিহারের মহারাজের সহিত জলযোগ। অপরাহ্ণ ৪ চতুর্থ ঘটিকার সময় ময়দানে সাধারণ অভ্যর্থনা।

গড়ের মাঠে অতি সুন্দর অভ্যর্থনা মণ্ডপ নির্ম্মিত হইয়াছিল। মণ্ডপের স্তম্ভ ও খিলান গুলি ইষ্টক নির্ম্মিত উত্তমরূপ চূণকাম করা নানা আভরণে সুসজ্জিত। মঞ্চোপরি দুইখানি স্বর্ণ সিংহাসন, মণ্ডপের উপর সুচিত্র মখমলের চন্দ্রাতপ উভয় পার্শ্বে দর্শক বৃন্দের বসিবার আসন শ্রেণীবদ্ধ। ঠিক বেলা পৌণে পাঁচটার সময় যুবরাজ সপত্নীক সসৈন্য ও সদল বলে মণ্ডপে উপস্থিত হইলেন। জয় সূচক বৃটিশ জাতীয়বাদ্য ঘোররবে বাদিত হইল। যুবরাজ উপস্থিত হইবা মাত্র বঙ্গেশ্বর সার এণ্ড্রু ফ্রেজার ও দ্বার বঙ্গের মহারাজ রামেশ্বর সিংহ K. C. I. E. প্রমুখ মাননীয় মহোদয়গণ সসম্ভ্রমে অভ্যর্থনা করিয়া যুবরাজ দম্পতিকে সিংহাসনে বসাইলেন। বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজ শ্রীল শ্রীযুক্ত বিজয় চাঁদ মহাতাপ বাহাদুর, মহারাজা বাহাদুর শ্রীল শ্রীযুক্ত স্যার যতীন্দ্র মোহন ঠাকুর বাহাদুর— K. C. S. I. গিধোড়ের মহারাজ রাবণেশ্বর প্রসাদ সিংহ বাহাদুর K. C. I. E. ঢাকার নবাব শ্রীল শ্রীযুক্ত খাজা সলিমুল্লা বাহাদুর, এই চারিজনে ছত্রধারিরূপে চন্দ্রাতপের চারিটি দণ্ড ধারিয়া

রহিলেন। কুমার শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্র সিংহ ও কুমার শ্রীযুক্ত শিবকুমার ঠাকুর উভয় পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া স্বর্ণদণ্ড শোভিত চামর দুলাইতে লাগিলেন, ইহাও অপূর্ব্ব দৃশ্য।

দিনাজপুরের মহারাজ শ্রীল শ্রীযুক্ত গিরিজানাথ রায় বাহাদুর যুবরাজকে একটি রত্ন খচিত গোলাপ পাস্ উপহার দিলেন, ময়মনসিংহের মহারাজকুমার শ্রীযুক্ত শশিকান্ত আচার্য্য চৌধুরী সেইটি হস্তে করিয়া আনিয়াদিলেন। মহারাজ কুমার শ্রীযুক্ত গোপেন্দ্র কৃষ্ণ দেব বাহাদুর রজত পাত্রে দুইছড়া পুষ্পহার আনয়ন করিয়া সম্মুখে ধারিলেন, শ্রীযুক্ত রাজা প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায় C. I. E. মহাশয় যুবরাজ দম্পতির কণ্ঠদেশে সেই পুষ্পহার পরাইয়াদিলেন, কাশিমবাজারের মহারাজ কুমারমহিম চন্দ্র নন্দী রজত পাত্রে অগুরু চন্দন আনিলেন, শোণবর্ষের মহারাজ শ্রীল শ্রীযুক্ত সার হরবল্লভ নারায়ণ সিংহ বাহাদুর তাহা যুবরাজ দম্পতিকে প্রদান করিলেন।

দ্বার বঙ্গের পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কৃষ্ণ সিংহঠাকুর কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের প্রিন্সিপল মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হর প্রাসাদ শাস্ত্রী এম, এ, মুলাজোড় ঠাকুর-চতুষ্পাঠির প্রধান অধ্যাপক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র সার্ব্বভৌম ও পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রামনাথ তর্করত্ন প্রত্যেকেস্বর্ণপাত্রে ধান দূর্ব্বা ও স্বর্ণমুদ্রা ধারণ পূর্ব্বক মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া যুবরাজ দম্পতির মঙ্গলার্থ আশীর্ব্বাদ করিলেন, সেই সঙ্গে মন্ত্র খোদিত এক একটি মাদুলী ও অর্পণকরিলেন। তিনজন মৌলবী স্ব স্ব বিরচিত "কাশীদা" পত্র অর্পণ করিয়া মঙ্গল কামনা করিলেন, বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বি চট্টগ্রাম নিবাসী কৃপাশরণ ভিক্ষু ও মহাস্থবির গুণালঙ্কার ভিক্ষু পালিভাষায় রচিত মঙ্গল সূচক মুদ্রিত শ্লোক প্রদান করিলেন। যুবরাজ দম্পতি প্রফুল্ল বদনে বিশেষ সৌজন্য সহকারে ঐ সমস্ত গ্রহণ করিলেন। যুবরাজের বঙ্গে আগমনের সানন্দ অভ্যর্থনা সূচক উৎসব উপলক্ষে সুকবি মহারাজ সার যতীন্দ্র মোহন ঠাকুর যে একটি সুন্দর গান রচনা করিয়াছেন, যুবরাজের পিতার আগমন উপলক্ষে যে গানটি হইয়াছিল, কতিপয় সুগায়কের দ্বারা সুস্বর তানলয়ে এক্ষেত্রেও সেইটি গীত হইল, মহারাজের কবিত্ব গৌরবের নিদর্শন স্বরূপ জন্মভূমির পাঠকগণের আনন্দ বর্দ্ধনার্থ সেই গীতটি আমরা এইস্থলে উদ্ধৃত করিলাম। যথাঃ—

রাগিণী ভূপ কল্যাণ—তাল ঝাপতাল।

এসহে ভামিনী সহ এস যুবরাজ।
মঙ্গল আহ্বান গান করে সবে আজ॥
পুলকে পূরিত অঙ্গ, বরিছে তোমারে বঙ্গ,
ভাবী অধিপতি তার ভাবী মহারাজ॥
দীন বঙ্গবাসীগণ কি করিবে আবাহন
বিনায়ে বিনয় বাণী হয় কি সে কাজ॥
জিনিয়া বঙ্গতপন রাজ ভক্তি দীপ্ত মন,
উপহার দিল তাই বঙ্গের সমাজ॥

অতঃপর ভারতীয় সঙ্গীত সমাজের উদ্যোগে রাজা স্যার সৌরেন্দ্র মোহন ঠাকুর প্রমুখের জলতরঙ্গ যন্ত্র বাদন ও সুমধুর সঙ্গীত, রঙ্গভূমিতে বাউল সঙ্গীত, সিকিমী নাচ, ভুটানী নাচ, তিব্বতী নাচ, ল্যাঠি খেলা যুবরাজকে দেখান হইল।

অভ্যর্থনা সভার সভাপতি দ্বারভঙ্গের মহারাজ রামেশ্বর সিংহ বাহাদুর যুবরাজ দম্পতিকে তাম্বুল পান ও আঁতর প্রদান করিলেন। মুর্শীদাবাদের মির্জ্জা বাহাদুর অনারেবল আসিফ আলিমির্জ্জা বাহাদুর প্রাচীন মুসলমান পদ্ধতি অনুসারে যুবরাজ দম্পতির হস্তে ইমাম করিম বাঁধিয়া দিলেন। কুচবিহারের মহারাজ কুমারী শ্রীমতী সুধীরা সুন্দরী যুবরাজ পত্নীকে একটি ফুলডালি উপহার দিলেন।

গড়ের মাঠ লোকারণ্য রাজপথ লোকারণ্য তিল ধারনের স্থান ছিল না সন্ধ্যা ৬টার সময় যুবরাজ দম্পতি অভ্যর্থনা কারী মহোদয়গণের নিকট বিদায় লইয়া মণ্ডপ হইতে বাহির হইয়া শকটারোহণে প্রস্থান করিলেন। পথের উভয় পার্শ্বে এক সহস্র মশালের বাঁধা রোশনাই হইয়াছিল সন্ধ্যার পর আতস বাজির মহাধূম বাজিগুলি অতি চমৎকার হইয়াছিল।

১৯শে পৌষ বুধবার নিশাকালে সমগ্র ইংরাজ টোলা ও বাঙ্গালীটোলা হ্যারিসন রোড পর্য্যন্ত সমুজ্জ্বল আলোক মালায় বিভূষিত হইয়াছিল। চৌরঙ্গির সমস্ত বাড়ী, মনুমেন্ট, কেল্লা, হাইকোর্ট, গবর্ণমেন্ট হাউস, গ্রেট ইষ্টান হোটেল প্রভৃতি বৈদ্যুতিক আলোক প্রভায় যেন উজ্জ্বল উজ্জ্বল মণিমণ্ডিত বোধ হইয়াছিল। বিশেষতঃ অস্‌লার কোম্পানির দোকান এবং ইষ্টইণ্ডিয়ান্‌রেলওয়ের আফিস, রাইটার্স বিল্ডিং, জেনারল পোষ্টআফিস্ অতি রমণীয় শোভা ধারণ করিয়াছিল। ইষ্টইণ্ডিয়ান রেলওয়ে আফিসে বিদ্যুৎ প্রভায় এঞ্জিন সঞ্চালিত হইয়াছিল, সকলেই বলিয়াছেন সে শোভা অতুলনীয়।

১৮ই পৌষ মঙ্গলবার বেলভেডিয়ার উদ্যান প্রাসাদে কতিপয় সম্ভ্রান্ত হিন্দু কুলমহিলা ও কয়েকটি বেগম সমবেত হইয়া রাজবধূ ঠাকুরাণীকে পুষ্পমাল্যাদি আভরণ প্রদান পূর্ব্বক বরণ করিয়া ছিলেন, সেথানে হিন্দু অন্তঃপুরের অসূর্য্যম্পশ্যা পরদানসীন রমণীগণের আবরু সম্ভ্রম রক্ষার ত্রুটি হয় নাই, যেস্থানে বরণক্রিয়া সম্পাদিত হয়, সেখানে পুরুষ মাত্রেরই প্রবেশাধিকার ছিল না অনেকে এই নূতন অনুষ্ঠানকে সমাজ বিরুদ্ধ বলিয়া আক্ষেপ প্রকাশ করিতেছেন।

২২শে পৌষ শনিবার পূর্ব্বাহ্ণ সার্দ্ধ দশম ঘটিকার সময় কলিকাতার বিশ্ববিদ্যালয়ের সিণ্ডিকেটগণের এক বিশেষ অধিবেশন হয়। যুবরাজ বাহাদুর আহুত হইয়া সেই সভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন, চ্যান্সেলার গবর্ণরজেনারল লর্ডমিন্টো

বাহাদুর মহাসম্মানে যুবরাজ বাহাদুরকে ডি, এল, অর্থাৎ আইনের ডাক্তার উপাধি প্রদান করিয়াছেন, ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে তদানীন্তন চান্সালার এইরূপ সভা আহ্বান করিয়া এই যুবরাজের পিতৃদেবকে (আমাদের বর্ত্তমান সম্রাট বাহাদুরকে) এইরূপ ডি, এল, উপাধি প্রদান করিয়াছিলেন। ইতিমধ্যে এক রজনীতে গবর্ণমেণ্ট হাউসে রাজকীয় নিত্যসভা হইয়াছিল।

দুঃখের বিষয় যুবরাজ বাহাদুর মহা নগরীর সমৃদ্ধি শালী ইংরাজ টোলার গড়ের মাঠের ঘোড়দৌড়, টালিগঞ্জের ঘোড়দৌড়, শিবপুরের বোটানিক্যালগার্ডেন চানকের গবর্ণমেণ্ট প্রাসাদ দর্শন করিয়াছেন কলিকাতার উত্তর বিভাগ যেথানে অধিকাংশ নগর বাসীর নিবাস সে অঞ্চলে একবারও পদার্পন করেন নাই, বাঙ্গালী-টোলার অধিবাসীবর্গ তাঁহাদের নিজপল্লিতে—ভাবীসম্রাটের দর্শন লাভে বঞ্চিত হইয়াছিল।

আর এক দুঃখের বিষয় রাজ কুমারের অভ্যর্থনা আলোকমালা আতস বাজি ও অপরাপর উৎসব দর্শনার্থি হইয়া লক্ষ লক্ষ বাঙ্গালী মহোৎসাহে একত্রিত হইয়াছিল, তাহাদের অনেকেই শান্তিরক্ষক পুলিশের হস্তে অতিশয় লাঞ্ছিত ও নিগৃহীত হইয়াছে।

নগরের উৎসব সমাপ্ত হইলে ২২শে পৌষ শনিবার যুবরাজ বাহাদুর সস্ত্রীক ভারতের রাজধানি পরিত্যাগ পূর্ব্বক বাষ্পীয় তরণী যোগে ব্রহ্মদেশে যাত্রা করিয়াছেন। আমরা কায়মন বাক্যে ভগবানের নিকট যুবরাজ মহোদয়ের দীর্ঘজীবন কামনা করি।

৺অবিনাশ কবিরত্ন

এই মহানুভব কবিরাজ মহাশয় অকস্মাৎ অকালে মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছেন। চিকিৎসায় তাঁহার সুযশ ছিল, তিনি অনেক লোককে অন্নদান করিতেন, তাঁহার যত্নে ও অধ্যবসায়ে চরকসুশ্রুতাদি দুর্লভ চিকিৎসাগ্রন্থ ইংরাজী ও বাঙ্গালা ভাষায় অনুবাদিত হইয়া প্রকাশ হইতে ছিল। অসময়ে তাঁহাকে হারাইয়া আমরা শোক-সন্তপ্ত হইয়াছি; প্রসিদ্ধ কবিরাজ শ্রীযুক্ত বারাণসী গুপ্ত কবিরত্ন মহাশয় তৎসম্বন্ধে একটি শোক সূচক কবিতা রচনা করিয়া আমাদের

নিকট প্রেরণ করিয়াছেন, সেই করুণ রসপূর্ণ কবিতাটি নিম্নভাগে পরিগৃহীত হইল :—

একি কথা শুনিলাম হায়!

বঙ্গের উজ্জ্বলরত্ন   অবিনাশ কবিরত্ন
আর নাকি নাহিক ধরায় ॥

কর্ম্মকরি রাশি রাশি   কীর্ত্তিরাখি অবিনাশী
তুচ্ছকরি জীবনের মায়া।

সংসার আঁধার করি   জীবলীলা সাঙ্গকরি
স্বর্গধামে গেছেন চলিয়া ॥

যে রতন স্বপ্রভায়   আত্মশক্তি প্রতিষ্ঠায়
হয়েছিল সর্ব্বত্র বিজয়ী।

আমেরিকা ইয়োরোপে   মধ্যাহ্ন মার্ত্তণ্ডরূপে
প্রভা যার চির আভাময়ী ॥

স্ব-নাম পুরুষ ধন্য   মানবের অগ্রগণ্য
তাহা তুমি ছিলে অবিনাশ।

যে কীর্ত্তি রাখিয়া গেলে   আদর্শ মানব কুলে
কভু তার না হবে বিনাশ ॥

আর্য্যভাবে উদ্দীপিত   আজীবন তবচিত
তাই তার প্রতিভা প্রচারে।

অদম্য উৎসাহ ভরে   প্রাণপন যত্ন করে
কত ভার বহিয়াছ শিরে ॥

"কীর্ত্তির্যস্য সজীবতি"   এইমন্ত্রে মহামতি
দীক্ষিত হইয়া আজীবন।

ধরিয়া কঠোর ব্রত   মানবের সাধ্যাতীত
করেছিলে কর্ম্ম আয়োজন ॥

আর্য্য আয়ুর্ব্বেদ ধন   ছিল তব প্রিয়তম
সেবা-ভার করে নিরন্তর।

সাধনায় সিদ্ধহলে   জয়মাল্য পরিগলে
মরভূমে হইলে অমর ॥

কিন্তু দেব কি করিলে   কর্ম্মযজ্ঞ মহানলে

আত্মপ্রাণ দিলে বলিদান।

এখন ত সুসম্পন্ন   হয় নাই তবকর্ম্ম
কেন তবে হ'ল এ বিধান ॥

আত্রেয় সংহিতারত্ন   প্রাণাধিক প্রিয়রত্ন
কবিরত্ন ছিলগো তোমার।

প্রোজ্জ্বল প্রভায় যার   মুগ্ধ হয়ে অনিবার
কীর্ত্তিতব ঘোষিছে সংসার ॥

সে কার্য্য না সমাপিয়ে   আশাদীপ নিবাইয়ে
শোকানলে দগ্ধিয়া সকলে

মৌনভাবে কি ভাবিয়া   কোন কথা না কহিয়া
চুপে চুপে কোথা গেলে চলে ॥

কর্ম্মক্ষেত্রে অবতরি   অহোরাত্র কর্ম্ম করি
পরিশ্রান্ত হইলে কি তুমি।

লভিতে বিশ্রাম শান্তি   তাই কি হে দেবকান্তি
ত্যাগ করে গেলে কর্ম্মভূমি ॥

বল বল সত্য করে   পুনঃ কি হে আসিবে ফিরে
না আসিলে কি হবে উপায় ॥

তোমার অশ্রিত যারা   কেমনে বাঁচিবে তারা
তোমাবিনে সব শব প্রায় ॥

সংসারের সার ধন   পুত্র কন্যা প্রিয়তম।
প্রবোধ না মানে তোমা বিনে ॥

ঐ দেখ "পবু" "সুবা"   কোথা তুমি গেলে বাবা
এই বলে কাঁদিছে দু-জনে ॥

অসূর্য্যম্পশ্যাজায়া   ধুলি ধূসরিতকায়া
তব শোকে ভূমে অচেতন ॥

দয়া করে ফিরে চাও   একবার দেখে যাও
কি দুর্দ্দশাগ্রস্ত পরিজন ॥

দীন হীন দুঃখী কত   তব শোকে অবিরত
পথে অশ্রু করে বিসর্জ্জন।

হায়! দেব কি করিলে   কি বজ্র হানিয়া গেলে

স্তম্ভিত হইল বঙ্গভূম ॥
অভ্র ভেদি অট্টালিকা যাহে তব কীর্ত্তি আঁকা
আজ তাহা বীজন আঁধার।
পতিপ্রাণা সতী শোকে সকলেই মহাদুঃখে
অন্তঃপুরে করে হাহাকার ॥
নীরবে চলিয়া গেলে কারে কিছু না বলিলে
তবে কিহে আসিবেনা আর।
সত্যই কি মর ধামে ঘৃণা জনমিল প্রাণে
পাপ তাপ দেখে অনিবার।
পৌষের পাপরাতি শুক্লাপ্রতিপদ তিথি
যে রতন করিল হরণ,
আর না মিলিবে তাহা অমূল্য রতন আহা
বড় দুঃখ দিলিরে শমন ॥

সোণার বাংলা।

লেখক—নাট্যাচার্য্য শ্রীযুক্ত গিরীশ চন্দ্র ঘোষ।

(সন্তানের উক্তি।)

শুনি মা তুই সোণার বাংলা,
শুনি যেমন সোণার কাশী ॥
তুমি যদি মা সোণার বাংলা,
আমরা কেন উপবাসী ॥
ধোঁয় ফুঁড়ে তোর আসে আকাশ,
দীর্ঘশ্বাসে তোমার বাতাস,
কানের কাছে সদাই হা-হা,
সে-তো নয় না মধুর বাঁশি ॥

সন্ধ্যা বেলা ফিরি ঘরে,
গিন্নী প'ড়ে আছে জ্বরে,
ঘুমুতে না পাইনে রেতে,
ছোট ছেলের ঘুংড়ি-কাসি ॥
বড়্টা বইয়ের বস্তা বয়ে,
দিনে দিনে যাচ্চে ক্ষয়ে,
চসমা চোখে ব'সে থাকে,
মলিন মুখে নাইকো হাসি ॥
ঘুচলো না গো উঠ্‌লো কেনা,
নিত্য বেড়ে যাচ্চে দেনা,
ডাক্তারখানার বিলে গেছে,
ঘটী, বাটী, থালা, কাঁসি ॥
দু'পাতা ইংরেজি চেটে,
দেমাকে মরেছি ফেটে,
সারা হলেম খেটে খেটে,
গলাতে গোলামী-ফাঁসী ॥
নাইকো মা তোর আমের বাগান
ম্যালেরিয়ায় করলে শ্মশান,
নাইকো শোভা নাইকো ছায়া,
পাখী হয়েছে উদাসী ॥
অন্ন নাই রাখালের পেটে,
গরু গেছে 'নিউ মারকেটে'
আঙিনাতে ধুলো উঠে,
ধুঁকে পড়ে আছে চাষী ॥

(মায়ের উক্তি।)

ঘুমিয়ে আছ অঘোর হ'য়ে,
তাইতে থাক উপবাসী।
ডাকি কত উঠো না তো,

চ'খের জলে সদাই ভাসি ॥
নগ্ন থাকো বসন বিনে,
পরের কাছে আনি কিনে,
আরো কি হয় দিনে দিনে,
হয়েছি তো পরের দাসী ॥
জন্মেছে নূতন বিজ্ঞান,
রোগের কি পেয়েছে নিদান,
ঘুমিয়েছ, তাই করলে শ্মশান,
নিত্য নূতন নিদান আসি ॥
বোঝ না শরীরের ওজন,
ভুলেছ মধ্যাহ্ন-ভোজন ॥
ব্রেকফাষ্ট, টিফিন, ডিনার
কুভোজন—হ'য়ে বিলাসী ॥
কলিকা বালিকা কালে
বিইয়ে ছেলে পালে পালে,
প্রসূতি মরে অকালে,
নিত্যি ছেলের বালসা কাসি ॥
একটু শিশু খেল্‌লে পরে,
বই হাতে দাও তাড়া ক'রে,
কেন তবে চোখ না যাবে,
মুখে কিসে থাকবে হাসি ॥
দুগ্ধ ফেলে সুরার কদর,
গরুর কেন থাকবে আদর,
অনাহারে রাখাল মরে,
সুদের ভরে ধোকে চাষী ॥
শুনেছ ইহুদী যারা,
নানাস্থানী, স্বদেশহারা,
বাণিজ্যে তার ভাঁড়ার ভরা,
নয় ত তারা পর-প্রয়াসী ॥
নির্ভাবনায় টাকা আনো,

চাকরী বড় জবর জানো,
ফুলের মালা ব'লে গলায়,
প'রেছ গোলামী ফাঁসী ॥
পুরুষসিংহ—যে উদ্যোগী,
নরত্বের সে উপযোগী,
চতুর্ব্বর্গ ফল সে ভোগী,
মা লক্ষ্মী যার গৃহবাসী ॥
সোণার আমি যাদুমণি,
ক্ষেত্র আমার সোণার খনি,
ভ্রাতৃ-প্রেমের বিমল জলে
ধোওরে মায়ের মলারাশি।

—— ০ ——

অসার সংসার।

লেখক—শ্রীঅমর নাথ বসু।

সংসার আবর্ত্তে পড়ি বুঝি প্রাণ যায়।
কেমনে বাঁচিব প্রভো! কি আছে উপায় ॥
কিছুই জানিনা আমি, এসেছি ভুবনে।
অনিত্য সংসার মাঝে ভ্রমিব কেমনে ॥
সংসার মায়ায়পূর্ণ কেবলি অসার।
একমাত্র তুমি প্রভু,—তুমিইগো সার ॥
হৃদয়ের সাধ সব দিছি বিসর্জ্জন।
ঝরিতে গো শুধু বাকি নশ্বর জীবন ॥
নাহিক হৃদয়ে মোর উচ্চ উচ্চ আশা,
যৌবনের সাথে ওগো নিভেছে পিয়াসা ;
একে একে সবে মিলি গিয়াছে চলিয়া,
হৃদয়ের প্রতিতন্ত্রী নীরবে দলিয়া।
রক্ষাকর দীনবন্ধু, করুণা নিদান।
পাই যেন অন্তিমেতে তব পদে স্থান ॥

—— ০ ——

ছবি।

লেখক—শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র কুণ্ডু বি, এ,।

কোন্ আদি বসন্তের পূজা উপচারে,
সাজায়েছ তনুখানি কত বর্ষ ধরে,
কে তোমার, মৌন বধূ, নির্ম্মাল্যের ডালি
অমর করিয়া দেছে সুধা অশ্রু ঢালি।
দূরে—বহু দূরদেশে বিদায়ের রেখা,
অস্তমান্ রবি আর ধরণীর দেখা,
রেখে গেছে, চিরদিন উদার অম্বরে
ঝলিছে সুবর্ণ আলো শিকর নিকরে।
কোন স্বপ্নলোক হ'তে কার সুখ-স্মৃতি
জাগায় হৃদয় মাঝে প্রীতি-ময়ি গীতি;
তাইবুঝি মৃদু হাসি অধর-যশনে
জেগে আছে চিরদিন আপনারি মনে।
লো সুন্দরি! কোন্ খানে ছিলো গো বালিকা
অনন্ত বিশ্বের পারে তব মুকুলিকা,—
কোন্ মধুনিশি শেষে ফুটেছিল কোথা,
যখন পশিলে বিশ্বে পূর্ণ প্রস্ফুটিতা।

—০—

সান্ত্বনা।

লেখিকা—শ্রীমতী চারুশীলা দাসী।

১

হের আঁখি! এই বিশ্ব চরাচর,
আপনার তরে কেঁদনা আর।
কত নর নারী বিষাদে মগন,—
দেখ সহে কত যাতনা ভার।

২

মুছাতে তাদের পার যদি আঁখি
সেই কাজ কর আপনা ভুলে।
আপনার দুঃখে হ'য়োনা কাতর
ঢাল সবে প্রীতি পরাণ খুলে।

৩

তাপিতের তরে ঢাল স্নেহ বারি
শোকীরে তোষহ সান্ত্বনা বোলে।
অনাথ আতুরে করিওনা ঘৃণা
মা-হ'য়ে সবার কররে কোলে।

৪

তাহাদের দুঃখ হেরিলে নয়নে
নিজ দুঃখ তোর ভুলিয়ে যাবি
তাহাদের কার্য্যে সঁপিলে জীবন
অপার আনন্দ হৃদয়ে পাবি।

৫

সুধু নিজ দুঃখে গুমরি মরিলে
"রমণী" নামেতে কলঙ্ক হবে।
জননীর জাতি স্বার্থপর হ'লে
নারীর মহত্ত্ব রবে কি তবে?

৬

তাই বলি মন! কাঁদিওনা আর
বিশ্ব-হিত ব্রতে সঁপরে প্রাণ!
গাহি প্রেম-গীতি মাতাও জগতে
জাগুক মানব শুনি সে তান।

৭

ভুলি দুঃখ জ্বালা ভাস প্রেম স্রোতে
ঢাল ভালবাসা জগতময়।
হেরি পর সুখ শান্ত হবে প্রাণ
রবেনা বিষাদ রবেনা ভয়।

—:—

সমালোচনা।

কর্ম্মফল ও জন্মান্তর রহস্য।—শ্রীযুক্ত আশুতোষ দেব এম, এ, প্রণীত মূল্য আট আনা। মানুষের মৃত্যুর পর পুরুষ জন্ম হয় কি না? সেই জন্মে পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মফল হয় কি না? পৃথিবীর বহুলোকের মধ্যে এই বিষয়ে বিস্তর মতভেদ আছে। হিন্দুশাস্ত্রে কর্ম্মফলভোগ ও জন্মান্তরের বিচার প্রসূত প্রচুর প্রমাণ দৃষ্ট হয়, বাবু আশুতোষ বহুযত্নে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য গ্রন্থাবলী হইতে জন্মান্তরবাদ ও কর্ম্মবাদের প্রচুর উদাহরণ সংগ্রহ করিয়া আত্ম অভিমতের সহিত এই পুস্তক খানি প্রণয়ন করিয়াছেন। সংসার যে ভাবে চলিতেছে, তাহাতে হিন্দু বিশ্বাসে জন্ম কর্ম্মের ফলাফলে বিশ্বাস করা ভিন্ন ঐ উভয় তত্ত্বের মীমাংসার—উপায়ন্তর নাই, বিশেষতঃ পুরাণাদি শাস্ত্রের স্থানে স্থানে কতকগুলি নর নারীর দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যায়, তাঁহারা জাতিস্মর; পূর্ব্বজন্মে কে কি ছিলেন, কে কি করিয়া ছিলেন, জাতি স্মরেরা তাহা ঠিক ঠিক স্মরণ রাখিয়া বলিতে পারিতেন, বেশী কথা কি ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গীতা যচনে অর্জ্জুনকে বহুজন্মের তত্ত্ব বুঝাইয়া ছিলেন, ইহা কল্পনার বিষয় নহে, এ কথা বলাই বাহুল্য কল্পনাবলেও জাতিস্মরত্ব উদিত হইয়াছিল। বাণভট্ট বিরচিত কাদম্বরি উপন্যাসে একটি শুক পক্ষীর জাতি স্মরত্বের উল্লেখ আছে। বাবু আশুতোষ দেব এই প্রস্তাবিত পুস্তকের যে রহস্য ভেদ করিয়াছেন, তাহা অতি প্রীতিকর ও বিশ্বাস যোগ্য, সত্যবটে, মরনান্তে মনুষ্যের কি হয়, নির্ব্বিরোধে নিসন্দেহে তাহা নিরুপণ করা দুরুহ কিন্তু জগতের গতি দেখিয়া জন্মান্তরে বিশ্বাস রাখিতেই হয়, সন্দেহ স্থলে কবিবর ৺ঈশ্বর চন্দ্র গুপ্ত বলিয়া গিয়াছে "মরে যদি ফিরে আসি, মনে যদি রয়, তবেত বলিতে পারি মরিলে কি হয়॥" এইছুটি পদ জাতিস্মর দিগের বাক্য স্বজীব করিয়া তুলিয়া দিতেছে, যখন জাতিস্মর ছিল, তখন অবশ্যই পূর্ব্ব জন্ম আছে, ইহা স্বীকার করিতে হইবে। আশু বাবুর পুস্তক খানি মনযোগ পূর্ব্বক পাঠের উপযুক্ত যাঁহারা জন্মান্তরে বিশ্বাস করেন, এবং যাঁহারা করেন না আমরা তাঁহাদের সকলকেই এই সুন্দর পণ্ডিত্যপূর্ণ উপাদেয় পুস্তক খানি এক একবার পাঠ করিতে অনুরোধ করি।

ভারত ভ্রমন ও তীর্থ দর্শন।—কলিকাতার রায় বাগান লেনের সান্যাল কোম্পানি এই নাম দিয়া একখানি ক্ষুদ্রপুস্তক প্রচার করিয়াছেন। ভারতের প্রধান প্রধান প্রাচীন নগরাদি ও সমস্ত তীর্থ স্থানের বিবরণ ইহাতে সংগৃহিত হইয়াছে, প্রত্যেক স্থানের প্রাচীন কীর্ত্তি কলাপ ও আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য শিল্প চাতুর্য্য যথা সম্ভম সংক্ষেপে এই পুস্তিকাগর্ব্ভে সন্নিবেশিত, এতৎ পাঠে পাঠক মণ্ডলীর বিশেষ উপকার দর্শিবে সান্যাল কোম্পানি এই পুস্তক প্রচারের নিমিত্ত আমাদের ধন্যবাদের পাত্র। পুস্তিকাখানি পকেটে রাখা চলে মূল্য আট আনা মাত্র।

—o—

REGISTERED No. C. 284.

১৪শ বর্ষ। ১৩১২ সাল। মাঘ। [৭ম সংখ্যা।

হিন্দুধর্ম্ম ও সমাজের মুখপত্র।

জন্মভূমি

(সচিত্র মাসিক-পত্রিকা ও সমালোচনী)।

	বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
১।	জনপ্রবাদ ও ইতিহাস	শ্রীযুক্ত যতীশচন্দ্র বসু এম, এ,	২২৯
২।	আয়ুর্ব্বেদ সমালোচনা	শ্রীযুক্ত তারানাথ চক্রবর্ত্তী	২৩৫
৩।	গ্রহের ফের (গল্প)	শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য	২৩৭
৪।	আধুনিক বাংলাসাহিত্য	শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্র কুমার রায়	২৪৭
৫।	আয়ুর্ব্বেদ	কবিঃ শ্রীযুক্ত গোবিন্দপ্রসাদ রায় কবিরত্ন	২৫০
৬।	বঙ্গভাষা (পদ্য)	শ্রীমতী নগেন্দ্রবালা সরস্বতী	২৫৪
৭।	সরস্বতী স্তোত্রম	কবিভূষণ শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র দে কাব্যরত্ন উদ্ভটসাগর বি, এ,	২৫৫
৮।	গর্ভিণী বা প্রসূতির খাদ্য,	শ্রীযুক্ত বিপ্রদাস মুখোপাধ্যায়	২৫৬
৯।	সধবা (পদ্য)	শ্রীযুক্ত কুমুদরঞ্জন মল্লিক বি, এ,	২৬০
১০।	সাহিত্যালোচনা	... ...	২৬২
১১।	সরস্বতী বন্দনা	শ্রীযুক্ত ললিতমোহন পাল	২৬৬
১২।	সমালোচনা	... ...	২৬৮

লেখকগণের মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন।

জন্মভূমি-কার্য্যালয়।
শ্রীনরেন্দ্রনাথ দত্ত দ্বারা প্রকাশিত।
৩৯ নং মাণিক বসুর ঘাট ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

বার্ষিক মূল্য ডাঃ.মাঃ সমেত ১॥০ দেড় টাকা। — প্রতি সংখ্যার নগদ মূল্য ৵১০ পয়সা।

শ্রীল শ্রীমন্মহারাজাধিরাজ কাশ্মীরাধিপতি তথা শ্রীল শ্রীযুক্ত মহারাজাধিরাজ
বর্দ্ধমান-প্রদেশাধিপতি বাহাদুরের অনুমোদিত ও অনুজ্ঞাত সুপ্রসিদ্ধ
কবিরাজ শ্রীযুক্ত বিনোদলাল সেন মহাশয়ের

আদি-আয়ুর্ব্বেদ ঔষধালয়।

১১৬.নং লোয়ার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।

কুন্তলবৃষ্য তৈল জগতে অমূল্য ও অতুলনীয়—মস্তিষ্ক স্নিগ্ধকর ও স্মৃতিশক্তি বর্দ্ধক—কেশকলাপের কান্তিপ্রদ—খালিত্য ও পালিত্যনাশে অদ্বিতীয়। কেশের কমনীয়তা কান্তি বৃদ্ধি করিতে, চিত্তের-নিত্যপ্রফুল্লতা অটুট রাখিতে কুন্তলবৃষ্যের তুলনা নাই ইহা অনুপম্ আদি ও অকৃত্রিম্ স্নিগ্ধগুণে কুন্তলবৃষ্যের সমতুল কোন তৈলই এ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই।

“বর্ত্তমান ভারতের প্রধান ধর্ম্মসংস্কারক, শান্তি-সুখ-সন্তৃপ্ত-বিলাসভোগ বিমুক্ত আধ্যাত্মিক উৎকর্ষের সমুচ্চ সোপানে সমাসীন—পূজ্যপাদ শ্রীমহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর বলিয়াছেন—যে, কুন্তলবৃষ্য তৈল এতদিন আমাকে রক্ষা করিল, আজ তাহাকে পরিত্যাগ করিতে পারি না।”

কুন্তলবৃষ্য—সাহিত্যসেবিগণের মহোপকারক, কারণ ইহাতে মেধা ও স্মৃতি বৃদ্ধি হয়, চিন্তাশীলতা ও ভাবুকতা নবীভূত ও স্ফুরিত হয়।

এক শিশির মুল্য ১৲ টাকা   প্যাকিং ও ডাকমাশুলাদি পাঁচ আনা।

উপহার—কুন্তলবৃষ্যের প্রত্যেক গ্রাহক তৈলের সঙ্গে একখানি করিয়া সুন্দর চিত্র উপহার পাইবেন।

সতর্কীকরণ।—দুষ্ট লোকেরা বড়ই জাল করিতেছে; গ্রাহকগণ সাবধান; আমাদের ঔষধালয় ভিন্ন কোথাও “কুন্তলবৃষ্য” কিনিবেন না, কিনিলেই প্রতারিত হইবেন।

কবিরাজ শ্রীআশুতোষ সেন চিকিৎসক।

“জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী”

(সচিত্র মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী।)

১৪শ বর্ষ। | মাঘ, ১৩১২ সাল। | ৭ম সংখ্যা।

“জনপ্রবাদ ও ইতিহাস”

লেখক—শ্রীযতীশচন্দ্র বসু এম, এ

জগতের জাতি সমূহের পৌরাণিক ইতিবৃত্ত দুর্ভেদ্য অন্ধকারে আচ্ছন্ন। ইউ-রোপ-ভূভাগের অতীত ঘটনাবলী যদিও জ্ঞানের আলোক-কিরণে ঈষৎ উজ্জ্বল হইয়াছে, এসিয়ার পুরাতত্ত্ব আজও অতীতের গাঢ় অন্ধকারে নিমগ্ন। সভ্যতার উদ্বেলিত জ্যোতিঃ এখনও এসিয়া মহাপ্রদেশকে উদ্ভাসিত করে নাই, শিক্ষার মাহাত্ম্য এখনও এসিয়াবাসীর অন্তরে জাগরিত হয় নাই; সুতরাং ইতিহাসের সৌন্দর্য্য ও উপকারিতা তাহাদের নিকট অপরিচিত, অজ্ঞেয় ও জটিল। ভারতবর্ষের উপকূলে

সভ্যতা-স্রোত আসিয়াছিল বটে, ভারতবর্ষে উচ্চ শিক্ষা প্রচলিত হইয়াছিল বটে, কিন্তু ভারতবর্ষের মনীষী পণ্ডিতগণ সাহিত্য দর্শনশাস্ত্রের গভীর গবেষণায় এতাদৃশ বিব্রত ছিলেন যে অতীত তত্ত্বের অন্বেষণের অবসর পর্য্যন্ত তাঁহারা পান নাই। সুতরাং অন্যান্য বিদ্যার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ইতিহাস উন্নতি লাভ করিতে পারে নাই। স্বদেশের তদানীন্তন সামাজিক, রাজনৈতিক, অবস্থা, তৎকালীন কৃতি ব্যক্তিগণের জীবনী আমাদিগের নিকট অস্পষ্ট ও দুর্ব্বোধ। ইহার বিষময় পরিণাম ফলিল স্বদেশকে আমরা চিনিতে পারিলাম না। হায়! এই কারণেই ভারত কল্পনার জন্মভূমি বলিয়া খ্যাত—এই হেতু হতভাগ্যদেশের ঐতিহাসিক তত্ত্ব কল্পনা-প্রসূত জনশ্রুতির সহিত এবম্বিধ সংমিশ্রিত হইয়াছে যে ইহাদের বিশ্লেষণ অতি দুরুহ। কিম্বদন্তী, প্রচলিত জনরবই ইতিহাস স্থান অধিকার করিয়াছে। এই কারণেই সভ্যতাদৃপ্ত পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের নিকট আমরা এইরূপ হেয় অপদার্থ। অযোধ্যাপতি শ্রীরামচন্দ্র একদল বানরসৈন্য লইয়া রাক্ষসরাজ রাবণকে বধ করেন—এইরূপ জনপ্রবাদ এমনি অসম্ভব এমনি অমূলক, যে ইহা বাতুলের প্রলাপোক্তি বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে।

কিন্তু জনপ্রবাদ গুলিকে একেবারেই হেয় ও অপদার্থ জ্ঞানে উড়াইয়া দেওয়া চলে না, ইহাদিগকে একেবারেই অগ্রাহ্যকরা যুক্তি সঙ্গত নহে। যে সকল অতীত ঘটনাবলী কালের করাল-স্পর্শে ধরণীতল হইতে লুপ্ত হইত, অবিশ্বাস্য তুচ্ছ জন-শ্রুতিই তাহাদিগকে সজীব রাখিয়াছে এবং সময়ে সময়ে অস্পষ্ট জনশ্রুতির অভ্যন্তরে যে সমুদয় গভীর ঐতিহাসিক তত্ত্ব নিহিত থাকে, তাহা আলোচনা করিলে মুগ্ধ ও বিস্মিত হইতে হয়।

অমূলক জনরব ও সত্য ঐতিহাসিক ঘটনা—এই উভয়ের মধ্যে কত ঘনিষ্ঠ নিকট সম্পর্ক থাকিতে পারে তাহা নিম্নলিখিত উদাহরণের দ্বারা সম্যক্ উপলব্ধি হইবে।

ভারতবর্ষের দক্ষিণে বীচিবিক্ষোভাকুল নীলাম্বুবেষ্টিত এক ক্ষুদ্র দ্বীপ আছে। এই পুরাণ প্রসিদ্ধ পুরাতন দ্বীপের বিবরণ কাহার অবিদিত নাই। বঙ্গবাসী মাত্রেই জানেন ইহাই আমাদের বাল্মীকি-রচিত রামায়ণোল্লিখিত লঙ্কা রাক্ষসদিগের আবাস-স্থান। বর্ত্তমান ইহাকে সিংহলদ্বীপ কহে। এই সিংহলবাসী ব্রাহ্মণ পুরোহিতদিগের মধ্যে এইরূপ জন-প্রবাদ আছে যে খৃষ্টের ৫৩১ বৎসর পূর্ব্বে দম-দ্বীপের লালাধিপতি সিংহবাহুর জ্যেষ্ঠপুত্র অজয়রাজ সপ্তদশ রাক্ষসসৈন্যসহ লঙ্কা বা লাংদ্বীপে অবতারণ করেন। এক দেবতুল্য অশেষ গুণশালী বুদ্ধ দ্বারা এই বিপুল

রাক্ষসবাহিনী পরিচালিত হয় এবং তিনি তদ্প্রদেশবাসী অসভ্যপ্রাণীদিগকে বিতাড়িত করিয়া অজয়রাজের রাজত্ব স্থাপন করেন। কিছু কাল পরে "তাম্রপরণী" নামক ক্ষুদ্র এক নগরী তথায় নির্ম্মিত হইল। অজয় রাজের রাজত্ব সময়ে লঙ্কাদ্বীপ প্রভূত সমৃদ্ধশালী ও বহুজনসমাকীর্ণ প্রদেশে পরিণত হইয়াছিল এবং বহুকাল অজয় রাজ সুখ শান্তিতে রাজত্ব করেন। অজয়রাজের বংশধরগণ পুরুষানুক্রমে সিংহলের সিংহাসনে উপবিষ্ট হন। কথিত আছে ১৭৯ নৃপতি এই ক্ষুদ্র দ্বীপ শাসন করেন। দিনে দিনে লঙ্কার শ্রীসম্পদ বর্দ্ধিত হইতেছিল—প্রজাবৃন্দ পরম সুখ শান্তিতে বাস করিতেছিল। অবশেষে দুর্দ্দান্তপ্রতাপ রাবণের রাজত্বকালে শ্রীরামচন্দ্র এই স্বর্ণ লঙ্কা বিধ্বস্ত করেন। ব্রাহ্মণগণ বলেন লালাপ্রদেশ ভারতবর্ষের পূর্ব্বে সায়ামদেশের অন্তর্গত জনপদ সমূহে এবং সিংহলবাসীগণ সায়ামপ্রদেশবাসীরই বংশোদ্ভব। ইহাই জনপ্রবাদ। এক্ষণে আমরা ঐতিহাসিক মূলের অনুসন্ধান করিব।

পর্ত্তুগীজ রাজার মুহুরী ডিয়াগোডে লাউটা (Diego de Louta) নামক একজন বিখ্যাত ঐতিহাসিক বহু উদ্যমে সিংহলের ইতিবৃত্ত সঙ্কলন করেন। তিনি বহুকাল সিংহলে বাস করিয়াছিলেন। এবং সিংহলবাসী কর্ত্তৃক লিখিত ইতিহাস সমূহ হইতে তিনি তাহার উপকরণ সংগ্রহ করেন, তিনি বলেন যীশুখৃষ্টের ৫০০ বৎসর পূর্ব্বে ভারতবর্ষের পূর্ব্ব-প্রান্তে টেনাসেরিম (Tenasserim) প্রদেশে "সায়াম" এই প্রদেশের অন্তর্গত, পুরাকালে ইহা গঙ্গোপকূল হইতে কোচিন চায়না (Cochein china) এবং দক্ষিণের পর্ব্বত-শ্রেণী হইতে উত্তর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল আয়াতো নামক নৃপতি রাজত্ব করিতেন। আয়াতোর বিজয়-রাজ নামে এক পুত্র ছিল। যৌবনের প্রারম্ভেই দুর্দ্দমনীয় প্রবৃত্তি-কুলের উত্তেজনায় সে পাপের পঙ্কিল পথে পদক্ষেপ করে। ক্রমে ক্রমে তাহার পাপস্পৃহা এতাদৃশ বলবতী হইল যে সুন্দরী যুবতী রমণী দর্শনেই, সে লালসা পূরণার্থে উন্মত্তপ্রায় হইয়া উঠিত। রাজ্যের নিরীহ প্রজাবৃন্দ তাহাদিগের পত্নী কন্যা রক্ষণে বিব্রত হইল। রাজপুত্রের অত্যাচারের রাজ্যময় হাহাকার উঠিল। নৃপতি পুত্রের এই উৎপীড়ন ও কলঙ্ক কাহিনী শ্রবণে অতিরুষ্ট হইয়া পুত্রকে অত্যন্ত ভৎসনা করিলেন। কিন্তু দুঃশীল রাজপুত্রের উচ্ছৃঙ্খলতা এতদূর বর্দ্ধিত হইয়াছিল যে তাহার পিতার ভৎসনা অবহেলা করিয়া বিজয়রাজ পুনরায় তদ্রূপ জঘন্য আমোদে প্রবৃত্ত হইল। অন্যোন্যপায় হইয়া রাজা তাহার পুত্রকে নির্ব্বাসন পাঠাইতে মনঃস্থ করিলেন।

প্রিয়তম পুত্রকে বিদায় দিতে তাহার মন কাতর হইল। কিন্তু হায়! অচি-

রেই প্রপীড়িত প্রজার করুণ ক্রন্দনে তাহার হৃদয় ব্যথিত হইল। স্নেহমমতা প্রভৃতি দুর্ব্বলতা পরিত্যাগ করিয়া তিনি কতকগুলি জাহাজ খাদ্য ও অন্যান্যদ্রব্য সামগ্রী দ্বারা সুসজ্জিত করিবার আজ্ঞা প্রচার করিলেন।

রাজ্যমধ্যে তৎকালে একটি অভিনব প্রথা প্রচলিত ছিল। জেষ্ঠ্য রাজপুত্রের জন্মদিনে রাজত্বমধ্যে প্রজাবর্গের যে সমস্ত পুত্রসন্তান ভূমিষ্ট হইত, তাহারা সকলেই সপ্তমবর্ষ অতিক্রম করিলে রাজদরবারে নীত হইত। সেই সকল বালকেরা রাজ-পুত্রের সহচর বলিয়া পরিগণিত হইত। তাহারা সকলে একত্রে অধ্যয়ন করিত, একত্রে ক্রীড়া করিত তাহারা রাজপুত্রকে কদাপি পরিত্যাগ করিত না। বিজ-রাজের সহচরেরা রাজপুত্রের কু-আদর্শে আকৃষ্ট হইয়াছিল। সকলে রাজপুত্রের ন্যায় ব্যসনে ও উচ্ছৃঙ্খলতায় জীবন অতিবাহিত করিত। হায়! দুর্ব্বল মনুষ্যের মন পাপপথে যত শীঘ্র আকৃষ্ট হয়, ধর্ম্মপথে তত শীঘ্র হয় না।

যাহা হউক জাহাজ সজ্জিত হইলে, নির্দ্দিষ্টদিবসে নৃপতি বিজরাজ ও তাহার সহচরগণকে নির্ব্বাসনে প্রেরণ করিলেন। তন্মধ্যে কেহ প্রত্যাবর্ত্তন করিলে প্রাণ-দণ্ডে দণ্ডিত হইতে হইবে এই আজ্ঞা ঘোষণা করিলেন।

বায়ুচালিত হইয়া নৌ-যান সমূহ ধীরে ধীরে অগ্রসর হইল। এতদিনে রাজ-পুত্রের চৈতন্য হইল। তাহার জঘন্য লালসা এতদিনে শান্ত হইল-পাপের শাস্তি হাতে হাতে ফলিল। রাজপুত্র কি করিবে—কোথায় যাইবে কিছুরই স্থিরতা নাই। তরঙ্গালোড়িত সমুদ্রতলে প্রতি মূহুর্ত্তেই তাহার পঙ্কিল জীবনের অবসান হইতে পারে। অনুতাপ, আত্মগ্লানি, বিষাদ, নিরাশা, তাহার হৃদয় বিক্ষিপ্ত করিতেছিল।

উপরে নীলাকাশ—নিম্নে অনন্তপ্রসারী, উর্ম্মিমালাস্পন্দিত নীল বারি-রাশি। ঈশ্বরের এই অপরূপ সৃষ্টি, স্বভাবের এই অলৌকিক শোভাদর্শনে তাহার কলুষিত হৃদয়ও পুলকিত হইল। অনুতাপে তাহার অন্তঃকরণ কাতর হইলে নীরব শুদ্ধতা তাহাকে সান্ত্বনা প্রদান করিত—মন্দ মন্দ সাগরানিল তাহার নিকট আশ্বাসবাণি বহন করিয়া আনিত। বিংশদিবস গত হইলে, তরুচ্ছায়াসমন্বিত ক্ষুদ্র একটি দ্বীপ তাহাদিগের নয়ন-গোচর হইল। বহুদিন সমুদ্রে অবস্থানের পর অট্টালিকা পরি-শোভিত, পর্ব্বতশ্রেণীসুশোভিত শুষ্কভূমি দর্শনে তাহার হৃদয় আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। জাহাজগুলি বন্দরের ভিতর (ট্রিনকোমালী ও জাফনাপাটামের মধ্যে প্রিরেটভিক (Prestevic) নামক বর্ত্তমান যে বন্দর আছে—ইহা সেই বন্দরে প্রবেশ করিল। রাজপুত্র ও তাহার সহচরগণ নির্ব্বিঘ্নে সেই দ্বীপে অবতরণ করিল।

এই ক্ষুদ্র দ্বীপের প্রাকৃতিক শোভা দর্শনে তাহারা মুগ্ধ হইল। প্রকৃতিজননী তাঁহার অনন্তশোভাভাণ্ডার নিঃশেষ করিয়া যেন এই রমণীয় দ্বীপটিকে সজ্জিত করিয়াছেন। চতুর্দ্দিকে পত্রপল্লবসুশোভিত পুষ্পভারাবনত বৃক্ষদল অদূরে পর্ব্বত-মালা নীলজলদের ন্যায় দৃষ্টিগোচর হইতেছে। সচ্ছসলিলা স্রোতস্বিনী ধীরে ধীরে সাগরাভিমুখে ধাবিত হইতেছে। সমুদ্রের বজ্রনির্ঘোষ রবে দিঙ্‌মণ্ডল মুখরিত। তাহারা যেন অনন্তশোভাশালিনী স্বপ্নপুরিতে প্রবেশ করিল। পক্ষীদিগের কল-কূজন সুগন্ধিপুষ্পের মনোহর গন্ধ তাহাদিগের অন্তঃকরণ পুলকিত করিল। খাদ্য-দ্রব্যের অপ্রতুল নাই। বৃক্ষে বৃক্ষে সুমিষ্ট আম্র, কমলালেবু প্রভৃতি মনোলোভা ফলরাজি ক্ষুধাকর্ষণ করিতেছে; সমুদ্র নিকটবর্ত্তী, মৎস্যেরও অভাব নাই। জলবায়ু অতীব স্বাস্থ্যকর অধিক শীত নাই, উত্তাপও নাই—চির বসন্ত রাজত্ব করি-তেছে। এইরূপ অপরাপর প্রদেশে পদার্পন করিয়া তাহারা আমোদে মাতোয়ারা হইল। ভূমির উর্ব্বরতা এবং স্বভাবের সৌন্দর্য্য অবলোকন করিয়া তাহারা এই দ্বীপটিকে লঙ্কানামে অবিহিত করিল। লঙ্কা অর্থে পৃথিবীর স্বর্গরাজ্য। পুর্ব্বে এই দ্বীপের কোন নাম ছিল না।

মানায়ারের (Manaar) পরপার্শ্বে মানটোটে (mantote) নামক এক মনোরম নগরী নির্ম্মিত হইল। কয়েক মাস গত হইলে মুক্তা প্রবালাদি সংগ্রহ করিতে কতকগুলি জাহাজ তদুপকূলে উপস্থিত হইয়াছে দেখিয়া বিজরাজ ও তাহার সহচরগণ কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া নবাগত বণিকদিগকে নানাবিধ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিল। প্রত্যুত্তরে জানিলেন তাহারা কোটরাজার প্রজাবৃন্দ। দ্বীপের অপরপার্শ্বস্থভূভাগে (অর্থাৎ ভারত বর্ষের দক্ষিণ সীমান্তে) কোটা রাজত্ব অবস্থিত ছিল। লঙ্কাদীপ হইতে ইহা একদিনের পথ মাত্র।

রাজপুত্র এই সুন্দর সমুদ্রবেষ্টিত দ্বীপে রাজত্ব সংস্থাপন করিতে মনঃস্থ করিয়াছিল। কিন্তু রাজত্ব কি প্রকারে স্থাপন করিবে, দেশ ত প্রায় জনশূন্য ? বিশেষতঃ স্ত্রীলোকা-ভাবে তাহাদিগের সন্তানসন্ততি হইবারও সম্ভাবনা নাই। এই সময় বণিক প্রমু-খাৎ নিকটবর্ত্তী রাজ্যের বার্ত্তা শ্রুত হইয়া দুই রাজ্যের সৌহার্দ্দস্থাপনার্থে বিজরাজ তথায় দূত প্রেরণ করিল। রাজপুত্র যে রাজ তনয়ার পাণিগ্রহনাভিলাষী, কোটা-রাজের নিকট এ সংবাদও অপ্রকাশিত রহিল না। বিজরাজের পিতার প্রবলপরা-ক্রম, অতুল ঐশ্বর্য্য লোকদুর্ল্লভ যশঃ কোটারাজের নিকট অবিদিত ছিল না সুতরাং তিনি কালবিলম্ব না করিয়া উদ্বিগ্নচিত্তে উপঢৌকন সহ রাজপুত্রের নিকট তাহার অভিমত প্রকাশপূর্ব্বক দূত প্রেরণ করিলেন।

চতুর্দ্দিকে আনন্দোৎসব পড়িয়া গেল। ঘরে ঘরে শঙ্খ, ঘণ্টা, প্রভৃতি মঙ্গল বাদ্য বাজিতে লাগিল—দীপালোকে ধরণীতলে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। মহাসমারোহে উদ্বাহ-ক্রিয়া সম্পন্ন হইল। রাজপুত্রের সহচরদল বিবাহপ্রার্থী জানিয়া কোটারাজ রাজকুমারীর সহিত বহু সুন্দরী যুবতী উপঢৌকন দিলেন। পরিণিতা পত্নী পাইয়া সকলে হর্ষোৎফুল্ল হৃদয়ে উল্লাসমনে দিনপাত করিতে লাগিল।

দুইরাজ্যের মধ্যে এইরূপ সম্প্রীতি স্থাপিত হইলে, কোটারাজের প্রজাবৃন্দ লঙ্কায় আসিয়া বাস করিতে লাগিল। কৃষকগণ লাঙ্গল, বীজ প্রভৃতি আবশ্যকীয় দ্রব্য-সামগ্রী গ্রহণপূর্ব্বক, শিল্পীকারিগণ প্রয়োজনীয় যন্ত্রাদি সঙ্গে লইয়া লঙ্কায় উপনিবেশ সংস্থাপন করিল। অচিরেই লঙ্কা অতি সমৃদ্ধিশালী জনপদে পরিণত হইল—উর্ব্বরা-ভূমি সকল কর্ষিত হইতে লাগিল শিল্পীর নিপুনকৌশলে লঙ্কা পরিশোভিত হইল।

কালক্রমে বিজরাজের বংশধরগণ কোটারাজ্যের অধিশ্বর হইয়াছিল এবং বীর পরাক্রমে উভয় রাজত্ব শাসন করিত। অবশেষে কয়েক শতাব্দির পর উত্তরাধিকারী অভাবে বিজবংশ লুপ্ত হয়। কোন কোন ঐতিহাসিক বলেন এই সময় উত্তর ভারতের নৃপতিগন অত্যন্ত পরাক্রান্ত ও দুর্দ্ধর্ষ হইয়া উঠিয়াছিল এবং দক্ষিণ ভারতবর্ষ এমন কি লঙ্কা ও জয় করেন। এই সময়েই বিজবংশ ধ্বংস হয়।

ইহাই লঙ্কা-দ্বীপের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত। ঐতিহাসিক সত্যে ও জনপ্রবাদে অল্প-বিস্তর প্রভেদ আছে বটে কিন্তু বৈলক্ষণ্য অপেক্ষা সাদৃশ্য নিকটতর। উভয়ই একই ভিত্তির উপর সংস্থাপিত। কিম্বদন্তী কল্পনার ঐন্দ্রজালিক তুলিকায় সামান্য ঘটনা অতিরঞ্জিত করে—ইতিহাস কঠোর হস্তে অতিবাদ, অতিশয়োক্তি উচ্ছেদ করিয়া কেবলমাত্র যাহা সত্য, তাহাই উল্লেখ করে ইহাই প্রভেদ জনশ্রুতি ও ইতি-হাসের মধ্যে ইহাই ব্যবধান। সুতরাং ইহদ্বারা সম্যক উপলব্ধি হয়, যে জনশ্রুতি, জনপ্রবাদ প্রভৃতি প্রচলিত কিম্বদন্তী আমাদিগের নিকট হেয়, অশ্রদ্ধেয় নহে-ইহা বহুমূল্য আমাদিগের অতি আদরের জিনিষ। আমরা প্রাদেশিক জনপ্রবাদ সমূহের তত্ত্বানুসন্ধানে রত হইলে ইতিহাসের অনেক নূতন সত্য-আবিষ্কার করিতে পারি—অতীতের অনেক নূতন ঘটনাবলী আমাদিগের নিকট উদ্ঘাটিত হয়। কিম্বদন্তীর সহায়তায় ভারতবর্ষের তমসাচ্ছন্ন ইতিহাস উজ্জ্বল হইয়া উঠিতে পারে।

———

আয়ুর্ব্বেদ সমালোচনা।

লেখক—শ্রীতারানাথ চক্রবর্ত্তী।

অহিফেন। আফুক ও অহিফেন এই দুইটি অহিফেনের আভিধানিক নাম। বাঙ্গালার সর্ব্বত্রই ইহাকে আফিং বলে। আসামে আফিং ও কানি বলে। উড়িষ্যাতে অফিং বলে। হিন্দীতে অফিম্ বলে। মহারাষ্ট্রে অফুকড়ী বলে ও অপু বলে। গুজরাটে অফীন বলে। কর্ণাটে অফেন বলে। ফারসীতে অফয়ুন তির্য্যাক বলে। আরবীতে লবনুন খসখাস বলে। মালবে আফন বলে। ধতলঙ্গে নাল্লামন্দু বলে। ডাক্তারীতে opiumpoppy (ওপিয়ম্ পপি) বলে।

পোস্তফলের ক্ষীরই ঘন ভাবাপন্ন হইলে আফিং বলে। পূর্ব্বে ইহার বৃক্ষ আসাম বাসীরা সকলেই রোপণ করিত। আসামে ইহার বৃক্ষকে আফুগাছ বলে। ইহার রোপণ প্রণালী প্রায় তামাকের মত। বীজ গুলিও প্রায় তদ্রূপই কিন্তু ধব বর্ণ। এখন বাণিজ্যের প্রবল স্রোতে ইহাকে আসাম হইতে অপ-সারিত করিয়াছে। এখন লাহোরে ইহার আবাদ হয়। ইহার বীজগুলি তরকারীরূপে ব্যবহৃত হয়।

ইহা শোষণকারী, ধারক, কফ নাশক, বায়ু ও পিত্ত বর্দ্ধক। উদ্বেগ নিবারক, নিদ্রা কারক, উন্মাদকারক, স্বেদজনক বেদনা নাশক, মূত্রাতীসার, কাস, শ্বাস, ও অতিসার নাশক রক্তস্রাব রোধক। মাত্রা সিকি রতি। ৪০ বৎসরের উর্দ্ধে প্রতিদিন বিধিমত আফিং সেবন করিলে শরীর সবল হয়। ৪০ বৎসরের নিম্ন বয়স্কদিগের পক্ষে ইহা অতিশয় অহিত কারক। ইহার সহিত দুগ্ধ পান না করিলে অনিষ্ট ঘটে। অতিসার রোগে ইহা একটি আশ্চর্য্য ঔষধ। আসাম প্রদেশ কলিকাতা হইতে যে সকল ইংরাজ সেনা গিয়াছিল, দৈবক্রমে তাহারা অনেকেই কলেরায় পীড়িত হয় এবং আফিং খাইয়াই পরিত্রাণ পায়। তখন সিপাহীরা কলেরা রোগগ্রস্ত আসাম বাসী অনেক লোককেও এই আফিংএর দ্বারা রক্ষা করে। তাহারাই আফিংএরবীজ আসাম বাসীকে দেয়।

অশ্বগন্ধা। বরাহকর্ণী, বরদা, বলদা, কুষ্ঠগন্ধিনী, এবং গন্ধবাচক শব্দের পূর্ব্ববর্ত্তী ঘোটকবাচক সমস্ত শব্দই অশ্বগন্ধার আভিধানিক নাম।

ইহা বঙ্গ, উড়িষ্যা, আসামে অশ্বগন্ধা নামেই খ্যাত। হিন্দুস্থানে অসগন্ধ ও বারাহীগেটী বলে। মহারাষ্ট্রে আসংধ, আসকন্দ এবং আসংবিকা বলে। গুজরাটে আথনংধ বলে। কর্ণাটে আসাহ্ ও অংগুর বলে। তৈলঙ্গে পিল্লিআঙ্গা বলে, ফারসীতে মেহেনন্বরবা বলে। ল্যাটিনে Physalis Sominifero. বলে। ডাক্তারীতে Withania somnifera (ইউথানিয়া সম্‌রিফেরা) বলে।

ইহা বায়ু, কফ, শ্বিত্ররোগ, সোথ, ধাতুক্ষয়, রাজযক্ষ্মা, কাস, শ্বাস, ব্রণ, কুষ্ঠ, বমি, হৃদরোগ, ও ত্রিদোষ নাশক। ইহা পার্ব্বত্য এবং জলশূন্য স্থানে বীজের দ্বারা উৎপন্ন হয়। ইহার বীজ ঠিক তামাকের বীজের ন্যায়। ইহা কাশ্মীর প্রভৃতি পার্ব্বত্য প্রদেশেই অধিক পরিমাণে জন্মে। অধুনা বাঙ্গালায় সৌখীন বাগান গুলিতে দুই চারিটি গাছ দেখা যায়। ইহার মূলই ঔষধাদিতে ব্যবহার হয়। সংসারে যত গুলি বাজীকরণীয় উদ্ভিদ্ দ্রব্য আছে তন্মধ্যে অশ্বগন্ধাই শীর্ষস্থানীয় প্রতিদিন প্রাতে ঈষদুষ্ণ দুগ্ধের সহিত অশ্বগন্ধা মূল চূর্ণ /০ আনা পরিমাণে পান করিলে শারীরিক বিশেষ উপকার প্রাপ্ত হওয়া যায়।

অপরাজিতা। আস্ফোতা, গিরিকর্ণী ও বিষ্ণুক্রান্তা এই কয়েকটি অপরাজিতার আভিধানিক নাম। ইহা শ্বেত ও নীল ভেদে দুই প্রকার। বঙ্গ, উড়িষ্যা ও আসামে ইহাকে অপরাজিতা বলে। হিন্দুস্থানে ইহাকে বিষ্ণুক্রান্তি, সফেদ কোয়ল ও নীলী কোয়ল বলে। গুজরাটে গরণী বলে। আরবীতে মজীরয়ুতএহিন্দী বলে। তৈলঙ্গে নল্লমেল গুম্মিরি বিষ্ণুক্রান্ত ও নল্লবিষ্ণুক্রান্ত বলে। কেবল শ্বেত অপরাজিতাকে মহারাষ্ট্র ও বোম্বেতে পাংড়রী, সুপলী, কর্ণাটে বিলয়গিরি ও কর্ণিকে, আসামে বগা অপরাজিতা বঙ্গে শ্বেত বা ধলা অপরাজিতা বলে। কেবল নীল অপরাজিতাকে মহারাষ্ট্রে নীলমুষলী কর্ণাটে নীলগিরি কর্ণিকে আসামে কলা অপরাজিতা বলে। ডাক্তারীতে clitaria teruotia. (ক্লিটারিয়া টার নাসিয়া) বলে।

ইহা কটুরস, মেধা বর্দ্ধক, শীতবীর্য্য, কণ্ঠশোধক, দৃষ্টিশক্তি বর্দ্ধক, কুষ্ঠ, মূত্রদোষ ত্রিদোষ, আমদোষ, শোথ, ব্রণ ও বিষদোষ নাশক। কটু ও তিক্তবিপাকী ও স্মৃতিশক্তিবর্দ্ধক। ইহা রসাল স্থল ভূমিতে বীজের দ্বারা জন্মে আকার লতার ন্যায়। সর্ব্বত্র প্রাপ্য। নাসাদক্তস্রাবে অপরাজিতার পত্ররসের নস্য বিশেষ উপকারক।

গ্রহের ফের।

লেখক—শ্রীনারায়ণ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

(১)

শেষ বয়সে বিশ্বম্ভর বাবু হঠাৎ মত পরিবর্ত্তন করিয়া ফেলিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়রূপ সমুদ্রোত্তীর্ণ অচিরাগত রজনীকান্ত কোন্ দূরদেশ হইতে সভ্যতার একটি প্রবল স্রোত আনিয়া তাঁহার হৃদয়ের চিরাভ্যস্ত বিশ্বাস গুলিকে সহসা কিরূপে ভাসাইয়া দিল, তাহা কেহই বুঝিয়া উঠিতে পারিল না। এমন কি তিনি নিজেই তাহা বুঝিয়া লইবার অবসর পাইলেন না। কলিকাতা হইতে অচির প্রত্যাগত যুবক রজনীকান্তের ওজস্বিনী ভাষা, সারপূর্ণ সরল যুক্তি, মধুর কণ্ঠ, মনোহারিণী বাক্যচ্ছটা প্রভৃতির এক একটি তাড়িতপূর্ণ অঙ্গুলিস্পর্শে তাঁহার চিরসুপ্ত হৃদয় খানি একদিন কোন শুভ মুহূর্ত্তে জাগিয়া উঠিল। যেন অকালে কুম্ভকর্ণের নিদ্রাভঙ্গ হইল। বিশ্বম্ভর বাবু পূর্ব্বকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্তের জন্যই যেন এবার উঠিয়া পড়িয়া লাগিলেন। সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের সহিত বাল্য বিবাহের বিরুদ্ধে তাঁহার প্রবল মত দেশ মধ্যে প্রচারিত হইয়া পড়িল। চির পুরাতন প্রাচীন মত পরিপালনে অবসন্ন গোঁসাইপুর গ্রাম খানি এই নব মতের নবীন হিল্লোলে শীঘ্রই সঞ্জীবিত হইয়া উঠিল।

বিশ্বম্ভর বাবু বড়লোক। আশ পাশের পাঁচ সাত খানি গ্রামের তিনি জমিদার, সর্ব্বে সর্ব্বা, দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা। তাঁহার অনুগত আশ্রিত লোক অনেক। কাজেই তৎপ্রচারিত এই নূতন মত সকলেই বিনা প্রতিবাদে শিরোধার্য্য করিতে বাধ্য হইল। দেখিতে দেখিতে রজনীকান্তের উদ্যোগে, বিশ্বম্ভর বাবুর ব্যয়ে, গ্রামের মধ্যে হরিসভার আটচালায় কান্তি সরকারের পাঠশালার পার্শ্বে এক অবৈতনিক বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইল। কলিকাতা হইতেক য়েক জন শিক্ষয়িত্রী আগমন করিলেন। তাঁহাদের গাউন-পরিবৃত মনোহর মূর্ত্তি, চর্ম্মপাদুকা-নিহিত চরণের অদ্ভুত গতি, অপূর্ব্ব বাক্যবিন্যাস প্রণালী প্রভৃতি নবভাব সমূহ গ্রামবাসীর ছোটবড় সকল লোকেরই সকৌতুক দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া তাহাদিগকে স্তম্ভিত করিল। কান্তি সরকার প্রমাদ গণিল; বৃদ্ধ শিরোমণি মহাশয় গোপনে ছাত্রগণের

নিকট বিষ্ণুপুরাণান্তর্গত কলিমাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতে করিতে দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন। আর শ্রীমান্ রজনীকান্ত ভবিষ্যতের সমুজ্জ্বল চিত্র খানি সেই বিদ্যালয়ের দ্বারদেশে বিলম্বিত দর্শন করিয়া মহোৎসাহে স্কুলের তত্ত্বাবধারণ করিতে লাগিল। বিশ্বম্ভর বাবু আপনার দ্বিতীয় পক্ষের কনিষ্ঠা কন্যা বিন্দুকে সর্ব্বাগ্রে স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দিয়া স্ত্রীশিক্ষা বিস্তাররূপ সুমহৎ অনুষ্ঠানের প্রথম দৃষ্টান্ত স্বরূপ হইলেন। গোঁসাইপুর গ্রামের অলিখিত ইতিহাসের প্রথম পৃষ্ঠায় তাঁহার নামটি চিরদিনের জন্য মুদ্রিত হইয়া রহিল।

দেখিতে দেখিতে অল্পদিনের মধ্যেই স্কুলটী বেশ জমকাইয়া উঠিল। দুই একটি করিয়া স্কুলের ছাত্রী সংখ্যা বাড়িতে লাগিল। প্রাচীনারা পুষ্করিণীর জলে দাঁড়াইয়া আহ্নিক করিতে করিতে দেখিলেন, দশটা না বাজিতেই ছোট ছোট মেয়ে গুলা বই বগলে স্কুলে যাইতেছে। তখন তাঁহারা পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিলেন, "হায় হায়! সব গেল দিদি, সব গেল। এবার সব এ, বি, পড়ে বিবি হবে।" কেহ কেহ বা মত প্রকাশ করিল যে, পৃথিবীটা শীঘ্রই উল্‌টাইবে।

এদিকে রজনীকান্ত দেখিয়া শুনিয়া মনে মনে গাহিল, "কত কাল পরে বল ভারত রে," ইত্যাদি।

(২)

বিশ্বম্ভর বাবুর গৃহিণী বড় আশা করিয়াছিলেন যে, বিন্দু শত্রুর মুখে ছাই দিয়া নয় বৎসরে পড়িলেই তিনি একটি টুকটুকে জামাতা ঘরে আনিবেন এবং তাহার উপর আপনার বুকভরা স্নেহরাশি ঢালিয়া, পরের ছেলেটীকে আপনার করিয়া পুত্রহীন হৃদয়ের দারুণ ক্ষোভ কিঞ্চিৎ নিবারণ করিবেন। কিন্তু তিনি স্বামীর এই আকস্মিক মতি পরিবর্ত্তন দেখিয়া হতাশ হইয়া পড়িলেন, তাঁহার হৃদয়ের চির-পোষিত আশালতাটী ভাঙ্গিয়া পড়িবার উপক্রম হইল। তিনি বিশ্বম্ভর বাবুকে অনেক বুঝাইলেন, তাঁহার সপত্নী-কন্যা সুধা ও হৈমবতী অষ্টমবর্ষ বয়সে বিবাহিতা হইয়াও যে সুখে ঘর সংসার করিতেছে তাহাও বলিলেন, তদ্ভিন্ন আরও অনেক বালিকার বিবাহিত জীবনের সুখ সৌভাগ্যের দৃষ্টান্ত দেখাইলেন। শেষে আবদার অনুরোধ, সোহাগ অভিমান, লাঞ্ছনা গঞ্জনা প্রভৃতি ব্রহ্মাস্ত্রগুলি একে একে বাছিয়া বাছিয়া প্রয়োগ করিলেন। কিন্তু বিশ্বম্ভর বাবু অচল অটল। তিনি এবিষয়ে এতদূর দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইয়াছেন যে, দ্বিতীয় পক্ষের গৃহিণীর এই অমোঘ অস্ত্রগুলি তাঁহার স্থির নির্ব্বিকার হৃদয়টিকে স্পর্শ করিতে সাহস করিল না। দেখিয়া শুনিয়া গৃহিণী আপন অদৃষ্টকে ধিক্কার দিতে দিতে নিরস্ত হইলেন। তিনি বুঝিলেন, এত

দিন পরে তাঁহার জীর্ণপ্রায় নৌকাটী বান্‌চাল হইয়াছে, এখন আর হাল মানিবে না। তাঁহার ব্যথিত হৃদয়ের একটা অভিমানের—নিরাশার তপ্তশ্বাস বিশ্বম্ভর বাবুর পদতলে আছাড়িয়া পড়িল।

(৩)

রজনীকান্ত উদ্যমশীল যুবক। তাহার অদম্য উৎসাহে—প্রাণপণ চেষ্টায় স্কুলটী চারি পাঁচ বৎসরের মধ্যেই বিশেষ উন্নতি লাভ করিল। অল্পদিনেই তাহা স্কুল পরিদর্শকের (Inspectar) খাতায় প্রথম শ্রেণীর স্থান অধিকার করিয়া বসিল। স্কুলের সঙ্গে সঙ্গে বিন্দুও উন্নতির অনেকগুলি সোপান অতিক্রম করিয়া ফেলিল। তাহার প্রখরা বুদ্ধি—অদম্য উৎসাহ শীঘ্রই তাহাকে ছাত্রীমণ্ডলীর হিংসাপূর্ণ দৃষ্টির মধ্য দিয়া তাহাদের মধ্যে প্রধান স্থান প্রদান করিতে বাধ্য হইল। বিন্দুর এতাদৃশ ত্বরিত উন্নতি দর্শনে রজনীকান্তের আর আনন্দের সীমা নাই। এতদিন পরে সুদূর পল্লীর নির্জ্জন ক্রোড়ে পালিতা একটী বালিকা যে এত শীঘ্র তাহার মুখোজ্জ্বল করিতে পারিবে, তাহা সে প্রথমে ভাবে নাই। এখন দেখিয়া শুনিয়া সে বুঝিল যে, যদি তাহার মত প্রত্যেক বাঙ্গালী চিরাভ্যস্ত আলস্য পরিত্যাগ করিয়া এইরূপ নিঃস্বার্থময় দেশহিতকর শুভ কার্য্যের অনুষ্ঠান করে তবে বোধ হয় ভারতমাতার উদ্ধার আর অধিক দূরবর্ত্তী থাকিবেনা।

শিক্ষার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে বিন্দুর আজন্ম অভ্যস্ত স্বভাব গুলিও উন্নত ও পরি-বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। বিন্দু এই ত্রয়োদশ বর্ষে পদার্পণ করিয়াছে মাত্র, সবে মাত্র তাহার কৈশোর লাবণ্যের উপর যৌবনের প্রথম তরঙ্গের একটু কোমল আঘাত লাগিয়াছে, এই মাত্র তাহার চঞ্চল দৃষ্টির মধ্যে একটু তীব্রতা—একটু মাদকতা মিশিতেছে, এইমাত্র তাহার শিক্ষিত হৃদয়ের উচ্চ কোমল ভাব গুলি ফুটনোন্মুখ হইতেছে। এই কৈশোর যৌবনের মধুর সঙ্গম স্থলে দণ্ডায়মানা বিন্দু যখন তাহাদের প্রাসাদ সংলগ্ন উদ্যানের ক্ষুদ্র বাপীতীরে দাঁড়াইয়া অনন্ত-নীলাকাশের কোলে একটী শান্ত সন্ধ্যাতারার দিকে স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিত, তখন তাহাকে দেখিয়া যে রজনীকান্তের ন্যায় শিক্ষিত যুবকের মনে নির্জ্জন সমুদ্রো-পকূলে দণ্ডায়মানা মিরান্দার চিত্র জাগিয়া উঠিবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি। আর স্কুল হইতে প্রত্যাগমন কালে বিন্দুও যে পথ পার্শ্বস্থ একখানি গৃহের দ্বারদেশ হইতে দুইটি চঞ্চল চক্ষুর সাগ্রহ দৃষ্টি তাহার গন্তব্য পথের উপর নিপতিত থাকিতে দেখিবে, তাহাতেই বা এমন দোষের কথা কি আছে? কিন্তু আমরা দোষ গুণের বিচার করিতে বসি নাই। কেবল পরছিদ্রান্বেষণ যাঁহার নিত্য কার্য্য,

তিনিই ইহার বিচার করিবেন। আমরা কেবল যাহা ঘটিয়াছিল তাহাই স্বরূপতঃ লিপিবদ্ধ করিয়া কালিকলমের সদ্ব্যবহার সঙ্গে সঙ্গে হস্ত কণ্ডূতি নিবৃত্তি করিতেছি মাত্র। আমরা জানিনা, সেই আকুল দৃষ্টিটির মধ্যে এমন কি ছিল, যাহাতে অল্পদিনের মধ্যেই তাহা আর একটী কোমল দৃষ্টির সহানুভূতি লাভে সমর্থ হইল। ইহার পর হইতে প্রায়ই রজনীকান্তের নামে পুস্তকের বড় বড় পার্শ্বেল ডাকে বা রেলে আসিত, এবং সেই সকল পুস্তক বিন্দুর পাঠাগারের শোভাবর্দ্ধনের সহিত তাহার উচ্চশিক্ষার সহায়তা করিত। অধিকাংশ সময়ই বিন্দু অভিনিবেশ সহকারে সেই পুস্তকগুলি পাঠ করিয়া কল্পনার বৈজয়ন্তীধামে বিচরণকরিতে করিতে নব শিক্ষার নিকট আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিত। দৈবাৎ মাতা আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলে সে অকুণ্ঠিত ভাবে বলিত, "এ সকল নূতন পাঠ্য পুস্তক" মাতা ইহাতেই সন্তুষ্ট হইলেও আমরা কিন্তু জানি, সেই নবপাঠ্য পুস্তকগুলির অধিকাংশেরই বাঁধান বহিরাবরণের উপর সোণার জলে বঙ্কিম বাবুর নাম মুদ্রিত ছিল।

কন্যার এইরূপ উন্নতি দর্শনে বিশ্বম্ভর বাবুর আনন্দের সীমা নাই। এজন্য তিনি সর্ব্বদাই রজনীকান্তের নিকট আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেন। রজনীকান্তও ঈষৎ হাস্য দ্বারা আপনার সফলতার গর্ব্ব প্রকাশ করিতে ক্রটী করিত না। কখন কখনও বিশ্বম্ভর বাবু গৃহিণীর উৎপীড়নে ব্যতিব্যস্ত হইয়া রজনীকান্তের নিকট বিন্দুর বিবাহের কথা পাড়িতেন। রজনীকান্ত বলিত, "আরও কিছুদিন থাক্, নতুবা অকালে উচ্চ শিক্ষার মূলে নির্দ্দয় ভাবে কুঠারাঘাত করা হইবে।"

বিশ্বম্ভর বাবু ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বলিতেন, "রাধে কৃষ্ণ! তাও কি হয়! ভাল আর কিছু দিন থাক্।

এদিকে আর কিছুদিনের মধ্যে রজনীকান্তের লিখিত পবিত্র ভাবপূর্ণ কয়েক খানি সুরঞ্জিত সুবাসিত পত্র বিন্দুর হস্তগত হইল এবং কতকগুলি দীর্ঘলিপি রজনীকান্তের বাক্স মধ্যে গুপ্তস্থান অধিকার করিল। সেই পত্র গুলির মধ্যে কি লেখা ছিল, তাহা আমরা জানিনা, অথবা জানিলেও সেই কথা প্রকাশ করিয়া সভ্যতার মর্য্যাদা লঙ্ঘন করিতে সাহস করি না। তবে এই টুকু মাত্র বলিতে পারি যে, চাঁদ, অনিল, কোকিল, প্রভৃতি কবিত্বের যাহা কিছু উপকরণ তৎসমস্তই সেই পত্রমধ্যে ছিল এবং তাহা পাঠ করিয়া উভয়েরই হৃদয় এক নবভাবে জাগরিত হইয়া কোন অজ্ঞাত রাজ্যে ছুটিয়াছিল। সেই সকল ক্ষুদ্র পত্রের অতি ক্ষুদ্র অক্ষর গুলির সহিত মানবহৃদয়ের কি এমন অদ্ভুত বৈজ্ঞানিক সম্বন্ধ আছে, তাহা এই বিজ্ঞানযুগে অবৈজ্ঞানিক আমরা বহু গবেষণার দ্বারাও স্থির করিতে পারি নাই

অগত্যা ভবিষ্যৎ বৈজ্ঞানিকগণের উপর এই গূঢ়তত্ত্ব নির্ণয়ের ভার অর্পণ করিয়া আমরা প্রকৃত ঘটনার বর্ণনে অগ্রসর হইলাম।

এইরূপে উচ্চ শিক্ষার এক একটী সোপানে আরোহণ করিতে করিতে বিন্দু জীবনের চতুর্দ্দশটী বর্ষসোপান অতিক্রম করিল।

(৪)

গৃহিণী তো ভাবিয়া অস্থির। এতবড় আইবুড় মেয়ে ঘরে থাকিতে কিরূপে বিশ্বম্ভর বাবুর উদরে অন্ন পরিপাক হয়, তাহা তিনি কিছুতেই বুঝিতে পারেন না। কিন্তু এবার তিনি একটু শক্ত করিয়া হাল ধরিলেন। কর্ত্তাকে বলিলেন, "তুমি মেয়ে লইয়া থাক, আমি যেদিকে দু'চক্ষু যায়, সেই দিকে চলিলাম। মেয়ের জন্য লোকের কাছে মুখ দেখান ভার হইয়াছে। কত লোকে কত কথা বলে!"

কর্ত্তাও বুঝিলেন, আর বেশী বাড়াবাড়ি করা ভাল নয়। কথাটা লইয়া চারিদিকে কানাঘুষা চলিতেছে বটে। কাজেই বিশ্বম্ভর বাবু এবার গৃহিণীর মতে মত দিয়া শীঘ্র বিন্দুর বিবাহের জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিলেন। চারিদিকে ঘটক-ঘটকীর দল ছুটিল।

সুপাত্র মিলিল। বৈকুণ্ঠপুরের জমিদার গোবিন্দচন্দ্র ঘোষের পুত্র। ছেলে এল এ পড়িতেছে, দেখিতে ভাল, স্বভাব চরিত্রও মন্দ নহে। বংশটীও নির্দ্দোষ। এরূপ সর্ব্বসদ্‌গুণ সম্পন্ন পাত্র পাইয়া বিশ্বম্ভর বাবুর আনন্দের সীমা রহিল না। শীঘ্র শীঘ্র কার্য্য শেষ করিতে মনস্থ করিলেন। দেনা পাওনা সমস্ত চুকিয়া গেল। বিবাহের দিন স্থির হইল। কিন্তু সহসা একি বিভ্রাট! গৃহিণী বিশ্বম্ভর বাবুকে বলিলেন, "মেয়ে বিবাহের নামে যেন শুকিয়ে যায়। বোধ হয় এ বিবাহে তার মত নাই।

বিশ্বম্ভর বাবুর মাথায় যেন আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। তিনি সবিস্ময়ে গৃহিণীর মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "মেয়ের মত?"

গৃহিণী বলিলেন, "তা সে এখন লেখাপড়া শিখেছে, সব বুঝ্‌তে পারে।"

"তবে তার মত কি?"

"বোধ হয় রজনীকান্তের সঙ্গে বিবাহ হলেই তার মনের মত হয়।"

বিশ্বম্ভর বাবু গর্জ্জন করিয়া বলিলেন, "তা কখনই হ'তে পারে না।"

গৃহিণী বলিলেন, "কেন?"

বিশ্বম্ভর বাবু দৃঢ়স্বরে বলিলেন, "কেন কি, তা' হ'তেই পারে না।"

আসল কথাটা এই যে, বিশ্বম্ভর বাবু কুলীন, কিন্তু রজনীকান্ত মৌলিক।

বিশেষতঃ তাহার বিষয় সম্পত্তি কিছুই নাই। এ অবস্থায় নিকৃষ্ট ঘরে কন্যাদান করিয়া তিনি সমাজে কিরূপে মুখ দেখাইবেন? আরও কুল নষ্ট করিয়া তিনি কি পিতৃ পুরুষগণের অভিশাপগ্রস্থ হইবেন? তিনি আর সব করিতে পারেন, কিন্তু কুলগৌরব নষ্ট করিয়া ঊর্দ্ধতন ও অধস্তন সপ্তম পুরুষের সহিত নরকে যাইতে প্রস্তুত নহেন। কিন্তু এদিকে কন্যার এই ভাব। এরূপ স্থলে এই উভয় সঙ্কটের মধ্যে পড়িয়া তিনি কি করিবেন, তাহা স্থির করিতে পারিলেন না। অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া শেষে তিনি একটু জমিদারী চাল চালিলেন। আপাততঃ রজনীকে বিন্দুর সম্মুখ হইতে সরাইয়া তাহার মতি পরিবর্ত্তনের চেষ্টা করিবেন স্থির করিলেন।

শীঘ্রই তাঁহার সংকল্প কার্য্যে পরিণত হইল। রজনীকান্ত দেওয়ানগঞ্জের নায়েবী পদে নিযুক্ত হইয়া সত্বর তথায় গমন করিতে বাধ্য হইল। বিশ্বম্ভর বাবু নিশ্চিন্ত মনে বিবাহের আয়োজনে ব্যস্ত হইলেন। এবার বিন্দু মাতার নিকট কাঁদিয়া পড়িল। বিশ্বম্ভর বাবু কন্যাকে বুঝাইতে আরম্ভ করিলেন। কন্যাও পিতার সম্মুখে অকুন্ঠিত চিত্তে আপনার স্বাধীন মত প্রকাশ করিতে একটুও ইতস্ততঃ করিল না। দেখিয়া শুনিয়া বিশ্বম্ভর বাবু হতবুদ্ধি হইলেন। মাথা হেঁট করিয়া তিনি কন্যার নিকট হইতে প্রস্থান করিলেন। তাঁহার মর্ম্মে অনুতাপের একটু আঘাত লাগিল।

এইরূপে কয়েক দিন কাটিল। তার পর একদিন বিন্দুর নামে ডাকে একখানি চিঠি আসিল। সেই চিঠি পড়িয়াই হউক বা অন্য যে কারণেই হউক, সেই দিন বিন্দু মাতার নিকট বিবাহের সম্মতি প্রদান করিল। বিশ্বম্ভর বাবু হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলেন। তিনি হাসিতে হাসিতে গৃহিণীকে বলিলেন, "যত হোক্, বিন্দু আমার লেখা পড়া শিখেছে। সে কি আমার মাথা হেঁট কর্ত্তে পারে।"

শুভদিনে, শুভলগ্নে, মহাসমারোহে বিবাহ কার্য্য শেষ হইয়া গেল। বিন্দু কনে বউ সাজিয়া, পাল্‌কী চড়িয়া শ্বশুর বাড়ী গেল।

কিন্তু শ্বশুর বাড়ীতে গিয়া বিন্দু বড় কষ্টেই পড়িল। অন্তঃপুরের রুদ্ধ বায়ুতে তাহার স্বাধীন হৃদয়টা হাঁফাইয়া উঠিল। তাহার উপর সমাগতা রমণীমণ্ডলী কর্ত্তৃক তাহার প্রতি অঙ্গ প্রত্যঙ্গের, প্রতি কার্য্যের, প্রতিপদক্ষেপের তীব্র সমালোচনায় সে জর্জ্জরিত হইয়া পড়িল। সর্ব্বোপরি স্বামীর সেই সলজ্জ আনত দৃষ্টি, প্রেমহীন সম্ভাষণ, কবিত্ব শূন্য হৃদয় তাহার পক্ষে বিষবৎ বোধ হইল। সে কেবল দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া নির্জ্জনে মনে মনে গাহিত, "কন্টকে গটিল বিধি মৃণাল অধমে।" ইত্যাদি।

হায়রে কুসংস্কারাচ্ছন্ন হিন্দুসমাজ! আর কতকাল তুমি অন্ধকারে থাকিবে? কত দিনে তুমি এরূপ সুশিক্ষার জন্য উচ্চ সম্মান প্রদান করিতে শিখিবে?

অনেক কষ্টে সুদীর্ঘ আটটি দিন শ্বশুর বাটীতে কাটাইয়া বিন্দু পিত্রালয়ে আসিল। সেখানকার মুক্তবাতাসে তাহার স্বাধীন প্রাণটা হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল।

(৫)

ইহার পর ছয়মাস কাটিয়া গেল। এই ছয় মাসের মধ্যে কেবল জামাই ষষ্ঠিতে বিন্দু একরাত্রির জন্য স্বামীসাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছিল। কিন্তু সে সাক্ষাৎ তাহার পক্ষে অসহ্য হইয়াছিল। হায়, শিক্ষার কতকগুলা চাপরাসধারী, অপ্রেমিক, শুষ্কহৃদয় এই মানুষটা কি তাহার স্বামীর যোগ্য? এই অশিক্ষিত অসভ্য দাঁড়ীটা কি তাহার সুসজ্জিত হৃদয়-তরণীর কর্ণধার হইতে সক্ষম? এই শুষ্ক কাষ্ঠ দণ্ডটা কি তাহার শোভাময়, আশাময়, বিস্তীর্ণ জীবনপথের অবলম্বন হইবার উপযুক্ত? হায় রজনীকান্ত! একটী সরলপ্রাণা অবলার কোমল হৃদয়-কুসুমটীকে এইরূপ নির্দ্দয়ভাবে পদদলিত করাইবার জন্যই কি তুমি তাহাকে বিবাহ করিতে অনুরোধ করিয়াছিলে?

বিন্দু এখন সর্ব্বদাই ভাবিত। ভাবিতে ভাবিতে সে দেখিত, তাহার স্বামীর বাহ্যিক মনোহর আকৃতির মধ্যে এক ভীষণকায় পিশাচ দাঁড়াইয়া রক্তনেত্রে তাহার দিকে চাহিতে চাহিতে খল্‌খল্ হাসিতেছে। ভয়ে বিন্দু চক্ষু মুদ্রিত করিত। তখন সেই নিমীলিত নেত্রে সে দেখিত, কল্পনার অনন্তরাজ্য, প্রেমের অক্ষয় স্বর্গ। সে স্বর্গে কি আছে? সবই আছে—সেখানে প্রেমমন্দাকিনীর বিমল স্রোত আছে, স্বাধীনতার মলয় হিল্লোল আছে, সুখের নন্দন কানন আছে, ভালবাসার কল্পপাদপ আছে, আর—আর সেই কল্পতরুতলে দাঁড়াইয়া আছে রজনীকান্ত। তবে ভয় কি বিন্দু? ভয়—ঐ যে ভীষণ নরক, ঐ যে তাহার অগ্নিময় তীরে এক বিকটাকৃতি যমদূত। তবে কি হইবে? ভয়ে ভয়ে বিন্দু কাঁদিয়া ফেলিল।

একদিন মধ্যাহ্নকালে সহসা বিন্দুর শ্বশুর বাটী হইতে পাল্‌কী বেহারা আসিয়া উপস্থিত হইল। পাল্‌কীর সহিত এক পশ্চিমে দ্বারবান ও একজন ঝি। সে ঝি ইতিপূর্ব্বে আরও কয়েকবার আসিয়াছিল। ঝি আসিয়াই বিশ্বম্ভর বাবুর হাতে একখানি পত্র দিল। বিশ্বম্ভর বাবু পত্রপাঠ করিয়া জানিলেন যে, বিন্দুর শাশুড়ী ঠাকুরাণার কঠিন পীড়া, মুমূর্ষু অবস্থা। এসময়ে তিনি বধুকে দেখিবার জন্য বড়ই ব্যাকুল। এই জন্যই সহসা পাল্‌কী পাঠান হইয়াছে। অদ্যই বিন্দুকে পাঠাইতে হইবে, নতুবা হয়ত এজীবনে আর তাহার শাশুড়ীর সহিত সাক্ষাৎ হইবে না।

রোগীকে লইয়া সকলেই ব্যস্ত, একারন কোন বিশ্বাসী দ্বারবান্ ও ঝিকেই পাঠান হইয়াছে।

বিশ্বম্ভর বাবু গৃহিণীকে পত্র পড়িয়া শুনাইলেন। ঝিও কাঁদ কাঁদ মুখে তাহার প্রভুপত্নীর গুণ কীর্ত্তন করিতে করিতে তাঁহার রোগের অবস্থা বলিল। অগত্যা গৃহিণী বেহানের শেষ সময়ে তাঁহার অন্তিম সাধ পূর্ণ করিবার পক্ষে বাধা দিতে ইচ্ছা করিলেন না। তৎক্ষণাৎ বিন্দুকে পাঠান স্থির হইল। অল্পক্ষণ পরেই বিন্দু রুমালে চক্ষু মুছিতে মুছিতে পাল্‌কীতে উঠিল। ছয় জন বেহারা পাল্‌কী খানাকে যেন উড়াইয়া লইয়া চলিল। গহনার বাক্স মাথায় করিয়া ঝি ও দ্বারবান্ পাল্কির পাছু পাছু ছুটিল।

(৬)

পরদিন প্রাতঃকালে বিশ্বম্ভর বাবু বেহানের অবস্থা জানিবার জন্য একজন লোক পাঠাইয়া দিলেন। মধ্যাহ্নকালে সে লোক ফিরিয়া আসিল। বিশ্বম্ভর বাবু তাহার নিকট যাহা শুনিলেন, তাহাতে তাঁহার মাথা ঘুরিয়া পড়িল, তিনি চারিদিক শূন্য দেখিলেন, একটা অলক্ষিত বিদ্রূপের তীব্র অট্টহাস্যধ্বনি যেন তাঁহার চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। তিনি কম্পিত পদে বাটীর ভিতর গিয়া গৃহিণীকে বলিলেন, "সর্ব্বনাশ হইয়াছে।"

গৃহিণী সভয়ে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "কি হইয়াছে ?"

বিশ্বম্ভর বাবু দুই হাতে কপাল টিপিয়া বলিলেন, "বিষম ষড়যন্ত্র ! হায় হায়, বিন্দু কোথায় গেল ?"

গৃহিনী সেইখানে বসিয়া পড়িলেন ; রুদ্ধশ্বাসে বলিলেন, "সে কি ?"

বিশ্বম্ভর বাবু দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, "সর্ব্বনাশ ! জাল লোক, জাল চিঠি। সব ষড়যন্ত্র ; বেহানের কোনই অসুখ নাই, সেখান হইতে পাল্‌কী বা লোক কিছুই আসে নাই।"

গৃহিনী কাঁদিয়া উঠিলেন। বিশ্বম্ভর বাবু উঠিয়া বাহিরে গেলেন। তৎক্ষণাৎ অনুসন্ধানের জন্য চারিদিকে লোক ছুটিল। কিন্তু বিন্দুর বা সেই সকল লোক জনের কোনই সন্ধান পাওয়া গেল না। বিশ্বম্ভর বাবু হতাশ হইলেন। গৃহিণী আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া কেবল কাঁদিতে লাগিলেন।

ইহার চারিদিন পরে বিশ্বম্ভর বাবুর নামে এক পত্র আসিল। তিনি পত্র খুলিয়াই বুঝিলেন, তাহা বিন্দুর হাতের লেখা। সাগ্রহে বিশ্বম্ভর বাবু পত্র পাঠ

করিলেন। পাঠ করিয়া স্তম্ভিত হইলেন। তারপর তিনি গৃহিনীকে সে পত্র পড়িয়া শুনাইলেন। পত্রে লিখিত ছিল ঃ—

"প্রিয় বাবা ! আপনারা বোধ হয় আমার জন্য বড়ই ভাবিতেছেন। কিন্তু আমার জন্য আপনাদের কোন চিন্তা নাই। আজি দুইদিন হইল, আমি রজনীর সহিত কাশীতে আসিয়াছি, এক্ষণে আমার কোন কষ্ট নাই, বেশ সুখে আছি। তবে বোধ হয় কল্যই কাশী ত্যাগ করিব। কোথায় যাইব, তাহা এখনও স্থির হয় নাই।"

"এখন আমি এরূপ ভাবে কেন আসিলাম, তাহাই সংক্ষেপে বলিব। আশাকরি, আমায় সমস্ত কথা শুনিয়া আপনারা আমাকে হৃদয়ের সহিত ক্ষমা করিবেন, এবং আমার প্রতি নির্দ্দয়ভাবে ক্রোধ প্রকাশ করিতে কুণ্ঠিত হইবেন। প্রথমতঃ শিক্ষা ও সংসর্গের উপরই মানুষের ভবিষ্যৎ জীবনের সুখ দুঃখ নির্ভর করে। এই শিক্ষা ও সংসর্গ দ্বারা চালিত হইয়া মানব-হৃদয় প্রথম জীবনে যে পথে অগ্রসর হয়, যে সংস্কারে আবদ্ধ হয়, ভবিষ্যতে আর কোন বাধাই তাহাকে সে পথ হইতে বা সে সংস্কার হইতে বিচ্যুত করিতে সমর্থ হয় না। তাহার প্রধান ও প্রথম সাক্ষী হিন্দু সমাজ। কিন্তু আপনি এই সমাজে থাকিয়াও এই সমাজের কুসংস্কার জালে দৃঢ়রূপে আবদ্ধ হইয়াও আমাকে প্রথম হইতে ইহার বিপরীত পথে চালিত করিয়াছেন ; চিরতুষারময় বিভিন্ন দেশের বীজ লইয়া চির প্রতপ্ত ভারতের হিন্দুরমনীর হৃদয়ে রোপন করিয়াছেন, সমাজ বন্ধনবিহীন বৈদেশিক স্বাধীনতার মলয় হিল্লোল আনিয়া কঠিন সমাজবদ্ধ হিন্দুঅন্তঃপুরে প্রবাহিত করাইয়াছেন। তাহাতে বিপরীত ফল হইয়াছে। যে বৃক্ষ একদেশে অমৃতময় ফল প্রসব করে; তাহাই যে স্থান ভেদে মৃত্তিকার গুণে বিভিন্নরূপ ফল প্রদান করিবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি ? আমি যেরূপ শিক্ষা ও সংসর্গ পাইয়াছি, সেইরূপ কার্য্যই করিয়াছি। আমি কি ক্ষমার পাত্রী নহি ?"

"যে দেশে নবম বর্ষীয়া বালিকা স্বামীকে দেখিয়া ঘোম্‌টা দেয়, সেই দেশে (হায়রে সে দেশ !) আপনি আমাকে চতুর্দ্দশবর্ষ পর্য্যন্ত অবিবাহিতা রাখিয়াছেন। অথচ একদিনের জন্য আমাকে পর পুরুষ সংসর্গ হইতে বিচ্ছিন্ন করিতে চেষ্টা করেন নাই। ইহার ফলে আমার মুক্ত হৃদয়ের প্রবল বাসনা-স্রোত বিভিন্ন পথে ছুটিল। সে সংযমবিহীন শত বিলাস বর্দ্ধিত স্রোতের সম্মুখে যে প্রথমে পড়িল, আমার প্রণয় তরঙ্গায়িত হৃদয়খানি তাহাকে সাগ্রহে আলিঙ্গন করিল। তাহাতে কোন বাধাই ছিল না। আমি নির্ব্বিবাদে কল্পনাপূর্ণ-হৃদয়খানি লইয়া নবালোক প্রদীপ্ত জীবন পথে অগ্রসর হইলাম।"

"কিন্তু এতদুরে আসিয়া আপনি বাধা দিতে চেষ্টা করিলেন। যখন পূর্ণতোয়া স্রোতস্বিনীর প্রবল স্রোতোবেগ উভয় কুল ভাসাইয়া উদ্দাম গতিতে ছুটিয়াছে, তখন আসিয়া আপনি তাহাকে প্রতিরুদ্ধ করিতে প্রয়াসী হইলেন। কিন্তু আপনার সেই অসময়িক চেষ্টার ফল কি হইল? বাধা পাইয়া সে বেগ আরও বর্দ্ধিত গতিতে ছুটিল। তখন আপনার সমাজ মনে পড়িল, কুল গৌরব মনে পড়িল, কন্যাদানের অক্ষয় ফল মনে পড়িল। তাই আপনি পূর্ণোৎসাহে এতদূর অগ্রসর হইয়াও আবার কাপুরুষের ন্যায় প্রতি নিবৃত্ত হইলেন। কুসংস্কারে শত বাধা আসিয়া আপনাকে বিভিন্ন পথে চালিত করিল। কিন্তু আপনি ফিরিলেন বলিয়া আমিও ফিরিতে পারিলাম না। আমার নব-শিক্ষার সুমধুর আলোকে সমুজ্জ্বল হৃদয় আর ফিরিতে চাহিল না। একবার যে হৃদয় স্বেচ্ছায় দান করিয়াছি, আবার তাহা প্রতি গ্রহণ করিয়া বিশ্বাসঘাতিনী হইতে সাহস করিলাম না। তখন আপনি নির্দ্দয় ভাবে আমার কোমল হৃদয়খানিকে চূর্ণ করিতে উদ্যত হইলেন, কন্যার কাতর মুখের দিকে না চাহিয়া আমার সমগ্র জীবনের সুখের আশাকে পদদলিত করিতে চেষ্টা করিলেন। এ অবস্থায় আমার কর্ত্তব্য কি বলুন দেখি?"

"আমার যাহা কর্ত্তব্য, তাহা করিয়াছি। মনে করিবেন না আমি স্বেচ্ছায় বিবাহে সম্মতি দিয়াছি। কেবল রজনীর আশ্বাসে ও অনুরোধে সে লৌকিক বিবাহ করিয়াছি। আমার হৃদয়ের যে বিবাহ প্রাণে প্রাণে যে বন্ধন, তাহা বহুপূর্ব্বেই রজনীর সহিত হইয়া গিয়াছিল। তাহার সাক্ষী আমাদের বাগানের মাধবীকুঞ্জ।"

"বিবাহের পর হইতে পত্রদ্বারা রজনীর সহিত আমার পরামর্শ চলিতেছিল। যখন দেখিলাম, আমাদের সুপবিত্র স্বাধীন প্রণয়ে অনেক বাধা, যখন বুঝিলাম সমাজত্যাগ ভিন্ন উপায়ান্তর নাই, তখন অগত্যা তাহাই করিতে হইল। রজনী অনেক চেষ্টা করিয়া আমার শ্বশুর বাড়ীর ঝিকে হাত করিল। সেটা আপনাদিগের দৃঢ় বিশ্বাসের জন্য। তারপর জাল পত্রের সহিত পাল্‌কী বেহারা প্রেরিত হইল। রজনী ষ্টেসনে বসিয়া আমার অপেক্ষা করিতে ছিল, আমি আসিলে উভয়ে মিলিয়া কাশীতে আসিয়াছি। অবশ্য গোপনেও আসিতে পারিতাম, কিন্তু তাহা নিতান্ত নীতি বিরুদ্ধ এবং তাহাতে অনেক বাধা বিশেষতঃ গহনার বাক্সটা মার কাছে ছিল। সেটা হাত করাও বড় সহজ হইত না।"

"এখন বোধ হয় আপনি বড়ই অনুতপ্ত হইয়াছেন। কিন্তু সে অনুতাপ এখন বৃথা। কারণ পূর্ব্বেই আপনার জানা উচিত ছিল যে, ইংলণ্ড ও ভারত সমান দেশ

নহে' উভয় স্থানের জল বায়ুতে বিস্তর প্রভেদ। সেখানে যাহা সাজে তাহা এখানে সাজিবে না। যাহা হইয়া গিয়াছে, তাহার আর উপায় নাই। এখন আমি সুখী হইলে যদি আপনারা সুখবোধ করেন, তবে জানিবেন আমি বেশ সুখে আছি। আরও জানিয়া রাখিবেন দেশ ভেদে শিক্ষার বিভিন্নতা আছে। মাকে আমার স্নেহ সম্ভাষণ দিবেন।

আপনার স্নেহের—

বিন্দু।

পত্র পাঠ শেষ হইলে গৃহিণী মাথায় হাত চাপড়াইয়া বলিলেন, "হায় হায়, শেষ বয়সে তোমার এ কু-বুদ্ধি কেন হ'লো?"

দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বিশ্বম্ভর বাবু বলিলেন, "গ্রহের ফের।"

ইহার কয়েক মাস পরে তিনি কলিকাতা হইতে বিন্দুর আর একখানি পত্র পাইয়াছিলেন, কিন্তু তিনি আর কন্যার সংবাদ লইতে বা তাহার অন্বেষণ করিতে আবশ্যক বোধ করেন নাই। কেবল জীবনে একবার গ্রহের ফেরে তিনি যে ভুল করিয়াছিলেন, সে জন্য তাঁহাকে অবশিষ্ট সমস্ত জীবনে অনুতাপের তীব্র কষাঘাত সহ্য করিতে হইয়াছিল।

সমাপ্ত।

আধুনিক বাংলা সাহিত্য।

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়।

জাতীয় উন্নতির অনুকূলে জাতীয় সাহিত্য যেমন সাহায্য করে, এমন আর কিছুই নহে। এই বিশাল কর্ম্মক্ষেত্রে উন্নতিশীল এমন জাতি দেখিতে পাই না, যে জাতির জাতীয় সাহিত্য উন্নত নহে। সকলেই যথাসাধ্য আপনাদের জাতীয় সাহিত্যকে সর্ব্বাঙ্গ-পুষ্ট করিয়া তুলিতে চেষ্টা করিতেছে।

আমাদের ভারতে এই চেষ্টা দেখিতে পাই না। এত বড় দেশটার ভিতর কেবল মাত্র বাংলা সাহিত্য কিছু উন্নত হইয়া তৈলহীন প্রদীপের মতন ক্ষীণভাবে জ্বলিতেছে। যে কোন মুহূর্ত্তে তাহা নিবিয়া যাইতে পারে। আমার কথার সারবত্তা য়ুরোপীয় সাহিত্যের সঙ্গে বাংলা সাহিত্যের তুলনা করিলেই

বুঝিতে পারা যাইবে। আমাদের বাংলা ভাষায় যে অনেক বই আছে, তাহা কেহ অস্বীকার করিবে না। কিন্তু বাছাই করিলে দেখা যাইবে বাংলা ভাষায় যে সকল বই প্রণীত হইয়াছে, তার ভিতরে অধিকাংশই বস্তাপচা চর্ব্বিত-চর্ব্বণ, "রাবিশ" ভিন্ন আর কিছুই নহে।

এই সকল বাজে বই পরিত্যাগ করিয়া যে কয়খানি অবশিষ্ঠ ভাল পাঠ যোগ্য বই, দেখা যাইবে তার সংখ্যা অতি অল্প। আর ইহাও সত্য যে বাংলা সাহিত্যের এই সকল আবর্জ্জনা বৃদ্ধির সহায়তায় আমরা অর্থাৎ পাঠক সমাজ যথেষ্ট সাহায্য করিতেছি। একটা কথা আমাদের জানিয়া রাখা দরকার যে পাঠক সমাজের রুচির তারতম্য অনুসারে সাহিত্যে ভাল মন্দের আধিক্য হইয়া থাকে। আগুণে হাত দিলে হাত পুড়িয়া যায় একথা যেমন সত্য তেমনি আমার উপরোক্ত কথা গুলির সারবত্তা সম্বন্ধেও কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু তবুও উক্ত বিষয়ের স্বপক্ষে দুইচারিটা কথা বলা, আমি আবশ্যক মনে করিতেছি। আমাদের দেশে গ্রন্থকারগণ দেখিলেন যে, পাঠক সমাজ মন্দ বই যতটা পছন্দ করে, ভাল বই ততটা করে না। গ্রন্থকারগণ তোমার আমার মতন সাধারণ মানুষ ভিন্ন আর কিছুই নহেন। মিছামিছি পয়সা নষ্ট করিতে এ জগতে কেহই সম্মত নহে। তখন, গ্রন্থকারগণ অবস্থা বুঝিয়া ব্যবস্থা করিলেন! পাঠক সমাজের রুচি বাজে নভেল নাটকের দিকে, অতএব চতুর গ্রন্থকার ভাবিয়া চিন্তিয়া বই লিখিলেন "অমুক সংসারের গুপ্ত কথা" অথবা "প্রণয় পাগলিনী" নাটক। পাঠকেরা খুব আগ্রহের সঙ্গে বই পড়িতে লাগিল, চারিদিকে ধন্য ধন্য রব পড়িয়া গেল, নানা পত্র পত্রিকায় সুখ্যাতিপূর্ণ প্রশংসা বাহির হইল, বইখানির চার পাঁচ বার সংস্করণ অবধি বাহির হইল। আসল কথা বই খানি বেশ Populer হইয়া পড়িল।

এখানে যেন কেহ মনে না করেন যে, আমি নাটক নভেল মাত্রকেই মন্দ বলিতেছি। নাটক-নভেলের ভিতরেও ভাল মন্দ দুই আছে। তবে মন্দের ভাগটাই বেশী দেখিতে পাই।

সত্য সত্যই, যে দেশে সাহিত্যের এ রকম অবস্থা, আমি হলপ করিয়া লেখকগণের এবং পাঠকগণের রুচির দিব্য দিয়া বলিতেছি যে বাংলা সাহিত্যের বর্ত্তমান অবস্থা আদৌ আশাজনক নহে। এবং শীঘ্র ইহার প্রতিবিধানের পন্থা না দেখিলে বাংলা সাহিত্যের নাম, সৎ সাহিত্যের List হইতে একেবারে অন্তহিত হইয়া যাইবে।

আমাদের দেশে তেমন গুণগ্রাহী প্রকাশকও নাই যে ভাল বইএর উপযুক্ত আদর করিবেন। যে দুই একজন universal pbulisher বর্ত্তমান আছেন, তাঁহারাও তথৈবচ। অতএব যে সাহিত্যের পাঠক-সমাজের এমন রুচি যে সাহিত্যের গ্রন্থকারগণের এমন রচনা, আর যে সাহিত্যের প্রকাশকগণের এমন স্বভাব সে সাহিত্যের অবনতি আদৌ বিচিত্র নহে।

তারপর আমার বক্তব্য এই যে আমি এই আবর্জ্জনা বৃদ্ধির অনুকূলে, আমাদের পাঠক সমাজকেই সকলের চাইতে বেশী দোষী স্থির করিতেছি। তাঁরা যদি একটু আসল নকল চিনিয়া লইয়া "মুড়ি মিছরির" একদর না করেন, তাহা হইলে আমাদের সাহিত্যের এমন দশা হয় না। তাহা হইলে, নিঃসন্দেহেই আমাদের সাহিত্য অতি অল্প সময়ের ভিতরে, অপর অপর দেশের সাহিত্যের সঙ্গে সমকক্ষতা লাভ করিতে পারে।

এক্ষণে আর দুই একটা কথা আলোচনা করা যাউক্। গ্রন্থকারগণের প্রধান কর্ত্তব্য হইতেছে, কোন নির্দ্ধারিত আদর্শের অনুরূপে, তাঁহাদের বইগুলি রচনা করা। একটা আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া রচনা করিলে রচিত বিষয় খুব পরিস্ফুট এবং উজ্জ্বল হইয়া উঠে অন্যথা "আঁধারে" ঢিল ছোঁড়ার মতন রচনা ব্যর্থ হয়।

মানব চরিত্রে অভিজ্ঞান এবং সামাজিক লক্ষণে অভিজ্ঞান থাকা গ্রন্থকারগণের একটী অপরিহার্য্য গুণ। ইহার জন্য গ্রন্থকারগণকে অনেক সাধনা করিতে হইবে, সাধনা ভিন্ন সিদ্ধি হয় না, ইহা আমাদের জানাই আছে। তারপর গ্রন্থের ভাষার কথা। রচনা প্রণালী সুন্দর হইলে, গ্রন্থের উপপাদ্য বিষয় যতই কেন নীরস হউক না সুন্দর রচনা দ্বারা তাহা সরস হইয়া উঠিবে। সেই জন্য ভাষা বেশ সরল, সংযত এবং সুন্দর করিয়া তুলিতে হইবে। অনেক দোষ থাকিলেও সুসংযত রচনা প্রণালীর গুণে পাঠকগণ সে সকল দোষের সন্ধানই পান না।

লেখকগণ মৌলিক বিষয় পাঠকগণকে উপহার দিবেন। পূরাণো চিন্তাতে কোন ফল নাই, অধিকন্তু তাহা পাঠকগণের চিত্ত আকর্ষণ করিতে পারে না। আরও অনেক গুলি গুন লেখকগণের থাকা উচিত, নব্য-লেখকগণ যদি এবিষয় বিশেষরূপে জানিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে প্রথম বৎসর "প্রচারে" ৫ম সংখ্যায় স্বর্গীয় বঙ্কিম চন্দ্রের রচিত প্রবন্ধ পাঠ করিবেন। তাহাতে এই বিষয়ে একটি অতি সুন্দর প্রবন্ধ আছে এবং নব্য-লেখকগণ তাহা পাঠে বেশ সাহায্য পাইবেন। বাস্তবিক গ্রন্থকাররূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করা বড় সহজ কথা নহে। গ্রন্থকাররূপে পরিচিত হইতে হইলে আগে কত পরিশ্রম, কত সাধনা, কত কষ্ট, কত যত্নের

আবশ্যক। তবে সাধনায় সিদ্ধি লাভ হয়। তাহা নাহলে, ঢাল নাই, খাঁড়া নাই, নিধিরাম সর্দ্দার হইলে চলিবে না।

আমাদের নীতি শাস্ত্রে একটা কথা আছে যে—

“স্বল্প জলে সফরী ফর্‌ফরায়।”

বাস্তবিকই একথাটা বড় সত্য কথা। আমাদের দেশে এক শ্রেনীর নিকৃষ্ট গ্রন্থকার আছেন। তাঁহাদের লিখিত রচনায় ভাবে গম্ভীরতা নাই। উপযুক্ত গবেষণা নাই, রচিত বিষয়ে মাধুর্য্যের লেশ মাত্রও বর্ত্তমান নাই; তথাপি তাঁরা গ্রন্থকার নাম কিনিবার জন্য মিথ্যা প্রয়াসে প্রয়াসী হন। কিন্তু তাহাও অল্পদিনের জন্য। যেখানে পরিশ্রম, সেখানে এই শ্রেনীর গ্রন্থকারগণকে দেখা যাইবে না, কেননা পরিশ্রম দ্বারা অথবা সাধনা দ্বারা সিদ্ধি লাভ করা ইহাদের কোন ‘কুষ্টিতে’ লেখে নাই। স্বতরাং উপরি উক্ত নীতি বচনের সার্থকতা ইহাদের দ্বারাই প্রতিপন্ন হয়।

আয়ুর্ব্বেদ।

লেখক—কবিরাজ শ্রীগোবিন্দপ্রসাদ রায় কবিরত্ন।

আয়ুর্ব্বেদ অথর্ব্ব-বেদের উপাঙ্গ, ভগবান্ ব্রহ্মার মুখ-নিঃসৃত অমৃতায়মান লোকহিতকর বাক্য। দেহ, ইন্দ্রিয়, মন ও আত্মার যে সংযোগ, তাহাকে আয়ু বলে। যে শাস্ত্রে সেই আয়ুর লক্ষণ, আয়ুর হিতাহিত এবং পরিমাণ উক্ত হইয়াছে কিংবা যদ্দ্বারা আয়ু পরিজ্ঞাত হওয়া যায় বা আয়ু লাভ হয় তাহাকে আয়ুর্ব্বেদ কহে। রোগীর রোগ মুক্তি ও সুস্থের স্বাস্থ্যরক্ষা এই উভয়ই আয়ুর্ব্বেদের প্রয়োজন। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, ও মোক্ষ এই চতুর্ব্বর্গ সাধনোপায় আরোগ্যের ও প্রাণের বিঘ্নভূত রোগনিচয় হইতে আয়ুর্ব্বেদ রক্ষা করে বলিয়া শাস্ত্র সমূহের মধ্যে আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্র সর্ব্বপ্রধান। হারিত ঋষি বলিয়াছেন “একং শাস্ত্রং বৈদ্যমধ্যাত্মকংবা।” অর্থাৎ একমাত্র শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে হইলে ঐহিক ও পারলৌকিক সুখপ্রদ আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্র কিংবা পারমার্থিক সুখমাত্র প্রদানকারী অধ্যাত্মশাস্ত্র অধ্যয়ন করা কর্ত্তব্য।

দূরদর্শী মহর্ষিগণের গভীরগবেষণালব্ধিকার অমৃতময় ফল, জ্ঞান ও বিজ্ঞানের

আদর্শ, জ্বালাময় সংসারের শান্তিবারিরূপ সেই মঙ্গলময় আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্র, এখন একপ্রকার অপাঠ্য। অনন্তরত্ন প্রসবিনী ভারত ভূমির অতি গৌরবের সেই উজ্জ্বলতম রত্ন এখন ধূলিধূসরিত নিষ্প্রভ। পক্ষান্তরে অরক্ষক বালকের ন্যায় ঘৃণিত, লাঞ্ছিত পদদলিত ও তিরস্কৃত। স্তন্য বিহীন দুগ্ধপোষ্যের ন্যায় পরমুখাপেক্ষী ও শ্রীহীন। “না যায় প্রাণ কাকুতি সার।” অবস্থায় জীর্ণ শীর্ণ ও দীন ভাবে কোন প্রকারে যেন এখনো জীবিত আছে।

যখন জর্ম্মন, গ্রীস ইটালি ও ইউরোপ ঘোর অজ্ঞান তমসাচ্ছন্ন, যখন আমেরিকার আকাশে ধর্ম্ম কি বিজ্ঞানের ক্ষুদ্র তারকাও ফোটে নাই, যখন আধুনিক সভ্যতাভিমানী অন্য দেশীয় ব্যক্তিগণ নগণ্য এবং বন্যপশুর ন্যায় জঘন্য ছিল। তখন ভারতভূমি দিব্য প্রভায় উদ্ভাসিত। তখন ভারতাকাশে বিজ্ঞান ও ধর্ম্মের মধ্যাহ্ন তপন বিরাজিত। তখন ভারত পদপ্রান্তে কত ধনের কাঙ্গাল, জ্ঞানের কাঙ্গাল বিলুণ্ঠিত ছিল। যে গ্রীস বিজ্ঞানের জননী বলিয়া ইউরোপবাসী জন সাধারণ বহুকাল বিশ্বাস করিয়া আসিতেছিলেন। পুরাতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণের গভীর অনুসন্ধানের ফলে সেই গ্রীস অপহৃত ভারতবর্ষীয় বিজ্ঞান বালকের পালয়িত্রী ধাত্রীরূপে স্থিরীকৃত হইয়াছে। পরন্তু ভারত ভূমিকেই তাঁহারা একবাক্যে বিজ্ঞানের প্রসূতি বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন।

অধুনা এদেশে যত প্রকার চিকিৎসাশাস্ত্র প্রচলিত আছে, আমাদের মতে এদেশীয়ের পক্ষে বিদেশীয় চিকিৎসা শাস্ত্রাপেক্ষা আমাদের আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্র অত্যুৎকৃষ্ট আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রে চিকিৎসা আটভাগে বিভক্ত হইলেও কায় চিকিৎসা এবং অস্ত্র চিকিৎসা এই দুইটিই প্রধান। তন্মধ্যে অস্ত্রচিকিৎসা প্রণালী আমরা প্রায় ভুলি ভুলি হইয়াছি। যদিও সুশ্রুতসংহিতা ভারতবর্ষে অস্ত্রচিকিৎসা সম্বন্ধে অতীতের সাক্ষ্য দিতেছে এবং প্রাধান্যের প্রমাণ দেখাইতেছে। তথাপি বহুকালের অনালোচনায় বর্ত্তমান অস্ত্রচিকিৎসায় ইউরোপীয় চিকিৎসাশাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতগণের তুলনায় আমরা অত্যন্ত হীন বিবেচিত হইব তাহার সন্দেহ নাই। সুতরাং অস্ত্রচিকিৎসা সম্বন্ধে এখন তাঁহাদের অনুশরণ করা আমাদের সর্ব্বোভাবে কর্ত্তব্য। পক্ষান্তরে কায় চিকিৎসা সম্বন্ধে সমালোচনা করিতে গেলে আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা যেমন সম্পূর্ণ দোষ শূন্য, উপযোগিনী ও ফলবতী অন্যকোন চিকিৎসাই তেমন নহে। আয়ুর্ব্বেদাচার্য্যগণ নিঃস্বার্থ পরোপকার পরায়ণ, দূরদর্শী ও নির্দ্দোষ হিতাকাঙ্ক্ষী ছিলেন সুতরাং অপরাপর চিকিৎসকগণের ন্যায় উপস্থিত রোগ নিবারণ মাত্র তাঁহাদের চিকিৎসার লক্ষণ নহে। তাঁহারা বলেন ঃ—

"ঘাতূদার্ণং শময়তি নান্যং ব্যাধিং কারাতি চ।

সা ক্রিয়া নতু যা ব্যাধিং হরত্যন্যমুদীরয়েৎ ॥"

অর্থাৎ যে ক্রিয়া উপস্থিত ব্যাধি বিনাশ করে. অথচ অন্য প্রকার ব্যধি জন্মায় না তাহাই চিকিৎসা। উপস্থিত ব্যাধি বিনাশ পূর্ব্বক যদি অন্য ব্যাধির প্রকোপ বৃদ্ধি করে কিম্বা ভবিষ্যৎ তজ্জন্য অন্যব্যাধি জন্মিবার হেতু থাকে তাহা হইলে ঐ ক্রিয়া চিকিৎসা শব্দ বাচ্যা নহে। এরূপ ভবিষ্যৎ ভাবিয়া কার্য্য কার নিখিল জ্ঞানশালী মহর্ষিগণ ভিন্ন ভ্রম প্রমাদপূর্ণ সাধারণ মানবের সাধ্য কি? আমরা পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রভাবে বিষয় বিশেষে কিঞ্চিৎ জ্ঞান লাভ করিতেছি বটে কিন্তু ক্রমে শারীরিক ও মানসিক বল হারাইতেছি। ক্রমে আমরা মনুষত্ব বিহীন হইয়া পড়িতেছি। ক্রমে আর্য্য ঋষিগণের অনুমোদিত কার্য্যকলাপের প্রতি বীতশ্রদ্ধ ও আর্য্যধর্ম্মে অবিশ্বাসী হইতেছি। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ প্রদত্ত নীল রং এর চসমা চোখে দিয়া বিশুদ্ধ শুভ্রকান্তি স্ফটিককেও নীলবর্ণ দেখিতেছি, বিশ্বাস করিতেছি ও বুঝাইতেছি। বিমল জ্ঞানাভাবে আমরা এখন কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণে অক্ষম, নেশাখোরের ন্যায় দিশাহারা, পাণ্ডু রোগীর ন্যায় ভ্রম বিশ্বাসী।

আয়ূর্ব্বেদীয় শরীর-চিকিৎসা, চিকিৎসা জগতে অতুলনীয়া। যত প্রকার চিকিৎসাশাস্ত্র আবিস্কৃত ও প্রচলিত হইয়াছে তন্মধ্যে আয়ূর্ব্বেদোক্ত চিকিৎসা নির্দ্দোষিতায় ও স্থায়ীফলে অদ্বিতীয়া। শীত প্রধান দেশীয় চিকিৎসা প্রণালী এবং তদ্দেশজ ঔষধ সমূহ উষ্ণপ্রধান ভারতবাসীর পক্ষে সম্যক্ উপযোগী নহে পক্ষান্তরে পরিণাম বিষময়। কোথাও ঠেকিয়া কোথাও সাক্ষাৎ ফল দেখিয়া এ সমস্ত কথা এখন বুঝিবার কাহারো বাকী নাই। দুঃখের বিষয় আমরা বিচার বিতণ্ডার সময় যেমন বুঝি কার্য্যকালে তেমন বুঝি না। বুঝিনা বলিয়াই আমাদের দেশে প্রচুর অথচ উৎকৃষ্ট ও উপযোগী ঔষধ বর্ত্তমান থাকিতে আমরা সাত সমুদ্র তের নদী পার ইউরোপ, আমেরিকা, জর্ম্মানী প্রভৃতি দেশের প্রতি সতৃষ্ণনয়নে চাহিয়া থাকি। বুঝিনা বলিয়াই আমরা বিদেশীয় ঔষধ ব্যবহারে ক্রমে স্বাস্থ্য সুখে জলাঞ্জলি দিতেছি ও অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িতেছি। বুঝি না বলিয়াই আমরা ঘরের অমুল্য রত্নে যত্ন না করিয়া পরের কাচদ্রব্য লাভে লালায়িত হইতেছি। বুঝি না বলিয়াই ঘরের অমৃত-ভাণ্ড পায়ে ঠেলিয়া পরের আপাতত সুখকর বিষভাণ্ড সাদরে কিনিয়া আনিতেছি এবং ব্যবহারে দিন দিন শৌর্য্য বীর্য্য বিহীন হইয়া সোণার সংসার অশান্তির আগার করিয়া তুলিতেছি। বুঝি না বলিয়াই ঘরের সদ্য প্রস্তুত অন্নে উপেক্ষা করিয়া পরের বাসী অন্নের ভিখারী হইয়াছি এবং তাহাই প্রাণরক্ষক ও সুখকর বোধে সাগ্রহে

গ্রহণ করিয়া অকালে কাল কবলে কবলিত হইতেছি।

আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রে ঔষধ ও রোগ নির্ব্বাচন প্রণালী অতি উৎকৃষ্ট। ঔষধগুলি সহজলভ্য ও বিকৃতি বিষম সমুবায় দোষশূন্য। সুতরাং প্রস্তুত কি প্রয়োগকালে বুঝিবার ক্রটীতে কি অনবধানতায় সামান্য ব্যতিক্রম ঘটিলেও রোগীর প্রাণের জন্য হতাশ হইতে হয় না। অনেকগুলি দ্রব্যের একজাতীয় গুণের সমাবেশে প্রস্তুত হওয়ায় ঔষধগুলি অত্যন্ত বীর্য্যশালী হইয়া থাকে। যথা শাস্ত্র প্রস্তুত ঔষধ যথোপযুক্ত রোগে ব্যবহৃত হইলে ইহার সুফলও অবশ্যম্ভাবী।

প্রচার।

ব্রহ্মা দক্ষ প্রজাপতির নিকট, আয়ুর্ব্বেদের সমস্ত জ্ঞাতব্য বিষয় লক্ষ শ্লোকে বর্ণনা করেন। প্রজাপতির নিকট অশ্বিনী কুমার দ্বয়, অশ্বিনী কুমার দ্বয়ের নিকট ইন্দ্র লোকহিতকর মহার্থযুক্ত আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্র যথাবিধি অধ্যয়ন করেন। ইন্দ্রের নিকট ধন্বন্তরি ও ভরদ্বাজ ঋষি অধ্যয়ন পূর্ব্বক অন্যান্য ঋষিগণকে অধ্যয়ন করান। ধন্বন্তরি সুশ্রুত, ঔপাধিনব, বৈতণ, ঔরভ্র, পৌষ্কনাবত প্রভৃতি ঋষিগণকে এবং ভরদ্বাজ ঋষি অগ্নিবেশ ভেল, জতূকর্ণ, পরাশর প্রভৃতি ঋষিগণকে সমস্ত আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র অধ্যয়ন করাইয়াছিলেন। তন্মধ্যে ধন্বন্তরি শল্য (অস্ত্রচিকিৎসা) চিকিৎসা এবং ভরদ্বাজ কায় চিকিৎসা (তৈল, ঘৃত, বটিকা. মোদক ইত্যাদি দ্বারা চিকিৎসা) সম্বন্ধে বিশেষ ভাবে শিষ্যগণকে শিক্ষা দিয়াছিলেন। তৎপরে ঐ সকল ঋষিগণের শিষ্য পরম্পরায় আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্র সর্ব্বত্র বিস্তৃত হইয়া পড়ে।

চরক ও সুশ্রুত।

বর্ত্তমান সময় আয়ূর্ব্বেদীয় যে কয়েকখানি গ্রন্থ পাওয়া যায় তন্মধ্যে চরক ও সুশ্রুত নামক গ্রন্থ দ্বয় সর্ব্ব প্রধান। চরক গ্রন্থে কায় চিকিৎসা সম্বন্ধে এবং সুশ্রুত গ্রন্থে শল্য তন্ত্র (অস্ত্রচিকিৎসা) সম্বন্ধে বিশদ ও বিস্তৃত ভাবে বর্ণিত হইয়াছে। এই গ্রন্থদ্বয় আয়ুর্ব্বেদের নিত্যতা, অভ্রান্ততা, অসীম শক্তিমত্তা ও অলৌকিকতা প্রমাণ করিতেছে। চিকিৎসা শাস্ত্রে এরূপ সর্ব্বাঙ্গ সম্পন্ন, সফল গ্রন্থ পৃথিবীর কোনও দেশে আছে বলিয়া এযাবৎ জানা যায় নাই। সহস্র সহস্র বৎসর পূর্ব্বে জীর্ণ পর্ণ কুটীরে বসিয়া ঋষিগণ যাহা বলিয়াছিলেন। এখনো একভাবেও অভ্রান্ত-রূপে তাহাই চলিতেছে। তাহার পরিবর্ত্তন নাই। তাহাতে অব্যাপ্তি অতিব্যাপ্তি দোষ নাই। প্রত্যেক ব্যাকের সারবত্তা প্রতিক্ষণে সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ করিয়া চিকিৎসা জগৎ মুগ্ধ হইতেছে।

কাল।

সেই চরক ও সুশ্রুতাদি গ্রন্থ কতকাল পূর্ব্বে প্রণীত হইয়াছে তৎসম্বন্ধে সম্পুর্ণ

নিদর্শন না থাকিলেও অন্ততঃ ৪০০০ হাজার বৎসর পূর্ব্বে যে প্রণীত হইয়াছে, তাহার অকাট্য নিদর্শন অনেক আছে। প্রয়োজন বোধ করিলে আমরা প্রমাণ করিয়া দিতে প্রস্তুত আছি।

অস্ত্র চিকিৎসা।

অনেকের বিশ্বাস আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে অস্ত্র চিকিৎসা নাই। যাঁহারা সুশ্রুত সংহিতার আলোচনা করিয়াছেন তাঁহাদের ঐরূপ বিশ্বাস আদৌ জন্মিবার কারণ নাই। সাধারণের কৌতুহল নিবৃত্তি জন্য বারান্তরে আমরা তাহার আলোচনা করিব। আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্র অস্ত্র চিকিৎসায় কত দুর অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিল পাঠকগণ অভিনিবেশ পূর্ব্বক আলোচনা করিলে বিস্মিত হইবেন ও আয়ুর্ব্বেদের ভূয়সী প্রশংসা করিবেন সন্দেহ নাই।

—o—

বঙ্গ ভাষা।

লেখিকা—শ্রীমতী নগেন্দ্র বালা সরস্বতী।

আধেক ঘোমটা খানি খুলি ধীরে ধীরে,
তন্দ্রালস মগ্ন আঁখি বিস্ফারিত করি
নব বধূটীর প্রায় চাহিতেছ ফিরে-
লইয়া তৃষিত প্রাণ কত আশা ধরি।
দূর ভবিষ্যৎ পানে রয়েছ চাহিয়া
অজানিত ভক্ত বৃন্দে সঙ্কেতি অঙ্গুলি,
সাজাইতে নববেশে বুঝিগো ডাকিয়া-
আদেশিছ সযতনে, চারু পুষ্প তুলি।
গাঁথিয়া সুচারু মালা ও কোমল কায়-
বাণী-বর-পুত্র-দল যেই ফুল দামে
সাজাইয়া চিরতরে সুচারু ছটায়
মরিয়া অমর চির জপি যেই নামে।
সেই দিন কতদিনে উদিবে ধরায়,
সাজিবে যে দিন তুমি বরেণ্য ছটায়।

—•o—

সরস্বতী-স্তোত্রম্

(পদ্মপুরাণোদ্ধৃতম্)

কবিভূষণ শ্রীপূর্ণচন্দ্র দে কাব্যরত্ন উদ্ভটসাগর বি-এ

(১)

শ্বেতপদ্মাসনা দেবী শ্বেতপুষ্পোপশোভিতা।
শ্বেতাম্বরধরা নিত্যা শ্বেতগন্ধানুলেপনা॥
শ্বেত-পদ্মে স্থিতি তব দেবি সরস্বতি!
শ্বেত-পুষ্পে মনোহর তোমার মূরতি।
শ্বেত-বস্ত্র-পরিহিতা, তুমি নিত্য ধন,
শ্বেত-বর্ণ-গন্ধ-দ্রব্যে তব বিলেপন!

(২)

শ্বেতাক্ষী শ্বেতহস্তা চ শ্বেতচন্দনচর্চ্চিতা।
শ্বেতবীণাধরা শুভ্রা, শ্বেতাভরণভূষিতা॥
শ্বেত-বর্ণ নেত্র দুটী জননি! তোমার,
শ্বেত-বর্ণ তব দুটী হস্ত অনিবার।
শ্বেত-বর্ণ চন্দনেই কর বিলেপন,
শ্বেত-বর্ণ বীণা করে করহ ধারণ।
শ্বেত-বর্ণ দেহখানি ধর মা সতত!
শ্বেত-বর্ণ অলঙ্কারে তুমি সুশোভিত,

(৩)

বন্দিতা সিদ্ধগন্ধর্ব্বৈরর্চ্চিতা দেবদানবৈঃ।
পূজিতা মুনিভিঃ সর্ব্বৈঃ ঋষিভিঃ স্তূয়তে সদা॥
কিবা দেব দৈত্য সিদ্ধ গন্ধর্ব্ব সকল
সকলেই বন্দে তব চরণ কমল।
মুনিগণ তব পূজা করে অনিবার,
ঋষিগণ স্তুতি-গান করে মা তোমার!

(৪)

স্তোত্রেণানেন তাং দেবীং জগদ্ধাত্রীং সরস্বতীম্।
যে স্মরন্তি ত্রিসন্ধ্যায়াং সর্ব্বাং বিদ্যাং লভন্তি তে॥
তুমি এই ত্রিভুবন-রক্ষার কারণ
তন্ময় হইয়া মাগো! যে সকল জন
তিন সন্ধ্যা ধরি করে স্মরণ তোমার,
সর্ব্ব শাস্ত্রে তাহাদের হয় অধিকার!

---*---

গর্ভিণী বা প্রসূতির খাদ্য।

লেখক—শ্রীবিপ্রদাস মুখোপাধ্যায়।

জীবের দেহ বা জীবন রক্ষার একটী প্রধান উপাদান খাদ্য বা আহার। খাদ্য ব্যতীত জীব, কোন প্রকারেই জীবন-ধারণ করিতে সমর্থ হয় না। এই জন্যই অসাধারণ ধীশক্তি সম্পন্ন মহর্ষি সুশ্রুত বলিয়াছেন ঃ—

"লোকস্যাহারঃ স্থিত্যুৎপত্তি বিনাশ হেতুঃ। আহারা দেহাভিবৃদ্ধির্বলমারোগ্যং বর্ণেন্দ্রিয়প্রসাদশ্চ তথাহারবৈষম্যাদস্বাস্থ্যঞ্চ।"

অর্থাৎ আহার দ্বারা স্থিতি, উৎপত্তি এবং বিনাশ প্রাপ্ত হয়। আহার হইতেই দেহের বৃদ্ধি; আহার হইতেই বল; আহার হইতেই আরোগ্য; এবং আহার হইতেই বর্ণ ও ইন্দ্রিয়-সমূহের প্রসন্নতা সংসাধিত হয়। আবার আহারের বৈষম্যেই স্বাস্থ্য বা জীবন বিনষ্ট হইয়া থাকে। ফলতঃ, জীবন-রক্ষণ ও উপভোগক্ষম করিতে হইলে, সর্ব্বাগ্রে খাদ্যাখাদ্য বিষয়ে দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। দেশ, পাত্র কাল, এবং

অবস্থা ভেদে খাদ্যদ্রব্য নির্ব্বাচন করিতে হয়। খাদ্য বা আহার সম্বন্ধে আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র প্রধানতঃ তিনটী নিয়ম নির্দ্দেশ করিয়াছেন ঃ—

হিতাশী স্যান্মিতাশীস্যাৎকালভোজী জিতেন্দ্রিয়ঃ।

অর্থাৎ হিতাহার, পরিমিতাহার এবং উপযুক্ত সময়ে আহার, এই ত্রিবিধ নিয়মের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া চলিলে, মানব দীর্ঘজীবন এবং স্বাস্থ্যবান্ হইতে সমর্থ হয়েন। যে সকল খাদ্য আহার করিলে, স্বাস্থ্য অব্যাহত থাকে, তাহাকে হিতাহার কহে। যে পরিমিত খাদ্য আহার করিলে, ক্ষুধা নিবৃত্তি এবং তৃপ্তি বোধ হয়, তাহাই পরিমিতাহার। আর আহার সম্বন্ধে একটী নির্দ্দিষ্ট সময় থাকা আবশ্যক। এই ত্রিবিধ নিয়ম পালন না করিয়া চলিলে, দেহ কখনই সুস্থ থাকিতে পারে না। অসুস্থ দেহ যে বিড়ম্বনা স্বরূপ, একথা কাহাকেও বুঝাইয়া দিতে হয় না।

দেহের অবস্থা ভেদেও আবার খাদ্য সম্বন্ধে বিশেষ বিশেষ বিধি অবলম্বন করিতে হয়। সুস্থাবস্থায় যাহা হিতকর, রুগ্নাবস্থায় তাহাই আবার বিষময় হইয়া থাকে। স্ত্রীলোকেরা সচরাচর যাহা আহার করিয়া থাকেন, গর্ভকাল বা প্রসবান্তে ঠিক সেইরূপ খাদ্য ব্যবহার করিলে, নানাবিধ অসুখ হইবার গুরুতর সম্ভাবনা। এজন্য গর্ভিণী বা প্রসূতির খাদ্য সম্বন্ধে বিশেষরূপ সতর্ক হইতে হয়। বিশেষতঃ গর্ভিণী বা প্রসূতির আহার জনিত কোন প্রকার রোগাৎপত্তি হইলে, গর্ভস্থ বা ভূমিষ্ট শিশুর স্বাস্থ্য বিনষ্ট হইবার গুরুতর আশঙ্কার কথা। হৃষ্টপুষ্ট বলিষ্ট শিশুর দীর্ঘজীবন কামনা করিতে হইলে, সর্ব্বাগ্রে জননীর স্বাস্থ্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হয়। ফলকথা কণ্টকময় বন বৃক্ষ হইতে সুমিষ্ট আঙ্গুর ফল অন্বেষণ করা, আর অসুস্থ রোগক্লিষ্ট জননী হইতে সুস্থ-শরীর দীর্ঘজীবি সন্তানের আশা করা একই কথা। ফলতঃ জননীর স্বাস্থ্যের উপর যে, সন্তানের স্বাস্থ্য ও জীবন সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া থাকে। ইহা বিজ্ঞান-সম্মত সত্য। আমাদের দেশে আজকাল স্ত্রীলোকদিগের খাদ্য সম্বন্ধে বিশেষরূপ দৃষ্টি নাই। সংসার মধ্যে নিত্য যে সকল খাদ্য দ্রব্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে। পুরুষেরাই প্রায় তাহার সারভাগ গ্রহণ করিয়া থাকেন। তাঁহাদিগের ভোজনাবশিষ্ট যাহা কিছু থাকে, তাহাই নারীগণের খাদ্যে ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়। খাদ্য বিষয়ে এরূপ ঔদাসিন্যই যে, জননী জীবনের স্বাস্থ্যভঙ্গ ও দুর্ব্বলতার একটী প্রধান কারণ, তাহা কাহাকেও যুক্তি দ্বারা বুঝাইয়া দিতে হয় না। সাধারণতঃ আয়ু, স্বাস্থ্য, বল এবং আরোগ্য, খাদ্যের উপর নির্ভর করিয়া থাকে। খাদ্যের দোষে নানাপ্রকার অকল্যাণ সাধিত হয়। বিশেষতঃ যাহাদের স্বাস্থ্যের উপর ভাবী বংশধরগণের

জীবন বা মনুষত্ব সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া থাকে, সর্ব্বাগ্রে তাহাদের খাদ্যের সুব্যবস্থা করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

গর্ভ-ধারণের প্রথম দুই এক মাস আহার সম্বন্ধে বিশেষ কোনরূপ নিয়ম অবলম্বন না করিলে চলিতে পারে। কারণ সে সময় ঋতু-রোধ নিবন্ধন শোণিত-পাত হয় না, এবং গর্ভস্থ ভ্রূণ অত্যন্ত ক্ষুদ্র থাকাতে তাহারও পোষণের জন্য অধিক বলক্ষয় হয় না; সুতরাং গর্ভসঞ্চারের প্রথম অবস্থায় স্ত্রীলোকদিগের বমন ভাব ও মনের চাঞ্চল্য বশতঃ একপ্রকার ক্লেশ হইতে দেখা যায়, তাহার উপর আহার বৈষম্য ঘটিলে, অপকার হইবার গুরুতর সম্ভাবনা। কোন কোন গর্ভিণীর গর্ভের প্রথম অবস্থায় ক্ষুধামান্দ্য অন্তর্দ্দাহ এবং গলা-পোড়ার লক্ষণ দেখা যায়, যখন পাকস্থলীর এরূপ অবস্থা, তখন খাদ্য সম্বন্ধে সতর্কতা অবলম্বন না করিলে, নানাপ্রকার অপকার হইবার কথা। কোন কোন গর্ভিণীর আহারে অরুচি জন্মে, এমন কি খাদ্য দ্রব্যের নাম শুনিলে যেন মনে ভয়ের সঞ্চার হয়। কিন্তু ভগবানের কেমন লীলা, গর্ভস্থ শিশু যেমন গর্ভে নড়িতে চড়িতে থাকে, এবং অঙ্গ চালনার জন্য তাহার দেহ-পোষণের প্রয়োজনীয়তা উপস্থিত হইতে থাকে, সেই সঙ্গে সঙ্গে গর্ভিণীর ক্ষুধা ও আহারে রুচি বৃদ্ধি হইতে দেখা যায়। ফলকথা, গর্ভাবস্থায় আহার বিষয়ে বিচিত্র রুচি পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। কোন কোন গর্ভবতী উপাদেয় খাদ্য পরিত্যাগ করিয়া, কুপথ্যে অভিরুচি প্রকাশ করিতে আনন্দ প্রকাশ করিয়া থাকেন। এমন কি অন্য সময়ে যে সকল খাদ্য দ্রব্যে অপ্রবৃত্তি থাকে, গর্ভাবস্থায় তৎসমুদায় অমৃতজ্ঞান করিয়া থাকেন। কিন্তু কি গর্ভাবস্থায় কি প্রসবান্তে লঘু অথচ পুষ্টিকর- খাদ্যই স্ত্রীলোকদিগের পক্ষে ব্যবস্থা করা আবশ্যক। এজন্য অনেক বিজ্ঞ চিকিৎসকদিগের অভিমত সুমাছের ঝোল এবং দুগ্ধ এই অবস্থার পক্ষে অতি সুপথ্য মধ্যে পরিগণিত। আর যে সকল ফল আহার করিলে, পেটের পীড়া হইবার সম্ভাবনা না থাকে, সেই সকল খাওয়া ভাল। গর্ভাবস্থায় অল্প পরিমাণে তেঁতুল ও কমলালেবু খাইতে দিলে, পিপাসা নিবারিত হইয়া; মৃদু জোলাপের কার্য্য করিয়া থাকে।

গর্ভিণী বা প্রসূতিকে দুষ্পাচ্য গুরুপাক খাদ্য-দ্রব্য আদৌ খাইতে দেওয়া উচিত নহে। আর প্রতিদিন একই খাদ্য না দিয়া, মধ্যে মধ্যে তাহার পরিবর্ত্তন করিয়া দেওয়া ভাল। গর্ভাবস্থায় কোষ্ঠ কঠিন হইলে, আহার বিষয়ে দৃষ্টি রাখিতে হয়। আর মধু আমের আচার, আঙ্গুর ফল এবং অল্প পরিমাণে গুড় খাইতে দিলে, কোষ্ঠের সরলতা সাধিত হইতে দেখা যায়। প্রত্যেক গর্ভিণীর ইহা মনে রাখা আবশ্যক যে, গর্ভাবস্থায় কোষ্ঠ পরিষ্কার থাকিলে প্রসবকালে প্রায় কষ্ট ভোগ করিতে হয় না। কোষ্ঠ কাঠিন্যই যে, দীর্ঘকালস্থায়ী প্রসব-বেদনার একটী কারণ, অনেক বিজ্ঞ চিকিৎসকের ইহাই অভিমত।

অনেক গর্ভিণীকে দেখা যায়, গর্ভ হইলে, তাঁহারা আদৌ পরিশ্রম করিতে ইচ্ছা করেন না। গর্ভকালে অতিরিক্ত পরিশ্রম অথবা এককালে শ্রম বর্জ্জন এ উভয়ই সম্পূর্ণ দূষণীয়। কিন্তু ইহা মনে রাখা আবশ্যক যে, গর্ভাবস্থায় সম্ভব-মত অঙ্গচালনা না করিলে, ক্ষুধামন্দ্য হইয়া থাকে; এই ক্ষুধামান্দ্য হইতেই অজীর্ণতা ও কোষ্ঠবদ্ধতা উৎপন্ন হয়। ফলতঃ এই কোষ্ঠবদ্ধতা প্রসবকালে ভয়ানক কষ্টের কারণ হইয়া উঠে। এ সংসারে নিষ্কর্ম্মা রমণীরাই অধিক পরিমাণে কষ্টভোগ করিয়া থাকেন।

কোন দূরদর্শী বিজ্ঞ চিকিৎসক বলিয়াছেন :—

গর্ভিণী বা প্রসূতি যদি সুস্থ ও প্রফুল্ল থাকিতে ইচ্ছা করেন, আর সন্তানের সুস্থ দেহ ও দীর্ঘজীবন দেখিতে মানস করেন, তবে নিয়মিত পরিশ্রম সহকারে গুরু-পাক খাদ্য ত্যাগ এবং লঘু অথচ পুষ্টিকর খাদ্য দ্রব্য ব্যবহার করিবেন। খাদ্য সম্বন্ধে আর একটী দোষাবহ প্রথা দেখিতে পাওয়া যায়, অনেকের মনে বিশ্বাস এই যে, অল্প অল্প করিয়া অনেকবার আহার করা ভাল। কিন্তু এ বিশ্বাসটী যে সম্পূর্ণ ভুল, তাহা জানা আবশ্যক। কারণ অন্যান্য অঙ্গের ন্যায় পাকস্থলীরও কিঞ্চিৎ বিশ্রাম দেওয়া আবশ্যক। নতুবা ক্রমাগত আহার গ্রহণ করিলে তাহার বিশ্রামের ব্যাঘাত জন্মিয়া থাকে।

পাকস্থলীর বিশ্রাম না হইলে, পরিপাক কার্য্যের বিশৃঙ্খলা হইয়া উঠে। সুচারু-রূপে পরিপাক না হইলে, অজীর্ণতা রোগ উৎপন্ন হয়। অজীর্ণতা দোষ ঘটিলে, সেই প্রসূতির স্তনপানে শিশুরও পেটের পীড়া জন্মে। যাহা আহার করা যায়, তাহা ভালরূপ জীর্ণ হইলে, দেহে রক্তরূপে পরিণত হয়; আবার সেই রক্ত হইতেই শিশুর জীবন রক্ষণোপযোগী দুগ্ধ জন্মে; অথবা গর্ভাবস্থায় দেহে রক্ত না থাকিলে, সন্তানের শরীর পোষণ হইবে কেন? রক্তই এক প্রকার জীবন বলিলেই হয়। এই জন্যই কবি গাইয়াছেন :—

"আদি উৎস মাতৃ-স্তনে দুগ্ধ-রস পাই,
শোণিতের হেতু খাদ্য-সংগ্রহ সদাই,
শোণিতে জীবের সৃষ্টি,
শোণিতে দেহের পুষ্টি,
অস্থি, মাংস, পেশী, ত্বক্ শিরা নক চুল—
সব উপকরণের রক্ত হয় মূল॥"

———

সধবা।

লেখক—শ্রীকুমুদ রঞ্জন মল্লিক বি, এ,

দাঁড়াও আসিয়া দ্বারে,
মুছাও মুছাও নয়নের জল
সধবা যেতেছে পারে।
আলতা রাঙানো পদ
যেন লাল কোকনদ,
রাঙা পেড়ে সাড়ী তনু আছে ঘেরি
বুক ঢাকা ফুল হারে,
দেখ গো আসিয়া দ্বারে।

(২)

দেখ দেখ আঁখি ভরি,
কণক প্রদীপ নিভিয়া যেতেছে
ভবন আঁধার করি।
শুভ সিন্দূর রেখা
ললাটে যেতেছে দেখা
চারু সীমন্ত সিন্দূর রাঁগে
লেপিয়া দিয়াছে মরি,
দেখ দেখ আঁখি ভরি।

(৩)

ওই দেখ যায় দেখা
সুন্দর করে অক্ষয় লোহা
যুগ্ম ঢাকাই শাঁখা।
দেখরে মাধুরী কিবা
যেন প্রসাদী রক্ত জবা,
ওই ভেসে যায় আদি গঙ্গায়
শ্বেত চন্দন মাখা
ওই দেখ যায় দেখা।

(৪)

ফেলোনা নয়ন জল,
সধবা যেতেছে হিন্দু রমণী
দুখ কিরে তায় বল।
পশে নাই কীট বুকে
কালিমা পড়েনি মুখে
বেচেনি' এয়োত' মুছেনি সিঁদুর
এ মরণ নিরমল!
ফেলোনা নয়ন জল।

(৫)

জোরে বল হরি হরি!
চলে সধবার বিদায় মঞ্চ
ভুবন উজল করি,
সাথে সাথে যায় পতি,
তনয় কোমল মতি
'মা' 'মা' রবে লুটায় ধরায়
কাঁদিছে ধুলায় পড়ি
জোরে বল হরি হরি!

(৬)

বল হরি হরি বোল
শঙ্খ ধ্বনিতে ডুবাইয়া দাও
গৃহ ক্রন্দন রোল।
অবশ নয়ন জল
ঝরুক্ না অবিরল,
হুলু ধ্বনিতে মিশাইয়া দাও
হৃদয়ের শত গোল!
বল হরি হরি বোল।

(৭)

জলে উজ্জ্বল চিতা
ধূমের মাঝারে ফুটিয়া রয়েছে

সিন্দুর ভরা সিঁতা!
বাজাও শঙ্খ খানি,
দাও দাও হুলু ধ্বনি,
কেঁদোনা কেঁদোনা যাক্ পুড়ে যাক্
হোমের অপরাজিতা
জ্বলে উজ্জ্বল চিতা।

—০০—

সাহিত্যালোচনা।

সাহিত্য সমালোচনা যে কিরূপ গুরুতর দায়িত্বপূর্ণ কার্য্য, তাহা যিনি প্রকৃত সমালোচক, তিনিই বুঝিতে পারেন। দুঃখের বিষয় আজিকালিকার সাহিত্যের বাজারে সেরূপ সমালোচক অতি অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু তাই বলিয়া সমালোচনার অভাব নাই। যিনি সাহিত্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া একটুমাত্র স্থান অধিকারে সমর্থ হইয়াছেন, তিনিই বিজ্ঞভাবে এক আধটু সমালোচনা দ্বারা আপনার হস্তকণ্ডুয়তি ও হৃদ্গত বিদ্বেষ বা আগ্রহের নিবৃত্তি করিয়া থাকেন। শুনিতে পাওয়া যায়, আজিকালিকার সাহিত্যের বাজারে সমালোচনার ক্রয় বিক্রয়ও হইয়া থাকে। ইহার ফলে সমালোচনার উপর সাধারণের একটা অশ্রদ্ধা ও উপেক্ষার ভাব দাঁড়াইয়াছে। যে সমালোচনা দ্বারা সাহিত্যের উন্নতি ও অবনতি সংশাধিত হয়, তাহার এইরূপ দুর্দ্দশা নিতান্ত ক্ষোভের বিষয় নহে কি?

একশ্রেণীর সমালোচক আছেন, তাঁহারা মনে করেন যে, কেবল কঠোর সমালোচনাই সু-সাহিত্য প্রচারের উপায়। কিন্তু এ কথা যে যথার্থ নহে, তাহা তীব্র সমালোচক বঙ্কিম বাবু স্বয়ং স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। এইরূপ রূঢ় সমালোচনা দ্বারা অনেক উদীয়মান প্রতিভা যে অকালে বিনষ্ট হইয়া যায়, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। অপিচ, কেবল পক্ষপাতপূর্ণ প্রশংসা সূচক সমালোচনাও যে প্রকৃত সাহিত্য প্রচারের উপযোগী নহে, অধুনাতন বঙ্গসাহিত্য ক্ষেত্রের দুর্গতি দর্শন করিলেই তাহার যাথার্থ্য উপলব্ধি হইবে। অতএব কেবল রূঢ় ভাষা প্রয়োগ বা অযথা প্রশংসাবাদই সমালোচনার উদ্দেশ্য নহে। তাহার

উদ্দেশ্য অতিমহৎ এবং গুরুতর। এক মাত্র নিরপেক্ষ সমালোচনাই প্রকৃত সাহিত্য প্রচারের প্রধান সহায় এবং সাহিত্যিকের পথ প্রদর্শক।

প্রকৃত সমালোচকের কার্য্য কি? তাঁহার কার্য্য যেমনই দুরূহ, তেমনই দায়িত্বপূর্ণ। সমালোচকের কার্য্য লেখকের ভাব সম্যক্‌রূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়া নিরপেক্ষ ভাবে তাহার দোষ এবং গুণ উভয়েরই প্রদর্শন। গুণাংশের সমালোচনা দ্বারা লেখককে উৎসাহ প্রদান এবং দোষভাগ প্রদর্শন দ্বারা লেখককে তদ্বিষয় হইতে সাবধান ও শিক্ষা প্রদান করাই সমালোচনার উদ্দেশ্য। এইরূপ সমালোচনাই যে সু-সাহিত্য প্রচারের একমাত্র উপায়, তদ্বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই। কিন্তু বঙ্গ-সাহিত্যের বড়ই দুর্ভাগ্য যে, এরূপ সমালোচনা বা সমালোচক অধুনা একান্ত দুর্লভ। এই জন্যই বোধ হয়, বঙ্গ-সাহিত্য ক্ষেত্র অনেক পূতিগন্ধময় জঙ্গলে পূর্ণ হইয়াছে এবং উৎসাহের অভাবে অনেক উজ্জ্বলরত্ন একবার মাত্র দীপ্তি বিকাশ করিয়াই সাহিত্য গগণ হইতে অন্তর্হিত হইতেছে।

উপরে যে কথাগুলা বলিলাম, তাহার একটা কারণ আছে। একখানি নবপ্রকাশিত উপন্যাসের একটু সমালোচনার জন্যই আমার এই বিস্তৃত ভূমিকার অবতারণা। সমালোচনাই বা বলি কেন, কিঞ্চিৎ আলোচনা মাত্র। কারণ সমালোচকের উচ্চ পদে আপনাকে বসাইতে আমাদের শক্তি বা সাহস নাই। এস্থলে ইহাও বলা আবশ্যক যে, আমি ইচ্ছা পূর্ব্বক এই আলোচনারূপ দুরূহ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে অগ্রসর হই নাই, কেবল কোন কোন বিজ্ঞ সমালোচকের এই পুস্তক খানির উপর পক্ষপাতপূর্ণ অযথা সমালোচনা এবং আমার পুস্তক পাঠ জনিত তৃপ্তি বা আগ্রহে এই কার্য্যে প্রবর্ত্তিত করিয়াছে। দোষটা কাহার, তাহা বিবেচ্য।

আমার আলোচ্য উপন্যাস খানির নাম "বীরপূজা"। সাহিত্য সম্রাট্ বঙ্কিম-চন্দ্রের ভ্রাতুষ্পুত্র এবং বর্ত্তমান কালের অদ্বিতীয় উপন্যাস লেখক—শ্রীযুক্ত দামোদর মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের জামতা শ্রীযুক্ত শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ইহার লেখক। লেখক একজন সুশিক্ষিত। এরূপ ব্যক্তির লিখিত গ্রন্থের সমালোচনা আমার দ্বারা হইতেই পারে না। সুতরাং এই কার্য্যে অগ্রসর হওয়া যে আমার পক্ষে ধৃষ্টতার পরিচয় মাত্র তদ্বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই। তবে আমার এই সমালোচন প্রবৃত্তির কারণটা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। পূর্ব্বাপর কারণ দেখিয়া গ্রন্থকার যে আমার এই ধৃষ্টতা মার্জ্জনা করিবেন, এরূপ ভরসাও বোধ হয় করিতে পারি।

গ্রন্থ খানি ক্ষুদ্র, ঐতিহাসিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইলেও ইহা সম্পূর্ণ

কাল্পনিক ; তথাপি যে কোন কোন সমালোচক কেন ইহাকে ঐতিহাসিক রূপে গ্রহণ করিয়া আপনাদের বিজ্ঞতার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, তাহা তাঁহারাই বলিতে পারেন। তাঁহাদের কথায় আমার কোন প্রয়োজন নাই। গ্রন্থের নায়ক ভবানী প্রসাদ পিতৃব্যের হৃদয়হীন ব্যবহারে নিপীড়িত, পর্য্যুদস্ত পিতৃরাজ্য হইতে নির্ব্বাসিত ভবানী প্রসাদ সহায় হীন আশ্রয়হীন হইয়াও একমাত্র বীরত্বের সহায়েই সংসারে পুনঃ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন, এই জন্যই বোধহয় গ্রন্থকার ইহার "বীরপূজা" নামকরণ করিয়াছেন। তাঁহার এই নামকরণ সার্থক হইয়াছে। দুই একটী ব্যতীত গ্রন্থোক্ত সকল চরিত্রই যে সুন্দর ও পরিস্ফুট হইয়াছে, তাহা নিশ্চয়। ভবানীপ্রসাদের চরিত্র অতুলনীয়, অলৌকিক। অবশ্যপ্রাপ্য পিতৃসিংহাসনে অধিরোহণ পূর্ব্বক পিতৃব্য অনন্তরাম, ভবানীপ্রসাদকে নানারূপে প্রপীড়িত করিয়া অবশেষে রাজ্য হইতে নির্ব্বাসিত হইবার আদেশ দিলেন। প্রভূত বাহুবলশালী, প্রজাবর্গ ও সৈন্যবর্গের প্রিয়পাত্র, সহায়সম্পন্ন ভবানীপ্রসাদ পিতৃব্যের আদেশের বিরুদ্ধে একটীমাত্র কথা না বলিয়া একবস্ত্র পরিধানে রাজ্য ও দেশ ত্যাগ করিলেন। কিন্তু ইহাতে পিতৃব্যের উপর তাঁহার ভক্তি ও শ্রদ্ধা তিল-মাত্র বিচলিত হইল না। ইহা সাধারণ হৃদয় বলের পরিচয় নহে। তিনি ইচ্ছা করিলে তদ্দণ্ডেই সিংহাসন অধিকার করিতে পারিতেন, কিন্তু ভক্তিমিশ্রিত কর্ত্তব্যের অনুরোধে তাহা করিলেন না। বরং তাঁহার প্রধান সহায় জনৈক সর্দ্দার ও ভৃত্য জনার্দ্দন যখন এ বিষয়ে তাঁহাকে উত্তেজিত করিল, তখন তিনি অকুণ্ঠিতচিত্তে বলিলেন, "পিতা পিতৃব্য" উভয়েই তুল্য গুরু ; তাঁহাদের নিন্দা শুনিলে প্রাণে বড় ব্যাথা পাই। সকল অবস্থায় তাঁহারা আমার পূজনীয়। সিংহাসন কাকার, তিনি থাকিতে আমি কে ? রাজ্য সিংহাসন কিছুই চাই না। যদি কখন কাকা সরল প্রাণে আদর করিয়া আমাকে রাজ্য ভার দেন, তবেই সিংহাসনে বসিব ; নতুবা কালী মাই সাক্ষী, জীবনে কখন সিংহাসনে বসিব না এবং রাজ্য ভার গ্রহণে প্রয়াসী হইব না।" কিন্তু এইখানেই সহিষ্ণুতার পরিসমাপ্তি নহে। নিরাশ্রয়, অসিমাত্র সম্বল ভবানীপ্রসাদ যখন বীরত্বের প্রভাবে আজমীর রাজের সেনাপতি পদে অধিরূঢ় হইলেন, যখন তাঁহার খ্যাতি ও বীরত্বের প্রভাব দেশে দেশে বিঘোষিত হইল তখন তাহা শুনিয়া অনন্তরামের হৃদয় জ্বলিয়া উঠিল। তিনি গুপ্তভাবে ভবানীকে হত্যা করিবার জন্য লোক নিযুক্ত করিলেন। তাহাতেও যখন কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না, তখন অনন্তরাম সসৈন্যে আজমীর রাজ্য আক্রমণ করিলেন। রণস্থলে পিতৃব্যকে দেখিয়া ভবানীপ্রসাদ অস্ত্র ত্যাগ

করিলেন, কেবল তাঁহাকে বিপক্ষের আঘাত হইতে রক্ষা করিতে চেষ্টিত হইলেন। ভাগ্যদোষে অনন্তরাম পরাজিত ও বন্দী হইয়া কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইলেন। ভবানীপ্রসাদ স্বীয় প্রাণের মায়া পরিত্যাগ করিয়া কৌশলে তাঁহাকে কারামুক্ত করিলেন। কিন্তু ঈর্ষাপরায়ণ অনন্তরাম মুক্ত হইয়াও তাঁহাকে অস্ত্রাঘাতে আহত করিতে কিছুমাত্র ইতস্ততঃ করিলেন না। সাংঘাতিক রূপে আহত হইয়াও ভবানীপ্রসাদ এতটুকু বিচলিত বা কাতর হইলেন না ; তিনি কেবল সকাতরে পিতৃব্যকে পলায়ন করিতে অনুরোধ করিতে লাগিলেন। এ দৃশ্যে কোন্ পাষাণ হৃদয় বিগলিত না হয় ? এতক্ষণে বুঝি অনন্তরামের পাষাণ প্রাণ গলিল, এতদিনে তাঁহার হৃদয়ে একটু অনুতাপ আসিল। তিনি ভবানীকে বলিলেন, "ভবানি ! আমি তোমায় মেরেছি—তোমার গা দিয়ে রক্ত ছুটছে। তলোয়ার পড়ে রয়েছে, আমায় মার, নইলে তোমায় আমি খণ্ড খণ্ড করে কাটব।" ইহার উত্তরে ধৈর্য্যের অবতার ভবানী বলিলেন, "মার ক্ষতি নাই, কিন্তু শীঘ্র পালাও।" তারপর অনন্ত-রামকে মুক্ত করার অপরাধে ভবানীপ্রসাদ যখন আজমীর রাজের সম্মুখে বিচারার্থ আনীত হইলেন, তখন তিনি স্বীয় রাজ্যের মমতা পরিত্যাগ করিয়া অনন্তরামের প্রাণ ভিক্ষা করিলেন। অনন্তরামও পুনর্ধৃত হইয়া সেইস্থলে আনীত হইয়াছিলেন। কিন্তু অনন্তরাম এবার আপনার মুক্তির উপায় আপনিই করিলেন। তিনি আত্মহত্যা করিয়া অনুতাপের প্রবলদাহ হইতে রক্ষা পাইলেন। এতদূর ধৈর্য্য ও গুরুভক্তি দেবচরিত্রে ও দুর্ল্লভ নহে কি ? একমাত্র ভবানীপ্রসাদের চরিত্রালোকেই গ্রন্থখানি অত্যুজ্জ্বল ও গৌরবান্বিত হইয়াছে !

এই প্রধান চরিত্রের পরই জয়ন্তের চরিত্র উল্লেখযোগ্য। জয়ন্ত বীর, জয়ন্ত যোদ্ধা, জয়ন্ত প্রেমিক। যে প্রেমে আত্মভোগ নাই, আত্মত্যাগ আছে, যে প্রেমে মোহের মদিরা নাই, অমৃতের স্নিগ্ধধারা আছে, জয়ন্ত সেই প্রেমের প্রেমিক। সে আজমীর রাজতনয়া উর্ম্মিবালাকে ভাল বাসিয়াছিল, প্রাণ দিয়া ভালবাসিয়াছিল। কিন্তু যেদিন সে শুনিল, উর্ম্মিবালা ভবানী প্রসাদের প্রেমার্থিনী, সেইদিন হইতে সে হৃদয়কে সংযত করিল, প্রণয় প্রতিদ্বন্দ্বী ভবানীপ্রসাদের সুখসাধনের জন্য চেষ্টিত হইল। শেষে তাঁহাকে শত্রুহস্ত হইতে রক্ষা করিবার জন্য বিপক্ষের অসিমুখে আত্মপ্রাণ বলিদিল। ভ্রাতৃপ্রেমমুগ্ধ দেবলের ভ্রাতৃভক্তি এবং জনার্দ্দনের প্রভুভক্তি অতুলনীয়। এই চরিত্রদ্বয় যেমন প্রস্ফুট তেমনই হৃদয়গ্রাহী। নারীচরিত্রের মধ্যে প্রমদার চরিত্রই প্রশংসনীয়। তবে বিধবা প্রমদার ভবানীকে ভালবাসাটা ভাল কাজ হয় নাই, আর উর্ম্মিবালার হৃদয়ে হিংসার বহ্নি জ্বালাইয়াও সে কাজটা ভাল

করে নাই। তবে সে ভবানীর জন্য প্রাণদিয়াই বোধ হয় সকল পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছে। আর উন্মিবালার চরিত্রটাও যেন কেমন কেমন লাগিল। লেখক আর একটু সংযতভাবে এই নায়িকার চরিত্রটা চিত্রিত করিতে পারিলেই ইহা সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হইত।

প্রবন্ধ দীর্ঘ হইয়া পড়িতেছে সুতরাং এই স্থলেই ইহার উপসংহার করিয়া পাঠকের ধৈর্য্য রক্ষা করিতে বাধ্য হইলাম। ফল কথা, সূক্ষ্মদর্শী সমালোচকের দৃষ্টিতে দুই একটা দোষ আবিষ্কৃত হইলেও গ্রন্থখানি যে সুন্দর ও উপাদেয় হইয়াছে, ইহা নিঃসন্দেহ। কিন্তু যদি হয়তো তাহাকে বিকৃত ভাবে পাঠকের সমক্ষে উপস্থিত করিলাম। জানিনা, আমার এই সমালোচনা ক্ষমার যোগ্য কি না। গ্রন্থকারের ভাব ও ভাষার ভঙ্গী দেখিয়া আবার বঙ্কিম বাবুর সেই নর্ত্তনশীল ভাষার তরঙ্গ মনে পড়ে। আশাকরি, গ্রন্থকার এইরূপে সাহিত্যসেবা করিয়া পিতৃকুল ও শ্বশুর কুলের কীর্ত্তি বজায় রাখিবেন।

সরস্বতী বন্দনা।

লেখক—শ্রীললিত মোহন পাল।

(১)

নমামি তোমারে দেবি স্বয়ম্ভু নন্দিনি!
বাক্‌দেবি, বীণাপাণি, বেদ প্রসবিনি!
কবিতা জলধি জলে,
ডুবেছি মা ভ্রান্তি ছলে,
কিরূপে তরিব হায় না জানি সাঁতার।

(২)

শুনি আজ শ্রীপঞ্চমী আনন্দের দিন,
তব পূজা ঘরে ঘরে কিবা দীন হীন,
চৌদিকে আনন্দ রোল,
শঙ্খ ঘণ্টা বাদ্য গোল,
মরি কি আনন্দ ধারা আজি বঙ্গ ভূমে,
বহিতেছে অয়ি মাগো বিশ্ব মনোরমে!

(৩)

তাই মা এ দাস তব অকৃতি সন্তান,
কাতরে ডাকিছে বাণি কর কৃপাদান,
কৃপাময়ী তুমি অতি,
আমি মূর্খ মূঢ়মতি,
না জানি তোমার স্তুতি অম্বুজ বাসিনি,
অকূলে উদ্ধার মাগো বিশ্ব-বিমোহিনি।

(৪)

তোমার অপার কৃপা জানি বিশ্ব-রমে,
ডুবেছি সিন্ধুর জলে, দুরাশা তাড়নে,
জয়দেব, কালিদাস,
কাশীরাম, কৃত্তিবাস,
মুকুন্দ, ভারত আদি বঙ্গ কবিগণে,
অমর করিলে মাগো কৃপা-বারি দানে।

(৫)

আমি ও ত গুণ-হীন তোমার সন্তান,
হব না বঞ্চিত আশা তোমার চরণ,
কে কোথা শুনেছে ভবে,
গুণ-হীন পুত্র কবে,
জননীর সুকোমল স্নেহেতে বঞ্চিত?
তাই বলি ক'র না মা চরণে দলিত।

(৬)

উত্তপ্ত তপন তাপে পথিক যেমন,
তাপিত হইয়া যাচে ছায়ার চরণ;
তেমতি সাগর জলে
ডুবিয়া মা এই কালে
লয়েছি আশ্রয় তব সংগীত রূপিণি—
কর কৃপা দাসে মাগো কমলবরণি।

সমালোচনা।

স্বাস্থ্যতত্ত্বম্।—শ্রীযুক্ত কবিরাজ গোবিন্দপ্রসাদ কবিরত্ন কর্ত্তৃক সঙ্কলিত ও প্রকাশিত। আমরা এই পুস্তকখানি প্রাপ্ত হইয়া কবিরাজ মহাশয়কে ধন্যবাদ অর্পণ করিতেছি। স্বাস্থ্য অমূল্যধন; আয়ুর্ব্বেদাচার্য্য মহর্ষিগণ মানবের স্বাস্থ্য বিধানের যে সকল উপদেশ দিয়া গিয়াছিলেন, তাহা নানাস্থানে বিক্ষিপ্ত হওয়াতে সাধারণের তদ্বিষয়ের পূর্ণাঙ্গ এক্ষণে পবিজ্ঞাত হইবার উপায় নাই। কবিরাজ মহাশয় সেই অভাব দূরিকরণার্থ মুল সংস্কৃত বচন ও পারিস্কার বঙ্গানুবাদ সম্বলিত, এই পুস্তক খানি প্রকাশ করিয়াছেন। আহার বিহারাদি স্বাস্থ্য বিজ্ঞানের নিয়ম সমুহ এই পুস্তকে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। প্রধাণতঃ আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র ইহার অবলম্বন হইলেও অপরাপর শাস্ত্রের প্রয়োজনীয় প্রমাণাদিও ইহার মধ্যে সন্নিবেশিত হইয়াছে। দুরুহ শব্দের টিকাও স্থানে স্থানে আছে। তৎব্যতিত ব্যবহার্য্য দ্রব্যের গুণও বর্ণিত হইয়াছে। এতৎপাঠে সাধারণের বিশেষ উপকার হইবে সন্দেহ নাই।

বঙ্গেযুবরাজ।—জনৈক বঙ্গ মহিলা বিরচিত। বঙ্গেযুবরাজের আগমন উপলক্ষে লেখিকা সুললিত কবিতায় এই পুস্তকখানি রচনা করিয়াছেন। বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদে বঙ্গবাসীর মলিনভাব যুবরাজকে জ্ঞাতকরা তাঁহার ইচ্ছা, বেলভেডিয়ার প্রাসাদে রাজবধূকে বরণ করিবার নিমিত্ত কতিপয় হিন্দুমহিলার বিবিআনা বেশে যাত্রা. শাঁকা সাড়ী পরিত্যাগ, এই কথা তুলিয়া গ্রন্থ কর্ত্রী আক্ষেপ প্রকাশ করিয়াছেন, আক্ষেপ ঠিক হইয়াছে। আমরা এই ক্ষুদ্র কাব্যখানি পাঠ করিয়া পরম সন্তোষ লাভ করিয়াছি। কবিতাগুলি সরস সুশ্রাব্য ও সার্থক।

কুসুমগাথা।—শ্রীমতী নগেন্দ্রবালা সরস্বতী বিরচিত। তিনটি স্তবকে ছত্রিশটি কুসুমমাল্য গ্রথিত, প্রথম স্তবকে প্রকৃতি চিত্র, দ্বিতীয় স্তবকে পৌরাণিক চিত্র, তৃতীয় স্তবকে প্রেমচিত্র। নির্ব্বাচিত কুসুমগুলি সুন্দর ও সুবাসিত, আঘ্রাণ লইলে চিত্ত প্রফুল্ল হয়। প্রকৃত চিত্রে "বসন্ত" কুসুমটি অতিমনোহর। শ্রীমতী-নগেন্দ্র বালার কল্পনাশক্তি এখনকার পুরুষ কবিকে পরাজিত করিতেছে।

দুর্গোৎসব।—শ্রীযুক্ত পণ্ডিত আনন্দচন্দ্র তর্কবাগীশ বিরচিত। ইহা সাধারণ দুর্গাপূজাপদ্ধতি নহে, তর্ক বাগীশ মহাশয়ের স্বরচিত ৭৭টি প্রাঞ্জল শ্লোক ও শ্লোকের বিশুদ্ধ বঙ্গানুবাদ এই পুস্তকে সন্নিবেশিত করিয়াছেন। অনুবাদটি সুললিত কবিতায় বিরচিত, মূল ও অনুবাদ উক্ত পণ্ডিত বরের আন্তরিক ভক্তির নিদর্শন, মা দুর্গাকে প্রণাম করিয়া আমরা তর্কবাগীশ মহাশয়কেও প্রণাম করিলাম। পুস্তকের মূল্য আটপয়সা মাত্র।

REGISTERED No. C. 284.

১৪শ বর্ষ।] ১৩১২ সাল। ফাল্গুণ। [৮ম সংখ্যা।

হিন্দুধর্ম্ম ও সমাজের মুখপত্র।

জন্মভূমি

(সচিত্র মাসিক-পত্রিকা ও সমালোচনী)।

	বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
১।	পরম কল্যাণ গীতা	শ্রীমদ শিবনারায়ণ স্বামী ...	২৭০
২।	বঙ্গীয় সমাজ সমালোচনা	শ্রীযুক্ত ত্রিলোচন চট্টোপাধ্যায়	২৭৪
৩।	অভিমান (গল্প)	শ্রীযুক্ত শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	২৭৯
৪।	শ্রীশ্রীকৃষ্ণের বসন্তোৎসব	শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ দত্ত	২৯০
৫।	সীতাষ্টক-স্তোত্রম্	শ্রীযুক্ত হরিহর ভট্টাচার্য্য	২৯৫
৬।	কলেরা প্রতিষেধক	শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	২৯৯
৭।	বিচিত্র প্রসঙ্গ	... ...	৩০০
৮।	বিষম সমস্যা	পরিব্রাজক ...	৩০২
৯।	সাবিত্রী	শ্রীমতী নগেন্দ্র বালা স্বরসতী	৩০৫
১০।	সমালোচনা	শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ বি, এ, ও সম্পাদক।	৩০৬

লেখকগণের মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন।

জন্মভূমি-কার্য্যালয়।

শ্রীনরেন্দ্রনাথ দত্ত দ্বারা প্রকাশিত।
৩৯ নং মানিক বসুর ঘাট ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

বার্ষিক মূল্য ডাঃ মাঃ সমেত ১৷৷০ দেড় টাকা। — প্রতি সংখ্যার নগদ মূল্য ৵১০ পয়সা

শ্রীল শ্রীমন্মহারাজাধিরাজ কাশ্মীরাধিপতি তথা শ্রীল শ্রীযুক্ত মহারাজাধিরাজ
বর্দ্ধমান-প্রদেশাধিপতি বাহাদুরের অনুমোদিত ও অনুজ্ঞাত সুপ্রসিদ্ধ
কবিরাজ শ্রীযুক্ত বিনোদলাল সেন মহাশয়ের

আদি-আয়ুর্ব্বেদ ঔষধালয়।

১১৬ নং লোয়ার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।

কুন্তলবৃষ্য তৈল জগতে অমূল্য ও অতুলনীয়—মস্তিষ্ক স্নিগ্ধকর ও স্মৃতিশক্তি বর্দ্ধক—কেশকলাপের কান্তিপ্রদ—খালিত্য ও পালিত্যনাশে অদ্বিতীয়। কেশের কমনীয়তা কান্তি বৃদ্ধি করিতে, চিত্তের-নিত্যপ্রফুল্লতা অটুট রাখিতে কুন্তলবৃষ্যের তুলনা নাই ইহা অনুপম্ আদি ও অকৃত্রিম্ স্নিগ্ধগুণে কুন্তলবৃষ্যের সমতুল কোন তৈলই এ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই।

বর্ত্তমান ভারতের প্রধান ধর্ম্মসংস্কারক, শান্তি-সুখ-সন্তৃপ্ত-বিলাসভোগ বিমুক্ত আধ্যাত্মিক উৎকর্ষের সমুচ্চ সোপানে সমাসীন—পূজ্যপাদ শ্রীমহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর বলিয়াছেন—যে, কুন্তলবৃষ্য তৈল এতদিন আমাকে রক্ষা করিল, আজ তাহাকে পরিত্যাগ করিতে পারি না।"

কুন্তলবৃষ্য—সাহিত্যসেবিগণের মহোপকারক, কারণ ইহাতে মেধা ও স্মৃতি বৃদ্ধি হয়, চিন্তাশীলতা ও ভাবুকতা নবীভূত ও স্ফুরিত হয়।

এক শিশির মূল্য ১৲ টাকা প্যাকিং ও ডাকমাশুলাদি পাঁচ আনা।

উপহার—কুন্তলবৃষ্যের প্রত্যেক গ্রাহক তৈলের সঙ্গে একখানি করিয়া সুন্দর চিত্র উপহার পাইবেন।

সতর্কীকরণ।—দুষ্ট লোকেরা বড়ই জাল করিতেছে; গ্রাহকগণ সাবধান; আমাদের ঔষধালয় ভিন্ন কোথাও "কুন্তলবৃষ্য" কিনিবেন না, কিনিলেই প্রতারিত হইবেন।

কবিরাজ শ্রীআশুতোষ সেন চিকিৎসক।

"জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী"

(সচিত্র মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী।)

১৪শ বর্ষ। | ফাল্গুন, ১৩১২ সাল। | ৮ম সংখ্যা।

পরম কল্যাণ গীতা।

লেখক,—শ্রীমদ্ শিবনারায়ণ স্বামী।

বিশেষ ব্যবহার।

বিবাহ।

জগতের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন সমাজে নানা প্রকার বিবাহের কল্পিত পদ্ধতি আছে তাহার সীমা নাই, কাহারও সমাজ মধ্যে ৮ প্রকার, কাহারও ৩ প্রকার, কাহারও ৪ প্রকার, ইত্যাদি, কিন্তু ইহা পরমাত্মা ঈশ্বরের নিয়ম নহে, সুবিধা মত সামাজিক ব্যবস্থা করিয়া লইয়াছেন। কিন্তু বিচার পূর্ব্বক মনুষ্য মাত্রেরই এই প্রকারে বিবাহ করা উচিত যাহাতে সহজে কার্য্য সিদ্ধ হয় এবং কোনও প্রকার ক্লেশ না হয়,

কন্যা বা উভয়ের হাতে ফুলের মালা দিবেন। কন্যা বরের গলাতে মালা দিবে ও বর কন্যার গলাতে মালা দিবে (অর্থাৎ মালা বদল করিবে) কন্যার মাতা পিতা কন্যার হাত বরের হাতে এই মন্ত্র বলিয়া দিবেন—

ওঁ পূর্ণপর ব্রহ্মজ্যোতিঃ স্বরূপায় নমঃ।

উভয়ের হস্ত একত্র করিয়া দিলে যথার্থ বিবাহ হইবে! আর যে দেশে একেবারে ফুল পর্য্যন্ত পাওয়া যায় না, সেখানে কেবল মাত্র হস্ত যোগ করিতে হইবে। তাহাতে কোন বিধি নিষেধ ও কোনও চিন্তা নাই। পূর্ণ পরব্রহ্মের নাম স্মরণেতেই সমস্ত বিধিই সম্পূর্ণ হইবে। যে বৎসরে এবং যে মাসে বিবাহ কর, পূর্ণমাসী বা অমাবস্যাতে, দিনে কিম্বা রাত্রিতে যখন হয় বিবাহ করিবে! আর বিবাহের সময়ে প্রথমে উত্তম উত্তম পদার্থ মিষ্টান্ন সুগন্ধ আদি যথা শক্তি ভক্তি সহকারে অগ্নিতে আহুতি দিবে এবং বর ও কন্যার দ্বারা দেওয়াইয়া দিবে। যদি জ্যোতিঃস্বরূপ সূর্য্য নারায়ণ চন্দ্রমা রূপে সাকার প্রত্যক্ষ হন তবে তাঁহার সম্মুখে প্রজা ভক্তি নম্রতা ভাবে হাত যোড় করিয়া নমস্কার প্রণাম করিয়া পরে কন্যাকে ফুলের মালা দিয়া বরের হাত ধরাইয়া দিবে। আর বর কন্যা উভয়কে বলিয়া দিবে যে এই জ্যোতিঃস্বরূপকে প্রাতে সন্ধ্যায় নমস্কার প্রণাম করিবে? ইনিই তোমাদিগের গুরু মাতা পিতা আত্মা এবং ওঁ সৎগুরু মন্ত্র উভয়কে ভক্তিপূর্ব্বক যপ করিতে বলিয়া দিবে। যে সময়ে যে স্থানে দর্শন হইবে সেই সময়ে সেই স্থানে প্রণাম নমস্কার করিবে ও করাইবে ঘরের ভিতরে কিম্বা ঘরের বাহিরে প্রণাম নমস্কার করিবে। যদি জ্যোতিঃ স্বরূপ প্রত্যক্ষ সাকার রূপে না থাকেন ও দেখা না যান তাহা হইলে আহুতি দিয়া যেদিকে ইচ্ছা হয় সেই দিকে মুখ করিয়া নমস্কার প্রণাম করিয়া ঐ মন্ত্র দ্বারা কন্যার হাত বরকে ধরাইয়া দিবেন এবং কন্যার মাতা পিতা কিম্বা মাতা কি পিতা অভাবে অন্য কেহ বলিবে যে এই কন্যাকে তোমায় প্রদান করিলাম, তুমি গ্রহণ কর, পরে বর বলিবে যে আমি গ্রহণ করিলাম এবং যাবজ্জীবন আমি ইহাকে পালন করিব এবং যাহাতে উভয়ে সুখে থাকি ও উভয়ের যাহাতে মুক্তি হয় তাহা করিব। কন্যা বলিবে যে আমি যাবজ্জীবন তোমার আজ্ঞা প্রতিপালন করিব, পরে বর কন্যা উভয়ে বলিবে যে আমরা বিরাট ব্রহ্ম চন্দ্রমা সূর্য্য নারায়ণ অগ্নি ব্রহ্মের সম্মুখে এই প্রতিজ্ঞা করিলাম যে আমরা উভয়েই বিচার পূর্ব্বক উভয়েরই আজ্ঞা প্রতি পালন করিব, নাকরিলে পরব্রহ্ম জ্যোতিঃ স্বরূপের নিকট অপরাধি হইব, এই রূপে বিবাহ সমাধা করিবে, ইহাভিন্ন অন্য কোনও আড়ম্বর করিয়া কষ্ট ভোগ করিও না। ইহাতে কোন বিষয়ের সংশয়

ভ্রম করিবে না! স্বার্থ পরবশ হইয়া যদি ইহাতে কেহ নিষেধ করে তবে শুনিবেন না। এই নিয়মে রাজা প্রজা মিলিত হইয়া পুত্র কন্যার বিবাহ দিবে ও দেওয়াইবে; তাহা হইলে সকল বিষয়ে সুখী নির্ভয় আনন্দরূপে থাকিবে এবং কন্যা অসময়ে বিধবা হইবে না। যদ্যপি কেহ বিধবা হয় তবে সময়ে হইবে এবং পুত্র কন্যা সদা জ্ঞানানন্দরূপে সুখী থাকিবে, মাতা পিতার আজ্ঞানুসারে চলিবে ও আয়ুর্বৃদ্ধি হইবেক! পরস্পর কাহারও সহিত শত্রুভাব থাকিবেক না এবং সমস্ত ভ্রম কষ্ট নাশ হইবেক। ইহা সত্য বলিয়া জানিবে! যদ্যপি অহঙ্কার অভিমানের জন্য না শুন ও না চল তাহা হইলে পরাধীন হইয়া থাকিবেক ও অনুশোচনায় কাতর হইয়া দিন যাপন করিতে হইবেক। ইহা ভিন্ন বিবাহ কার্য্যে অন্য কোন প্রকার প্রপঞ্চ করিবে না এবং অপর কাহাকেও করাইবে না! পূর্ণপরব্রহ্মঃ জ্যোতিঃস্বরূপ গুরু মাতা পিতাকেই শুভদিন দণ্ড, মুহূর্ত্ত লগ্ন বলিয়া জানিবে এবং উহার নাম লইয়া পুত্র কন্যার বিবাহ দিবে এবং ইত্যাদি ব্যবহার কার্য্য করিবে। কোন গ্রহ দেবতাই বিরুদ্ধ হইবেন না। গ্রহ শব্দ পূর্ণপরব্রহ্মকে জানিবে। উহারই ভরসা কর। রাজা প্রজাগণ আপনারা বিচার করিয়া দেখুন যে পণ্ডিতগণ আপন পুত্র কন্যার বিবাহ, শাস্ত্রের টীকা টীপ্পনী নির্ঘণ্ট করিয়া ঠিকুজী কুষ্ঠী অনুযায়ী গণন মিলন করিয়া দণ্ড মুহূর্ত্ত ইত্যাদির শুভকাল উত্তম রূপে নির্ণয় করিয়া যথা শাস্ত্র বিধি পূর্ব্বক আপন পুত্র কন্যার বিবাহ দিয়া থাকেন তথাপিও তাঁহাদের পুত্র অকালে মরিয়া যায়, আর কত কন্যা অসময়ে বিধবা হইয়া যায়; এবং কত পুত্র কন্যার সন্তান হয় না বন্ধ্যা হয় ও মৃতবৎস্যাদি দোষ জন্মায়; আর কোন কোন বিবাহের পর পুত্র কন্যার পিতাও মরিয়া যায়।

আপামর সাধারণ জ্ঞানে ব্যবহার মতে কুল শব্দে বংশ বুঝায় অর্থাৎ যে বংশে যাহার জন্ম হয় তাহাকে সেই কুলের ব্যক্তি বলা হয়। কিন্তু আপনারা বিচার করিয়া দেখুন যে সর্ব্ব আদি কুল অর্থাৎ যাহা হইতে ইহ সৃষ্টি চরাচর জগৎ ব্রহ্মাণ্ড উৎপন্ন হইয়া যাইতেই স্থিত রহিয়াছেন সেই অনাদি কারণ শুদ্ধ চৈতন্য পরব্রহ্ম যিনিই মহাদেবা মহাশক্তি মহামায়া রূপে এই জগৎ চরাচর ব্রহ্মাণ্ড প্রকাশ রহিয়াছেন সেই এক অনাদি কারণ শুদ্ধ চৈতন্য পূর্ণপরব্রহ্ম সর্ব্বজ্ঞতই সর্ব্বকুল। সেই কুলকেই রাজা প্রজা সকলেরই চিন্তা করা কর্ত্তব্য এবং বিশেষ আবশ্যকীয় সাধারণতঃ বিবাহ শব্দে আপনারা বুঝিয়া থাকেন যে শাস্ত্রোক্ত শ্লোক দ্বারা মন্ত্রপূত হইয়া হস্তে হস্ত বন্ধন করিয়া দেওয়ার নাম বৈধ অর্থাৎ শাস্ত্রোক্ত বেদ বিহিত বিবাহ, কিন্তু যদ্যপি তাহাই যথার্থ বিবাহ হইত তবে কেন বিবাহের পর ব্যক্তি বিশেষে বর কন্যার

উভয়েরই ব্যভিচার দোষ ঘাট ও অসময়ে মৃত্যু মুখে পতিত হয়। পরন্তু প্রকৃত বিবাহ শব্দ ভাবার্থে এইরূপ ঘটনা সম্ভব নয়; একারণ উহাকে প্রকৃত বিবাহ বলা যাইতে পারে না। অর্থাৎ উভয়ের পরস্পর সদা একমতি হওয়াই (পরস্পরের মনোবৃত্তি একত্রে মিলিত হওয়া) প্রকৃত বিবাহ। প্রচলিত বিবাহকে বহির্ব্বিবাহ বলে, অন্তর্ব্বিবাহ অর্থাৎ জীব মূল। প্রকৃতির সহিত পরব্রহ্মে লীন হইলেই তাহাই যতার্থ জানিবে।

বিবাহের ব্যয় সম্বন্ধের বিবরণ।

রাজা প্রজা আপনারা গম্ভীরভাবে বিচার পূর্ব্বক শুনুন যে, আপনারা নির্ধনী সদ্বংশের কন্যাকে বিনা যৌতুক গ্রহণ করিতেছেন না এবং নীচ ঘরের কন্যা দশ বিশ হাজার টাকার যৌতুকের লোভে লইয়া যাইতেছেন আর তাহার চরণধূলি পর্য্যন্ত গ্রহণ করিতেছেন; অতএব আপনাদিগকে ধনের দাস বলা উচিত। রাজা প্রজা পণ্ডিত আপনাদিগের ধিক্‌কার। সত্যধর্ম্ম পরিত্যাগ করাতে আপনাদের কুকুরের অপেক্ষা অধিক দুর্দ্দশা হইয়াছে। আপনাদের আর্য্যাবর্ত্তে যখন সনাতন ধর্ম্ম ছিল আপনাদের তেজের সম্মুখে কেহ কথা কহিতে পারিত না। এবং যদ্যপি অর্থ অভাবে দরিদ্র ব্যক্তির পুত্র কন্যার বিবাহ হইতে না পারিত তবে তখনকার সত্য-ধর্ম্মা রাজা, জমিদার, পণ্ডিত ও প্রধান প্রধান প্রজাগণ গ্রামে গ্রামে অন্বেষণ করিয়া আপনার ভাণ্ডার হইতে যথা শক্তি ধন দিয়া বিবাহ দিত। আপন পুত্রের বিবাহ দিতে হইলে তখন যদ্যপি কোন উত্তমবংশ দরিদ্রের কন্যা পাইতেন তাহা হইলে যৌতুক আদি না লইয়া নিজ হইতে উভয় পক্ষের ব্যয় বহন করিয়া বিবাহ দিতেন, আর সকলকে এইরূপই করাইতেন।

সুপাত্র জ্ঞানিগণ! আপনাদের এই ধর্ম্ম যে, কন্যাকর্ত্তা ব্যক্তি আপন ইচ্ছাতে, বিনাকষ্টে লগ্ন পত্রাদি বিষয়ে যাহা দেয় তাহাই গ্রহণ করিয়া সন্তুষ্ট হওয়া এবং যাহার ধন দিবার ক্ষমতা নাই যদি তাহার কন্যা উত্তম গুণবতী হয় তবে মানের জন্য যিনি তাঁহার নিকট অধিক ধন যাচ্ঞা করেন ও পীড়ন করেন তাঁহার কার্য্য কসাইয়ের অধম, কারণ কসাই শীঘ্রই গলা কাটিয়া মারিয়া ফেলে। দরিদ্র লোকের পুত্র কন্যার ধনের জন্য বিবাহ হয় না অধিক বয়স হইয়া যায়। ইহা অপেক্ষা আর্য্যাবর্ত্তবাসীদিগের মৃত্যু ভাল। যেহেতু এ বিষয়ে বিচার না করিয়া কোন উপায় বিধান করিতেছেন না। যদি বরকর্ত্তা দরিদ্র হয় আর কন্যাকর্ত্তা ধনী হয়, তবে সন্তোষের সহিত উহাকে বিবাহ দিয়া তাঁহাকে ও প্রতিপালন করিবেন। আর

যদি বরকর্ত্তা ধনী হয় ও কন্যাকর্ত্তা দরিদ্র হয় তবে নিজে হইতে ধন দিয়া বিবাহ দিয়া সন্তোষে থাকিবেন আর তাহার পরিবারগণকেও প্রতিপালন করিবেন। কিম্বা ধনী ব্যক্তি আপন নিকট হইতে ধন ব্যয় করিয়া ঐ কন্যার অপর ঘরে বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন করিয়া দিবেন; ইহাতে ধর্ম্ম এবং বিশেষরূপ পুণ্য আছে।

রাজা, জমিদার ও প্রজাগণ! আপনারা বিচার করিয়া দেখুন যে সুখ্যাতি ও মানের জন্য বিবাহ ও যৌতুক আদিতে, যজ্ঞ ও শ্রাদ্ধ আদিতে কত লোকের কতই জমিদারী রাজ্য প্রভৃতি বিক্রয় হইয়া যাইতেছে। তখন উন্মত্ত হইয়া বিবাহ শ্রাদ্ধাদিতে ব্যয় করেন তখন কিছুই বুঝিতে পারেন না কিন্তু পরে যখন ঋণী হইয়া বিপদগ্রস্ত হন এবং আহার অভাবে স্ত্রী পুত্র কষ্ট পায় তখন অতি কাতরে অনুশোচনা করিতে থাকেন। রাজা, প্রজা! আপনারা বিচার করিয়া বিবাহ কার্য্যের আদান প্রদানের ব্যয় একেবারে উঠাইয়া দিন, ইহাতে কিছুই লাভ নাই ও কোন বিধি নিষেধ নাই। ইহা কেবল লোকাচার ও সামাজিক ব্যবহার। তুচ্ছ মানের জন্য আপনি দুঃখ পাওয়া আর অপরকেও দুঃখ দেওয়া উচিত নয়। এরূপ মানে কি আছে যে, অমুকের নিকট যৌতুকাদির জন্য এত টাকা লইব এবং পূর্ব্বে ও লইয়াছি, আমার বংশ মহৎ বংশ। এই কথা সুপাত্র ভদ্র লোকদিগের কথা নয়। ঘোড়া গরুর ন্যায় পুত্রকন্যার জন্য মূল্য লওয়া ও দেওয়া ভদ্রলোকের কর্ত্তব্য নয়। ইহা অবোধ, জড়, পশুবুদ্ধি লোকদিগের কার্য্য।

মহৎবংশের সুপাত্র ভদ্র জ্ঞানিলোকদিগের এই রীতি ও ধর্ম্ম যে, যাহাতে রাজা প্রজা চরাচর আদি সকলে সুখী থাকেন এবং কোন বিষয়ে দুঃখ ও কষ্ট না পান, তাহাই যত্ন পূর্ব্বক করেন ও করান; তাহাই আপনাদের করা ও করান যোগ্য এবং বিশেষ কর্ত্তব্য।

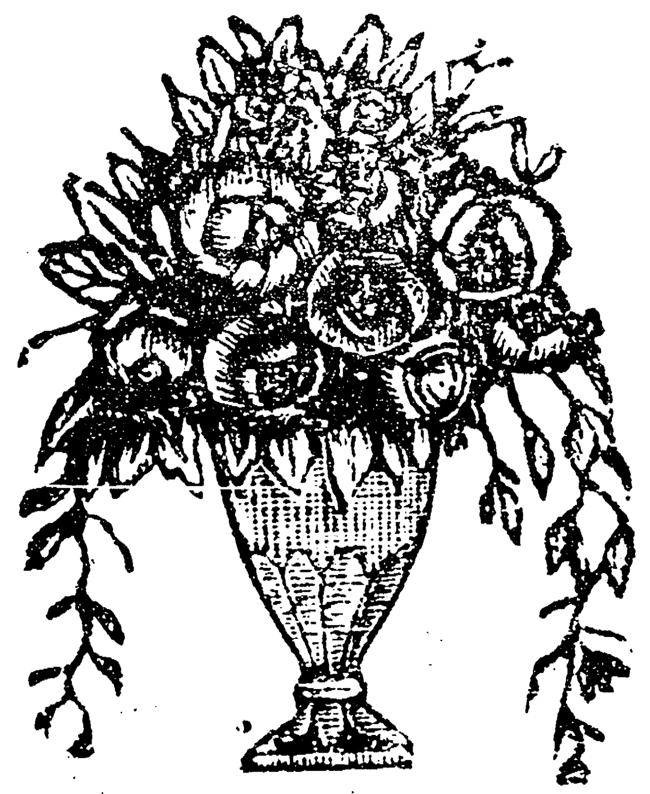

বঙ্গীয় সমাজ সমালোচনা।

লেখক শ্রীত্রিলোচন চট্টোপাধ্যায়।

বঙ্গীয় সমাজ সাধারণতঃ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। ধনাঢ্য মধ্যবিত্ত এবং দিন শ্রমজীবী। দ্বিতীয় শ্রেণীর লোক আবার নানা ভাগে বিভক্ত। (১) নিষ্কর ভূসম্পত্তি এবং বৃত্তি ভোগী। (২) বৃত্তিভোগী এবং কৃষিজিবী (৩) কৃষিজিবী (৪) কৃষিজিবী এবং সামান্য ব্যবসায়ী (৫) চাকরি উপজিবী। আমরা এই প্রবন্ধে এই বঙ্গীয় সমাজের পূর্ব্বতন, বর্ত্তমান অবস্থা এবং সাংসারিক সুখ সচ্ছন্দতা দেখাইতে চেষ্টা করিব। প্রথম শ্রেণীর লোকের পূর্ব্ব এবং বর্ত্তমান সুখ সচ্ছন্দতার তুলনা করিলে, কিছু ইতর বিশেষ লক্ষিত হয় না। সময়ের ভীষণ পরিবর্ত্তনে আজকাল সাংসারিক ব্যয়ভার বহুল হইলে ও এই শ্রেণীর কেহ কেহ পূর্ব্ব মহাপুরুষদিগের ক্রিয়া কলাপের সঙ্কোচ করিয়া এবং কেহ বা নিঃস্বপ্রজার কাতর নয়নের দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া, ক্ষীণ স্বরে কর্ণপাত না করিয়া, জমি জায়গার কর বৃদ্ধি করিয়া, আপনাদিগের সুখ সচ্ছন্দতা বজায় রাখিয়াছেন, তৃতীয় শ্রেণী অর্থাৎ দৈনিক শ্রমজীবির অবস্থা পূর্ব্বাপেক্ষা এখন ভাল বলিয়া বোধ হয়; তখন যে কার্য্যে তাহারা চার পয়সা মজুরী পাইত এখন সেই কার্য্যে চার আনা মজুরী পায়। তখন চার পয়সায় একসের চাউল পাইত, এখন চার আনায় সেই চালই পায়। প্রকৃতির নিয়মানুসারে জীবনধারণোপযোগী সমস্ত দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধির সহিত তাহাদের শ্রমের দর বৃদ্ধি হইয়া থাকে। অধিকন্তু তখন তাহাদের কার্য্যাভাব থাকিত, কার্য্য না জুটলে ভদ্রলোকের নিকট ধার করিয়া দিন চালাইতে হইত, সেই কারণে ভদ্রলোকের সহিত তাহাদিগের বিশেষ বাধ্য বাধকতা থাকিত কিন্তু আজ কাল ইংরাজ বাহাদুরের কৃপায় নানা স্থানে কল কারখানা হওয়াতে তাহাদের কার্য্যের অভাব হয় না এবং শ্রমের যেরূপ মূল্য পায় তাহাতে তাহাদের সচ্ছন্দে চলিয়া যায়। এই কারণে অনেকের মুখে এই অভিযোগ শোনা যায়, যে ১০ জন ভদ্র লোক মিলে, কিন্তু দুই জন মজুর লোক মিলে না। জগতে উপকার দ্বারা পরস্পরের উপর ভালবাসা ঘনিষ্টতা ঘটিয়া থাকে, এই ঘনিষ্টতা বিচ্ছিন্ন হওয়াতে মধ্যবিত্ত লোকের বিশেষ কষ্ট হইয়াছে। শ্রমজিবী স্বভাবের ও পরিবর্ত্তন হইয়াছে। এখন তাহারা রেলগাড়ীতে ভদ্রলোকের দোষ গুণের বিচার করে। সাধারণ স্থানে ভদ্রলোকের সহিত একত্র বসিতে কুণ্ঠিত হয় না, আপনারা ভদ্রলোক সাজিতে চায়।

মধ্যবিত্ত লোকের পূর্ব্ব অবস্থা এবং বর্ত্তমান অবস্থা তুলনা করিলে শরীর শিহরিয়া উঠে, চক্ষে জল আইসে; এখন আর তাহারা পূর্ব্বের ন্যায় সাংসারিক সুখ ভোগে অধিকারী হয় না, অনেকেই পরদেশবাসী, পরান্নভোজী, এবং পরপ্রত্যাশী। (১) এই শ্রেণীর লোক অর্থাৎ যাহারা কেবল মাত্র সামান্য ভূসম্পত্তির কর এবং বৃত্তির উপর নির্ভর করিয়া জীবন যাপন করেন, তাহাদের কষ্টের অবধি নাই। ব্রহ্মোত্তর ভোগী ব্রাহ্মণই এই শ্রেণীতে অধিক। যাহারা পূর্ব্বে সচ্ছন্দে জীবন যাপন করিতেন স্বদেশে স্ত্রী পুত্র লইয়া বাস করিতেন, দোল দুর্গোৎসব করিতেন, আত্মীয় স্বজনকে প্রতি পালন করিতেন, সময় সময় দ্বারে অতিথি আসিলে অভ্যর্থনা এবং সৎকার করিতেন, সময়ের কি ভীষণ পরিবর্ত্তন, আজ তাহাদিগের পুত্র পৌত্রদিগকে উদরান্নের জন্য দেশ বিদেশে পরের দ্বারস্থ হইতে হইয়াছে। আর এখন তাহাদিগের ঘরে বসিয়া চলে না আয় ও বৃদ্ধি হইবার নহে পূর্ব্বে যে জমীর খাজনা ৫৲ টাকা ছিল এখনো সেই জমীর খাজনা ৫৲ টাকাই আছে, প্রজাইসত্ত্ব বশতঃ তাহার আয় বৃদ্ধি করিবার উপায় নাই পূর্ব্বে ৫৲ টাকায় যে পরিমাণ চাউল কি ভরণপোষণোপযোগী দ্রব্য পাওয়া যাইত, এখন তাহার পাঁচ ভাগের একভাগও পাওয়া যায় না অর্থাৎ সাংসারিক ব্যায় পাঁচ গুণ বৃদ্ধি হইয়াছে, কাজেই তাহাদিগকে উদরান্নের জন্য লালায়িত হইয়া দাসত্ব স্বীকার করিতে হইয়াছে, শুদ্ধ বিত্তভোগী শ্রেণীর লোক অতি বিরল হইয়াছে, এইত গেল শুদ্ধ বৃত্তিভোগীর কথা। যাহারা নিষ্কর ভূমীর উপসত্ত্বভোগী এবং বৃত্তিভোগী কৃষিজিবী তাহাদিগের অবস্থা এইরূপ। বৃত্তির আয়ে যে এখন সংসার চলে না তাহা দেখান হইয়াছে। তখনকার কৃষিকার্য্য এবং এখনকার কৃষিকার্য্যে কিরূপ প্রভেদ জন্মিয়াছে দেখা যাউক চালধানের মূল্য অধিক হইয়াছে বলিয়া এখনকার কৃষিকার্য্যে আয় আছে কিন্তু চাষ করিবে কে? তখন প্রায় সমস্ত ভদ্রলোকেরই চাষ ছিল। তখন ভট্টাচার্য্য মহাশয়, মুখোপাধ্যায় চট্টোপাধ্যায় মহাশয়, রক্ত চন্দের তিলক করিয়া গোল পাতার ছাতা ধরিয়া, গামছা কাঁধে আলের মাথায় বসিয়া জন মজুর খাটাইতেন। জন মজুরি সস্তা ছিল, অনায়াসে পাওয়া যাইত; বৃত্তি বিধানে যাহা পাইতেন তাহাদ্বারা সাংসারিক অপরাপর ব্যয় নির্ব্বাহ হইত, উৎপন্ন ধান্যে অন্নের সংস্থান হইত, কিন্তু আজ কাল তাঁহাদের পুত্রগণ কালের বিচিত্র মায়ায় পড়িয়া বিপথ গামী হইয়াছেন। আর গোল পাতার ছাতা মাথায় দিতে পারেন না, ভিজে কাদায় দাঁড়াইতে পারেন না, অমনি সর্দ্দি হয়, দোষ তাঁহাদের নাই কারণ যাহারা ২০ বৎসর পর্য্যন্ত ইংরাজী বিদ্যালয়ে শুষ্ক

যে অসম্ভব স্থানে টেবিল চেয়ারে বসিয়াছেন, তাঁহাদের পক্ষে আর চাষ বাস করা অসম্ভব
স্থানে টেবিল চেয়ারে বসিয়াছেন, তাহাদের পক্ষে আর চাষ বাস করা অসম্ভব
বিশেষতঃ ইংরাজী শিক্ষার আহুতর ক্ষমতায় তাঁহাদের হাব ভাবও পরিবর্ত্তন
হইয়াছে। আর পূজা করিতে রক্ত চন্দনের টিপ পরিতে লজ্জা বোধ হয়, চাষ
করিতে ভিজে কাদার বসিবে কি করিয়া। গোল পাতার ছাতা মাথায় দেওয়া
ভাবিলে হাঁসি আসে মাথায় দিবে কি করিয়া; ডসনের জুতা চাই, কোট চাই, ঘন
ঘন রুমালে মুখ পোছা চাই, ইংরাজী শিক্ষায় এই গুণ লাভ করিয়াছেন। অতএব
তাহাদের পক্ষে ওরূপ চাষ করা কি রূপে সম্ভবে। যদি কাহারো কাহারো এরূপ
চাষে প্রবৃত্তি ও হয়, কিন্তু জন মজুর এত দুর্ল্লভ যে একা কৃষিতে ত সংসার চলে না।
শরীরের দফা একেবারে খাইয়াছেন, অনেকেরই পরিপাক শক্তি দুর্ব্বল এবং দৃষ্টি
ক্ষীণ তাই এ শ্রেণীর ও অবস্থা শুদ্ধ বৃত্তি ভোগী ব্রাহ্মণ দিগের ন্যায় হইয়াছে,
উদারান্নের জন্য পরের দাসত্ব স্বীকার করিতে হইয়াছে। এইতো দুই শ্রেণীর
অভাব ও অন্ন কষ্টের কথা ইহার উপর আর এক বিষম দায় আছে; কন্যাদায়,
কন্যাদায় যে কি, যিনি একবার ভুক্তভোগী তাঁহাকে আর বেশী বুঝাইতে হইবে
না। ভুক্তভোগী কিম্বা আসন্ন কন্যাদায় গ্রস্ত ব্যক্তির পুত্রবানের ভীষণ মূর্ত্তি
এবং সেই দুর্দ্দিন মনে পড়িলে হৃদয় কম্পিত হয়, চক্ষু স্থির হয়, কণ্ঠ শুষ্ক হয়, বাক্য
রোধ হয়, শরীর ঘর্ম্মাক্ত হইতে থাকে। পুত্র সক্ষম হউক, আর অক্ষম হউক,
বিদ্বান হউক, বা মূর্খ ই হউক, সুশ্রী হউক, আর কদাকারই হউক, কিম্বা সবল
হউক, বা দুর্ব্বল হউক, পিতা প্রচুর ধনের আশায় আকাশ কুসুম দেখিতে
থাকেন। সেকরার দোকানে যত রকমের গহনা পাওয়া যায় সে সবগুলির
নাম মুখস্থ করিয়া রাখেন. কন্যাদায়গ্রস্থ ব্যক্তি পাইলেই স্বজনরক্ত
পরিলেহন করিবার আশায় বিষাক্ত হৃদয়ে হাস্যমুখে এক ফর্দ্দ বাহির
করিয়া দেন। ৫০ ভরি সোণা চাই. ৫০০ ভরি রূপা চাই, ঘড়ি চাই, চেন
চাই, কেবল আকাশের চাঁদটী বাকি রাখেন, আর প্রায় সবই চোখ বুজিয়া
বুজিয়া বলিয়া ফেলেন। তাই বলিতে ছিলাম পুত্রবান ব্যক্তির মূর্ত্তি
ভীষণ। ইহাদের মধ্যে অনেকে ইংরাজী শিক্ষায় শিক্ষিত এবং কৃতবিদ্য
বলিয়া পরিচিত। স্বজন শোণিত শোষণ যদি শিক্ষার ফল হয়, তাহা হইলে এমন
শিক্ষায়বিক। ইহাদের মধ্যে যাঁহাদের পুত্র কন্যা দুই আছে, তাঁহারা সমাজের
দোষ দিয়া আমিও আপনার ন্যায় বিপদ গ্রস্ত এই বলিয়া কন্যাদায় গ্রস্ত ব্যক্তির
মুখ পানে চাহিবার ক্ষমতা থাকিলেও চাহেন না। একটী কন্যার বিবাহে এক-
জনের সর্ব্বস্বান্ত হয় পৈতৃক যাহা কিছু থাকে, বিক্রয় করিতে হয় এবং আজন্ম
ঋণগ্রস্ত হইয়া চিরকাল মৃত প্রায় হইয়া থাকিতে হয়।

এখন দেখা যাউক পূর্ব্বে কিরূপ পদ্ধতি ছিল। তখন মহাপুরুষগণ দেখিতেন
বংশ কিরূপ. মেয়েটী সুস্থ কিনা, তাঁহারা পরমা সুন্দরী পরী চাহিতেন না কন্যা
দেখিতে গিয়া. কন্যাকে তুমি কি পড়ো? ইংরাজী কতদূর পড়িয়াছ? শিল্প কার্য্য কিছু
জান কিনা জিজ্ঞাসা করিতেন না, জিজ্ঞাসা করিতেন. মেয়েটীকে কাজ কর্ম্ম শিখাইয়া-
ছেন ত আমার আর ঘরে লোক নাই. মাকে আমার অনেক কাজ করিতে হইবে।
টাকা কড়ি দেনা পাওনার কথা হইলে লজ্জিত হইয়া বলিতেন "ইহার জন্য কি
আটকাইবে যাহা পারিবেন তাহাই করিবেন, আমি কিছু মাত্র বলিব না অবস্থা
বুঝিয়া কাজ করিবেন, আপনার নিকট ১০৲ টাকা লইয়া কি আমি বড় লোক
হইব।" হায় সে সময় কোথায় গেল, এখন যে সমাজ অবসন্ন বিপন্ন এবং উৎসন্ন
প্রায় তাহা কেহই দেখিয়া ও দেখিতেছেন না। তোমরা বুয়র যুদ্ধে এত আনন্দ
প্রকাশ কর, জাপানের জয় পরাজয়ে আত্মহারা হও, কিন্তু নিজের ঘরের সর্ব্বনাশে
তোমাদের মনকে বিচলিত করিতে পারে না এই বড় দুঃখের কথা। তোমার
আত্মীয় স্বজন প্রাণ হারাইতেছে, পুত্র গণের দশাও সেইরূপ হইবে তাহা তুমি
কিজন্য দেখিতেছ না, এই সামাজিক কুপ্রথা নিবারণ যুদ্ধে গোলা গুলি চাই না
কামান বারুদ চাই না, চাই কেবল মনের বল এবং স্বজন সহানুভূতি। এই কার্য্যে
অর্থ মিলিবে না, জমিদারী মিলিবে না, সোনার খনি মিলিবে না, তোমার পুত্রগণ জীবন
পাইবে। সকলেই বলেন পুত্র বিক্রয় এবং কন্যা বিক্রয় উভয়ই ঘৃণিত, কিন্তু প্রতি
বিধানে যত্নবান হন কই, বিশেষতঃ যাঁহাদের পুত্র আছে, তাঁহারা এসব কথায়
কর্ণপাতও করেন না। কিন্তু তিনি বুঝিতেছেন না আপন সন্তান গণের
সর্ব্বনাশ করিতেছেন, তিনি যাহার সর্ব্বস্বান্ত করিবার জন্য উদ্যত সেই একদিন
তাহার পুত্র গণের সর্ব্বনাশ করিবে। এই কন্যাদায়ে এই সম্প্রদায়ের অনেকের
সংসারিক সুখ চিরকালের জন্য নষ্ট করিয়াছে। কেহ কেহ বলেন মধ্যবিত্ত লোকের
আজ কাল সোণা দানা বৃদ্ধি হইয়াছে, পূর্ব্বের সহিত তুলনায় তাহা কতক
পরিমাণে বৃদ্ধি হইয়াছে সত্য, কিন্তু সে বৃদ্ধি কোথা হইতে এবং কি
প্রকারে হইল দেখা উচিত। সময়ের বিষম বিপর্য্যয়ে স্ত্রীলোকের হাব ভাব
পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, এখন পূর্ব্বের ন্যায় সতী লক্ষ্মী সাঁকা হাতে দিয়া কোমর বাঁধিয়া
হৃদয় ভরিয়া হাসিতে হাসিতে লোকের পাতে অন্ন দিয়া খুসী হন না, এখন মোজা
বুনিবে চেয়ারে বসিবে, সোণা দানা পরিবে, চেলি পরিবে, সেমিজ পরিবে বডি
পরিয়া থাকিবে আর আরসি দিয়া মুখ দেখিবে, এই ভাল বাসে। গৃহিণী নিজের
কন্যা বধূর কিসে অলঙ্কার পাঁচ খানা পরিবে এই ভাবনায় ব্যাকুল হইয়া উঠেন।

স্বামী নিরন্তর তাড়নায় পৈতৃক কাজ-কর্ম্ম একবারে বন্ধ করিয়া দেন। দোল দুর্গোৎসবের ত কথাই নাই, গৃহিণীর তাড়নায় পিতৃ শ্রাদ্ধও করিতে কুণ্ঠিত হন। স্বজন আত্মীয়কে বাটীতে আনা দূরে থাকুক ভিখারী পর্য্যন্ত উকি মারিবার অধিকার থাকে না।

জীবাত্মারে কষ্ট দিয়া অর্দ্ধাশনে জীবন ধারণ করিয়া পৈতৃক কার্য্যে জলাঞ্জলি দিয়া কুলোজ্জ্বল পূর্ব্বক গৃহিণীর সন্তোষ সাধন করেন আবার অপর দিকে একের সর্ব্বস্বান্ত করিয়া সোণা দানা লইয়া অপরের ঘর সজ্জিত হয়। এই প্রকারে কতক পরিমাণে সোণা দানা বৃদ্ধি হইয়াছে। ইহাই কি সাংসারিক সুখ? ইহাই কি মনুষ্যত্ব। পূর্ব্ব পুরুষগন পুকুর প্রতিষ্ঠা করিয়া জল কষ্ট নিবারণ করিতেন, পথিক দিগকে ছায়া দিবার জন্য বৃক্ষ প্রতিষ্ঠা করিতেন, কর্ম্মের উপলক্ষ করিয়া বিস্তর গরীব দুঃখীকে অন্ন দান করিতেন, এবং বন্ধু বান্ধবকে বাটীতে আনিয়া আমোদ আহ্লাদ করিতেন; কিন্তু আজ কাল কি করেন পাঁচ খানা গহনা দিতে পারিলেই মনে করেন জীবনের কর্ত্তব্য কর্ম্ম হইয়া গেল। দুর্লভ মানব জন্ম লাভ করিয়া, পেটে না খাইয়া, পরকে না খাওয়াইয়া, কিছু না দেখিয়া—না দেখাইয়া অতি দুঃখে জীবন, ধারণ করেন।

শুধু তাহা নহে এই শ্রেণীর আর এক বিপদ ইংরাজী শিক্ষা আনিয়াছে ধুতি উড়ানীতে আর চলেনা ভাল ধুতি চাই, বিলাতি জুতা চাই, জামা চাই, কোট চাই, ভাল ছাতা চাই, নচেৎ ভদ্র বলিয়া গণ্যই করিবে না জঠর জ্বালা সহ্য করিয়াও এ সব না করিলে বাহিরে যাইবার উপায় নাই। হায় সমাজ তোমার এরূপ অবস্থা হইল কেন? তুমি কি অনাবৃত দেহকে ভদ্রলোক বলিয়া গণ্য করিতে পার না। তুমি কি কেবল চটী জুতা পায়ে দিলে মনুষ্যত্বের হানি হয়, বিবেচনা কর, যদি মনে কর তাহা হইলে তোমার ভুল হইয়াছে। তোমার হিতাহিত বোধ হয় নাই। তোমার ভ্রম হইয়াছে, তুমি আপনার দুঃখ আপনি আনিতেছ। তোমার দুঃখ দূর করিবে কে? তাই বলিতে ছিলাম উক্ত দুই শ্রেণীর অবস্থা অতি শোচনীয় হইয়াছে এবং প্রায় সকলেই চাকরী বৃত্তি অবলম্বন করিয়াছেন।

বঙ্গীয় মধ্যবিত্ত লোকের মধ্যে এক শ্রেণী লোক আছেন। তাঁহাদের চাষ এবং সামান্য ব্যবসা বৃত্তি কিম্বা চাষ এক মাত্র বৃত্তি।

অভিমান।

লেখক—শ্রীশচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

ভাগীরথী উপকূলবর্ত্তী কোন অট্টালিকার ছাদে বসিয়া একদা অপরাহ্নে স্বামী স্ত্রীকে বলিতেছে, "কেন, বিলি, আবার বাপের বাড়ী যাবার কথা বলিতেছ?"

বিলি ওরফে বিজলি উত্তর করিল, "কেন তাত তোমায় বলেছি। দাদা একটু ভাল হ'লেই আবার আসব।"

স্বামী বলিল, "আসিবে তাত বুঝিলাম। কিন্তু যতদিন না এস ততদিন?"

বিলির চোখে জল আসিল; একটু কম্পিত কণ্ঠে বলিল, "ততদিন তোমার যা' আমারও তাই।"

স্বামী। তবে কেন দু'টী প্রাণ কাঁদাইয়া যেতে চাও?

স্ত্রী। কেন চাহি তাহাত বার বার বলেছি। যদি পিত্রালয়ে গেলে প্রাণে ব্যথা পাও তবে যাব না।

স্বামী নির্ম্মলকুমার একটু ম্লান হাসি হাসিয়া বলিলেন, "ব্যথা পাব কিনা তাহা তুমি নিজের হৃদয় দিয়া বুঝিতে পার না? ভাইকে দেখিবার সাধ করিয়াছ আমি তোমার সে সাধে বাধা দিব না।"

ক্ষণকাল উভয়ে নীরব। বিলির যেন কান্না আসিল; কিন্তু কি করিয়া, কি ভাবিয়া কাঁদিবে তাহা খুঁজিয়া পাইল না। অস্থির মনকে শান্ত করিতে না পারিয়া অবশেষে বলিল, "আমি যাব না।"

স্বামী। কেন, বিলি?

স্ত্রী। তুমি কেন হাসিতে হাসিতে আমায় ছেড়ে দিতেছ না?

স্বামী। হাসি যে আসছে না, বিলি!

স্ত্রী। অন্যবারে ত' এমন কর না!

স্বামী। এবার আমার প্রাণ কাঁদছে; জানিনা কপালে কি আছে।

আবার উভয়ে নীরব। উভয়ের হৃদয়ে বৈশাখী মেঘ-বাহিরে গাম্ভীর্য্যময়ী সন্ধ্যা।

বিলি বলিল, "তুমিও কেন সঙ্গে চলোনা।"

এই অনুরোধে একটা কথা নির্ম্মলের মনে পড়িল। বৎসরেক পূর্ব্বে নির্ম্মল-কুমার একবার শ্বশুরালয়ে গিয়াছিলেন। সে সময় বিলির ভ্রাতৃজায়া, নির্ম্মলের রূপে মুগ্ধ হইয়া নির্ম্মলের নিকট প্রণয় যাচিঞা করিয়া ছিলেন। সে প্রার্থনা ঘৃণা ভরে প্রত্যাখ্যাত হইয়াছিল। নির্ম্মল তদবধি শ্বশুরালয়ে গমনাগমন পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। বিলি এ সকল কথা জানিত না; নির্ম্মল কাহাকেও কিছু বলেন নাই। এক্ষণে মনোভাব গোপন করিয়া নির্ম্মল বলিলেন, "মাকে ছাড়িয়া আমি কোথাও যাইতে পারিব না।"

এ কথাটাও প্রকৃত। নির্ম্মল মাকে ছাড়িয়া কোথাও যাইতেন না। শ্বশুরালয়ে দুই এক দিনের বেশী থাকিতেন না। কোথাও বেশী দিন থাকিতে হইলে মাকে সঙ্গে লইয়া যাইতেন।

বিলি একটু উত্তেজিত কণ্ঠে উত্তর করিল, "তবে আমাকে ছাড়িয়া দুই দিন থাক।"

নির্ম্মল কোন উত্তর করিলেন না। তাঁহার প্রাণে একটু ব্যথা লাগিল। ক্ষণ-কাল পরে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "আবার কবে ফিরিবে?"

স্ত্রীর অপ্রসন্নতা দূর হইল। হাসিতে হাসিতে বলিল, "তোমায় ছাড়িয়া আমি কতদিন থাকিতে পারিব?"

স্বামী বলিল, "যত শীঘ্র পার ফিরিও।"

স্ত্রী সানন্দে স্বামীর পদধূলি মাথায় লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। তখনও সন্ধ্যা হয় নাই। লাল রবির লাল আভা বিজলির মুখে, গণ্ডে, বাহুতে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। দ্বিতীয় উষার ন্যায় বিজলির ছবিখানি আকাশ পটে কেযেন আঁকিয়া দিয়াছে। নির্ম্মল দেখিলেন অতি সুন্দর। একবার সাধ হইল বিলিকে বুকের ভিতর টানিয়া লইয়া বলেন, "বিলি আমায় ছেড়ে যেওনা।"

বলিলে সকল গোল মিটিয়া যাইত—বিলি যাইত না। কিন্তু বিলির প্রফুল্ল ও ব্যগ্র মুখ খানি দেখিয়া সেইচ্ছা নির্ম্মল দমন করিলেন। তবু একটু আশা সঞ্চারিত প্রাণে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলে যে?"

বিজলি বলিল, "একটা চুমো।"

নির্ম্মল উঠিয়া দাঁড়াইয়া বিলির রক্তরাগ রঞ্জিত ওষ্ঠের উপর স্বীয় ওষ্ঠ স্থাপন করিলেন। সুদীর্ঘ চুম্বনে বিলিকে বুঝাইয়া দিলেন কেন তাহাকে ছাড়িয়া দিতে নির্ম্মলের প্রাণ এত কাতর।

বিলি কাঁদিয়া ফেলিল; একবার ভাবিল, এমন প্রেমময় স্বামী ছাড়িয়া কোথাও যাব না। কিন্তু তাহার পরিবর্ত্তিত মনোভাব মুখদিয়া ব্যক্ত হইবার পূর্ব্বেই নির্ম্মল বলিলেন, "বিলি প্রত্যহ চিঠি লিখ্‌বেত? তোমার দাদা কেমন থাকেন লিখিও।" বিলির মন আবার পিতৃ-গৃহ পানে ছুটিল। সে চলিয়া গেল!

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

কাটোয়ার উত্তরে ভাগীরথীর উপকূলে বধূগ্রাম নামে এক সমৃদ্ধিশালী গণ্ডগ্রাম আছে। গ্রামের প্রকৃত নাম গোপন করা যখন আজ কাল প্রথা হইয়া দাঁড়াইয়াছে তখন আমিও সেই মহাজন প্রদর্শিত পথ অবলম্বন করিয়া গ্রামের প্রকৃত নাম গোপন করিলাম। যাহা হউক এই বধূগ্রামে অবনীশচন্দ্র বসু নামে একজন প্রজা-রঞ্জক জমিদার ছিলেন। তিনি বিধবা স্ত্রী ও একমাত্র শিশুপুত্র রাখিয়া অকালে স্বর্গারোহণ করিলে পর তাঁহার সহোদর ভ্রাতা অমরীশচন্দ্রের উপর বিষয় রক্ষাদির ভার অর্পিত হয়। অমরীশ বাবু নিজের স্বার্থ সম্বন্ধে একটু তীব্রদৃষ্টি রাখিতেন। নাবালক ভ্রাতুষ্পুত্র নির্ম্মল কুমারের বিষয়াদি কতক পরিমাণে নিলামের ডাকে নিজের নামে কিনিয়া লইলেন। তবে কতক সম্পত্তি নির্ম্মলের রহিল। গ্রামের জমিদারী, দু'একখানা তালুক, প্রাসাদ তুল্য অট্টালিকা, প্রজার ভালবাসা, বংশ খ্যাতি নির্ম্মলের রহিল।

অবনীশ বাবুর বিধবা পরিবার অন্নপূর্ণার তত্ত্বাবধানে নির্ম্মলের বিদ্যাশিক্ষালাভ ও চরিত্র গঠন হইয়াছিল। অন্নপূর্ণা উচ্চ কুলোদ্ভবা শিক্ষিতা মহিলা। তিনি নির্ম্মলের ত্রয়োদশ বৎসর বয়সে বিবাহ দিয়া দশম বর্ষীয় বধূ বিজলিকে ঘরে আনিয়া জীবনের সাধ মিটাইয়াছিলেন।

এখন নির্ম্মলের বয়স বিংশতি বৎসর। তাঁর চেয়ে বিজলি তিন বৎসরের ছোট বিজলির রূপে নির্ম্মলের হৃদয় সুখ-পরিপ্লুত, অন্নপূর্ণার গৃহ আলোকিত, বধূগ্রাম উদ্ভাসিত। কিন্তু তার রূপের চেয়ে গুণবেশী। সে বড়-মানুষের মেয়ে হয়েও গৃহস্থালীর কার্য্য করিতে ঘৃণা বোধ করে না—শ্বশুরীর যত্নসেবা করিতে কখন অবহেলা করে না—কাঙ্গাল, গরীবকে অর্থ বা আহার্য্য দিয়া সাহায্য করিতে কখন পরাঙ্মুখ হয় না। স্বামীর প্রতি তাহার ভালবাসা ও ভক্তি, গ্রামের দৃষ্টান্ত-স্বরূপ ছিল।

কিন্তু তাহার ভক্তি, ভালবাসা অপেক্ষা আত্মাভিমান বড়; একথা নির্ম্মল ব্যতীত আর কেহ জানিত না। অভিমানের সঙ্গে একটু রাগ, একটু জিদ্ আসিয়া জুটে। এই তিন পাপ একত্র ভর করিলে চিত্তবেগ দুর্দ্দমনীয় হইয়া উঠে। এই অভিমানের শিখা কোমলতা ও আদরে নিবাইতে গিয়া নির্ম্মল আরও ইন্ধন যোগাইয়াছিলেন।

বিজলি চলিয়া গেলে পর নির্ম্মল, গঙ্গাবক্ষ পানে চাহিয়া একাকী ছাদে বসিয়া রহিলেন। ক্ষণ পরে দেখিলেন, এক খানি ছোট বজরা তাঁহার অট্টালিকা সংলগ্ন খিড়কির ঘাট পরিত্যাগ করিয়া উত্তরাভিমুখে পাল তুলিয়া ছুটিল। উন্মুখ হইয়া দেখিলেন, বজরার গবাক্ষে বিজলি বসিয়া রহিয়াছে। তাহার ঊর্দ্ধ উৎক্ষিপ্ত চক্ষু ব্যগ্রভাবে সৌধ চূড়াপানে চাহিয়া রহিয়াছে তাঁর গণ্ড বহিয়া চোখের জল ছুটিতেছে। নির্ম্মলের চোখে জল আসিল—প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। চক্ষু মুছিয়া নির্ম্মল আবার চাহিয়া দেখিলেন দেখিলেন! বিজলি গলায় কাপড় দিয়া যুক্তকরে তাঁহার পানে কাতর দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিয়াছে' যেন ক্ষমা ভিক্ষা করিতেছে। নির্ম্মল আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, বিলিকে ফিরাইবার অভিপ্রায়ে ক্ষিপ্রপদে সৌধচূড়া হইতে অবতরণ করিলেন। দ্বিতলে আসিয়া দেখিলেন, সিঁড়ির ধারে একটি বালক দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। নির্ম্মলকে দেখিয়া বালক বলিল, "নূতন দাদা 'মা তোমায় ডাকুছে-একবার এস!" নির্ম্মল বলিলেন, "কেন,—যাচ্ছি।"

তাহাকে অতিক্রম করিয়া নির্ম্মল যাইবার উদ্যোগ করিলেন। এমন সময় অন্নপূর্ণা ডাকিলেন, "বাবা, নির্ম্মল, ওদের বাড়ী বড় বিপদ; তুমি এখনি যাও।"

নির্ম্মল দাঁড়াইলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন মা, কি হয়েছে?"

অন্নপূর্ণা বলিলেন, "সোহাগের বাপ বুঝি বাঁচেনা।"

"যাইতেছি" বলিয়া নির্ম্মল নীচে ছুটিয়া আসিলেন। ঘাটের ধারে আসিয়া গঙ্গার পানে চাহিয়া দেখিলেন; কিন্তু বজরা কোথাও দেখা গেল না। বজরা তখন বাঁকের অন্তরালে অদৃশ্য হইয়াছে। নির্ম্মল ক্ষণকাল নদীতটে দাঁড়াইয়া রহিলেন। তারপর ধীরে ধীরে গৃহে ফিরিয়া আসিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

নির্ম্মল শূন্যহৃদয়ে, ক্ষুব্ধান্তঃকরণে গৃহে ফিরিলেন। ফিরিয়া দেখিলেন, তাঁর মায়ের কাছে সেই বালক বসিয়া রহিছে। তা'কে দেখিয়া তা'র প্রার্থনাও মনে পড়িল। বালকের বাড়ী আনন্দপুরে; তথায় যাইতে হইলে নৌকা পথই প্রশস্ত। নির্ম্মল তাই নৌকা প্রস্তুত করিতে আদেশ দিলেন।

নির্ম্মলের একখানি বজরা ও দুইখানি ছোট নৌকা ছিল। জ্যোৎস্না-পুলকিত নিশীথে বিজলিকে বজরায় লইয়া গঙ্গার উপর নির্ম্মল কখন কখন বেড়াইতেন। নিজে হাল্ ধরিতেন, কখন কখন গান করিতেন। বিজলি কাছে বসিয়া গান শুনিত দাসীরা দাঁড় টানিত। আর কেহ থাকিত না। বজরা নির্ম্মলের বিলাসের সামগ্রী। সেই বজরা, আর সেই বিজলি এখন কতদূরে।

বালককে সঙ্গে লইয়া নির্ম্মল একখানি নৌকায় উঠিলেন। ঘাট ছাড়িয়া নৌকা দক্ষিণদিকে অনুকূল স্রোতের মুখে ছুটিল; এবং সত্বর আনন্দপুরের ঘাটে আসিয়া পৌছিল।

আনন্দপুর একটি ক্ষুদ্রগ্রাম। বধূগ্রাম হইতে প্রায় একক্রোশদূরে অবস্থিত দিবসে নির্ম্মলকুমার এইরূপ অশ্বারোহণে অতিক্রম করিয়া থাকেন। রাত্রিতে অথবা সঙ্গে লোক থাকিলে নৌকা পথই সচরাচর অবলম্বিত হইয়া থাকে।

ঘাটের সন্নিকটেই সোহাগের বাপের ঘর। পথে যাইতে যাইতে নির্ম্মল বালককে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হেম, তোমার কেদার জেঠা কি তোমার বাপ্‌কে দেখিতে এ'সেছিলেন?"

হেম বলিল, "না, ওবাড়ীর কেউ দেখ্‌তে আসেনি। মা কেবল কাঁদছেন।"

বলিয়া বালক চুপ করিল। তাহার নাম হেম, বয়স দশবৎসর মাত্র। সে যাই হউক, এক্ষণে দুইজনে একটা একতল গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। বাড়ীটা পুরাতন, বেমেরামতি অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে। কক্ষ সকল অপরিষ্কার, অপরিচ্ছন্ন; প্রাঙ্গনে ময়লা, বারাণ্ডায় আবর্জ্জনা।

অন্তপুরস্থ একটা কক্ষমধ্যে নির্ম্মল প্রবেশ করিয়া দেখিলেন যে, সোহাগের বাপ একটা পালঙ্কের উপর শুইয়া রহিয়াছেন, আর পার্শ্বে তাঁহার পত্নী ও কন্যা বসিয়া পরিচর্য্যা করিতেছে। নির্ম্মলকে দেখিয়া সকলেরই একটু ভরসা ও আনন্দ হইল। নির্ম্মল মুমূর্ষুর পার্শ্বে বসিয়া একবার নাড়ী টিপিলেন, একবার পায়ে

মাথায় হাত দিয়া দেখিলেন; পরে ডাক্তারকে আনিতে নৌকার মাঝিকে পাঠাইয়া দিলেন।

রোগীর চৈতন্য ও বাক্‌শক্তি সম্পূর্ণছিল। সে বলিল, "বাবা নির্ম্মল, এখন ডাক্তার আসিয়া আমার কি করিবে? এখন তোমাকে আমার প্রয়োজন। জগতে আমার বন্ধুর মত বন্ধু বলিতে কেহ নাই। তোমার মত নিঃস্বার্থ পরোপকারী সংসারে বিরল। তাই তোমায় ডাকাইয়াছি। বাবা এসময় যদি আমার প্রার্থনা রক্ষা করিতে প্রতিশ্রুত হও তাহা হইলে আমি সুখে মরিতে পারি।"

নির্ম্মল বলিলেন, "কালীখুড়ো, আমার নিকট আপনি এত সঙ্কুচিত হইতেছেন কেন? আপনার যাহা কিছু বক্তব্য থাকে নিঃসঙ্কোচে বলুন।"

কালীবাবু বলিলেন, "বাবা, আমার জীবনের কাহিনী সকলি জান। মদ খাইয়া মকর্দ্দমা করিয়া সমস্ত বিষয় নষ্ট করিয়াছি। সমস্তই কেদার নিয়েছে। বাপের অগাধ বিষয়ের সামান্যই এখন আছে। আছে কিনা তাও ঠিক জানিনা। আজ দুইমাস শয্যাগত, কিছুই দেখি নাই। কোন খান হইতে এক পয়সা পাই নাই। স্ত্রীর গহনা বেচিয়া খাইতেছি ও নিজের চিকিৎসা করাইতেছি।"

কালীবাবু নীরব হইলেন; সন্তান সন্ততির ভবিষ্যৎ চিন্তায় অভিভূত হইয়া পড়িলেন।

ক্ষণপরে মন একটু শান্ত হইলে তিনি বলিলেন, "সোহাগের বিয়ে দিব বলে কিছু টাকা রাখিয়া ছিলাম; কিন্তু তাও মদ ও মকর্দ্দমায় নষ্ট হইয়াছে। এখন আমি নিঃস্ব। যখন অর্থ ও আয়ু দুই ফুরাইল, তখন আমার জ্ঞান জন্মিল। এজ্ঞান কেবল আমার যাতনা দিতে আসিয়াছে। এক্ষণে তুমি ভিন্ন এ অনাথ বালক বালিকার উপায়ন্তর নাই। আমার স্নেহের সোহাগ ও হেনকে তোমার হাতে সমর্পণ করিলাম। দেখো, বাবা, তারা যেন একমুঠা অন্নের জন্য দ্বারে দ্বারে কাঁদিয়া না বেড়ায়।"

নির্ম্মলের চক্ষে জল আসিল। ভাবিলেন, সেই কালীনাথ মিত্র।—যাহার প্রতাপে আনন্দপুর একদিন কাঁপিত,—সেই কালীখুড়োর আজ এই দশা!

যৌবনে পিতার সঞ্চিত অর্থ ও সম্পত্তি পাইয়া কালী বাবু কুসংসর্গে মিশিলেন। কলিকাতায় বিদ্যাভ্যাস কালে কতকগুলি বন্ধু জুটিয়া ছিল; তাহাদের নিকট মদ খাইতে শিখিয়া গ্রামে আসিয়া গোলা ভাঁটি খুলিলেন। মধুর গন্ধে চারিদিক হইতে মক্ষিকা আসিয়া জুটিতে লাগিল। প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী সরিক কেদার বাবুর সঙ্গে এক কাঠা জমি লইয়া মোকদ্দমা বাধিল। সেটা চুকিতে না চুকিতে একটু

ভাঙ্গা প্রাচীর লইয়া মোকদ্দমা লাগিল। এইরূপে আজীবন মোকদ্দমা চলিল। সঞ্চিত অর্থ সত্বর ফুরাইয়া আসিল। অবশেষে ঋণ করিয়া, সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া, মদ ও মকর্দ্দমা চলিল। মধুভাণ্ড শূন্য হইলে মক্ষিকা নিচয় সরিয়া পড়িল। প্রাণবায়ু নিঃশেষিত হইবার সম সময়ে মোকদ্দমার প্রবৃত্তি মিটিল। মদ ও মোকদ্দমায় আজীবন ব্যস্ত থাকিয়া এক্ষণে সন্তান সন্ততি অকূলে ভাসাইয়া অনুতপ্ত হৃদয়ে মহাবিচারকের নিকট সমুপস্থিত হইবার জন্য কালীনাথ যাত্রা করিলেন।

নির্ম্মলকে নীরব দেখিয়া কালীবাবু একটু বিচলিত ভাবে বলিলেন, "বাবা, এদের ভার নিতে ইতস্ততঃ করিতেছ? তুমি সহায় না হইলে এরা যে অকূলে ভাসিবে, বাবা! আর যে আমার কেহ নাই—ভগবানও যে আমায় ছেড়েছেন।"

নির্ম্মল বলিলেন, "আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন; আমার যতদূর সাধ্য ছেলেদের জন্য আমি ততদূর করিব। আজ হইতে আমি ইঁহাদের ভাই বোন বলে গ্রহণ করিলাম। যতদিন আমার এক মুঠা অন্নের সংস্থান থাকিবে, ততদিন এরাও খাইতে পাইবে।"

মুমূর্ষু কম্পিত কণ্ঠে বলিল, "বাবা, তুমি চিরসুখী হও, ভগবান তোমায় রাজরাজেশ্বর করুন। তুমি ইহাদের রহিলে, আর এদের কিছুই রহিল না। আর— আর — যে কখন আমায় তিরস্কার করে নাই কটু বলে নাই, কখন অপ্রসন্ন মুখ দেখায় নাই, সেই অনাথিনী বুড়িকে একটু দেখিও।"

কালীনাথের কণ্ঠ ক্ষীণতর হইয়া আসিল—ক্রমে বাক্‌রোধ হইল। এমন সময় ডাক্তার বাবু আসিয়া পৌঁছিলেন। ডাক্তার নাড়ী টিপিয়া গঙ্গাযাত্রার ব্যবস্থা করিলেন। এই ব্যবস্থারই প্রতীক্ষা হইতেছিল। নির্ম্মলের আহ্বানে চারি দিক হইতে লোক আসিয়া পৌঁছিল। ক্রন্দনের রোলের মধ্যে মুমূর্ষুর দেহ বহন করিয়া গঙ্গার ঘাটে আনা হইল। জাহ্নবীনীরে দেহ অন্তর্জলি করা হইলে মুমূর্ষু ভাবিল, এই পবিত্র তোয়ে কি আমার পাপরাশি ধৌত হবে? ভগবান্‌, আজীবন কখন তোমায় ডাকি নাই, বলে দেও প্রভু, ঐ উপরের আকাশে তুমি আছ কিনা, তার এই নীচের জলে তোমার পদ নিঃসৃত ভাগীরথী কিনা? যদি তাই হয় তাহলে তোমার পাদোদক সর্ব্বাঙ্গে মেখে, তোমার পানে চেয়ে মরিতে পারিলে আর ভয় কি, প্রভু?"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

বিজলিকে পিত্রালয়ে পৌঁছিইয়া দিয়া বজরা চারিদিন পরে ফিরিয়া আসিল। মাঝিদের হাতে বিজলি একখানা পত্র দিয়াছিল। নির্ম্মল ব্যগ্র হইয়া পত্র উন্মোচন করিয়া পড়িলেন,—

"আমার জীবন সর্ব্বস্ব!

তোমায় ছাড়িয়া আসিয়া ভাল করি নাই। সমস্ত পথ কাঁদিতে কাঁদিতে আসিয়াছি। এখানে আসিয়াও কান্নার বিরাম নাই। মায়ের মুখ, ভাইয়ের মুখ কিছুই তোমার বিচ্ছেদ যন্ত্রনা ভুলাইতে পারিতেছে না। প্রাণটা যেন শূন্য শুধু হাহাকার ময়। দু-দিন এখানে থাকিলে যদি মনের অবস্থা পরিবর্ত্তিত না হয়, তাহা হইলে দাসী ছুটিয়া গিয়া সত্বর শ্রীচরণে উপস্থিত হইবে। ইতি

ব্যাকুলা বিলি।"

একবার, দুইবার, দশবার পত্রপাঠ করিলেন। অতৃপ্ত নয়নে পত্র পানে চাহিয়া রহিলেন। চখের জলে পত্র সিক্ত হইল। অবশেষে পত্রখানি বুকে ধরিয়া নীরবে কাঁদিতে লাগিলেন।

পাঠ ও কান্নার পর চিন্তা আসিয়া জুটিল। চিন্তায় কিছু সুখ পাইলেন। উঠিয়া গবাক্ষে দাঁড়াইলেন। নীচে জাহ্নবীর জল হাসিতে হাসিতে, নাচিতে নাচিতে ছুটিয়াছে। আশা ও উল্লাসে নির্ম্মলের প্রাণ উছলিয়া উঠিল। ভাবিলেন বিলি আমার জন্য এত কাতর? দু'দিন পরে আবার সে আসিবে?"

এমন সময় মা ডাকিল; পুত্র ছুটিয়া মায়ের কাছে গেল। অন্নপূর্ণা জিজ্ঞাসা করিলেন. "বউমা কি লিখিয়াছেন আমায় বলিলে না ত?"

মায়ের ইচ্ছা চিঠিখানা পড়ে শুনান হয়,—বুড়ীদের দশাই ঐ।

ছেলে আদুরে, সুতরাং লজ্জাহীন; স্বচ্ছন্দে চিঠিখানা মায়ের কাছে ফেলিয়া দিল। মা চিঠিখানা উঠাইয়া লইয়া পড়িলেন। তা'রপর পিছন ফিরিয়া, লুকাইয়া চোখের জল মুছিতে লাগিলেন। অবশেষে গলা পরিষ্কার করিয়া অন্নপূর্ণা বলিলেন, "তুমি কেন বাবা, একবার বিশালপুর যাওনা।"

নির্ম্মল বলিলেন, "পরের বাড়ীতে থাকিতে আমার বড় কষ্ট হয়—আমি কোথাও যেতে পারিব না।"

অন্নপূর্ণা বুঝিলেন, পুত্র স্থানান্তরে যাইতে কেন অসম্মত। তবুও বলিলেন, "তুমি না হয় বজরায় থাকিও।"

নির্ম্মল উত্তর করিলেন, "ঝড় তুফানের দিন বজরায় থাকিতে সাহস হয় না।"

ফাল্গুন মাসে ঝড় তুফান! অন্নপূর্ণা আর কিছু বলিলেন না। শুধু গর্ব্বভরে প্রীতমনে একটু হাসিলেন। ভাবিলেন, "আমায় ছেড়ে বাছা, বউকেও দেখিতে যেতে চায় না।"

এমন সময় হেম রুদ্ধশ্বাসে ছুটিয়া আসিয়া সেখানে উপস্থিত হইল। উভয়ে ব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কি হয়েছে, হেম?"

হেম বলিল, "নূতন দাদা, শিগ্গীর এস, দিদি বুঝি বাঁচে না।"

বাক্যব্যয়ে সময় নষ্ট না করিয়া নির্ম্মল অশ্বশালের দিকে ছুটিয়া গেলেন। স্বহস্তে অশ্বসজ্জিত করিয়া তদুপরি হেমকে লইয়া লম্ফত্যাগে উঠিলেন। এবং অত্যল্প কালমধ্যে আনন্দপুরে আসিয়া পৌঁছিলেন। কালা খুড়ার গৃহ সন্নিকটে সমুপস্থিত হইবামাত্রেই অশ্ব হইতে লাফাইয়া পড়িলেন, এবং গৃহমধ্যে দ্রুতপদে প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন, ধূলার উপর সোনার সহাগ গড়াগড়ি যাইতেছে, আর পাশে বসিয়া সোহাগের মা চীৎকার করিয়া কাঁদিতেছে।

সোহাগের আমরা পরিচয় দিই নাই। তাহার নাম শুনিয়াছি মাত্র; কিন্তু ভাল করিয়া দেখি নাই। তাহার বয়স তের বৎসর মাত্র। অযত্ন রক্ষিত মলিন বস্ত্রাচ্ছন্ন রূপরাশি এই বয়সেই ফুটিয়াউঠিয়াছে। নববর্ষ সমাগমে যেমন বৃক্ষদেহ নববিল্ব পত্রে সমাচ্ছন্ন হয়, তেমনি নবযৌবন সম্ভাবণে সোহাগের দেহতরু নব শোভায় সমাচ্ছাদিত হইয়াছে। সন্ধ্যাকালে উদ্যানমধ্যে প্রস্ফুটিত প্রায় মল্লিকা দেখিলে এই বালিকার রূপের কথা মনোমধ্যে সত্যই জাগিয়া উঠে। জাগিলে তাহাকে দেখিতে বাসনা হয়। দর্শনের পর স্পর্শ করিতে সাধ হয়। স্পর্শলাভ ঘটিলে মালা গাঁথিতে ইচ্ছাকরে। মালা গ্রন্থিত হইলে গলায় পরিতে বাসনা হয়। জীবনে যখন যাহা কিছু আশা করিয়া ছিলাম, যখন যাহাকিছু আশঙ্কা করিয়াছিলাম, এই বালিকাকে দেখিলে সেই অতৃপ্ত বাসনার স্মৃতি হৃদয় মধ্যে জাগিয়া উঠে। প্রাবৃট কালে দিবাবসানে সুদূর আকাশ প্রান্তে চাহিয়া থাকিতে থাকিতে মনোমধ্যে যেমন এক অস্ফূট, অব্যক্ত বাসনার সঞ্চার হয়, তেমতি এই বালিকার সরল কোমলতা পূর্ণ মুখখানি পানে চাহিয়া দেখিলে হৃদয়ে কেমন এক অভিনব সাধের সৃষ্টি হয়, বহুদিনের বিস্মৃত আকাঙ্ক্ষার কথা মনো মধ্যে স্বতঃই জাগ্রত হয়।

সোহাগের অবস্থা দেখিয়া নির্ম্মল বুঝিলেন যে, সোহাগ মুর্চ্ছিত হইয়াছে। ঘাড়ে, মুখে জলের ছিটা দিতে দিতেই সোহাগের চৈতন্য সঞ্চার হইল। পিতার মৃত্যুদিনে এইরোগ সূচিত হয়। কিন্তু আজ হইতে বদ্ধ মুল হইল।

সোহাগ সুস্থ হইলে পর নির্ম্মল, কেদার জেঠার বাড়ীতে গেলেন। জেঠা তখন বৈঠক খানায় তাকিয়া ঠেস্‌দিয়া একজন খাতকের পাওনা হিসাব করিতেছিলেন। খাতক কিছু সুদ ছাড়িবার জন্য কেদার জেঠাকে পীড়া পীড়ি করিতেছিল; কিন্তু জেঠা গোলায়েম হাসির সহিত খাতককে বুঝাইতে ছিলেন যে, সুদ ছাড়িলে তিনি খাইতে না পাইয়া মারা যাইবেন। এমন সময় সেখানে নির্ম্মল আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া সকলেই সসম্ভ্রমে উঠিয়া দাঁড়াইল। জেঠা, "এস, বাবা এস" বলিয়া আদর করিয়া নির্ম্মলকে বসাইলেন।

জেঠার বাড়ীটি বেশ, অবস্থাও খুব ভাল। চক্‌মিলন বাড়ী, সামনে পূজার দালান, তাহাতে মহামায়ার পূজা হয়। অন্দর মহল স্বতন্ত্র। বৈঠক খানা উমেদার খাতক ও প্রজায় সতত পরিপূর্ণ।

জেঠার কিছু তালুক মুলুক আছে। তেজারতিও বেশ চলে। যে খাতক একবার দু'টাকা লইয়াছে সে আর দেনা শোধ করিয়া উঠিতে পারিত না। তাই ব'লে জেঠা অধার্ম্মিক নহেন। তাঁহার মুণ্ডিত মস্তকে সুদীর্ঘ শিখা, গাত্রে হরি নামাবলী, কণ্ঠে তুলসীর মালা। সুতরাং এই ত্রিবিধ আড়ম্বর সমন্বিত জেঠার প্রকৃতি ও চরিত্র সম্বন্ধে সন্দেহ করিবার কিছুই ছিল না।

তাঁহার তিন সংসার, তন্মধ্যে দুই পত্নী বর্ত্তমান। জ্যেষ্ঠা নিঃসন্তান অবস্থায় গত হইয়াছেন। মধ্যমার একটি পুত্র। কনিষ্ঠার দুইটি কন্যা। পুত্রের নাম হরি কিঙ্কর। কিঙ্কর বিবাহিত, বুদ্ধিমান ও কার্য্যক্ষম।

জেঠার বৈঠক খানাটি সে কালের ধরণে সাজান। ঢালা বিছানা, তার উপর একখানি ছোট গালিচা। গালিচার উপর একটি তাকিয়া-বালিশ। তদগ্রে জেঠা উপবেশন করেন। গালিচার উপর বড় একটা কাহারও বসিবার হুকুম নাই। তবে নির্ম্মলের কথা স্বতন্ত্র। জেঠা তাঁহাকে আদর করিয়া গালিচার উপর বসাইয়া নিজে পার্শ্বে বসিলেন।

কেদার জেঠা, দন্তহীন বদনে আকর্ণ হাস্য বিস্তার করিয়া বলিলেন, "আজ আমার ঘর আলো হ'ল, বাবা। তোমারা সব ছেলে মানুষ, তোমরা সব, কি জান্‌বে। (ক্রন্দনের সুরে) আজ যদি তোমার স্বর্গীয় পিতা বেঁচে থাক্‌তেন, ত'হ'লে (চখের জল মুছিয়া) আহা! তিনি আমায় কত ভাল বাসতেন।"

কেদার জেঠা, একটা কথা আছে, গোপনে বলিতে ইচ্ছা করি।"

জেঠা একটু থতমত খাইলেন। বলিলেন, "তা, বই কি, কথা থাক্‌বেইত স্বর্গীয় কর্ত্তা যে কত কথা আমায় বল্‌তেন।"

জেঠার ইঙ্গিতে অনুচর বর্গেরা স'রিয়া পড়িল। তখন নির্ম্মল কুমার কালী খুড়োর বিষয়ের কথা পাড়িলেন এবং গোলমাল মিটাইয়া লইতে জেঠাকে অনুরোধ করিলেন। জেঠা আকাশ হইতে পড়িলেন এবং কালী খুড়ার জন্য একটু দুঃখ প্রকাশ করিলেন। পরে নামাবলীর অংশ বিশেষ দ্বারা শুষ্ক চক্ষু ধীরে ধীরে পরিষ্কৃত করিয়া বলিলেন, "গোলমাল কি, বাবা, গোলমাল কা'কে বলে তা' আমি জানিনা। আমি, হরিনাম জপি, আর দুটো আলোচাল খাই। হরিবল, হরিবল।" ইত্যাদি।

নির্ম্মল, জেঠাকে সবিশেষ চিনিতেন। তিনি সে কথায় না ভুলিয়া বলিলেন, "যিনিই গোল করুন এখন গোল করিতে হইলে আমার সঙ্গে গোল করিতে হইবে। আপোষে মিটাইলে ভাল হয়।"

আরও কিছু কথাবার্ত্তা হইল। নির্ম্মলের যুক্তি তর্কের উত্তরে জেঠা হরিনাম শুনাইলেন। অবশেষে নির্ম্মল একটু বিরক্ত হইয়া বিদায় হইলেন।

নির্ম্মল চলিয়া গেলে কেদার পুত্র হরি কিঙ্করকে বলিলেন, "কালীর যাহা লইয়াছি তাহার কিছুই ছাড়িতে পারিব না, নির্ম্মল বলিলেও না, ভগবান বলিলেও না। নির্ম্মল সমাজপতি, সে রাগিলে আমার একটু ক্ষতি হইতে পারে তা'কি করব তাই বলে বিষয় ছাড়িতে পারি না। সে যা'হোক এখন কালীর বিধবার সঙ্গে একটু আত্মীয়তা দেখাতে হবে—কেন, তা' পরে বলিব।"

পুত্র বলিল, "নির্ম্মল বাবু একটু শাসাইয়া গিয়াছেন। কালী খুড়ার বিষয় লইয়া নির্ম্মল বাবুর সহিত গোল বাধিতে পারে।"

কেদার বলিলেন, "তাহাতে ডরাই না। যাহা লইয়াছি তাহা আইন সিদ্ধ করিয়া লইয়াছি। সহজে কিছু ছাড়িব না—ছাড়াইতে ও কেহ পারিবে না।"

(ক্রমশঃ।)

শ্রীশ্রীকৃষ্ণের-বসন্তোৎসব।

লেখক—শ্রীযতীন্দ্র নাথ দত্ত।

(১)

ভক্ত মন বিমোহন, শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবন,
বসন্তে সেজেছে অপরূপ।
ভক্তেরা যে দিকে চায়, সেই দিকে দেখা পায়,
নতোন্নত রাধাকৃষ্ণ রূপ ॥

(২)

কালিন্দ নন্দিনী কূলে, কুঞ্জতরু দুলে দুলে,
অনিলের সঙ্গে খেলা করে।
পল্লবিত তরু লতা, বায়ু সনে কয় কথা,
সুরে সুরে ভ্রমরা গুঞ্জরে ॥

(৩)

সুরভি কুসুম বাস, দশদিকে সু-প্রকাশ,
পবন প্রবাহে অনুক্ষণ।
শাখী পরে পাখী সব, সুখে করে কলেরব,
করে যেন হরিসঙ্কীর্ত্তন ॥

(৪)

কুঞ্জতরু শির পরে, গাঢ় কৃষ্ণ কলেবরে,
লুকাইয়া সুমধুর স্বরে।
কৃষ্ণরূপ ধ্যান করি, কৃষ্ণভক্তি হৃদে ধরি,
কুহরবে কোকিল কুহরে ॥

(৫)

হেরিবারে বৃন্দাবন, আকাশে উদয় হন,
কলাহীন বসন্তের শশী।
বিমল আকাশ জ্যোতি, বিমলা প্রকৃতি সতী,
ফাল্গুনের শুক্লাচতুর্দ্দশী ॥

(৬)

বসন্তের সন্ধ্যাকাল, বায়ুসহ দিয়া তাল,
নেচে যায় যমুনা লহরী।
পূরায়ে মনের সাধ, যমুনায় নাচে চাঁদ,
তারামালা করি সহচরী ॥

(৭)

এমন সুখের কালে, সাজি বন ফুল মালে,
চাঁদমুখে হাসি অবিরাম।
শিঙাবাঁশী পরিহরি, গলা ধরাধরি করি,
ভ্রমিছেন কৃষ্ণবলরাম ॥

(৮)

পীতবাস নন্দলাল, অলকা রঞ্জিত ভাল,
নীলাম্বর রোহিণী নন্দন।
শ্বেতকৃষ্ণ দুইসাজে, উজলে ভুবন মাঝে,
অঙ্গে শোভে চাঁদের কিরণ ॥

(৯)

কেলিকুঞ্জে দুটি ভাই, রূপের তুলনা নাই,
দুটি চাঁদ ভূতলে উদয়।
গগণে বসন্ত চাঁদ, নিকুঞ্জে যুগল চাঁদ,
তিন চাঁদে দেখা শুনা হয় ॥

(১০)

প্রদোষে চাঁদের মেলা,
অপরূপ লীলা খেলা,
রামকৃষ্ণ খেলিছেন বনে।
হেন কালে শিশু নেড়ে,
বেগে আসিতেছে তেড়ে,
ভেড়া এক হেরিলা নয়নে ॥

(১১)

বিশ্বময়ী যাঁর মায়া,
তাঁরে কি দেখাবে মায়া,
দৃষ্টিমাত্রে মায়া দর্প চূর।
ভাঙ্গিল ভেড়ার ভুর,
নাম তার মেড্ডাসুর,
প্রেরণ করেছে কংসাসুর ॥

(১২)

কৃষ্ণে বধিবার আশে,
মেড্ডাসুর ছুটে আসে,
হাসি কৃষ্ণ ধরিলেন তায়।
ঢুসাঢুসি ঘুসাঘুসি,
কৃষ্ণচন্দ্র মহা খুসি,
দুই ভাই মত্ত গজ প্রায় ॥

(১৩)

নররূপী নারায়ণ,
একঅংশে দুইজন,
নরলীলা মধুবৃন্দাবনে।
নরেতে মেড়াতে রণ,
অপরূপ দরশন,
কে হারে কে জিতে এইরণে ॥

(১৪)

নাশিতে ধরণী ভার,
যুগে যুগে অবতার,
নাম ধরি দানবারি হরি।
মায়াসুরে নিপাতন,
করিলা মধুসূদন,
আছাড়িয়া দুই শিশু ধরি ॥

(১৫)

মরিল মায়ার মেড়া,
ঘুচে গেল শিশু নাড়া,
দুই ভাই নাচিতে লাগিলা।
কি হবে এ মেড়া নিয়া,
কে করে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া,
এইখানে এই এক লীলা ॥

(১৬)

কাট পাতা কুড়াইয়া,
মেড়াটারে জড়াইয়া,
পুড়াইলা কৃষ্ণ বলরাম।
সেই হতে কালে কালে,
চাঁচড়ের সন্ধ্যাকালে
রটিয়াছে মেড়াপোড়া (১) নাম ॥

(১৭)

মেড়া পোড়া সাঙ্গ করি,
কৌতুকে মাতিয়া হরি,
প্রকাশিতে কৌতুকের লীলা।
সাধিয়া বাঁশরীতান,
গাইয়া বাসন্তী গান,
গোপীগণে চঞ্চলা করিলা ॥

(১৮)

গৃহকার্য্য পরিহরি,
সঙ্গে অষ্ট সহচরী,
রাধিকা আইলা কুঞ্জবনে।
কহিলেন বংশীধারী,
আজি তব সহ প্যারী,
দুলিতে সাধ হতেছে প্রাণে ॥

(১৯)

যিনি জগতের নাথ,
তাঁর দুলিবার সাধ,
সাধ শুনে হরিষ অন্তর।
তবু যেন লজ্জা পেয়ে,
কৃষ্ণ পানে চেয়ে চেয়ে,
পালাইলা দাদা হলধর ॥

——০০——

হাসিয়া রাধারে কন নিকুঞ্জ বিহারী।
আনন্দ ভুঞ্জিবে আজি সব গোপ নারী ॥
রজনী প্রভাতে হবে তিথি-পৌর্ণমাসী।
জান রাধে! পূর্ণিমারে বড় ভালবাসি ॥

(১) শ্রীশ্রীকৃষ্ণের দোল যাত্রার পূর্ব্বদিন সন্ধ্যাকালে, "চাঁচড়" হয়। চাঁচড়ের সংস্কৃত নাম "সায়ংবহ্ন্যুৎসব"। বৃন্দাবনে মেড্ডাসুর বধের সময় বৃন্দাবনে অগ্নিক্রীড়া হইয়াছিল, এখনকার ভক্তগৃহে "মেড়াপোড়া" কথাটা ক্রীড়ার নামান্তর। অশিক্ষিত লোকে ইহাকে নেড়াপোড়া বলে। লেখক —

আবির কুম্‌কুমে দিব সাজায়ে তোমারে।
দু-জনে খেলিব হোলি দেখিব কে হারে॥
আবিরে বিভোর হ'য়ে প্রেমানন্দে ঢলে।
দু-জনে দুলিব রাধে লতিকার দোলে॥
সখীরা খেলিবে লয়ে, তোমায় আমায়।
করতালি দিয়া গাব হোলি-হায় হায়॥
সখীরা প্রেমেতে মাতি যোগ দিবে তায়।
আবির ছড়ায়ে দিবে আমাদের গায়॥
সে খেলাত কাল হবে আজি রাসেশ্বরি!
দোল-লীলা অধিবাসে হও দোলেশ্বরী॥

——০——

উৎসব আনন্দে হাসি মাথা নত করি।
তথাস্তু বলিয়া সায়, দিলেন কিশোরী॥
নৃত্য গীত প্রেমামোদে মাতাইয়ে প্রাণ।
চাঁচড়ের বিভাবরী হ'ল অবসান॥
পরাদন পূর্ণিমায় লতা-মঞ্চোপরি,
দোল দোল দোল খেলা খেলিলেন হরি॥
বামেতে শ্রীমতী রাধা, মেঘে সৌদামিনী,
চারিভিতে অষ্ট সখি সুচারু হাসিনী॥
মাধবের হোলিখেলা সখিদের সনে,
অতি অপরূপ দৃশ্য মধুবৃন্দাবনে॥
হোলিনৃত্য, হোলিগীত, আবিরের গোলি,
হোলি হোলি হোলিরবে সবে কুতূহলী॥
এই পর্ব্বে কত রঙ্গ, কত পরিহাস,
কতই ঠমক ঠাট, হোলির বিলাস॥
দেখি নাই, পাই শুধু পুরাণে শুনিতে,
কাজে কাজে ষোল আনা নারিনু বর্ণিতে॥
এবে সেই হোলি খেলা আমাদের দেশে,
নকলে কতই খাস্ত দাঁড়ায়েছে এসে।

নামে আছে হোলিখেলা, হরি ভক্তি নাই,
বীভৎস্য রসের শ্রাদ্ধ, বলিহারি যাই॥
এক এক কাণ্ড দেখে এত ঘৃণা হয়,
উঠে যাক হোলি পর্ব্ব, থাকা ভাল নয়॥
সুখেতে থাকুন সদা গোপের বালিকা,
ব্রজেশ্বরী দোলেশ্বরী শ্রীমতী রাধিকা,
সুখী হউন কৃষ্ণচন্দ্র দোলের ঈশ্বর।
ফাল্গুনি-পূর্ণিমা হউক অক্ষয় অমর॥
হে কৃষ্ণ! তোমার পদে মাগি পরিহার।
ধাতু দেহে দোলে তুমি উঠিও না আর॥
পারি যদি দোলেশ্বর, ব্রজেন্দ্র কুমার।
দেখিতে তোমার সেই হোলি চমৎকার,
তবে ত খেলিতে সাধ হইবে আবার,
এখন হোলির পায় কোটি নমস্কার!
তোমরা খেলেছ, হরি হোলি হায় হায়,
এখন আমরা কাঁদি, হোলি হায়! হায়!!

——০——

সীতাষ্টক-স্তোত্রম্

(শ্রীহরিহর ভট্টাচার্য্য-বিরচিতম্) (*)

(১)

উদ্ধর্ত্তুং ত্রিদিবেশবৃন্দঘৃণিতং রক্ষঃকুলং পঙ্কিলং
সম্ভূতা জনকালয়ে জনজনুর্বন্ধব্যাথানাশিনী।
কালে গচ্ছতি রূপযৌবনযুতা প্রোদ্বাহযোগ্যা তথা
রাজন্তী নিজশোভয়া পিতৃপুরে সীতা ময়োপাস্যতে॥
নন্দন-বন্ধন-ব্যথা কথন' জননী
না পারে সহিতে,—ইহা বিদিত অবনী!

ঘৃণিত যদিও সেই নিশাচর-কুল,
তথাপি স্নেহের বশে হইয়া ব্যাকুল,
তাহাদের জন্ম-পাশ করিতে মোচন,
উজলিলা যিনি আসি জনক-ভবন।
দিনে দিনে রূপ আর যৌবনের ঘটা,
ক্রমশঃ বেড়িয়া যাঁর বাড়াইল ছটা।
হইলা বিবাহ-যোগ্যা কালক্রমে যিনি
নমি তাঁর রম্যপদ কোকনদ-জিনি।

(২)

শ্যামাঙ্গং কৃতভঙ্গশৈবধনুষং রামং বিদেহাগতং
পশ্যন্তী রঘুবংশহংসমনঘং স্নিগ্ধৈঃ কটাক্ষৈর্মুদা।
অন্যোন্যেক্ষণমেলনাৎ স্মিতমুখী ব্রীড়াবিনম্রাননা
মুগ্ধা প্রেমনবাঙ্কুরৈর্বিলসিতা সীতা ময়োপাস্যতে॥

নব-দূর্ব্বা-দল-শ্যাম রামরঘু বর
আসিলেন জনকের মিথিলা-নগর।
ভাঙ্গিলেন শৈব-ধনু হুঙ্কারে হেলায়,
সভামাঝে মুগ্ধ সবে হ'লো স্তব্ধপ্রায়।
অলক্ষিতে লক্ষ্মীরূপা যে জানকী সতী,
করিলা কটাক্ষ-পাত রামচন্দ্র প্রতি।
অকস্মাৎ দু'জনের আঁখির মিলনে,
লজ্জাবতী যিনি অতি সহাস্য-বদনে।
সাক্ষাৎ কমলা সেই সীতার চরণ
ভক্তিভরে উপাসনা করি অনুক্ষণ।

(*) শ্রীযুক্ত হরিহর ভট্টাচার্য্য মহাশয় এই স্তোত্রটীর রচয়িতা। ইনি একটি বালক মাত্র। ইহাঁর বয়ঃক্রম ১৮ বৎসর। ইনি নৈয়ায়িক-চূড়ামণি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত রাখালদাস ন্যায়রত্ন মহাশয়ের নিকটে ন্যায়শাস্ত্র [অধ্যয়ন করিতেছেন। এত অল্প বয়সেই ইনি যখন এরূপ উৎকৃষ্ট সংস্কৃত ও বাঙ্গালা কবিতা রচনা করিতে পারেন, তখন তিনি ভবিষ্যতে যে একজন পরম সুকবি হইবেন, তদ্বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। ভগবান্ তাঁহাকে দীর্ঘজীবী করুন। জন্মভূমি সম্পাদক।

(৩)

আকর্ণ্যেতি বসেদশেষগুণভৃদ্ রামো বিচারাসনে
সম্যক্ প্রীতিবতী পুনর্বনগতিং সঞ্চিন্ত্য ক্ষীণম্ া।
হাহা দেবরলক্ষ্মণেন সহিতা ক্লান্তা সকান্তা গতা
শোভামণ্ডিতদণ্ডকাখ্যবিপিনং সীতা ময়োপাস্যতে॥

কতই আনন্দ আজি অযোধ্যা-ভবনে,
বসিবেন রঘুনাথ বিচার-আসনে;
ইহা শুনিয়াই প্রাণে প্রমোদ অতুল;
গড়িলেন যিনি কত সুখের পুতুল।
যাইতে হইবে বনে সহসা একথা
হৃদয়মাঝারে হায় দিল যার ব্যথা,
দেবর ও পতি সনে অরণ্যের মাঝে
প্রবেশিলা যিনি শেষে বল্কলের সাজে,
সাক্ষাৎ কমলা সেই সীতার চরণ
ভক্তিভরে উপাসনা করি অনুক্ষণ।

(৪)

মারীচেন কুরঙ্গরঙ্গদধতা রামং প্রতার্য্য স্বয়ং
পৌলস্ত্যেন তপোধনাকৃতিভৃতা নীতা বিনীতা বনাৎ।
হাহা রামহতাঽভবামি রুদতীত্যুক্ত্বা বদন্তী মুহুঃ
স্বামিন্ রক্ষ বিপক্ষরাক্ষসকরাৎ সীতা ময়োপাস্যতে।

মারীচ মায়ায় রাম লক্ষ্মণে ছলিয়া,
হরিল রাবণ যাঁরে তপস্বী সাজিয়া;
"রাক্ষসের কর হ'তে রক্ষা কর রাম
যায় প্রাণ"—ইহা কহি' যিনি অবিরাম,
ভাসাইলা বক্ষঃস্থল নয়নের জলে
উপাসনা করি তাঁর চরণ-কমলে।

(৫)

স্থিত্বাহশোকবনেঽপি সন্ততমহং প্রাণেশ শোকাকুলা
নো দৃষ্ট্বা তব চারুবক্ত্রমমলং সংরম্য সোমোপমম্।
পীত্বা নাথ কদা তবাধরসুধাং লপ্স্যেঽতুলং সম্মদং
প্রোচ্যেদং ভুবি লুণ্ঠিতা নৃপসুতা সীতা ময়োপাস্যতে॥

"থেকেও অশোক-বনে আমি নিরন্তর,
না দেখে ও মুখ-শশী ব্যাকুল-অন্তর।
তোমার অধর-সুধা করিয়াই পান,
শীতল হইবে মোর এই পোড়া প্রাণ।
ইহা কহি পড়িলেন যিনি ধরাতলে,
উপাসনা করি তাঁর চরণ-কমলে।

(৬)

দৃষ্টা মারুতিনা প্রবিশ্য কৃতিনা লঙ্কাং সশঙ্কাননা
ব্যালীবৃন্দবৃতেব চন্দনলতা রাত্রিঞ্চরীবেষ্টিতা।
দীর্ঘং নিশ্বসতী প্রকম্পনবতী ভূয়স্তথা ক্রন্দতী
চেটীভীষণভাষণৈর্ভয়যুতা সীতা ময়োপাস্যতে॥

বেড়িয়া চন্দন-লতা ভুজঙ্গ-সন্ততি
রহে ভয়ঙ্কর- ভাবে নিয়ত যেমতি,
তেমতি রাক্ষসী-কুল আছয়ে ঘিরিয়া,
ঘন ঘন বহে শ্বাস, ভয়ে কাঁপে হিয়া,
শোক-অশ্রু-রাশি ফেলি' তিতাইছে বুক,
শঙ্কায় মলিন হায় চিরপ্রফুল্লমুখ ;
মারুতি এমতিভাবে পশি' লঙ্কাপুরে
নেহারিলা যাঁরে-করি উপাসনা তাঁরে।

(৭)

শ্রুত্বা বাচমিমাং দশাননমুখাদ্ যুদ্ধে হতো রাঘবঃ
সুগ্রীবঃ সহ সেনয়া খলু নিজস্থানং ভয়াৎ প্রস্থিতঃ।
দৃষ্ট্বা রামশিরো ধনুশ্চ সশরং সংকল্পিতং মায়য়
হারা মেতি নিগদ্য মূর্চ্ছিতবতী সীতা ময়োপাস্যতে॥

শুনি' রাবণের মুখে "যুদ্ধে হত রাম,
সুগ্রীব সৈনিক সহ করেছে প্রস্থান।"
কল্পিত রামের শির মায়াময় ধনু"
আ মরি নেহারি' যাঁর রোমাঞ্চিত তনু।
"হায় রাম!" ইহা কহি' যিনি মূর্চ্ছাগত,
উপাসনা সে সীতার করি অবিরত।

(৮)

বন্ধং বন্ধুগণৈর্বিধায় সরুষা রামেণ সিন্ধোস্তথা
লঙ্কেশঞ্চ নিহত্য বংশসহিতং রক্ষঃপুরাদুদ্ধৃতা।
ক্রীড়াদিঞ্চ সমাপ্য মাতৃবসুধাক্রোড়ং পরীক্ষাচ্ছলৈ
র্যাতাগত্য বনাৎ স্বকীয়নগরীং সীতা ময়োপাস্যতে॥

সিন্ধুর বন্ধন করি' বন্ধুগণ সনে
বংশ সহ বিনাশিয়া দুষ্ট দশাননে।
সাঙ্গ করি' লীলাখেলা পরীক্ষার ছলে
প্রবেশিলা যিনি মাতৃ-বসুধার কোলে ;
সাক্ষাৎ কমলা সেই সীতার, চরণ
ভক্তিভরে উপাসনা করি অনুক্ষণ॥

কলেরা প্রতিষেধক।

লেখক—শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

অধুনা বিলাতের প্রধান ডাক্তারদের মধ্যে অনেকে বলিতেছেন, "তাম্র" কলেরা রোগের একটী উৎকৃষ্ট প্রতিষেধক। The best medicine as a preventive is undoubtedly Cuprum (copper)—William Bayes, M. D.

তজ্জন্য তাঁহারা কলেরায় প্রাদুর্ভাবের সময় ইহার আক্রমণের হাত হইতে এড়াইবার জন্য হোমিওপ্যাথিক মতের কিউপ্রম (যাহা তাম্র হইতে প্রস্তুত) ১ম শতমিক শক্তির ১০ ফোঁটা ৪ ড্রাম পরিস্কৃত জলের সহিত প্রত্যহ প্রাতে একবার করিয়া সেবন করিতে উপদেশ দিয়াছেন।

আমাদের দেশে এই ব্যবস্থা নূতন নহে। কারণ তাম্রকুণ্ডস্থিত বিষ্ণু পাদোদক যে অকাল মৃত্যুহরণকারী ও সর্ব্বব্যাধিবিনাশক তাহা আর্য্য মনীষিগণ বহু প্রাচীন কাল হইতেই বলিয়া আসিতেছেন :—

অকালমৃত্যুহরণং সর্ব্বব্যাধিবিনাশনং।
বিষ্ণুপাদোদকং পীত্বা শিরসা ধারয়াম্যহং॥

অকাল মৃত্যু হরণকারী ও সর্ব্বব্যাধিবিনাশক বিষ্ণু চরণামৃত পান করিয়া আমি তাহা মস্তকে ধারণ করি।

ধর্ম্ম ও স্বাস্থ্য বিজ্ঞানের সহিত ঈদৃশ সামঞ্জস্য পৃথিবীর আর কোন জাতির ধর্ম্ম শাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায় না।

হিন্দূসন্তানগণ যদি স্বীয় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সনাতন ধর্মশাস্ত্রানুসারে নিত্যকর্ম্মসম্পাদনে রত থাকেন এবং প্রত্যহ বিষ্ণুর চরণামৃতপানে বিস্মৃত না হন তাহা হইলে তাঁহাদিগকে কলেরা প্রভৃতি অকালমৃত্যুকর পীড়া কিছুতেই আক্রমণ করিতে পারিবে না। কয়েক স্থলে কলেরা এপিডেমিকের সময় আমরা তত্রত্য জনগণকে এই ব্যবস্থা পালনে উপদেশ দিয়া আশানুরূপ ফল প্রত্যক্ষ করিয়াছি।

—০—

বিচিত্র প্রসঙ্গ।

নাড়ী।—নাড়ীর গতি পরীক্ষা করিয়া মনুষ্য দেহের সুস্থাসুস্থের বিষয় জ্ঞাত হওয়া যায়। চিকিৎসকের মত, জন্মের সময়, জাতকের নাড়ীর গতি প্রতি মিনিটে ১৩০ হইতে ১৪০ বার, বাল্যকালে ১০০ বার, যৌবন কালে ৯০ বার, প্রৌঢ়ে ৭৫ বার, বার্দ্ধক্যে ৭০ বার। স্ত্রীলোকের পীড়ার গতি পুরুষের অনুপাতে ৬ হইতে ১৪ বার বেশী। তাপমান যন্ত্রের পরিমাপে প্রতি ৬৬ ডিক্রির উত্তাপে দশবার করিয়া নাড়ীর গতি বৃদ্ধি পায়।

নিদ্রা।—কোনও সুবিখ্যাত অধ্যাপক তাঁহার ছাত্র গণকে নিদ্রার সময় সম্বন্ধে সর্ব্বদাই বলিতেনঃ—

Sik hours for a man,
Sevenffor a woman,
Eight for a fool,
And ten for a pig,

অর্থাৎ পুরুষে ৬ ঘণ্টা, স্ত্রীলোকে ৭ ঘণ্টা, নির্ব্বোধে ৮ ঘণ্টা এবং শূকর শাবকে দশ ঘণ্টা ঘুমাইবে। অতি নিদ্রা স্বাস্থ্যহানিকর।

অষ্টাদশ বর্ষব্যাপী নিদ্রা।—মিথ্যা কথা নহে, ক্রমাগত ১৮ বৎসর নিদ্রাঘোরে কাটাইতে পারে কে? শ্রীমতী বুয়েন-উত্তম জীবনের অর্দ্ধেক কাল নিদ্রায় অতিবাহিত করিয়াছেন। এক্ষণে তাঁহার বয়স ৩৬ বৎসর। সেন্ট কোয়েন্টনের নিকট থেনেলিন নামক এক ক্ষুদ্র পল্লিতে—শ্রীমতীর বাস। অষ্ট্রেলিয়ার "থিয়োসফি" নামক পত্রিকায় এই সংবাদটি প্রকাশিত হইয়াছে। রমনীর পানাহার প্রায়বন্ধ, নিদ্রাই জীবনের একমাত্র কার্য্য, সুবিজ্ঞ ফরাসী ডাক্তারগণ রমণীকে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন, তাঁহার নাড়া ক্ষীণ, কিন্তু নিয়মমত চলিতেছে, চক্ষু যেন স্বভাবতঃ মুদ্রিত। রমণী একদিন হঠাৎ অজ্ঞান হইয়া পড়েন, তার পর হইতেই এই অবস্থা।

বিভিন্ন প্রদেশ হইতে ভারতে যত টাকার দ্রব্য আমদানী হয়, তন্মধ্যে শতকরা ৩৬ টাকার কাপড় চোপড়।

মা-ষষ্ঠীর কৃপা।—বেল্‌জিয়ামের বেভারেণ সহরে এক ব্যক্তির ৩০ ত্রিশটি সন্তান। বিবাহ দুইটি, ছেলে ২২ টি, কন্যা ৮ টি।

গরমজলের উপকারিতা।—আহারের পূর্ব্বে অল্প পরিমাণে গরমজল পান করিলে, অজীর্ণতা কোষ্ঠবদ্ধতা রোগ দূর হয়। হঠাৎ ঠাণ্ডা লাগিয়া দেহ অসুস্থ হইলে, গরম জলের সহিত একটি পাতি লেবুর রস ও চিনি মিশ্রিত করিয়া খাইলে, শরীরের শ্লেষাভার দূর হয়। স্নায়বিক দুর্ব্বলতা বশতঃ মাথাব্যথায় গরম জলের সেক দিলে অল্প সময়ের মধ্যে শান্তি হয়। চক্ষু জ্বালা করিলে বা ক্লান্তি বোধ করিলে বাহিক গরম জল প্রয়োগে সবিশেষ উপকার হয়। শরীরের কোনস্থানে মোচড়াইয়া গেলে, সেইস্থান গরমজলে কিয়ৎক্ষণ ডুবাইয়া রাখিয়া পরে গরম জল ফ্লানেল দিয়া সেক দিলে আরোগ্য হয়। শরীরের কোন অঙ্গ থেঁৎলাইয়া গেলে উক্ত উপায়ে আরোগ্য হয়। দেহের কোন স্থান কাটিয়া কিম্বা আঘাত লাগিয়া যদি রক্তপাত হইতে থাকে, তাহা হইলে, সেই স্থানে গরম জল ঢালিয়া দিলে রক্তপড়া বন্ধ হইয়া যায়। যাঁহারা অনিদ্রা জনিত পীড়ায় কষ্ট পাইতেছেন, তাঁহারা গরম জলে স্নান করিলে তন্দ্রাযুক্ত হইবেন।

বিষম সমস্যা।

কোন পরিব্রাজকের লিখিত।

মনোমহেশের পথে মানস সরোবর হইতে আগত কএকজন মহাপুরুষের সহিত আমাদিগের সাক্ষাৎ হইয়াছিল। বেশ ভূষা বা আকার প্রকারে তাঁহাদিগকে না চিনিতে পারিলেও, তাঁহারা যে কে, ইহা ভারতবর্ষীয় কথা প্রসঙ্গে জানিতে আর বাকি রহিল না। তাঁহাদিগকে "মহাপুরুষ" কেন বলিলাম, তাহার কারণ এ স্থানে উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন। তবে ভারতের বর্ত্তমান অবস্থা-সম্বন্ধে তাঁহাদের সহিত যে সকল কথা বার্ত্তা হইয়াছিল, তাহার কোন কোন অংশ যেমন জ্ঞানো-দ্দীপক তেমনই সমস্যাপূর্ণ। তাই এই প্রস্তাবের "বিষম সমস্যা" নাম করা হইল। ইহা আদ্যোপান্ত পাঠ করিলে পাঠক বুঝিতে পারিবেন ঐ মহাপুরুষদিগের চিন্তা কতদূর প্রশস্ত ও উদার এবং ধর্ম্ম জগতের পক্ষে কীদৃশ উপকারক।

প্রায় অশীতি (৮০) বৎসর অতীত হইল, মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়, হিন্দু সমাজের শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া, বেদ উপনিষদ্ পুরাণ এবং তন্ত্র হইতে যে সকল সত্য উদ্ধার করিতে প্রয়াস পাইয়া ছিলেন, তাঁহার পরবর্ত্তী আচার্য্য শ্রীমদ্ দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুর প্রভৃতি তাহা সম্পূর্ণ করিতে ধন অকাতরে ব্যয় করিতে কুণ্ঠিত হন নাই; কিন্তু তাঁহার পরবর্ত্তী যুবকেরা সে জাতীয় ধর্ম্মভাব রক্ষা করিতে না পারিয়া স্বতঃ পরতঃ বিজাতীয় বা খৃষ্ট ধর্ম্মের পদাশ্রয় গ্রহণ করিয়া হিতে বিপরীত করিয়া তুলিয়াছেন; তবে শুভ সংবাদ এই যে, তাঁহারা তাহা করিয়া হিন্দু সংস্রব পরিত্যাগ করত খৃষ্ট-সমাজের অন্তর্ভূত হইতে প্রয়াস পাইতেছেন; সুতরাং, হিন্দু সমাজ তাঁহাদের দ্বারা আর কোন আশা করিতে পারেন না।

সে দিন ড্যাল হাউসী শৈলে অবস্থিতি কালে, উন্নতিশীল খৃষ্ট সমাজের নেতা কাউন্ট টলষ্টয়-প্রমুখ ভারতীয় উচ্চপদস্থ ইংরাজ দিগের মধ্যে মহানুভাব মিঃ ফিলিনের (Supenintendig engineer qunjaf.) সহিত আমাদের সাক্ষাৎ হইয়াছিল। স্বজাতীয় ধর্ম্ম প্রসঙ্গে কথা উঠিলে, তিনি কহিলেন, "ধর্ম্মের মর্য্যাদা বহুকালে বহুযত্নে এবং বহুআত্মত্যাগে সমাজ জাতিগত শক্তির অন্তর্ভূক্ত হইয়া থাকে। সেই ধর্ম্ম-সমন্বিত জাতিগত শক্তি, যত বদ্ধমূল হইতে থাকে, তত সেই জাতির মধ্যে মহাপুরুষদিগের আবির্ভাব হইয়া থাকে। এরূপ দৃষ্টান্ত, প্রায় সকল জাতির মধ্যেই দেখিতে পাওয়া যায়। পাঁচ হাজার বৎসরের মধ্যে আব্রাহিম হইতে

খৃষ্ট পর্য্যন্ত খৃষ্ট সমাজে কত মহাপুরুষ আবির্ভূত হইয়া, যে উন্নতির স্রোতঃ সেই সমাজে আনিয়া দিয়াছেন, তাহার ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে ইহার তথ্য সহজে বুঝিতে পারা যাইবে।

এই তত্ত্বকথা, সমীচীন বলিয়া সমর্থন করত আমরা বলিলাম, ঘোর অন্ধকারের মধ্যে সূর্য্যদেব যখন প্রথমে উদয় হইয়াছিলেন, তখন সেই নবোদিত আলোক, অগ্রে যাঁহারা দেখিয়াছিলেন, তাঁহাদের বংশধরেরাই জগতে "আর্য্য" বলিয়া পরিচিত। সেই আর্য্যেরা যখন সংসার বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া আর্য্যজাতি বলিয়া চিহ্নিত হইলেন, তখন হইতে তাঁহাদের বেদ, উপনিষদ্, পুরাণ এবং তন্ত্র প্রভৃতি, দেশ, কাল, পাত্র ভেদে সময়ে সময়ে তাঁহাদের প্রবক্তা, দেব, ঋষি, আচার্য্য এবং তন্ত্রধার বলিয়া প্রতিষ্ঠিত; সে কথা কতিপয় সহস্র বৎসরের কাহিনী নহে। তাহা যাবচ্চন্দ্র দিবাকরবৎ বিদ্যমান। অর্থাৎ চন্দ্র সূর্য্য যত কালের, ততকালের। তাই তাঁহারা শাস্ত্রে তেত্রিশ কোটি দেবতার মহিমা কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। এই আর্য্যজাতি সেই সকল দেবতার সন্ততি হইয়া, পূর্ব্বপুরুষের দেবত্ব হারাইয়া বসিয়াছেন। তাই ভারতীয় হিন্দু এখন 'নিগার" লোকের বে-গারে নিযুক্ত হইয়া নিষ্কর্ম্মা হইয়া গিয়াছেন। নচেৎ যাঁহাদিগের প্রণীত গ্রন্থপড়িয়া, সার উইলিয়ম জোনস, কোলব্রুক, লাসেন, কাউএল, ম্যাক্সমূলার প্রভৃতি পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ প্রমুগ্ধ তাঁহাদের বংশ ধরেরা কি ধর্ম্মে এতই হীন হইতে পারেন?

হিন্দুশক্তি সমস্ত জগতে সঞ্চারিত। কিরূপে, কিভাবে, কোথা হইতে সে শক্তি সকল জাতির মধ্যে সঞ্চারিত হইল, তাহার প্রকৃষ্ট ইতিহাস বর্ত্তমান না থাকিলেও, সেই শক্তির জ্যোতিঃ সর্ব্বত্র সঞ্চারিত দেখিয়া আদি স্রোতের আভাস স্পষ্ট অনুভূত হইতেছে। তখন সেই মাতৃ-শক্তির পূজা করিতে সভ্য জগৎ এত কুণ্ঠিত কেন? এবং সেই "জেষ্ঠ সহোদর দিগের" সম্মান রক্ষা করিতে এত লজ্জাবোধ হইতেছে কেন? খৃষ্টান্ মিশনারীগণ যদি স্বার্থশূন্য হইয়া, হিন্দুর জাতীয় ধর্ম্মশাস্ত্র আলোচনা করেন, এবং পুরাণাদি শাস্ত্র পাঠ করিয়া গত পাঁচ হাজার বৎসরের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগকে এত আত্মবিস্মৃত হইতে হয় না। হিন্দুমুক্তকণ্ঠে বলিতে পারেন, বাইবেলের একটী কথাও তাঁহাদিগের অমাননীয় নহে। পিতা কি পুত্রের ঐশ্বর্য্য দেখিয়া ঈর্ষা করিতে পারেন? সরল মনে ইহা স্বীকার করিলে বাল বৃদ্ধ শ্রীকৃষ্ণ এবং ক্রুশবিদ্ধ খৃষ্ট এক হইয়া যান। এই সকল কথা শুনিয়া মিঃ ফিলিন, হিন্দুশাস্ত্র আলোচনা করিতে আগ্রহ প্রকাশ করিলেন। আমরা তাহাতেই আহ্লাদিত।

আজিকালি সমস্ত সভ্য জগতে একটা "ধর্ম্ম বিপ্লব" উপস্থিত হইয়াছে। তাই দেখিতে পাই, সকলেই নিজ নিজ ধর্ম্মের উন্নতি সাধনে যত্নবান্।" ধর্ম্ম যে সমাজের রীতি, নীতি, ধ্যান, জ্ঞানের প্রসূতি, তাহা আর কাহাকেও বলিয়া দিতে হয় না। অথচ দেখিতে পাওয়া যায়, ধর্ম্ম বিনা সমাজের যে অধঃপতন হইয়াছে, তাহার কারণ চিন্তায় কেহই অগ্রসর নহেন। যিনি যে অবস্থায় যে ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া রহিয়াছেন, তিনি সেই ধর্ম্মের সেই অবস্থার উন্নতি সাধন করিতে পারিলেই কৃতার্থ হন্। কিন্তু, তাহার মূলে যে কত ভ্রম রহিয়াছে, কেহই তাহা অবধারণ করিতে প্রস্তুত নহেন। সাধারণতঃ দেখিতে পাওয়া যায়, লোকে পীড়িত হইলেই ডাক্তার ডাকাইয়া চিকিৎসা করিতে অনুরোধ করেন। ডাক্তার আহ্বান পাইলেই উপস্থিত হইয়া রোগীর মুখে দুই একটি কথা শুনিয়া জিহ্বা দেখিয়া ব্যবস্থা লিখিতে বসেন।" রোগী যদি শিরঃপীড়ার যন্ত্রণার কথা বলে, অমনই তাহার ঔষধের ব্যবস্থা হয়; কিন্তু, কি কারণে শিরঃপীড়া হইয়াছে, তাহার কারণ অনুসন্ধান করেন না। সুতরাং পীড়া, ক্রমে সঙ্কটাপন্ন হইয়া পড়ে। তখন পীড়া স্থির করিবার জন্য "মেডিকেলবোর্ড" বসিয়া যায়। তাহাতে কিছু নিরাকরণ হউক, বা নাই হউক, বোর্ডের ফির জন্য গৃহস্থকে বিপদ্‌গ্রস্থ হইয়া পড়িতে হয়। রোগীও তাহার পর প্রায় পঞ্চত্ব পায়। এইরূপ ব্যাপার ঘন ঘন হইতে দেখিয়া এখন আয়ুর্ব্বেদ সঙ্গত চিকিৎসা আরম্ভ হইয়াছে। কিন্তু, তাহাতেই বা কি ফল হইতেছে? "এলো"-আয়ুর্ব্বেদের স্থলে চিকিৎসা কার্য্যকরী হইতেছেনা দেখিয়া সূক্ষ্ম হোমিও প্যাথি বাহির হইয়াছে। সকল বিষয়ের ত প্রতিযোগিতা চাই। তাই দেখিতে পাই, কোথা হইতে সুপ্রাপ্যাথী, ইলেক্‌ট্রোপ্যাথী, হাইড্রোপ্যাথী, পথে পথে দাঁড়াইয়া পীড়িত সমাজকে নিষ্পীড়ন করিতেছে। কৈ? কিছুতেইতো কিছুই হইতেছেনা? বরং গবর্ণমেণ্ট রিপোর্টে প্রকাশ দিন দিন নানাজাতীয় ব্যাধি সংক্রামিত হইয়া এদেশ ছারখার করিয়া ফেলিতেছে। এখন আবার কোন 'প্যাথি' পথ আগলাইয়া দাঁড়াইবে, তাই ভাবিতেছি।

এইরূপ ধর্ম্ম জগতেও পীড়ার আধিক্য যার পর নাই প্রসারিত। শরীরের রোগ মুক্ত করিবার জন্য ডাক্তার, কবিরাজ হাকিম, বয়েদ, যেমন ঔষাধালয় খুলিয়া অভয়দান করিতেছেন, পাপরূপ পীড়া হইতে আত্মাকে রক্ষা করিবার জন্য তেমনই শত শত ভজনালয়, মন্দির, সভা, সমাজ, সমিতি উন্মুক্ত হইয়া পাপী তাপীকে আশ্রয় দিবার জন্য প্রেম প্যাথিও প্রচার করিতেছেন। অথচ দেখিতে পাই পাপ পিশাচীর তাড়না কোথা হইতেও নিবৃত্তি হইতেছেনা। হইবে কোথা হইতে? রোগ, শোক, পাপ তাপের মূল কারণ কি কেহ কি অনুসন্ধান করিতেছেন? তাহা হইতেছেনা বলিয়াই সংসারে এতই হাহাকার।

মূল প্রবন্ধে সর্ব্ববিধ রোগের কারণ কথঞ্চিৎ নিরাকৃত হইয়াছে। এখন ভরসা এই যে সুযোগ্য হিন্দু সমাজপতিগণ তাঁহা যুক্তি যুক্ত বোধ করিলেই শ্রম সার্থক বোধ করিব এবং অবহিত হইয়া তাহা পাঠ করত, তাহার সদুপায় উদ্ভাবন করিলে সকল মনোরথ হইব।

সাবিত্রী।

লেখিকা—শ্রীমতী নগেন্দ্র বালা সরস্বতী।

কৃষ্ণা চতুর্দ্দশী নিশি আঁধার গগন খানি,
নিবীড় শ্যামল বাসে মণ্ডিতা প্রকৃতি রাণি!
নাহি খদ্যোতের জ্যোতি চারুছটা তারকার,
যেদিক চাহিয়া দেখি শুধু ঘন অন্ধকার।
ধ্বনীতেছে বিশ্বে শুধু ক্ষীণ ঝিল্লিকার সুর,
মাতাইয়া মানবের উনমত্ত হৃদি পুর।
মৃত পতি কোলে ল'য়ে বসিয়া রয়েছে বালা,
ঝরিতেছে অশ্রু—স্মরি কঠোর বৈধব্য জ্বালা।
"আসুন পতির আত্মা লতে সর্ব্ব দেবগণ,
দিবনা কখনো আমি আমার হৃদয়ধন।"
কঠোর প্রতিজ্ঞা এই করি সতী নিজ মনে,
রহিলা নিশ্চিন্তে বসি সে নিশীথে সে বিজনে।
লইবারে সত্যবানে শমনের অনুচর,—
আসিয়া, সতীরে হেরি কম্পিলেন থর থর।
না হলো শকতি কারো লইবারে সত্যবানে,
নমি জ্যোতির্ম্ময়ী মূর্ত্তি ফিরে গেল নিজস্থানে।
তবে ধর্ম্মরাজ নিজে আসি সাবিত্রীর পাশে,
যাচিলেন সত্যবানে বিনয়ে অমিয় ভাষে।
দৃঢ়রূপে পতি পদ ধরিসতী বক্ষমাঝে,
অমৃত শাস্ত্রীয় ভাষে তুষিলেন ধর্ম্মরাজে।
রহিল প্রতিজ্ঞা তাঁর ধর্ম্মরাজ হর্ষভরে,
ফিরে দিলা মৃত পতি সতীর সম্মান তরে।

সমালোচনা।

পি, এম, বাগচির নূতন পঞ্জিকা।—আমরা পি, এম বাগচি কোম্পানির নূতন ডাইরেক্টরী পঞ্জিকা ও দিন পঞ্জিকা প্রাপ্ত হইয়া সাতিশয় আহ্লাদিত হইয়াছি। ডাইরেক্টরীর বিশেষ উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন, কারণ ইহা কয়েক বৎসর হইতে সর্ব্বসাধারণের বিস্তর উপকার করিয়াছে ও করিতেছে। পঞ্জিকা খানিও সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হইয়াছে, ইহাতে পঞ্জিকা সুলভ জ্ঞাতব্য বিষয় ব্যতীত অন্যান্য নিত্য প্রয়োজনীয় অনেক জ্ঞাতব্য বিষয়ের সমাবেশ দেখা যায়। পি, এম, বাগচি কোম্পানি এই পঞ্জিকা সঙ্কলনের জন্য সর্ব্ব সাধারণের ধন্যবাদার্হ। আমরা তাঁহাদের উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি ও উন্নতি কামনা করি। শ্রীসুরেন্দ্র নাথ ঘোষ বি, এ।

ভারতে যুবরাজ—শ্রীযুক্তবাবু তিনকড়ি বন্দ্যোপাধায়, বি, এ, মহাশয় কর্ত্তৃক বিরচিত। এই কবিতা খানির রচনা, যেমনই সরল ও প্রাঞ্জল—তেমনই মনোহারিণী এবং প্রসাদগুণময়ী। বন্দ্যোপাধায় মহাশয়, যাদৃশী প্রতিভা সম্পন্ন, অগণ্যগুণান্বিত সৎ-কবি—তদীয় বর্ণনা ও রচনাও তাদৃশী সু-শোভনা। ৩০ (ত্রিশ) বর্ষ-পূর্ব্বে ৺ হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, বি, এ, বি, এল্ এবং শ্রীযুক্ত ব্যবু নবীনচন্দ্র সেন, বি, এ, এই মহাশয়দ্বয়, বর্ত্তমান প্রিন্স অব্ ওয়েল্সের (তদানীন্তন যুবরাজ ও বর্ত্তমান ভারত-সম্রাট্ এবং ইংলণ্ডেশ্বর সপ্তম এড্ওয়ার্ড মহোদয়ের) শুভাগমনে কাব্য-গ্রন্থ লিখিয়া, যাদৃশী সৎ-খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন, —অতীব প্রীতির বিষয় যে—উপস্থিত কাব্যখানিও, তদনুরূপ প্রশংসনীয় হইয়াছে। পুস্তকের মূল্য ৵০ (দুই) আনা-মাত্র—সুতরাং অত্যন্ত স্বল্প বলিতে হইবে। মুদ্রণ, কাগজ প্রভৃতিও, নিতান্ত পরিপাটী। শ্রীমহেন্দ্র নাথ বিদ্যানিধি।

(সম্পাদকীয়।)

উদ্ভট শ্লোক মালা। শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র দে কব্যরত্ন উদ্ভট সাগর বি, এ, সংগৃহীত। উদ্ভট শ্লোক কি, ইহা যাঁহাদের জানা নাই, তাঁহাদের অবগতির নিমিত্ত সংক্ষেপে আমরা বলিতেছি, আর্য্য শাস্ত্ররত্নাকরে মহা মহা কবি যে সকল শ্লোকরত্ন সন্নিবেশিত করিয়াছেন, তাহা ব্যতিরেকে যে সকল স্মরণীয় প্রতিভা ক্রমে ক্রমে যে সমস্ত সদর্থ পূর্ণ অপূর্ব্ব শ্লোক বিরচন করিয়া গিয়াছেন, সেই সকল শ্লোকের নামই উদ্ভট-শ্লোক। স্থূল কথায় শাস্ত্র বহির্ভূত শ্লোক মাত্র। বাবু পূর্ণচন্দ্র ভারতের নানা স্থান হইতে বহুযত্নে এই সকল উদ্ভট শ্লোক সংগ্রহ

করিয়াছেন। প্রস্তাবিত পুস্তকে চারিশত শ্লোক এবং সঙ্কলন কর্ত্তার স্বরচিত অতিসুন্দর পদ্যানুবাদ আছে। শ্লোকগুলি অমূল্যরত্ন ইহা বলাই বাহুল্য, বিশুদ্ধ সংস্করণ, বাবু পূর্ণচন্দ্রের শ্রম-যত্ন সকল "উদ্ভট'সাগর" উপাধি-টিও সার্থক।

মোহ-মুদ্গার ও মোহকুঠার।—দুইখানি গ্রন্থ স্বতন্ত্র হইলেও একত্র সম্বদ্ধ। ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য এই উভয় গ্রন্থের প্রণয়ন কর্ত্তা। বাবু পূর্ণচন্দ্র দে কাব্যরত্ন উদ্ভটসাগর বি, এ, তাহাই অবলম্বনে সুললিত বঙ্গানুবাদসহ এই পুস্তক প্রকাশ করিয়াছেন। সাধক সাম্রাজ্যের মহারাজ চক্রবর্ত্তী সাক্ষাৎ শঙ্করোপম ভগবান শঙ্করাচার্য্যের কবিতার বিশেষ পরিচয় দিবার প্রয়োজন নাই, যাহাতে মোহ রাক্ষসের মস্তক চূর্ণ হয়, এইরূপ মুদ্গার এবং যাহাতে মোহপাশচ্ছেদন হয় সেইরূপ সুতীক্ষ্ণ কুঠার। বাবু পূর্ণচন্দ্র বিশুদ্ধ বুদ্ধিতে অতি সরল বঙ্গীয় কবিতায় সেই শ্লোক গুলির বিশুদ্ধ অর্থ করিয়া দিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার কবিত্বের ও বিশেষ পরিচয় আছে। যাঁহারা ব্রহ্মজ্ঞানের অভিলাষী হইয়া বৈরাগ্য তত্ত্ব জানিতে উৎসুক, তাঁহারা এতৎ পাঠে শান্তিলাভ করিতে পারিবেন, তাহাতে অনুমাত্র সন্দেহ নাই। মূল শ্লোকগুলিও বঙ্গাক্ষরে মুদ্রিত।

প্রশ্নোত্তর-মণিরত্ন মালা প্রশ্নোত্তর-রত্নমালা প্রশ্নোত্তর-রত্নমালিকা—

এইতিনখানি গ্রন্থও একত্র সম্বদ্ধ ; উক্ত উদ্ভটসাগর সংগৃহীত এই তিনখানি গ্রন্থেরও পদ্য বঙ্গানুবাদ নিম্নভাগে সন্নিবিষ্ট প্রথমখানি পরমহংস শঙ্করাচার্য্য বিরচিত। দ্বিতীয় খানি জৈনকবি বিমল বিরচিত। তৃতীয় খানি পরমহংস কৃষ্ণানন্দ সরস্বতী বিরচিত। মূল শ্লোকগুলি দেব নাগরাক্ষরে সন্নিবেশিত হইয়াছে। তিনখানি গ্রন্থই তত্ত্বজ্ঞানের মাহাত্ম্যপূর্ণ ; পাঠ করিলে প্রকৃত জ্ঞানগর্ভ অনেক উপদেশ প্রাপ্ত হওয়া যায়, আমরা ইহা পাঠ করিয়া পরমানন্দ লাভ করিলাম। উদ্ভটসাগর মহাশয় বহুযত্নে ও বহুশ্রমে একে একে ভারতের অনেক দুর্লভ রত্ন উদ্ধার করিতেছেন, তন্নিমিত্ত তিনি সাধারণের ধন্যবাদার্হ।

হেমজ্যোতি।—শ্রীযুক্ত ঋতেন্দ্র নাথ ঠাকুর কবিভাস্কর সম্পাদিত। স্বধর্ম্ম পরায়ণ স্বর্গীয় হেমেন্দ্র নাথ ঠাকুর মহাশয় বিজ্ঞানামোদে প্রমোদিত হইয়া বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের বিমল ভাবার্থ পূর্ণ যে সকল উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ রচনা করিয়া গিয়াছেন, তাহা ইতিপূর্ব্বে প্রকাশিত হয় নাই; তাঁহার ধর্ম্মশীল পুত্র (এই পুস্তকের সম্পাদন কর্ত্তা) শ্রীযুক্ত ঋতেন্দ্র নাথ ঠাকুর কবিভাস্কর এক্ষণে "হেমজ্যোতি" নাম

দিয়া ক্রমে ক্রমে সেইগুলি প্রকাশ করিতেছেন। ব্রহ্মর্ষি আখ্যাঙ্ক ইন্দ্র অভিহিত যে খণ্ড খানি আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহাতে ধর্ম্মতত্ত্ব, ভাষাতত্ত্ব ও বিজ্ঞানতত্ত্ব বিষয়ক কতকগুলি সুন্দর সুন্দর প্রবন্ধ আছে, স্বর্গীয় হেমেন্দ্র নাথের ফটোগ্রাফ ও বিজ্ঞানের চিত্র ইহার মধ্যে সন্নিবিষ্ট প্রবন্ধগুলি পাঠ করিলে প্রচুর জ্ঞানলাভ হয়, আমরা আশাকরি বাবু ঋতেন্দ্র নাথের অভিলাষপূর্ণ হউক, তিনি আপন পিতৃদেবের অক্ষয় কীর্ত্তি প্রকাশ করিয়া চিত্তানন্দ ও সাধারণের প্রশংসা লাভ করুন।

মারুতির মতিভ্রম।—রামায়ণের ইতিবৃত্ত মূলক নাটক। শ্রীরাখাল দাস মিত্র ভিষক্‌রত্ন বিরচিত। কবিরাজ মহাশয় আয়ুর্ব্বেদে সুপণ্ডিত হইয়া যে সাহিত্য চর্চ্চায় মনোযোগী হইয়াছেন ইহা অতীব সুখের বিষয়। পুস্তক খানি সুপাঠ্য নূতন সৌষ্ঠবে নূতন ভাবে লিখিত। বৃহস্পতি ও রাবণের কথোপকথনে পাঠক অনেক জ্ঞানগর্ভ উপদেশ পাইবেন, চেড়ীদের কথায় হাসিতে হাসিতে প্রাণান্ত হইবে। সীতার উক্তিতে উক্তিতে আমরা অশ্রু সম্বরণ করিতে পারি নাই। এক টাকা দিয়া একখান পুস্তক কিনিলে টাকাটীর সদ্‌ব্যবহার হইবে বলিয়া মনে করি।

বাবু কি?—শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদ চন্দ্র বসু ইহার প্রকাশক। বঙ্গবাসী ভদ্র পুরুষগণকে আজ কাল সচরাচর বাবু বলা হয়, কোথা হইতে কিরূপে এই বাবু শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে, প্রসিদ্ধ ইতিহাস লেখক হুইলার সাহেব প্রভৃতি পাশ্চাত্য পণ্ডিত তাহার অপরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। অধ্যাপক ডার উইন সাহেব সমগ্র পৃথিবীর নর সংসারকে বানরের বংশ বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, হুইলার সাহেব এতদূর না গিয়া অদ্ভুত কল্পনাবলে স্থির করিয়াছেন, সমুদ্রের চড়ার জঙ্গলে যে সকল জানয়ার আশ্রয় লইয়াছিল, তাহাদের মধ্যে একপ্রকার জানয়ারের নাম বাবু। কথাঠিক;—গদ্য প্রবন্ধকে যাঁহারা কাব্য বলিতে বদন বক্র করেন না। তাঁহার বুঝিবেন এই পুস্তকখানি প্রকৃত ব্যঙ্গ কাব্য এ ধরণের পুস্তক এই নূতন। প্রকাশের উপযুক্ত সময়ই এই। কাব্যের মধ্যে মধ্যে বিলক্ষণ রসিকতার পরিচয় আছে। সময় ঠিক হইয়াছে, এ কথা আমরা কেন বলিলাম, বুদ্ধিমান পাঠকেরা নিশ্চয়ই তাহা মনে মনে বুঝিয়া লইবেন। কিন্তু কাব্যকার কি কারণে "বন্দে মাতরম" নাম দেন নাই সেইটি বুঝিলাম না, দিলেই বোধ হয় ভাল হইত। পুস্তকের মূল্য কত, ভুমিকার স্থলে কৌতুক করিয়া প্রকাশক এইরূপে তাহা লিখিয়া দিয়াছেন:—

যোল খানি তাম্রমুদ্রা না পেলে প্রণামী,
বাবু কি? প্রতিমাখানি দেখাবনা আমি।"

—o—

REGISTERED No. C. 284.

১৪শ বর্ষ।] ১৩১২ সাল। চৈত্র। [৯ম সংখ্যা।

হিন্দুধর্ম্ম ও সমাজের মুখপত্র।

জন্মভূমি

(সচিত্র মাসিক-পত্রিকা ও সমালোচনী)।

	বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
১।	স্থূল কথা	শ্রীযুক্ত সিদ্ধেশ্বর শর্ম্মা ...	৩০৯
২।	অভিমান	শ্রীযুক্ত শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	৩১৮
৩।	ভালবাসা (পদ্য)	শ্রীমতী নগেন্দ্রবালা সরস্বতী	৩৩১
৪।	আবাহন (পদ্য)	শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র কুণ্ডু বি, এ,	৩৩৩
৫।	মধুর মধু (পদ্য)	শ্রীমতী জ্যোৎস্নাময়ী ঘোষ	৩৩৪
৬।	নিশীথচিন্তা (পদ্য)	শ্রীযুক্ত বঙ্কিম বেহারী বসু	৩৩৫
৭।	শ্মশান (পদ্য)	... ...	৩৩৭
৮।	প্লেগ-প্রতিষেধক ও চিকিৎসা	শ্রীযুক্ত নীলমনি পাল	৩৪০
৯।	নিরাশ প্রণয় (গল্প)	শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য	৩৪২

লেখকগণের মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন।

জন্মভূমি-কার্য্যালয়।

শ্রীনরেন্দ্রনাথ দত্ত দ্বারা প্রকাশিত।

৩৯ নং মাণিক বসুর ঘাট ষ্ট্রীট,

কলিকাতা।

বার্ষিক মূল্য ডাঃ মাঃ সমেত ১॥০ দেড় টাকা। — প্রতি সংখ্যার নগদ মূল্য ৵১০ পয়সা।

শ্রীল শ্রীমন্মহারাজাধিরাজ কাশ্মীরাধিপতি তথা শ্রীল শ্রীযুক্ত মহারাজাধিরাজ
বর্দ্ধমান-প্রদেশাধিপতি বাহাদুরের অনুমোদিত ও অনুজ্ঞাত সুপ্রসিদ্ধ

কবিরাজ শ্রীযুক্ত বিনোদলাল সেন মহাশয়ের

আদি-আয়ুর্ব্বেদ ঔষধালয়।

১১৬ নং লোয়ার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।

কুন্তলবৃষ্য তৈল জগতে অমূল্য ও অতুলনীয়—মস্তিষ্ক স্নিগ্ধকর ও স্মৃতিশক্তি বর্দ্ধক—কেশকলাপের কান্তিপ্রদ—খালিত্য ও পালিত্যনাশে অদ্বিতীয়। কেশের কমনীয়তা কান্তি বৃদ্ধি করিতে, চিত্তের নিত্যপ্রফুল্লতা অটুট রাখিতে কুন্তলবৃষ্যের তুলনা নাই। ইহা অনুপম্ আদি ও অকৃত্রিম স্নিগ্ধগুণে কুন্তলবৃষ্যের সমতুল্য কোন তৈলই এ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই।

বর্ত্তমান ভারতের প্রধান ধর্ম্মসংস্কারক, শান্তি-সুখ-সন্তু বিলাসভোগ বিমুক্ত আধ্যাত্মিক উৎকর্ষের সমুচ্চ সোপানে সমাসীন—পূজ্যপাদ শ্রীমহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর বলিয়াছেন—যে, কুন্তলবৃষ্য তৈল এতদিন আমাকে রক্ষা করিল, আজ তাহাকে পরিত্যাগ করিতে পারি না।"

কুন্তলবৃষ্য—সাহিত্যসেবিগণের মহোপকারক, কারণ ইহাতে মেধা ও স্মৃতি বৃদ্ধি হয়, চিন্তাশীলতা ও ভাবুকতা নবীভূত ও স্ফুরিত হয়।

এক শিশির মূল্য ১৲ টাকা প্যাকিং ও ডাকমাশুলাদি পাঁচ আনা।

উপহার—কুন্তলবৃষ্যের প্রত্যেক গ্রাহক তৈলের সঙ্গে একখানি করিয়া সুন্দর চিত্র উপহার পাইবেন।

সতর্কীকরণ।—দুষ্ট লোকেরা বড়ই জাল করিতেছে; গ্রাহকগণ সাবধান; আমাদের ঔষধালয় ভিন্ন কোথাও "কুন্তলবৃষ্য" কিনিবেন না, কিনিলেই প্রতারিত হইবেন।

কবিরাজ শ্রীআশুতোষ সেন চিকিৎসক।

"জননীজন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী"

(মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী।)

১৪শ বর্ষ। | চৈত্র, ১৩১২ সাল। | ৯ম সংখ্যা।

স্থূল কথা।

লেখক—শ্রীসিদ্ধেশ্বর শর্ম্মা।

কল্পনা করিয়া আর আমরা স্থূল কথাকে সূক্ষ্ম করিতে চাই না। প্রত্যক্ষ যেরূপ দেখিতেছি, তাহা লইয়াই বিচার করিব। দেখিতেছি,—তুমি, আমি কত কি চিন্তা করিতেছি, কত কি আলোচনা করিতেছি, কত কি বিতণ্ডা করিতেছি, কিন্তু ঐ বৃক্ষটীর জীবন থাকিলেও উহার চিন্তা শক্তি নাই কেন?

চক্ষে না দেখিলেও, বিশ্বস্ত সূত্রে অবগত আছি যে যব ও আফ্রিকার কোন কোন জাতীয় বৃক্ষ প্রাণীভূক্। নিকটে কোন প্রাণী আসিবা মাত্র তাহাদের শাখাদি এত বেগে সঞ্চালিত হয় যে, প্রবল তুফান বলিয়া মনে হয়। আবার যেই

সে ধৃত বা বৃক্ষ সংলগ্ন হয়, অমনি পূর্ব্ববৎ নিষ্পন্দ হয়। পাঠ করিয়া প্রথমে যে একটু ধাঁধাঁ না হইয়াছিল, এমন নয়। বৃক্ষের এরূপ সচেতনত্ব কোথা হইতে আসিল? তবে পর্ব্বতের পক্ষ, সমুদ্রের বাক্‌শক্তি অসম্ভব কিসে? জীবেই উদ্ভিজ্জ ভোজী, উদ্ভিজ্জে জীব-ভোজী, ইহা কিরূপ কথা? সঙ্গে সঙ্গে লজ্জাবতী, বন চণ্ডাল প্রভৃতির কথা মনে পড়িল, সুমিষ্ট খাদ্য দর্শনে বালকের রসনা সজল হয়, লৌহ চুম্বকের মিলনাকাঙ্ক্ষা কি সেরূপ সচেতনত্ব জ্ঞাপক? দোলায়মানা লতিকা দুলিতে দুলিতে নিকটস্থ বৃক্ষ শাখা অবলম্বন করে। ইহাদের কি চক্ষুঃ আছে বুঝিব, না নিকটস্থ বস্তু বুঝিবার ঘ্রাণেন্দ্রিয় আছে বলিব? কিন্তু না থাকিলেই বা নির্ভুল কার্য্য কিরূপে করে? যাহা হউক, তৎসমস্ত মীমাংসার ভার অন্য পাঠকের হস্তে দিয়া মানব যে একমাত্র চিন্তাশীল প্রাণী, তাহাই আমরা আলোচনা করিব। সুখ দুঃখের ভাগ তাঁহারই অধিক, সুতরাং সংসারে তাহাকে সব মানিয়া, সব ভয় করিয়া চলিতে হয়। তাহাকে ছাড়িয়া সংসার থাকে না। আর তাহার চিন্তা-শক্তি ত্যাগ করিলে মনুষ্যত্বও থাকে না। নির্ব্বোধ আমরা, মনুজ ধর্ম্ম জিজ্ঞাসু হইয়া সেইজন্য জ্ঞানীর দ্বারে উপস্থিত। সদুত্তর দানে কেহ কি শান্তি দিবেন?

প্রথমে একটা স্থূল কথা জিজ্ঞাসা করি?—বিশ্ব সংসারের সকলেইত শান্তি সন্ধানে ব্যতিব্যস্ত। বৃক্ষের পত্রটী পর্য্যন্ত স্থির থাকিবার আশায় পৃথিবীর গাত্র খুঁজে। ধ্বংসও সকলের নিয়তি; তবে মনুষ্য মৃত্যু চিন্তায় কাতর হয় কেন? আর সেই ভয়ে সে ভাল মন্দ, ধর্ম্মাধর্ম্ম বিচার করে কেন? আর কেহ কি সংসারের দায়ী নয়? যতই পরিণাম শূন্যতা থাক, এই প্রত্যক্ষ দর্শন লইয়াই তাহাকে বিচার করিতে বলি। নিতান্ত ডোর কৌপীন ধরিয়া, ভস্মলেপ গায়ে দিয়া সিদ্ধাশ্রম বা মানস তীরে গেলেই তাহাকে ছাড়িতে পারি না। তাহাকে লইয়াও সংসার। এই বাষ্পরথ, এই স্বার্থের সংগ্রাম, এই অর্থ সংগ্রহ, সুরম্য অট্টালিকা প্রভৃতি কার জন্য? ইহার ফলাফল ভোগাভোগ সকলই তাহার। সংসার-সুখ-ভোগের জন্যই, বৃদ্ধ পল ক্রুগার বা লর্ড রবার্টস্ এই অন্তিম সময় পুত্র শোক বিস্মৃত হইয়া, জীবন্ত কৃতান্ত-সদৃশ ভীম নাদী কামান সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন। আর সুখের জন্যই শত শত মনুষ্য শতাধিক হস্ত মৃত্তিকা নিম্নে অলাত শিলা উত্তোলনে ব্যস্ত! তুষারাচ্ছন্ন মেরু সন্নিহিত আলাস্কার দুরধিগম্য স্বর্ণ খনিতে সমুপস্থিত! দারুন শীত, বিষম খাদ্যাভাব, সব অগ্রাহ্য! ইহারই জন্য কাপ্তেন ফিপ্, সিন্ধু-জল-তলে অর্থ সন্ধানে রত! কলম্বস্ নূতন মহাদেশ আবিষ্কারে মত্ত, নেন্‌সন মেরু সমুদ্রে উপনীত।

সংসার কি, কেন? আমরা এই সংসারে এত ঘুরিয়া ঘুরিয়া এত বিবাদ বিসম্বাদ লইয়া, "আমার, আমার" করিয়া এত কোলাহল বাড়াইয়া জীবন অতিবাহিত করি? কেহ কি ইহার স্থূল কথা বলিয়া দিবেন? সূক্ষ্ম কথার উত্থাপন করিতে গেলেই ত বড় বড় মস্তিষ্কশালী ক্ষণজন্মা মহাত্মারা সেই পাপ, পুণ্য অহংতত্ত্ব, জীবাত্মা, পরমাত্মা জীবন কি বিশ্ব সাদি কি অনাদি ইত্যাকার বড় বড় জটীল প্রশ্নের অবতারণা করিয়া কতকগুলি বিতণ্ডার কলেবর পুষ্ট করেন! স্থূল কথা অর্থাৎ মোটা মুটি একটা ধারণা আমাদিগকে দেওয়া দূরে থাক্, খিচুঁড়ির ন্যায় কেবল নানারূপ চিন্তারূপ মশলা দিয়া চিত্তরূপ হাণ্ডিকায় কেমন একরূপ "কিম্ভূত কিমাকার" পাক করিয়া ছাড়িয়া দেন! প্রকৃত পক্ষে তাহা আমাদিগের পরিপাক হয় না, বা তাহাতে তৃপ্তি হয় না! কতকগুলি শাস্ত্রীয় বচন শুনিয়া, কূটতর্ক মাথায় পুরিয়া, হৃদয়ের পিপাসা মিটে কি? ধী-শক্তি সম্পন্ন পণ্ডিতগণের হইতে পারে, কিন্তু আমার ন্যায় জ্ঞান লিপ্সু অনভিজ্ঞের চিত্তের আকাঙ্ক্ষা নিবৃত্ত হয় কি? সকলে প্রাণ খুলিয়া বল দেখি, নিবৃত্ত হয় কি? কখন নয়। তবে যে সভাস্থলে মস্তক সঞ্চালন করিয়া 'বুঝিলাম' বলিয়া সায় দেই, কি বক্তার চতুর্দ্দিক ঘিরিয়া করতালি দেই, সে কেবল লোক-লজ্জা ভয়ে, অভিমানের বেগে নয় কি? পণ্ডিত গণের জন্য আমাদের মাথাব্যথা নয়, তাঁহারা "স্বগুণেই তরিবেন।"

"ত্বয়া হৃষিকেশ হৃদিস্থিতেন, যথা নিযুক্তোস্মি তথা করোমি," ইহা বলিয়া কেহ নিরস্ত করিতে চাহিবেন না। তাহাতে যথেচ্ছাচারিতাই আইসে। তখন মনে হয়, যাবতীয় অসৎকার্য্যেও কি ভগবান নিযুক্ত করেন? ফলতঃ আমরা স্থূল কথার ভিখারী। আমাদিগকে আর বৃথা সন্দেহ সাগরে নিমগ্ন না করিয়া, অত তর্ক-জালে, দুর্ব্বোধ্য ভাব সমাবেশ না করিয়া সরল কথায়, একটা সহজ ধারণা করিয়া দিয়া, জীবনের উদ্দেশ্য ও গতি চিনাইয়া দিলেই কৃতার্থ হই।

এই পরিদৃশ্যমান জগৎ যে অনিত্য, প্রসাদ-ভবনই বল, আর মোক্ষমূলর, বিদ্যাসাগরই বল, সকলেই যে এই নশ্বর বিশ্বের নশ্বর পদার্থ, তাহাতে কি সংশয় আছে? প্রতাপ সিংহ আকবরসাহ, নেপোলিয়ন কি ওয়েলিংটন, লুথার কি রামমোহন, সকলেই যে নশ্বরত্বের অবিনশ্বের নিদর্শন, তাহা আর বলিয়া দিতে হয় কি? এই প্রত্যক্ষ তাবৎ দ্রব্যই যে ভঙ্গ-প্রবন কাচের বাসন, তাহা কেমন করিয়া অস্বীকার করিব? বিষয় বিভব আত্মীয় বন্ধু, দাসদাসী, বিলাস ভবন, প্রমোদ-কানন, প্রভৃতি সকলই সেই কাচের বাসনের ছায়া! অর্থাৎ নিজে কাচের বাসন হইয়া তাহার ছায়া লইয়া কিয়ৎ কাল ধরাতলে ক্রীড়া কৌতুক করত বিচূর্ণ

হইবে, তাহা সহস্রবার, লক্ষবার সত্য। কাচের কারখানায় কাচের দ্রব্যই জন্মে, ও তাহা লইয়াই এই কারখানার অধিকারী কৌতুক করেন।

কৌতুক যে কি, তাহা বাসনে কি বুঝিবে? তাহাও বেশ বুঝিতেছি, ইহাও বুঝিতেছি যে যতই শাস্ত্রীয় দোহাই, যতই তর্কের ছড়াছড়ি করি, নশ্বরত্বের কণা-মাত্রও অপনীত হইবার নয়; একে একে গণাদিন ফুরাইয়া গেলে, শেষের দিন আসিবে, কোন ব্যাথার ব্যাথী নাই যে, তাহা নিবারনে সমর্থ হইবে। তথাচ বল দেখি, তাহা বলিয়া নিশ্চিন্ত বসিয়া থাকা যায় কি? কাচের সেই ভঙ্গ প্রবণ বাসন না পাইলে সুখী হও কি, না নিশ্চেষ্ট থাকিতে পার? সংহতি প্রভাবে স্বজাতীয় পরমাণু সম্মিলিত হয়, তাই কাচের দ্রব্য হইয়া আবার কাচের দ্রব্যের সন্ধান করে! নতুবা সেই প্রবোধে কি কেহ নিরস্ত থাকে? যখন পুত্রটী নিকটে বসিয়া "কি খাইব" বলিয়া কাঁদিতে থাকে, তখন কি চুপ করিয়া থাকিতে পার, না সব অনিত্য বলিয়া হাসিয়া উড়াইতে প্রবৃত্তি হয়? ঐ শুনিতে পাইতেছ না,—ক্ষুধা ক্লীষ্ট সন্তানকে আহার্য্য দিতে অসমর্থ হইয়া পিতা উদ্বন্ধনে, মাতা কূপে জীবনান্ত করিতে কিছু মাত্র কুণ্ঠিত হইল না? ঐ প্রবৃত্তির মূলে কি সামান্ত বেগ? যিনি "মুক্তি "মুক্তি" করিয়া মুদিত নেত্রে নির্জ্জন অরণ্যে একাকী বসিয়া থাকেন, বলেন—এই বিনশ্বর সংসারে কিছুতেই মুগ্ধ নন, কিছুরই প্রত্যাশা নাই; তিনি প্রাণ খুলিয়া বলুন দেখি, সত্যই কি তিনি কিছু চাহেন না? সত্যই কি এই "ছায়া স্বপ্নবৎ" সংসারে কোন বিষয়ে তাঁহার প্রাণকে মোহিত করে নাই?

"মুক্তি" কি, তাহা পাইলেই বা জীবের কি? তাহার এত আকর্ষণই বা কেন? যাহা জানা যায়, তাহা আয়ত্ত করিতেই আগ্রহ জন্মে; কল্পনার কুহকে পড়িয়া 'নির্ব্বাণ' 'নির্ব্বাণ' করিয়াই উন্মত্ত হইতেছি বটে, কিন্তু তাহা কি, এ পর্য্যন্ত তাহা কেহ দেখিতে বা দেখাইতে পরিয়াছেন, এমত কেহ আছেন কি? তবে তজ্জনই বা ব্যস্ত হওয়া কেন? প্রকৃতির সহিত অহোর্নিশ এত দ্বন্দ্ব করিয়া কি হইবে? বস্তুতঃ মুখে যাহাই বলেন, সেই সংসার-বিরাগী পুরুষ তাহার অদ্ভুত ইন্দ্রজাল দেখাইয়া সকলকে মোহিত, স্তম্ভিত করিবেন, এবার জীবনে না কুলাইলে পরবারে এই ধরাতলে অবতীর্ণ হইয়া উচ্চ শিখরে আরোহণ করিবেন, ও উচ্চাঙ্গের কিছু প্রদর্শন করিয়া সাধারণের কর্ণ-বিবরে প্রশংসা-শঙ্খ বাজাইবেন, অলোক-সাধারণ কিছু হইবেন, ইহাই তাহার ধ্যান, ইহাই নির্ব্বাণ, ইহার জন্যই বর্ত্তমান জীবনের প্রতি তাহার এত ঔদাসীন্য।

যোগ-নিরত কোন সাধু পুরুষ আমাদের এরূপ মন্তব্যে তুষ্ট না হইতে পারেন,

কিন্তু আমরা নিজ হৃদয় খুলিয়া বলি,—যদি আমি ত্রৈলঙ্গস্বামী বা ভাস্করানন্দ স্বামীর ন্যায় সিদ্ধ-পুরুষ হইতাম, তবে বলিলাম, যেন বার্ক বা শেরিডনের ন্যায় বক্তা, কালিদাস বা সেক্ষপিয়রের ন্যায় মহাকবি, ঈশ্বর চন্দ্রের বা মোক্ষ মূলরের ন্যায় পণ্ডিত, তানসেন বা মৌলা বক্সের মত সংগীত-নিপুন, দক্ষিণা রঞ্জনের তুল্য রূপবান, শ্যাম কান্তের সদৃশ বলবান, গ্লাড্ ষ্টোন বা বিস্ম'র্কের ন্যায় রাজ-নীতি বিশারদ প্রথম গঙ্গোর মত ঐন্দ্র-জালিক, নেপোলিয়নের তুল্য মহাবীর, লিওনিডাস্ বা প্রতাপ-সিংহের ন্যায় স্বদেশ—প্রেমিক প্রভৃতি হইয়া পৃথি-তলে অক্ষয় ধ্বজা উড়াইতে পাড়িলেই আমার সকল বাসনা, সকল তপস্যা সিদ্ধ হইত। জল-বিম্ব হইয়া সাগরোর্ম্মিতে লীন হইতে আকিঞ্চন করিতাম না। যদি কেহ বলেন, তাহা হইলেও ত জঠোর যন্ত্রনা ও শৈশব-লাঞ্ছনা এড়াইতে পারা যায় না? তদুত্তরে বলিতে হয়, যে ঐ সকল কষ্ট জনক দশা সত্য, কিন্তু তাহা বলিয়া কয়জনে ব্যস্ত বা তন্নিবারণোদ্দেশে বসিয়া চিন্তা করে? যখন সে কষ্ট মনে নাই বা অপরের ঐ দশা প্রত্যক্ষ করিয়াও নিজের সে দশা স্মৃতিতে জাগে না, তখন ভয় কি? উহা অপেক্ষা জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত দেখিয়াই যখন আমরা তদনুষ্টানে বিরত হই না, তখন কল্পনা-জাত ঐ কষ্টের জন্য মাথা ব্যথাই বা কেন? পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া ক্লেশ সাধ্য, পুনঃ পুনঃ জানিয়াও কি কেহ বিরত হয় না, প্রসব-বেদনা স্মরণ করিয়া বিবাহে অসম্মত হয়? পূর্ব্ব হইতেই প্রকৃতি প্রয়োজনানুরূপ আয়োজন ব্যবস্থিত করেন। তাঁহার বিধানে ত্রুটী বা সংঘর্ষণ ঘটে না। এই খানে ঐশ মহিমার আর একটু কৃতিত্ব ও বিশেষত্ব দেখিতে পাই। আমরা সংসারে ভাগ্য-বিপর্য্যয়ে বিড়ম্বিত হইলেই আর সে ক্লেশ পুনরনুভূত হয় না; বরং তাহার স্মৃতি জাগিয়া সুখ প্রদান করে। তখন নিজের বুদ্ধিকে, সহিষ্ণুতাকে ধন্য মনে করি, ও সগর্ব্বে তদালোচনায় প্রবৃত্ত হই। সংসারও অশেষ প্রশংসা প্রতিদান করে। ওয়াটার্লুতে ওয়েলিংটনের বা পলাশী ক্ষেত্রে ক্লাইবের চিন্তার প্রতিদান পাইয়া তাহাকে কি সুখাস্পদ মনে করেন নাই? সহজ—সাধ্য হইলে নিঃসন্দেহ তাহাদের তৈল-চিত্র এত উজ্জ্বল হইত না? কলম্বস অত কষ্টে, উদ্বেগে না পড়িলে আমেরিকা আবিষ্কারে অমরত্ব লাভ করিতে পারিতেন না। আমেরিগোর নাম কয় জনে জানে? স্পেন্সার সাহেবের বেলুন-বাজী, হাসনাবাদের বিপদ সংশ্লিষ্ট না থাকিলে এত চিত্তাকর্ষক হইত না। ফলতঃ গত যন্ত্রনার অনুভূতি থাকে না, অথচ তাহার স্মৃতি আমাদিগকে উৎসাহিত ও গৌরবান্বিত করে। ইহা বিশ্ব নিয়ন্তার অনির্ব্বচনীয় কৌশল বলিতে হয়।

তুমি বড় হইয়াছ। কত বিজ্ঞ হইয়াছ, কত কত নূতন উৎভাবন, অভিনব তত্ত্বের পরিচয়-দিতে সমর্থ হইয়াছ, ভাবিয়া সগর্ব্বে মস্তক উচ্চ করিতেছ, দশ দিনের পথ এক দিনে যাইতেছ, সহস্র ক্রোশ দূরবর্ত্তী স্থানের সংবাদ দশ পলে আনিতেছ, বিনা পাখায় নভোদেশে উধাও হইতেছ, সুক্ষ রজ্জুর উপর নৃত্য করিতেছ, শতগজ চন্দ্রালোকে আলোকিত কিরতেছ, গৌরী শঙ্করের উচ্চতা নির্ণয় করিতেছ, ঘরে বসিয়া নিশাকরের মানচিত্র আনিয়া দেখাইতেছ, ইহাতে তোমার মনে কত শ্লাঘা হইতেছে, কতই আস্পর্দ্ধা করিতেছ, স্ফীত-বক্ষ হইয়া সদম্ভে পদ বিক্ষেপ করিয়া ধরাতল আলোড়িত করিতেছ, কিন্তু ভাবিয়া দেখিয়াছ কি, তোমার ঐ শক্তি টুকুর পরিমাণ কি ? ভূ মধ্য-সাগরে কত পৌণ্ড জল আছে, তাহার পরিমাণ স্থির হইল, নিজের ক্ষমতার ওজন অনিশ্চিত রহিল, তাহাতে কি লজ্জা হইতেছে না ? পৃথিবীর বয়স কত হইল, তাহা নিরুপিত হইয়াছে, কত দিনই বা কি ভাবে আমাদিগকে কোলে করিয়া নভোদেশে ঘুরিবে, তাহাও "নখদর্পণের" ন্যায় গণিয়া দেখাইলে, নিজে দেহ লইয়া কতদিন আর বেড়াইবে, বা কবে তোমার দন্তটী স্খলিত হইবে, তাহার মীমাংসা হইল না ! তুমি "সব জান্তা" ভাবিতেছ, আমি দেখিতেছি, তুমি কিছুই জান না। প্রাণের পিপাসা-মিটান জ্ঞান তোমার নিকট পাই না। যাহা পাই, তাহাতে সংশই বৃদ্ধি করে ! চাউল, জল অগ্নি যোগে অন্ন প্রস্তুত হয়, অর্দ্ধ ভরি অহিফেন সেবনে প্রাণ ত্যাগ ঘটে, রাম ধনুতে ৭টি বর্ণ আছে, শব্দের গতি প্রতি সেকেণ্ডে একাদশ শত পঞ্চবিংশতি ফিট, রাত্রিকালে আমরা সূর্য্যের বিপরিত দিকে অবস্থিতি করি, বৃক্ষাদি অক্সি-জেন ত্যাগ করে, কিন্তু নিশি যোগে কার্ব্বন, নির্গত হয় সর্ব্ব প্রধান জল-প্রপাত, কুই-নাইন সেবনে জ্বর বন্দ হয়, গীতায় নানা রূপ ধর্ম্মোপদেশ আছে, পৃথিবীর আপন কক্ষে প্রদক্ষিণ করিতে করিতে পূর্ব্বাবস্থায় আসিতে সপ্তদশাধিক বৎসর লাগে, শিরিয়স্ নক্ষত্র হইতে আলোক আসিতে বিংশতি বর্ষ অতীত হয় ইত্যাদি বিষয় অবগত হইয়া তুমি নিজেকে অশেষ জ্ঞানি মনে করিতেছ, ধরাকে সরাবৎ দেখিতেছ, কিন্তু ভাবিয়া দেখ, তুমি কিছুই জান না। তোমার জ্ঞান সঙ্কীর্ণ গণ্ডীমধ্যে লুক্কায়িত।

স্থূল কথাই বলি,—তোমার এত যত্নের এই দেহ খানি কবে কি পীড়ায় আক্রান্ত হইবে, ও কতদিন কি ভাবে ভোগাইয়া কাহার কি ঔষধে নিরাময় হইবে, হইবে কি না, স্থির করিয়াছ কি ? তোমার মৃত্যু-মুহূর্ত্ত একটু সরাইতে পারিবে কি ? যোগের দোহাই দিবে, কিন্তু সেই যোগ কি তোমার হাতধরা ? সেরূপ

সিদ্ধ হওয়া কি তোমার ইচ্ছাধীন, না সহজ সাধ্য ? ময়দার কল, সুর্কির কল করিয়াছ, যোগ-সিদ্ধির কল আছে কি ? একটী মায়ার দ্রব্যের বিচ্ছেদ নিবারণ করিতে শিখিয়াছ কি ? তুমি পৃথিবীর অঙ্গ ক্ষত বিক্ষত করিয়া তাহার স্তরাবলীর বয়স নির্ণয় করিতেছ, প্রাচীন যুগের ম্যাষ্টিডিয়ন, ম্যামথ প্রভৃতির জন্ম-ভূমি বাহির করিতেছ, কিন্তু তোমার পশ্চাতে বসিয়া ঐ যে শ্রোতা মুখ-বিকৃত, কি অপাঙ্গ ভঙ্গী করিতেছে, চিনিতেছ কি ? জানিবার সম্ভব থাকিলে, সে তাহা করিত না। অধিষ্ঠান-ভূতা ধরিত্রীর গর্ভ কঠিন, কি তরল, তাহাতে নিঃসন্দেহ না হইতেই মঙ্গল গ্রহে জীব লোক আছে কি না, জানিতে শশব্যস্ত ! তোমার নূতন কি ? যাহা তোমার চক্ষের অন্তরালে ঘটিয়াছে, তাহার নিদর্শন পাইয়া, তাহারই পরিচয় দিতেছ মাত্র ! পারদের কত গুণ শুনাইয়া তোমার সাধের বিজ্ঞানের বালকত্বই প্রতিপন্ন করিতেছ। যাহা ছিল, দেখ নাই, তাহাই এখন দেখিলে, দেখাইলে ; ইহাতে তোমাকে তীক্ষ্ণ চক্ষু ষ্মান্ বলিতে পারি, উচ্চতর জীব বলিব না। মানবের আলোকিকত্ব কিছুই নাই। পূর্ব্বেও যেমন তুমি প্রকৃতির দাস, এখনও দেখিতেছি তাই। পূর্ব্বে পর্ণ কুটীরে অবস্থিতি করিতে, এখন না হয় ইষ্টকালয় করিয়াছ। তখন প্রতিহিংসা করিতে, এখন আর একটু দূরে থাকিয়াও তাহা চলে। যদি বিশ্বামিত্র সাজিয়া প্রকৃতির প্রতিকূলে দণ্ডায়মান হইতে পারিতে, যদি নারদের ন্যায় গ্রহ হইতে গ্রহান্তর পরিভ্রমণ করিতে সক্ষম হইতে, তবে তোমার এই দিবাকরের দূরত্ব-নিরূপণ-শক্তি বা হর্শেলের আবিষ্কার শুনিয়া বিস্মিত হইতাম। তোমার উদ্যম কার্য্যকর মনে করিতাম। মানবের কোন্ দুঃখ, মানবের বুদ্ধিতে ধরা-ধান ছাড়িয়াছে ? বিজ্ঞাপনের আড়ম্বরে স্বজাতিকে নিয়ত প্রতারিত করিতেছি কিন্তু দন্তনী নাড়িলে আর কি রাখিতে পারিতেছ ? ঔষধে কোন্ ভাগ্যবানের বার্দ্ধক্য অপগত হইল ? বা অমোঘ জ্বরঘ্ন-বটিকায় কৃতান্তদেব অশ্ব পালনে নিযুক্ত হইয়াছে ? দূরের বস্তু দেখিতে উপায় করিয়াছ সত্য, কিন্তু দর্শন শক্তি অক্ষুন্ন রাখিবার কৌশল কৈ ? যদি কিছু করিয়া থাক, তাহা প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইনা কেন ?

তুমি সমিতি করিয়া তোমার কোমলাঙ্গ শৃঙ্খল করিবার ব্যবস্থা করিতেছ, অর্থ উপার্জ্জনে কৃতকার্য্য হইলেই অহঙ্কারে বক্ষ উন্নত কর, পর্ব্বত বক্ষ ; বিদীর্ণ করিয়া মটরকার চালাইতেছ, সত্য, কিন্তু তোমার অমানুষিকত্ব কোথায় দেখাইতেছ ? তোমার নিজের সংবাদ জানিতে গণৎকারের দ্বারস্থ, তাহাও দেখি ! কিন্তু সেই গণনাতেও নিশ্চেষ্ট নও ! নিজের জ্ঞানে নিজেরই সন্দেহ !

অথচ তুমি পণ্ডিত! রজ্জুপরি তোমার নিত্য করিবার পূর্ব্বেই ত ঐ পিপীলিকাটী সচ্ছন্দে বেড়াইল, ঊর্ণানাভটী বিনা প্যারাচুটে অবলীলা ক্রমে বৃক্ষ চূড়া হইতে অবতীর্ণ হইল! নিশাকালে বৃক্ষতলে তুমি কার্ব্বনের ভয় করিলে পতঙ্গটীও ত গন্ধকের তীব্রতায় স্থান ত্যাগ করিল্ল? তবে সে বিজ্ঞানে বঞ্চিত কিসে বলিব? মানব বহু গবেষণায় যাহা করিতেছে, সে তাহা স্বতই বহু পূর্ব্বে জ্ঞান পাইয়াছে।

রাত্রি দিবা এই যে দেহ লইয়া এত দম্ভ কর, এত ঠমক করিয়া পাদ-চারণা কর যে, মুখ থানি বারম্বার দর্পনে—দেখিয়াও পিপাসা মিটে না, কত রূপ বিন্যস্ত করিয়া হেয়ার কাটারের বাড়ী হইতে কেশ-রচনা করিয়াও তৃপ্তি পাও নাই, দশ দিন পরে জর বিকারে তাহা বিরূপ হইবে না, সাহস করিয়া বলিতে পার কি? তোমার স্নেহের এই পুতুলটী কিম্বা ঐ প্রতিমাখানি এমনই সুন্দর চিরদিন থাকিবে না, ভাবিয়া থাক কি, না তাঁহার প্রতিবিধান করিতে পারিয়াছ? তবে সব জান, সবপার, এ গর্ব্ব কেন? উল্কাপিণ্ড-পতনের দিনটা স্থির করিতে ত মহা ব্যস্ত; কেহ কাশীর মান মন্দিরে, কেহ সিমলা-গিরি-শিখরে যন্ত্রাদি সহ মহাড়ম্বরে সমুপস্থিত। কিন্তু অন্তকার দিনটা তোমার কি ভাবে যাইবে, এমন কি, এই যে অক্ষ ক্রীড়া করিতেছ, কতক্ষণ ইহা চলিবে, কে জিতিবে বল দেখি? তুমি জটাজুট ধারণ করিয়া কখন কাহার করকোষ্ঠি-দেখিয়া তাহার শনির ভোগকাল, কয়টী সন্তান, কত আয়ু ইত্যাদি নির্ণয় করিয়া বিলক্ষণ বাহাদুরী লইতেছ, বায়ুমান যন্ত্র শূন্যে বসাইয়া তুফানের কথা রাষ্ট্র করিতেছ, কল্পনা প্রসূত অমঙ্গল বার্ত্তা পৃথিবীময় প্রচার করিয়া অসীম জ্ঞানের প্রমাণ দিতেছ, দুঃসহ পীড়া ক্লিষ্ট ব্যক্তিকে দুই বিন্দু আরক দিয়া বিলক্ষণ অর্থার্জ্জন করিতেছ, তবে আবার প্রবল ভূ-কম্পনে বঙ্গদেশ, দার্জ্জিলিং উচ্ছন্ন গেল কেন? কেরোসিন ল্যাম্পটা রাখিবার দোষে পল্লিটা ভস্মীভূত হইল কেন? আকস্মিক্ প্লাবনে ভাগলপুর অঞ্চলে হাহাকার উঠিল কেন? কেনই বা শর্য্য-পার্শ্বে ২।৩ জন চিকিৎসক থাকিতে, প্রসব-যন্ত্রনায় তোমার অর্দ্ধাঙ্গী সংসারের মায়া ছাড়িলেন? প্লেগ, দুর্ভিক্ষ কোন্‌টীর কথা বলিব? কতই ত গণনা, মন্ত্রণা, অগ্র পশ্চাৎ বিবেচনা করিয়া উপায় উদ্ভাবন করিলে, তবে আবার মৃত্যু সংবাদ শ্রুত হয়? তোমার গণনা-শক্তি কোথায় ছিল? তাপাভাবে কবে পৃথিবী ধ্বংস হইবে, তাহা গণিলে, আর বর্ত্তমানেই গোল? সহদেবের জ্যোতিষ-জ্ঞান মহা প্রস্থানকালে কোথায় ছিল? যে নিউটনকে মহা-পণ্ডিত বলিয়া পূজা করিতেছ, সেই সুধীবর স্বীয় আকিঞ্চিৎ করত্ব

হৃদয়ঙ্গম করিয়াই বলিয়াছেন যে জ্ঞানার্ণব সম্মুখে অক্ষুন্ন রহিয়াছে। বাস্তবিক তোমরা—এখন জ্ঞান শিশু, সেই অসীম, অনন্ত, পুর্ণ জ্ঞানের নিকট যাইতে তোমার আরও কোটী কোটী বৎসর বিলম্ব!'

বিজ্ঞান যতই দ্রুত বেগে অগ্রসর হউক না কেন, তুমি জ্ঞানার্ণবে বিচরণ করিবার সাজ সরঞ্জাম সংগ্রহ করিতে এখনও পার নাই। তোমার সে অবস্থায় পৌছিতে ধরণী দেবী ততকাল প্রতীক্ষা করিবেন কিনা সন্দেহ! কেমন করিয়া বলিব, তোমার জন্য পৃথিবী এমনই ভাবে তোমার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিবে?

বিদেশে কৃষি বিদ্যালয়ে স্বর্ণপদক পারিতোষিক পাইয়াছ, জন্মভূমির মুখোজ্জ্বল করিয়াছ, তবে বিভিন্ন প্রদেশে শত শত লোক ভীষণ দুর্ভিক্ষের করাল কবলে নিহত হইতেছে কেন? তোমার আগমনে প্রশমিত হইল কি! তোমার প্রতিবাসী দীন কৃষক 'গায়ের রক্ত জল করিয়া' শস্যোৎপাদন করিল, অনাবৃষ্টিতে তাহা বিনষ্ট হইয়া যাইতেছে, তোমার স্বর্ণপিণ্ডে কি করিল? অসীম শূন্যমণ্ডলে দূরাদৃষ্ট গ্রহের দূরত্ব নির্ণয় করিতে তোমার যেরূপ আয়োজন, তোমার চতুর্দ্দিকস্থ দিগ্বলয় ভেদ করিতে তাহা দেখিনা কেন? শরীর মধ্যস্থ তাড়িৎ কিরূপ সংযোগে কোন প্রবৃত্তির উত্তেজনা করে, জান কি? অথচ তেজঃপুঞ্জ সাবতৃ মণ্ডলের গর্ভ প্রদেশের অবস্থা না জানিতে পারিয়া মহাত্রুটী মনে করিতেছ।

নিজের কার্য্য-সুগমতার জন্য বাস-ভবন, কি সময় নিরুপন যন্ত্র, আতপত্র, কি মুদ্রাযন্ত্র, বাষ্পীয়রথ করিয়া বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়াছ সত্য, কিন্তু অপ্রত্যক্ষ বা ভূত, ভবিষ্যৎ দর্শন ঘটে না কেন? অনিশ্চিত কথাটা ভাষায় স্থান পায় কেন? সংসারে স্ফূর্ত্তিখেলা ঘুচে না কেন! সহদেব যদি ভবিষ্যৎ জানিতেন, শিশুপঞ্চের তবে অকাল মৃত্যু কেন! বলাকায় হস্তে জলাশয় তটে সকল ভ্রাতার প্রাণগত ঘটে কেন? পদে পদেই ত দেখিতে পাই, প্রকৃতির প্রতিকূলে কেহ নাই।

আমরা এতদ্দুর পর্য্যালোচনা করিয়া কি স্থির করিলাম? যে দিক্‌দিয়াই দেখি, একটী অদৃষ্ট শক্তি সর্ব্বত্র বিধি ব্যবস্থা পরিচালিত করিতেছে, মনে হয়, তুমি আমিও সেই ঘটনার্ণবের ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র দুই একটি বুদ্ বুদ্ মাত্র। কিয়ৎকাল তরঙ্গ তাড়নে নাচিয়া ঘুরিয়া বিচূর্ণ হইব। অনন্ত কাল সাগরের গাত্রে তাহার কোন চিহ্ন পড়িবে কি না, জানি না, জানিবার সাধ্য ও নাই। সেই অন্তর্নিহিত শক্তি বলে চালিত হইয়া যেখানে যে ভাবে যাইব, তাহাই আমার গতি। কিন্তু এই স্থূল কথার মধ্যে একটীসূক্ষ্ম কথা—ইহার মধ্যে একজন ভোক্তা আছে, একটু চৈতন্য সত্ত্বা দেখিতে হয়; মূল শক্তি বিধান-বলে যাহা ঘটে, তন্মধ্যে "আমি"

থাকিয়া আমার গুলিকে স্বতন্ত্র করিয়া লই, তাহার ফলও "আমার" অনুবর্ত্তন করে। দৈব বা পুরুষকারের স্কন্ধে চাপাইলে চলিবে না। আমরা বলি যতই বিতণ্ডা করি, যখন কর্ম্ম আছে, তখন ভোক্তাও আছে। এবং তাহা তোমার আমার পরিবর্ত্তন সাধ্যও নহে। প্রবৃত্তির সঙ্গে বিবেক পরিচালিত হইয়া যাও, তিনিই ঠিক চালাইবেন। ভ্রম-সঙ্কুল পথে পাদচারণা করিতে তিনি বড় নারাজ। একটী স্বর্গীয় পদার্থ সর্ব্ব সমক্ষে ধরিয়া প্রকৃতি দেবী তাঁহার কার্য্য শৃঙ্খলা বজায় রাখিয়াছেন। সানুভাবে, কাহার মনে বেদনা না জন্মাইয়া "প্রশংসার আলোকে" কার্য্য করিয়া সোপানদন কয়টী অতিক্রম করিয়া যাও; তাহাতেই শান্তি পাইবে, পথের শ্রম জানিতে পাইবে না। এই সংসার পথ পর্য্যটনের ইহাই "স্থূল কথা।"

আর সূক্ষ্ম কথা ধরিতে চাও, তবে প্রকৃতির চিন্তায় বিভোর থাক, আত্ম হারা হও; বা বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে নিজেকে মিশাইয়া ফেল, সুখ দুঃখের সন্ধানে কাজ নাই।

অভিমান।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

লেখক—শ্রীশচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

আমরা একবার বিলিকে দেখিতে যাইব। সঙ্গে সঙ্গে পাঠককেও যাইতে হইবে; অসম্মত হইলে এ অপূর্ব্ব আখ্যায়িকা পাঠ বন্ধ করা ভিন্ন তাঁহার উপায়ান্তর দেখি না!

গঙ্গার উপকূলবর্ত্তী একটি সমৃদ্ধিশালী গণ্ডগ্রামে বিলির পিত্রালয়। গ্রামের প্রকৃত নাম গোপন রাখিয়া তাহাকে আমরা বিশালপুর নামে অভিহিত করিব। এ গ্রাম মুর্শিদাবাদের সন্নিকট এবং বধূগ্রাম হইতে নৌকা পথে দুই দিনের পথ। বিলির পিতা নাই; ভ্রাতা রমেশচন্দ্র এক্ষণে অতুল সম্পত্তির অধীশ্বর। বিধবা মাতা সংসারে স্পৃহা শূন্যা। রমেশচন্দ্র দুরন্ত জমিদার। কেহ তাঁহাকে ভয় করে, কেহবা ভালবাসে; তাহার নাম যশ খুব, নিকটে বা দূরে সকলেই তাঁহাকে চিনে। বিলি; মাকে দেখিল, ভাইকে দেখিল; কিন্তু তাহার মন সুস্থ হইল না। স্বামীর কাছে ফিরিয়া যাইবার জন্য ছট্‌ফট্‌ করিতে লাগিল। এমন সময় ভাইয়ের ব্যা-

রাম বাড়িল। তখন বিলি, ফিরিয়া যাইবার সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিয়া ভ্রাতৃ সেবায় নিযুক্ত হইল।

রমেশের শ্বশুরালয় হইতে তাঁহার শ্যালক ও শ্বাশুড়ী আসিল, মাতুলালয় হইতে আত্মীয় স্বজন আসিল, যে যেখানে কুটুম্ব বা সুহৃদ ছিল সে সেখান হইতে ধনবান আত্মীকে দেখিতে ছুটিয়া আসিল। গ্রামস্থ বৈদ্য ও ডাক্তারে গৃহ পরিপূর্ণ হইল দূরদেশ হইতে চিকিৎসক ও বৈদ্য আহুত হইল—বহরমপুর হইতে সাহেব ডাক্তার আনীত হইল।

এই গোল-মালের ভিতর নির্ম্মলকে প্রত্যহ পত্র লিখিতে বিলি অবহেলা করিত না। ভাইয়ের রুগ্ন শয্যার পার্শ্বে বসিয়াও বিলি নির্ম্মলকে ভাবিতে ভুলিত না। তাঁর কথা যে আপনা হইতেই সতত মনে আসিত; চেষ্টা করিয়া ভাবিতে হইত না, নির্ম্মলের পত্রও প্রত্যহ আসিত। সব কাজ ফেলিয়া বিলি আগে নির্ম্মলের পত্র পড়িত।

রমেশের যখন শ্বশুর বাড়ী আছে তখন তাঁহার বিবাহ ঘটিয়া থাকাও সম্ভব। স্ত্রীর নাম জ্যোৎস্না সুন্দরী, বয়স বিংশতি বৎসর। পিত্রালয় সন্নিকটস্থ রুদ্রপুর গ্রামে। জমীদার গৃহিনীর যেমন রূপ ও গর্ব্ব থাকা উচিত—জ্যোৎস্নারও তেমনি ছিল। তবে গরবটা যেন কিছু বেশী বেশী। তা' হইবারই ত' কথা। যে ঊর্দ্ধতন চতুর্দ্দশ পুরুষের মধ্যে কখন ঐশ্চর্য্য দেখে নাই সে, রাজ প্রসাদ তুল্য অট্টালিকা মধ্যে অবস্থান করিয়া রাজৈশ্চর্য্য-ভোগ করিলে কেন না গর্ব্বিত হইবে?

জ্যোৎস্নার ভাইটিও অনেকটা ভগ্নীর মত। হারাণচন্দ্র কখন অট্টালিকায় বাস করে নাই; সুতরাং ভগ্নীর নিকট আসিলে অট্টালিকা বাসীর চাল চলন অবলম্বন করিত। হারাণ-চন্দ্রের বয়স প্রায় ত্রিশ বৎসর হইবে। সে নিতান্ত মূর্খ নয়; কিছু লেখা পড়া জানিত নাটুকে কথা অনেক শিখিয়াছিল। চারিবার প্রবেশিকা পরীক্ষায় অকৃত-কার্য্য হইয়া হারাণ, দুইখানি নাটক ও একখানি নবেল লিখিয়াছিল। জগতে সেই অত্যুপাদেয় গ্রন্থ কয়খানি প্রচার হইবার পূর্ব্বেই ভগ্নী জ্যোৎস্না তাহা অনল দেবকে উপহার দিয়াছিলেন। ক্ষোভে, অভিমানে হারাণ তদবধি পুস্তক লেখা বন্ধ করিয়াছিল। না জানি সে অভিমানের ফলে বঙ্গ ও ভারতের কি অনিষ্ট সংঘটিত হইল। তা' ভারতের ভাগ্যে যাই হউক হারাণ বই লেখা বন্ধ করিল। বন্ধ করিয়া একটি "ক্লব" খুলিল। সেখানে চাঁদা দিলে সকল শ্রেণীর, সকল জাতির লোক প্রবেশ করিতে পাইত। এই "ক্লবে" রাজনৈতিক, সামাজিক ব্যাপার সকলি আলোচিত হইত—সুরা, পক্ষী, চা উদরস্থ

হইত। এখানে সভ্যেরা দাঁড়াইয়া গ্লাস হস্তে "হেল্থ" পান করিতেন—সিগারেট মুখে চেয়ারে বসিয়া দেশ উচ্ছন্ন যাইতেছে বলিয়া আক্ষেপ করিতেন—মেজের উপর গড়া-গড়ি দিয়া উদরস্থ সুধা উদ্গীরণ করিয়া বসুধা সিক্ত করিতেন।

ক্লবের সভাপতি হারাণ চন্দ্র দেশ পূজ্য। কেননা তিনি বিশালপুরের জমীদার ধনবান রমেশ বাবুর শ্যালক। হারাণের অবস্থা নিতান্ত মন্দ নয়; তার উপর ভগ্নীর সাহার্য্যে হারাণের বাবু গিরিটা স্বচ্ছেন্দে চলিয়া আসিতেছিল।

হারাণ ভাবিত তাহার মত রূপবান পুরুষ দেশে বিরল। সেই কারণেই হউক বা যে জন্যই হউক সে মনে করিত যে, প্রত্যেক রমণী তাহার রূপে মুগ্ধা। যদি পথিমধ্যে বা বাতায়নস্থিত কোন রমণী ঘটনা ক্রমে একবার হারাণের প্রতি মুহূর্ত্তের জন্য চাহিয়া দেখিত তাহা হইলে হারাণ তাহার পার্শ্বস্থ বন্ধুকে বলিত, "দেখ, আমাকে দেখে মেয়েটা চেয়ে রয়েছে।" ইত্যাদি।

হারাণ, মাকে সঙ্গে লইয়া ভগ্নীপতিকে দেখিতে আসিল। রুগ্ন ভগ্নীপতির শয্যাপার্শ্বে হারাণ যাহা দেখিল, সে তাহা ভুলিল না। অনিমেষ নয়নে বিলির অসামান্য সৌন্দর্য্য পানে চাহিয়া রহিল। বহু দিন পূর্ব্বে হারাণ, বিলিকে একবার দেখিয়াছিল। কিন্তু সে বিলি, আর এ বিলি? অনেক প্রভেদ। প্রতিমার খড়ে মাটী লেপিতে দেখিয়া ছিলাম, আর আজ সেই প্রতিমা নানা বর্ণ চিত্রিতা, পুষ্পালঙ্কার ভূষিতা দেখিলাম। দ্বিতীয়ার ক্ষীণ চাঁদ দেখিয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম, নিদ্রাভঙ্গে শারদাকাশে পূর্ণিমার চাঁদ দেখিলাম, হারাণ অনিমেষ নয়নে বিলির পানে চাহিয়া রহিল।

হারাণের তীব্র দৃষ্টি সহ্য করিতে না পারিয়া বিলি বউ দিদির কাছে উঠিয়া গেল। জ্যোৎস্না তখন কক্ষান্তরে কৌচের উপর অর্দ্ধ-শায়িতাবস্থায় একখানা উপন্যাস পড়িতে ছিলেন। বিলিকে দেখিয়া জ্যোৎস্না বই রাখিলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, "চলে এলি যে?"

বি। লোক এসেছে।

জ্যো। কে?

বি। হারাণ বাবু।

জ্যো। দাদাকে দেখে আবার লজ্জা!

বি। কি জানি ভাই, কেমন লজ্জা এ'ল।

জ্যো। দেখিস্, এর পরে যেন নিজের দাদাকে দেখে লজ্জায় জড় সড় হসনে।

বি। লজ্জাটা ত' আর হাত ধরা নয়।

জ্যো। না সেটা পায়ে ধরা; পায়ে ধর্‌লে তবে লজ্জা ভাঙ্গে, না?

বি। সেটা ভাই তুমি ভাল জান। দুনিয়াটাকে পায়ে ধরিয়ে এখন লজ্জা ছেড়েছ।

জ্যো। লজ্জা করিলে কি জমিদারী চলে? দাওয়ান, নায়েবকে কে হুকুম দিবে?

বি। কেন দাদা?

জ্যো। ছোট খাট জমিদারী হ'লে পুরুষে চালাতে পারে। তুই এসব কি বুঝবি, বল্।

বি। আঃ বাঁচলুম্! আমার পিতার জমিদারী তোমার মত দেওয়ান পেয়ে এতদিনে রক্ষা পাইল।

উভয়ে যেন পরস্পরের প্রতি কেমন একটু অপ্রসন্ন হইল। বর্ত্তমান ক্ষেত্রে বিলির অপরাধ এই যে, সে হারাণের তীব্র দৃষ্টি সহ্য করিতে না পারিয়া চলিয়া আসিয়াছিল। বিলি কোন কালেই জ্যোৎস্নাতে অনুরক্ত ছিল না। জ্যোৎস্নার লজ্জাহীনতা দেখিয়া বিলি বরং বিরক্ত হইত।

বিলি উঠিয়া মায়ের কাছে গেল। মা তখন হরি নামের মালা লইয়া ব্যস্ত। দু' চারিটা কথার পর বিলি নিজের কক্ষে উঠিয়া আসিল। পিত্রালয়ে সে দুইটী ঘর পাইত; এখনও তাহা পাইয়াছিল। বসিবার ঘরটি বেশ সুসজ্জিত। কাষ্ঠাসন আছে, পালঙ্ক আছে—পালঙ্কের উপর কার্পেট পাতা আছে। বড় বড় আয়না, ফ্রেমে আঁটা বড় বড় ছবি দেয়ালের গায়ে বিলম্বিত রহিয়াছে। কোন খানি দশ মহা বিদ্যা, কোন খানি বা দশ অবতারের ছবি; কোন খানি প্রেমময় চৈতন্য দেবের, কোন খানি বা কর্ম্মময় কংসারি শ্রীকৃষ্ণের। ছবি ছাড়া ঘরে আরও অনেক জিনিস আছে;—আলমারি, দেরাজ, আন্‌লা প্রভৃতি কিছুরই অপ্রতুলতা নাই।

ঘরে আসিয়া বিলি একজন দাসীকে ডাকিল। রেবতী নাম্নী একজন পরিচারিকা বিলির সঙ্গে বধু গ্রাম হইতে আসিয়াছিল। রেবতী বিগত যৌবনা হইলেও বুদ্ধিমতী।

রেবতী শ্যামবর্ণা, কৃশা; বয়স ত্রিশ বৎসর। চক্ষু দুটি আয়ত, শুভ্রদন্ত, মিশি রঞ্জিত—যেন সাদা কাগজে কে কালীর আঁচোর পাড়িয়াছে। কেশ, নিতম্ব বিলম্বিত।

রেবতী আসিল। দাদার কক্ষে কেহ আছে কিনা দেখিবার জন্ত বিলি তাহাকে পাঠাইয়া দিল। রেবতী গিয়া দেখিল, রমেশের কাছে হারাণ বসিয়া রহিয়াছে। হারাণের উপর দু' চারিটা ভীষণ কটাক্ষ নিক্ষেপ করিতে রেবতী ক্রুটী করিল না; পাছে সেই কটাক্ষ অনলে হারাণ দগ্ধীভূত হয় এই আশঙ্কায় কিছু হাস্ত সুধাও বর্ষিত হইল।

রেবতী আসিয়া বিলিকে সংবাদ দিল। বিলি তখন অন্যান্ত কর্ম্ম সারিয়া স্বামীকে পত্র লিখিতে বসিল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

অপরাহ্নে বিলি দাদার কাছে আসিয়া বসিল, রমেশ শয্যা শায়িত; বিলিকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "এতক্ষণ তুমি আসনি কেন, দিদি?"

বিলি। তুমি কি আমায় খুঁজেছিলে দাদা?

রমে। তোমায় আবার খুঁজিনি? তুমি ছিলে না বলে আমার যে কিছু খাওয়া হয়নি, বিজু।

বিলি দুধ গরম করিয়া আনিয়া দাদাকে খাওয়াইল। রমেশ বলিলেন, "জাননা কি, তুমি না খাওয়াইলে আমার খাওয়া হয় না বিজু? একটু আগে খানিকটা ঠাণ্ডা দুধ নিয়ে জ্যোৎস্না আমায় খাওয়াইতে আসিয়াছিল। অক্ষুধার অছিলায় আমি তাহা খাই নাই।"

এমন সময় হারাণ সেখানে আসিল। মাথার কাপড় একটু টানিয়া বিলি বসিয়া রহিল। হারাণ যাহা খুঁজিয়া বেড়াইতেছিল তাহা দেখিতে পাইল। বিলির লাজ রঞ্জিত মুখখানি দেখিয়া হারাণ আত্ম-হারা হইল,—সব ভুলিয়া সেই মুখ খানি পানে অনিমেষ নয়নে চাহিয়া রহিল। হারাণের তীব্র দৃষ্টি বিলি অনুভব করিল; সে বিরক্ত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। রমেশ বলিলেন, "আবার কোথায় যাচ্ছ, বিজু?"

বিজু বসিল; তবে এবার ঘোমটার—মুখ সম্পূর্ণ আচ্ছাদন করিল। রমেশ বিস্মিত হইয়া কারণ অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন। হঠাৎ হারাণের পানে দৃষ্টি পড়িল, দেখিয়া সকলই বুঝিলেন। বিশেষ বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "হারাণ, তুমি এখন বাহিরে যাও।"

অগত্যা হারাণ চলিয়া গেল। রমেশ তখন দেওয়ানকে ডাকাইলেন, দেও-

য়ান আসিলে বিলি কক্ষান্তরে গেল। রমেশ বলিলেন, "দেওয়ান, আত্মীয় স্বজন, বন্ধু বান্ধব যাঁহারা আমায় দেখিতে আসিয়াছেন বহির্ব্বাটীতে তাঁহাদের স্থানাভাব আছে কি?

দেওয়ান। আজ্ঞে না।

রমেশ। উত্তম, যাঁহারা আমায় দেখিতে ইচ্ছা করিবেন; তাঁহাদের বলিও যে, এক্ষণে আমি বিশেষ কাতর। আমার অনুমতি ব্যতীত কাহাকেও আমার মহলে আসিতে দিবে না।

দে। হারাণ বাবু ও না?

রমে। সকলের পক্ষে একই আদেশ।

দে। অন্দর মহলে প্রবেশ নিষেধ কি?

রমে। আত্মীয় স্বজনের পক্ষে অন্দর-মহল পূর্ব্ববৎ অবারিত রহিল।

দেওয়ান বিদায় হইল। বিলি আসিলে রমেশ বলিলেন, "বিজু, একটা কথা ভুলে গিয়াছিলাম, তুমি তা' আমায় মনে পড়িয়ে দিলে। এ বাড়ীতে লজ্জা সরম ঠাঁই পায় না, স্ত্রীলোকদের যে লজ্জা করিতে হয় তা'ও আমার মনে ছিল না।"

বিলি কিছু বলিল না; মাথা হেট করিয়া বসিয়া রহিল। রমেশ যুবা পুরুষ; কিন্তু খর্ব্বকায় ও কুৎসিৎ দর্শন, নিজে শিক্ষিত এবং মেম রাখিয়া স্ত্রীকেও উচ্চ শিক্ষা দিয়াছিলেন। লেখা পড়া শিখিয়া স্ত্রী বিলাস শিখিল; বিলাসের সামগ্রীতে গৃহ পরিপূর্ণ হইল। স্ত্রী যাহা—চাহিল স্বামী তাহাই যোগাইলেন। অবশেষে স্ত্রী স্বাধীন হইল—পুরুষের সাম্‌নে ঘোমটায় মুখ ঢাকিয়া রাখিতে ঘৃণা বোধ করিল। তবে দয়া করিয়া অন্দর ছাড়িয়া বৈঠক খানায় গিয়া বসিল না। স্বাধীন হইয়া জমিদারীর কার্য্য দেখিতে লাগিল, রোকড়-খতিয়ান না বুঝায়াই নায়েব গোমস্তার কৈফিয়ৎ তলব করিল।

জ্যোৎস্না দরিদ্রের কন্যা হইলেও অসামান্ত রূপসী। রূপে সংসার মুগ্ধ হয়। যতদিন রূপের মোহ থাকে ততদিন আমরা দোষগুণ বিচারাক্ষম হইয়া রূপের পানে চাহিয়া থাকি। তবে রূপের মোহে দীর্ঘকাল আবদ্ধ থাকা সম্ভব নয়; সংসর্গে শয্যা সঙ্গিনীর রূপের নূতনত্ব বিনষ্ট হয়—মোহ ক্রমে ঘুচিয়া যায়। রমেশের এক্ষণে মোহ ঘুচিয়াছে—তিনি রূপের-পা ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়াছেন! রমেশ এক্ষণে উপাসক নন্—তিনি এখন সমালোচক।

রমেশ দুরন্ত ও বুদ্ধিমান; কিন্তু স্ত্রীর কাছে শান্ত ও অল্প-ভাষী। তিনি উন্নত চেতা ও আত্ম সংযমী। তবে ক্রোধে ক্বচিৎ কখন আত্মহারা হইতেন।

সে কথা থাক্ ; এখন যাহা বলিতেছিলাম তাই বলি।

হারাণ রমেশের কক্ষ হইতে বিতাড়িত হইয়া ভগ্নীর নিকট উপস্থিত হইল। হারাণ বলিল, "দত্ত মহাশয় কেমন আছেন ?"

জ্যোৎস্না। তুমি দেখে এ'স্যো না।

হা। সেখানে আমার যাবার উপায় নাই।

জ্যো। কেন ?

হা। সেখান হইতে বিতাড়িত হইয়াছি।

জ্যো। সে কি ? কে তোমায় তাড়াইয়া দিয়াছে ?

হা। দত্ত মহাশয়।

জ্যো। কেন ?

হারাণ সকল কথা বলিল—একটু অতিরঞ্জিত করিয়া বলিল। ক্রোধে জ্যোৎস্নার কপালের শিরা স্ফীত হইয়া উঠিল। বিলির উপরই রাগটা বেশী হইল। বলিলেন, দাদা, তুমি আবার যাও ; কোন চিন্তা নাই—আমি পাছু পাছু যাইতেছি।"

হারাণ একটু ইতস্ততঃ করিল, যাইতে সাহসে কুলাইল না ;

যে খণ্ডে রমেশ আছেন সে মহল দ্বিতল। উপরে উঠিবার পূর্ব্বেই হারাণ বাধা পাইল। দেখিল সিঁড়িতে প্রহরী পথ ছাড়িল না। হারাণ বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "পথ রুদ্ধ কেন ?"

প্র। হুজুরের হুকুন।

হা। আমার পক্ষে ও ?

প্র। সকলের পক্ষে।

হা। তবে কেমন করিয়া বাবুর কাছে যা'ব ?

প্র। হুজুরের হুকুম হইলে পথ ছাড়িয়া দিব।

হা। আমি এখানে আটক রহিলাম—কেমন করিয়া হুকুম আনিব ?

প্র। আমি আনাইতেছি।

প্রহরী, একজন দাসীকে প্রভুর নিকট পাঠাইল। যথা সময়ে অনুমতি আসিল। হারাণ, রমেশের কক্ষে গিয়া দেখিল, তথায় বিজলী নাই। ব্যাকুল হইয়া চারিদিকে চাহিল, যাহা খুঁজিতেছিল তাহা কোথাও দেখিতে পাইল না। হারাণের এ ব্যাকুলতা রমেশ লক্ষ্য করিলেন। একটু কর্কশ স্বরে বলিলেন, "কি জন্যে এখানে এসেছ ?

হা। আপনি কেমন আছেন জানিবার জন্য জ্যোস্না আমায় পাঠাইয়া দিয়াছে।

র। তিনি যখন স্বয়ং আসিয়া দেখিয়া যাইতে পারেন তখন তোমায় পাঠাইবার প্রয়োজন কি ?

হা। তা' জানি না।

র। তিনি কোন্ কাজে ব্যস্ত।

হা। পিয়োনা বাজাইতেছেন।

র। উত্তম। তুমিত একটু পূর্ব্বেই আমায় দেখিয়া গিয়াছ, এর মধ্যে ফিরিয়া আসিবার কি প্রয়োজন ছিল ?

হা। তখন কোন কথা জিজ্ঞাসা করা হয় নাই।

র। আমায় জিজ্ঞাসা না করিয়া ডাক্তার বৈদ্যকে জিজ্ঞাসা করিলে সঠিক সংবাদ পাইতে পারিতে ত।

হারাণ নিরুত্তর। তখন রমেশ শয্যার উপর উঠিয়া বসিয়া একটু উত্তেজিত কণ্ঠে বলিলেন," দেখ, হারাণ, তোমায় যখন প্রয়োজন হইবে তখন তোমায় ডাকাইয়া পাঠাইব। না ডাকিলে বুঝিবে তোমার এখানে আসিবার প্রয়োজন নাই। বুঝেছ ত ? এখন যাও।"

হারাণ চলিয়াগেল। হারাণকে রমেশ বেশ চিনিতেন। হারাণের ভগ্নীকেও রমেশ যে একেবারে চিনিতেন না এমন নহে, ইদানীং কতকটা চোখ ফুটিয়া ছিল। তবে ঘরের কথা পাছে বাহিরে যায়, এই ভয়ে রমেশ নীরব থাকিতেন। তদ্ভিন্ন এরূপ অবস্থার গত্যন্তর কি ?

পথিমধ্যে হারাণ, ভগ্নীর সাক্ষাৎ পাইল। জ্যোৎস্নাকে সকল কথা বলিল। রাগে জ্যোৎস্না ফুলিয়া উঠিল। স্কন্ধ হইতে বস্ত্রাঞ্চল খসিয়া পড়িল কবরী হইতে দুই চারিটা গোলাপ ফুল কক্ষচ্যুত নক্ষত্রের ন্যায় ভূমিতে পড়িয়াগেল, দাসদাসী চারিদিকে সশঙ্কিত হইয়া ছুটিয়া পালাইল। পদভরে হর্ম্ম্যতল কাঁপাইয়া, অলঙ্কার শিঞ্জিতে প্রতিধ্বনি উঠাইয়া জ্যোৎস্নাময়ী স্বামীর কক্ষের দিকে অগ্রসর হইলেন।

স্বামীর কক্ষে প্রবেশ করিয়া জ্যোৎস্না দেখিলেন, রমেশ মুদিত নয়নে শয্যার উপর পড়িয়া রহিয়াছেন। কক্ষে আর কেহ নাই। স্ত্রী ডাকিল, "রমেশ।"

কোন উত্তর নাই। শিক্ষিতা স্ত্রী রুগ্ন স্বামীর শয্যাপার্শ্বে দাঁড়াইয়া উচ্চকণ্ঠে আবার ডাকিল, "রমেশ।" এবারও কোন উত্তর নাই। বুদ্ধিমতী স্ত্রী বুঝিল, নিদ্রা কৃত্রিম ; তখন গর্ব্বস্ফীতা রমণী ক্রোধভরে কক্ষ ত্যাগ করিল।

রমেশের কক্ষে পরদিন জ্যোৎস্নার উদয় হইল না। রমেশও শান্তি পাইলেন।

অষ্ট প্রহর জ্বরের যন্ত্রনার উপর মানসিক অশান্তি সহনাতীত। তাই সুখ ও শান্তির আশায় তিনি সকল সময়েই বিজলীকে কাছে বসাইয়া রাখিতেন। বিজলী ঔষধ খাওইত, পথ্য দিত, মাথা টিপিত, গল্প করিত। বিজলীর মত কেহ কিছু পারিত না। মামী বা শাশুড়ী, মামাত বা পিস্‌তুত ভগ্নীরা কাছে বসিয়া পরিচর্য্য করিলে রমেশের ভাল লাগিত না। বিজলী যাহা করিত না, তাহা রমেশের পছন্দ হইত না।

মধ্যাহ্নে আহারান্তে বিজলী নিজের ঘরে প্রত্যহ একটু বসিত। আজও যথা সময়ে ঘরে গিয়া পালঙ্কের উপর বসিল। নির্ম্মল কুমারের একখানি ক্ষুদ্র প্রতিকৃতি বিলির নিকট ছিল। একটি ক্ষুদ্র আধার হইতে ছবিখানি বাহির করিয়া বিলি নির্নিমেষ নয়নে তাহা দেখিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে চ'ক্ষে জল আসিল। জল ক্রমে ছাপাইল, অবশেষে গণ্ড বহিয়া গড়াইতে লাগিল।

ছবি খানি আধার মধ্যে রাখিয়া বিলি চক্ষু মুছিল। সেই ক্ষুদ্র বাক্স মধ্যে কয়েক খানি চিঠি ছিল। বিলি একে একে তাহা পড়িতে লাগিল। পড়িতে পড়িতে কাঁদিল; চক্ষু মুছিয়া আবার পড়িতে লাগিল। চিঠি গুলি, নির্ম্মলের লিখিত; সুতরাং না কাঁদিয়া তাহা পাঠ করা বিলির পক্ষে অসম্ভব।

তার পর বিলি পত্র লিখিতে বসিল। কাঁদিতে কাঁদিতে, চ'খের জল মুছিতে মুছিতে বিলি পত্র লিখিল। নির্ম্মলকে সান্ত্বনা দিয়া কাঁদিতে নিষেধ করিয়া, কাঁদিতে কাঁদিতে বিলি পত্র সমাপ্ত করিল।

পত্র সমাপ্ত করিয়া বিলি দাদার ঘরে গেল। সেখানে গিয়া দেখিল, একটা ক্ষুদ্র প্রলয় বাধিয়াছে। জ্যোৎস্নাময়ী কক্ষমধ্যে দ্বাদশ রবির তেজে দাঁড়াইয়া বক্তৃতা স্রোতে পীড়িত স্বামীকে প্লাবিত করিতেছেন। বিলিকে দেখিয়া প্রবাহ যেন বায়ুর সহায়তা পাইয়া আরও গর্জ্জিয়া উঠিল।

কক্ষে অপর কেহ নাই, জ্যোৎস্নার ভাব দেখিয়া আত্মীয় স্বজন সরিয়া পড়িয়াছিল। জ্যোৎস্না বলিতে ছিলেন, "নিজের গৃহে পাইয়া যে অতিথিকে অপমান করে, আত্মীয় কুটুম্বকে লাঞ্ছিত ও নির্য্যাতন করে, সে শিক্ষিত ভদ্রলোক নামে অভিহিত হইবার যোগ্য নয়। যাঁহারা দয়া করিয়া আমাদের বিপদের সময় আমাদের দেখিতে আসিয়াছেন, তাঁহারা আমাদের সম্মানের পাত্র; বর্ব্বরের হস্তে কেবল তাঁহাদের নির্য্যাতন সম্ভব। এই গৃহ, (বিলির পানে তীব্র কটাক্ষ পাত করিয়া) এই সংসার পাপ স্পৃষ্ট হইয়াছে। পাপ, লজ্জার আবরণ খুঁজে; ধর্ম্ম নিঃসঙ্কোচে বিনা আবরণে দাঁড়ায়। যাহাদের গুপ্ত জীবন, প্রকাশ্য

জীবন হইতে ভিন্ন পন্থাবলম্বী তাহারা ভদ্র সংসারের মধ্যে প্রবেশ করিলে সংসারের সুখ, শান্তি বিনষ্ট হয়। এতদিন এ সংসারে সুখ, শান্তি ছিল, অধুনা—।"

রমেশ বাধা দিয়া বলিলেন, "জ্যোৎস্না আমার জর বাড়িয়াছে, কোন কথা এখন আমার ভাল লাগিতেছে না।"

জ্যো। উচিত কথা চিরকালই তোমার ভাল লাগে না।

র। গোলমাল বিরক্তিকর হইতেছে।

জ্যো। আমার কথায় তোমার চিরদিনই বিরক্তি জন্মে। উপযুক্ত ভ্রাতার উপযুক্ত ভগ্নীর কথা অমৃত বর্ষণ করে।

র। জ্যোৎস্না—।

জ্যো। কি বল?

র। ধৈর্য্যের সীমা আছে।

জ্যো। আমার তাড়াবে নাকি?

র। জ্যোৎস্না তোমায় স্বাধীনতা দিয়াছি, আমার স্বাধীনতায় কেন হস্ত ক্ষেপ কর।

জ্যো। তুমি আমার ভ্রাতাকে দূরীভূত করিবে, আমায় পদে পদে অপমানিত করিবে, আর তাহার প্রতিকার প্রার্থনা করিতে আসিলে আমি মন্দ হইলাম?

র। তোমার ভাই আমার কাছে না আসিলেই পারেন।

জ্যো। (ব্যঙ্গ স্বরে) গৃহস্বামীর আদেশ শিরোধার্য্য। আমার পক্ষে কি হুকুম হয়?

র। জ্যোৎস্না, ক্ষান্ত হও—আমার ক্ষমা কর, আমি ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছি।

রোষভরে জ্যোৎস্না তখন কক্ষ ত্যাগ করিলেন। যাইবার সময় বিলির পানে একবার জ্বালাময়ী কটাক্ষপাত করিয়া গেলেন।

জ্যোৎস্না আপন কক্ষে গিয়া দ্বার অর্গল বদ্ধ করিলেন। দুই দণ্ড পরে দ্বার খুলিয়া হারাণকে ডাকাইলেন। হারাণ আসিলে ভাই ভগ্নীতে অনেক পরামর্শ হইল। নিম্নে তাহার কিছু নমুনা দিতেছি।

হারাণ জিজ্ঞাসা করিল, "প্রত্যহ চিঠি আসে?"

জ্যো। প্রত্যহ আসে।

হারাণ। ঠিক জান?

জ্যো। অন্দরের সব চিঠি আগে আমার কাছে আসে, আমি আবার ঠিক জানি না?

হা। কাল চিঠি এলে আটক রাখিও।

জ্যো। তা'র পর?

হা। তা'র পর আমার বিয়ে ত তোমার জানাই আছে।

জ্যো। দেখিও যেন কোন বিপদে পড়ো না।

হা। সে ভয় নাই; এত আর কোন দলীল নয়।

জ্যো। যদি ভয় না থাকে তবে যা ইচ্ছা করিও—এ কার্য্যে আমার সহানুভূতি আছে।

হা। তবে আর কি!

জ্যো। কিন্তু রেবতী?

হা। সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাক।

জ্যো। টাকার জন্য ভেব না, যত লাগে আমি দিব। যেমন করে পার বিলির সর্ব্বনাশ কর—তার স্বামীর সঙ্গে বিচ্ছেদ ঘটাও; তা'র পর তাকে কলঙ্কিনী অপবাদ দিয়ে এ বাড়ী থেকে তাড়াব। আমার বাড়ীতে আমার অপমান, আমার ভাইয়ের অপমান! তা'র মতিচ্ছন্ন ধরেছে।

শুধু তাই নয়; জ্যোৎস্নার রাগের আরও একটু কারণ ছিল। জ্যোৎস্না এক সময়ে উপযাচিকা হইয়া নির্ম্মলের প্রণয় যাচিঞ্চা করিয়া ছিলেন। কিন্তু সে প্রার্থনা প্রত্যাখ্যাত হইয়াছিল। লজ্জায়, রোষে জ্ঞান শূন্য হইয়া জ্যোৎস্না তদবধি অন্তরে অন্তরে পুড়িতেছিলেন। এক্ষণে নির্ম্মলের প্রণয় পাত্রীর সর্ব্বনাশ করিয়া, নির্ম্মলকে কাঁদাইবা, বৈরি নির্য্যাতনের সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে। তাই জ্যোৎস্না আজ হিংসাময়ী।

পর দিন প্রাতে কতকগুলি পত্র আসিল। অন্দরের পত্র জ্যোৎস্নার নিকট প্রেরিত হইত। আজও তাই হইল। বিজলীর নামে একখানা পত্র ছিল। জ্যোৎস্না সেই পত্র খানা রাখিয়া বাকী পত্রগুলা দাসীর হস্তে বিতরণের জন্য ভারার্পণ করিলেন।

বিলি সে দিন স্বামীর পত্র পাইল না। না পাইয়া উন্মত্তের ন্যায় ছুটিয়া বেড়াইতে লাগিল। দেওয়ানের নিকট রেবতীকে পাঠাইল। দেওয়ান কোন সংবাদ দিতে পারিল না।

অবশেষে বিলি কাঁদিতে কাঁদিতে পত্র লিখিতে বসিল। কিন্তু জলে চক্ষু ভরিয়া

গেল দৃষ্টি রোধ হইল। পত্র লেখা হইল না। চক্ষু মুছিয়া আবার লিখিতে বসিল আবার জল আসিল; চক্ষু ছাপাইয়া গণ্ড বহিয়া জল গড়াইতে লাগিল। অবশেষে অনেক কষ্টে চক্ষের জলে পত্র সিক্ত করিয়া খিলি পত্র সমাপ্ত করিল। সমাপ্ত করিয়া ডাক ঘরে দিবার জন্য রেবতীর হস্তে প্রদান করিল।

রেবতী পত্র লইয়া সদরে চলিল। পথিমধ্যে হারাণকে দেখিতে পাইয়া একটু দাঁড়াইল! তারপর মাথার কাপড় একটু টানিয়া, মিশি রঞ্জিত দন্তে তাম্বুল রাগ বিলিপ্ত কৃষ্ণাধর টিপিয়া একটু মধুর হাসি হাসিয়া হারাণের উপর কটাক্ষের উপর কটাক্ষ বর্ষণ করিল। হারাণ ও একটু হাসিল। একটু অগ্র হইয়া হারাণ বলিল, "রেবতি, তোমার চোখ দুটি অতি সুন্দর।"

রেবতী গলিয়া গেল। এমন কথা অনেক দিন কেহ যে রেবতীকে বলে নাই।

হারাণ রেবতীকে ডাকিয়া নিজের ঘরে লইয়া গেল। ঘরটি সদরে; বেশ বড়, সুসজ্জিত। চেয়ার টেবিল, কৌচ, সোফা, ঘড়ি, আলমারি প্রভৃতির অপ্রতুলতা নাই। এক পাশে, সুদৃশ্য পালঙ্কের উপর শুভ্র শয্যা বিস্তৃত রহিয়াছে। এক খানি কৌচের উপর রেবতীকে বসাইয়া হারাণ নিকটে বসিল। বিস্মৃত প্রায় মনোহর সঙ্গীতের স্মৃতির মত যৌবনের সুখ-স্বপ্ন একে একে রেবতীর মনে জাগিয়া উঠিল। রেবতী ভাবিল, "এত দিনে মনের মত পুরুষ পাইলাম।"

রেবতী জিজ্ঞাসা করিল, "আমাকে এখানে আনিলে কেন? ওমা লোকে দেখ্‌লে বলবে কি?"

হারাণ সে কথার উত্তর না দিয়া বলিল, "রেবতি, তুমি কি সুন্দর! তোমার মত সুন্দর বুঝি তোমার মুনিব ঠাক্‌রুণ ও নন্।"

এবার রেবতী আহ্লাদে আটখানা হইল। চক্ষের তারা, স্বীয় কেন্দ্র ছাড়িয়া এমনি ভাবে ঘুরিতে লাগিল যে, চক্ষের নিরাপদত্ব সম্বন্ধে সাতিশয় সন্দেহ জন্মিল; সুমধুর হাস্যে ওষ্ঠাধর এমনি ভাবে আকর্ণ বিস্তৃত হইল যে, মুখের পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্তির জন্য হারাণ নিতান্ত উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল। হারাণ বলিল, "তোমার হাতে ওখানা কি, রেবতি?"

চক্ষু ও ওষ্ঠাধর স্বাভাবিক অবস্থায় দাঁড়াইল। রেবতী উত্তর করিল, "চিঠি।"

হা। কার চিঠি?

রে। বউ দিদির।

হা। কোথায় নিয়ে যাচ্ছ?

রে। ডাকে দিতে।

হা। কাকে লিখেছেন?

রে। তা' জানিনা; ঠিকানা পড়ে দেখ।

হা। (পড়িয়া) নির্ম্মল কুমার বুঝি তোমার দাদা বাবুর নাম?

রে। হাঁ। আমি যাই—অনেক দেরি হলো, বউ দিদি কি মনে করবেন!

হা। তা' কষ্ট করে ডাক ঘরেই বা তোমার যাবার দরকার কি? টেবিলের উপর রেখে যাও, আমার চিঠির সঙ্গে ডাক ঘরে পাঠিয়ে দেব।

রে। আঃ বাঁচলাম্। বউ দিদির আবার কাউকে বিশ্বাস হয় না, আমাকেই ডাক ঘরে চিঠি নিয়ে যেতে হয়।

হা। এটা তার অন্যায়। তোমার মত ভদ্র ঘরের যুবতী মেয়ে কেমন করে রাস্তায় বেরিয়ে চিঠি দিতে যায় বল দেখি।

রে। আমার কদর কি বউ দিদি বুঝেন? তা' হ'লে আর দুঃখ কি? এই রকম আমায় রোজ চিঠী নিয়ে যেতে হয়।

হা। রোজই পত্র যায়?

রে। তবে বলছি কি!

হা। ভাল কথা, রোজ তুমি পত্র আমার কাছে নিয়ে এস—আমি লোক দিয়ে পাঠিয়ে দেবে।

রে। কেন আমার জন্যে এতটা করবে?

হা। আমি যে এই সুযোগে প্রত্যহ তোমায় এক বার দেখিতে পাইব, তাই যে আমার যথেষ্ট পুরস্কার।

রেবতী বলিল, "আজ হ'তে আমি তোমার দাসী হ'লাম।" পরে পত্র রাখিয়া চলিয়া গেল।

রেবতী চলিয়া গেলে হারাণ পত্র খানা নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিল; তারপর খামের উপর একটু জল লাগাইয়া আবরণ উন্মোচন করিল, ফলে পত্র অপহৃত হইল, তদ্ বিনিময়ে হারাণের লিখিত অপর পত্র রক্ষিত হইল। হায়, বিলি, তোমার অশ্রু নিষিক্ত পত্র খানির দুর্দ্দশা দেখিয়া যাও। তোমার এই পত্র খানি পাইলে নির্ম্মলের কত আনন্দ হইত! তাহা না পাইয়া যে পত্র নির্ম্মল পাইল তাহা পাঠান্তে কাঁদিতে কাঁদিতে দিন কাটিল।

বিলির ও কাঁদিতে কাঁদিতে দিন গেল। কাঁদিতে কাঁদিতে বিছানা ভিজাইয়া রাত্রি কাটাইল।

কষ্টের রাত্রি প্রভাত হয়, এই দুঃখের রাত্রির ও অবসান হইল। প্রাতে উঠিয়া ডাকের চিঠীর আশায় বিলি পথ পানে চাহিয়া রহিল। অবশেষে চিঠী আসিবার সময় হইল; বিলি তখন আকুল প্রাণে ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতে লাগিল; ডাক আসিয়াছে কি না দেখিবার জন্য লোকের উপর লোক বাহিরে পাঠাইতে লাগিল। ডাক আসিল; বিলির নামে এক খানি পত্র ও আসিল। ঠিক সেই পত্র খানা না পাইলেও বিলি এক খানা পত্র পাইল। পত্র পাইল পত্র পড়িয়া বিলি স্তম্ভিত হইল। তাহাতে লেখা ছিল:——

"আমার বিলিটুকু,

কোন কার্য্যে ব্যস্ত ছিলাম, তাই কাল তোমায়—পত্র লিখিতে পারি নাই। যদি মধ্যে মধ্যে পত্র না যায় তাহা হইলে রাগ করিও না। আমার অবসর কম—কাজ অনেক।

তোমারই———নির্ম্মল।"

পত্র পড়িয়া বিলির মুখ মলিন হইয়া গেল;—যেন উষা আলোকিত নদী বক্ষে হঠাৎ কালো মেঘের ছায়া পড়িল। সেই প্রেমময় স্বামীর এই পত্র! যাহার স্নেহ পূর্ণ সুদীর্ঘ পত্র পড়িতে পড়িতে বিলির হৃদয় নাচিয়া উঠিত, চোখে জল আসিত,—তাহার এই নীরস, ক্ষুদ্র পত্র! বিলির মাথা ঘুরিতে লাগিল, ক্রমে, মাথা কাঁধের উপর লুটাইয়া পড়িল,—যেন মৃণাল ভাঙ্গিয়া কমলিনী জলের উপর লুটাইয়া পড়িল।

—·—

ভালবাসা।

লেখিকা—শ্রীমতী নগেন্দ্র বালা সরস্বতী।

কে তুমি মোহন মন্ত্রে
বেঁধেছ বিশাল ভব,
কেন বিশ্ব সদা ধায়
উর্দ্ধশ্বাসে পাশে তব।
নদ নদী পশু পক্ষী
জ্ঞানী নর তরু লতা,
সবাই শুনিতে চায়
তোমারি মধুর কথা।

না বুঝিয়া তোমারে লভি'
এতই কি আছে ফল,
যে তোমা' আদরে পূজে
তারি সার অশ্রু জল।
উন্মত্তা বিহ্বলা রাই
তোমারে আশ্রয় করি,
পূত তপোবন-মাঝে
কি বলিব হরি হরি !!
ঢালিয়াছে শকুন্তলা
কত প্রাণ গলা জল,
জানকী নয়নাসারে
ভিজায়েছে ধরাতল।
পবিত্র স্বরগ বাসী
উর্ব্বসী, সুন্দরী, হায়,
এসেছিল তোমা' তরে
পাপ পূর্ণ এ ধরায়।
যে তোমা' আশ্রয় করে,
তারি সার অশ্রুধার,
তোমারে পূজিয়া শুধু—
লাভ অশ্রু পুরস্কার
বস তুমি যার বক্ষে
দগ্ধ কর তার মন,
তবু তোমা' সবে পূজে
একি তীব্র আকর্ষণ।
আমি ত বুঝিনা তুমি
কি মধুর হলাহল,
এত যে যাতনা তবু
কেন তোমা' পূজি বল।

——০০——

অবাহন

লেখক—শ্রীকৃষ্ণ চন্দ্র কুণ্ডু বি, এ,

নীলিমা নীরদে ঘিরে 'এসেছে বরষা ফিরে
এসেছে আবার,
তুমি ও এস গো ওয়ি এস ফিরে মনোময়ি
অন্তরে আমার ;
মেলিয়া অযুত-পাখা
আঁধার দিয়েছে ঢাকা
ধরা যেন মসী-মাখা
ভরা অন্ধকার ;
তুমি ওগো স্বপ্নময়ি এলাইয়া দাও ওয়ি
মুক্ত-কেশ-ভার।

ঝর ঝরে বরিষণ থাকি' থাকি' অনুক্ষণ
ধরণীর বুকে,
তুমি ও ঢাল গো ওয়ি মোর প্রাণে মনোময়ি
নিশিদিন সুখে,
পাপিয়া গাহে না আর
রুদ্ধ-কণ্ঠ কোকিলার
ডাহুকী খেলিছে তার
লইয়া ডাহুকে,
তুমি হৃদি-কুল-বাসি খেল হৃদি-কুঞ্জে আসি
অনন্ত কৌতুকে।

কাননে কামিনী ফুল ফুটিয়া সৌরভ কূল
কোমল মধুর,
তোমার ও স্মিত হাসি ফুটাক্ আবেগ-রাশি
পরাণ-বধুর ;
দিক-বধু কুতূহলে
চকিতে জলদে তুলে
নিজ-রূপ দেয় খুলে
চঞ্চল মেদুর ;

তব নীলাম্বর টুটে থাকি' থাকি যেন ফুটে
তন্বিমা তনুর।

নীলিমা নীরদে ঘিরে আজিকে বরষা ফিরে
এসেছে আবার,
তুমিও এসো গো আজি নব-অভিসারে সাজি'
অন্তরে আমার;
মিলনের সুখে সুখী
দুইজনে মুখো মুখী
জেগে র'বে দু'টি আঁখি
শূন্য চারিধার,
আষাঢ়ের বরিষণে বিরলেতে গৃহ কোণে
এসগো আবার।

মধুর 'মধু'

লেখিকা—শ্রীমতী জ্যোৎস্নাময়ী ঘোষ।

মধুর আকর 'মধু' মধুর-সময়
'মধু'র-প্রভাবে ধরা মধুময়ী হয়।
'মধু'র কুসুম ফুটে কুঞ্জে অগণন,
মধুর ঝঙ্কারে ভৃঙ্গ প্রেমে অনুক্ষণ।
'মধু'র সমীর বহে প্রাণ স্নিগ্ধ কর,
মধুর কূজন করে বিহঙ্গ-নিকর;
'মধু'র পুষ্পিতালতা মুনি-মনঃ হরে,
'মধু'র কোকিল-স্বরে মনঃ মুগ্ধ করে;
মধুর ডাহুক হংস খেলে সরোবরে,
মধুর বিচরে তা'রা, স্নিগ্ধ-স্বচ্ছ-নীরে;
'মধু'র নিকুঞ্জে ভ্রমে প্রজাপতি-দল,
'মধু'র আসব পিয়ে মধুপ সকল।

'মধু'র সুধাংশু শোভে কৌমুদী-নিশায়,
'মধু'র নিশার বায়ু স্নিগ্ধ করে কায়।
মধুর চকোর ভ্রমে নভে জ্যোৎস্নায়,
মধুর চকোরী প্রেমে তা'র পিছু ধায়।
মধুর অমৃত দোঁহে রঙ্গে করে পান;
মধুর কৌমুদী-দীপ্ত-নিশা হরে প্রাণ।
মধুর আনন্দ জাগে জীবের জীবনে,
মধুর লহরী বহে সংযোগীর মনে।
মধু'র অনিল দেয় সুখ-আলিঙ্গন;
মধুর পরাণে উঠে প্রেম-প্রস্রবণ।
মধুর প্রণয় জাগে বিশ্ব-বাসী-মনে,
মধুর প্রবাহ বহে দম্পতী-জীবনে।
'মধু'র প্রভাবে মত্তা বিরহিণীগণ
মধুর পতির মুখ চিন্তে অনুক্ষণ।
মধুর আপন গৃহ, প্রবাস বিরস
মধুর 'মধু'তে ভাবে রজনী-দিবস।
মধুর মিলন-বাঞ্ছা করে 'মধু' মাসে,
মধুর ভুবন তা'র, পতি যা'র বাসে।
'মধু'র আগমে সুখী জীব সমুদয়,
মধুর আকর 'মধু'——সন্দেহ কি তায়!!

নিশীথ চিন্তা।

লেখক—শ্রীবঙ্কিম বেহারী বসু।

(১)

নিবীড় তিমিরাবৃত নিশীথ যামিনী।
নিশ্চল পবন গতি নিথর মেদিনী
তরুলতা মৌন সবে, রয়েছে আপন ভাবে
যেন সেই বিশ্ব ধ্যানে হয়েছে মগন
তাই বুঝি স্তব্ধ ভাব ধরেছে পবন।

(২)

থেকে থেকে ঝিল্লীগণ গাছে সমস্বরে।
আনন্দে বিভোর হয়ে বিভু গান করে
অধম মানব মন, আছে ঘুমে অচেতন
স্বপন দেখিয়া কেহ করে বা রোদন
কেহবা-বেহাগ-তানে ভেদিছে গগণ।

(৩)

প্রকৃতির হেন ভাব হেরিলে নয়নে।
কার্ না-পবিত্রভাব উথলে পরাণে॥
হৃদয়ের-স্তরে স্তরে, জেগে-উঠে বারে বারে
সংসার তিমিরাবৃত হব না কথন
ধাইব বিজন স্থানে টুটিব বন্ধন॥

(৪)

গহন কাননে কিম্বা পর্ব্বত শিখরে।
ভুস্তর প্রান্তরে কিম্বা-ভীষণ গহ্বরে॥
সদা বলি এক মনে, ডাকি তাঁয় কায় মনে
লইব স্মরণ তাঁয়—ছিঁড়ি মায়া জালে
ভুলিবনা মজিব না-সংসার জঞ্জালে।

(৫)

সংসার-বন্ধনে সবে হইয়া জড়িত।
হারায়েছে-তত্ত্ব-জ্ঞান মায়াতে বেষ্টিত,
সংসার নরক সম, ভাবি সদা হৃদে মম
কেমনে লভিব সেই-সুখের আকর।
যথা বাঁধা রহে সদা নিশা দিবাকর॥

(৬)

অহংকার অভিমানে মত্ত সদা আছে
ছলনা চাতুর্য্যে সবে আপনা ভুলিছে।
হেন স্থান পরিহরি, চলি যাব ত্বরা করি,
বৃথা সুখ—আশে কভু ভুলিব না আর
লভিব অপার সুখ—চরণে তাঁহার।

—— ০০০০০ ——

শ্মশান।

(১)

শ্মশান পবিত্র স্থান
হয় সকলে—সমান
এই খানে ভেদা-ভেদ কিছু নাহি রয়।
ঘুচিবে বৈষম্য-ভাব
পূর্ণ হবে ধর্ম্ম ভাব,
ইংরাজ—বাঙ্গালী—সবে একেলীন হয়॥

(২)

মূরখ-দরিদ্র—ধনী
সবে নেবে এক গণি
বিভিন্নতাকিছু ভাই, থাকেনা এখানে।
শুশ্রী-কুৎসিত, ক্ষুদ্র
ব্রাহ্মণ পণ্ডিত শূদ্র।
সবে হয় সম ভাব আসি এই থানে॥

(৩)

এ বাজারে একদর,
নাহি কোন অন্য পর
এমন সুখের স্থান দেখিনে কথন।
সেক্স-পির কালিদাস
মহাকবি বেদব্যাস
সকলেই এক মূল্য করে যে বহন॥

(৪)

কেন বল আপনার,
কিছু ত নয় তোমার,
কেন ভাই সদা কর বৃথা অভিমান।
সকলি বিলীন হবে
অনলে পুড়িয়া যাবে,
মাটিতে জনমি হবে মাটিতে বিলীন॥

(৫)

কোথা যায় কত ধ্বনি
রূপে-ভারী—অভিমানী,
অনলে—পুড়িয়া শেষে, হয় ছারখার
কোথা-সে-রূপের অংশ
পুড়ে সবে হ'ল—ধ্বংশ
কোথায় রহিল—পড়ি সৌন্দর্য্য তাহার ॥

(৬)

তুমি আমি কে যে জান ?
আমার বচন শুন,
আসা যাওয়া বিড়ম্বনা—কেবল—এ ভবে।
ক' দিনের তরে আসি,
সংসার সাগরে ভাসি,
জল-বিম্ব সম ভাই বাতাসে মিশাবে ॥

(৭)

তবে কেন অহংকার,
মিছে কর বার বার,
মাটির পুতুলে দর্প শোভা নাহি পায়
তাই বলি এই স্থান,
পাইলে—মনেতে স্থান,
অহংকার অভিমান দূরেতে পালায়

(৮)

জানি না স্বরগ সুখ
জানিব না সেই সুখ
অভাগা—মানব—হয়ে—কেমনে বর্ণিব।
শ্মশান ভূমির এই
জীবন্ত দৃষ্টান্ত যেই
পালিবে, লভিবে সেই সুখ অভিনব।

(৯)

শ্মশান ভীষণ স্থান
অনন্ত—পবিত্র—স্থান
সম্মুখে বাহিয়া যায় অসীম বারিধি।

বিপুলা ধরিত্রী—দেবী।
পদ তলে—আছে লুটী
জীবের অনন্ত—সেই—পরম—সমাধি

(১০)

ভাল মন্দ সদা সৎ
আর যা আছে-মহৎ
সংসার ত্যায়াগি যায়—এই পথ—দিয়ে।
এখানে শুইলে পরে,
শোক তাপ যায়—দূরে,
যাতনা—যন্ত্রণা—দুঃখ—যায়—দূর হয়ে ॥

(১১)

অথবা যে এই স্থান
কেমনে সুখের স্থান
যে অনল জ্বলে—হেথা কখন নিবে না।
তাহে পোড়ে সরলতা
তাহে পোড়ে-কোমলতা
পবিত্রতা—পোড়ে হেথা কিছুই থাকেনা।

(১২)

সৌন্দর্য্য—পোড়ে যে হায়
মায়া,বা ব্রীড়া প্রেম পোড়ে তায়
সকলেই—পোড়ে হায়—যা পুড়িবার নয়
অপরের সুখ আশা
প্রফুল্লতা—ভাল—বাসা
কিছুই থাকেনা বুঝি থাকিবার নয়।

(১৩)

তাই বলি এই স্থান
সুখের দুঃখের স্থান.
ভুঞ্জেন অসীম—সুখ—যিনি—চলি যান।
পড়িয়া—থাকেন যিনি
পড়ে অতি দুঃখে তিনি,
সংসার নিয়ম—এই হয় না খণ্ডন॥

(১৪)

কুসুমে সৌরভ রয়
কণ্টক তাহাতে হয়
ভাল—মন্দ—সবে মিলি চলিছে জগৎ।
যে রমণী—রূপ—ভরে
ফুলের আঘাতে ডরে
ভাল বাসা—প্রতারণা—তাহে যে—মিশ্রিত ॥

প্লেগ-প্রতিষেধক ও চিকিৎসা।

লেখক—শ্রীনীলমণি পাল।

সংবাদ পাইতেছি, কলিকাতা ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থানে প্লেগ ক্রমে ক্রমে বিস্তার লাভ করিতেছে। কাশীতে ডাক্তার সরকার মহোদয়ের নির্দ্দেশিত ইগ্‌নেসিয়া বীন (Ignatia Bean) ও ইগ্‌নেসিয়া (Ignatia) দ্বারা প্লেগের চিকিৎসা করিয়া; আমি যেরূপ চমৎকার ফল পাইয়াছি; তাহা প্রকাশ করিলে, এই প্লেগ পুরিত দেশে এ সময় সাধারণের অনেক উপকার আশা করা যায়।

প্রতিষেধক।

ইগ্‌নেসিয়া বীন দুইটা বা দুই টুকরা লইয়া, প্রত্যেকটার মাঝখানে ছিদ্র করিয়া, তাহাতে সূতা পরাইয়া, এক একটী বাম ও দক্ষিণ বাহুতে ধারণ করা; এবং ইগ্‌নেসিয়া ৩X (Ignatia 3X) অবস্থা বিশেষে, রোজ একবার, কিম্বা ২য় ৩য় ৪র্থ দিনে একবার করিয়া সেবন করা।

চিকিৎসা।

ইগ্‌নেসিয়া বীন পূর্ব্বোক্তরূপে ধারণ করা ও ইগ্‌নেসিয়া ৩X (Ignatia-3X) প্রতিষেধক-স্বরূপ সেবন করা সত্বেও যেখানে দেখিয়াছি একটু আধটু গ্রন্থি ফুলিয়াছে, কিন্তু জর নাই (এইরূপ প্রায়ই যেখানে সেখানে হইয়া থাকে) সেস্থলে স্নান বন্ধ করিয়া ও ঠাণ্ডা লাগান হইতে বাঁচাইয়া, মিষ্ট বর্জ্জিত লঘু আহার দিয়াছি; ইগ্‌নেসিয়া বীন পরিষ্কার শীলে চন্দনের মত করিয়া ঘসিয়া গ্রন্থি ফুলা-স্থলে উহার প্রলেপ দিয়াছি; ও ইগ্‌নেসিয়া ৩X (Ignatia 3X) দিনে তিন

চারি বার সেবন করাইয়াছি; ইহাতে ঐ গ্রন্থি ফুলা মাত্রমন্ত্রের মত আরোগ্য হইয়াছে।

প্লেগ এপিডেমিকের সময় শরীর ভার, খাইতে অনিচ্ছা অথবা ক্ষুধা না থাকা, দুর্ব্বলতা, অবসন্নতা, গা হাত পায়ে ব্যথা, অথবা গা আড়ামুড়ী ভাঙ্গা, মাথাঘোরা, কানে ব্যথা, গলার কাছে ব্যথা, বগল ও কুঁচকীতে ব্যথা, ও জ্বর;—এই জ্বর সামান্যই হউক বা প্রবলই হউক, এ সকলকে বিশ্বাস নাই। কারণ অনেক স্থলে দেখা গিয়াছে, যে কেহ ঐ সকল অবস্থায় অবহেলা ও ঔদাস্য করিয়াছে, সেই শেষে প্রমাদ ঘটাইয়াছে। আমি ঐ অবস্থায়, স্নান আহার বন্ধ করিয়া দিয়া আবশ্যক মত গরম জল ও কিঞ্চিৎ লবণ সহ জলসাগু, অন্নমণ্ড, যবের মণ্ড, মসুরের যুস, রোগীর রুচি বুঝিয়া ব্যবস্থা দিয়াছি, এবং ইগ্‌নেসিয়া বীন পূর্ব্বের মত ধারণ করাইয়া একোনাইট্‌ ৩X (Aconite 3X] ও ইগ্‌নেসিয়া ৩X (Ignatia 3X) পর্য্যায়ক্রমে অবস্থা বিশেষে ১, ২, ৩, ঘণ্টা অন্তর খাওয়াইয়া হাতে হাতে ফল পাইয়াছি।

আবার যেখানে দেখিয়াছি জর প্রবল ও সেই সঙ্গে সঙ্গে গ্রন্থিফুলা, পিপাসা, ছটফট ও প্রলাপ আছে; সেখানে গরম জল ঠাণ্ডা করিয়া ও আবশ্যক মত পূর্ব্ববৎ লঘুপথ্য ব্যবস্থা দিয়া, (এখানে ইহাতে প্রকাশ থাকে যে গ্রন্থি ফুলার পথ্যের সঙ্গে কিম্বা কেবল জর সময়েও কখনও চিনি, মিছরী, কি মিষ্ট কিছু দিতে নাই) ইগ্‌নেসিয়া বীন পূর্ব্বের মতধারণ করাইয়া ও গ্রন্থি ফুলাস্থানে বীনের প্রলেপ লাগাইয়া দিয়াছি; এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে খালি ইগ্‌নেসিয়া ২X (Ignatia 2X) অবস্থা অনুসারে অর্দ্ধ, এক বা দুই ঘণ্টা অন্তর সেবন করাইয়াছি। এইরূপে এক ইগ্‌নেসিয়াতেই যথেষ্ট ফল পাইয়াছি। আবার দুই এক স্থলে ইহার সঙ্গে অন্তর্ব্বর্ত্তী ঔষধস্বরূপ (Intercurrent Remedy) একোনাইট ৩X (Aconite 3X) দুই এক স্থলে দিয়াও যথেষ্ট ফল পাইয়াছি।

এইরূপ অভিজ্ঞতার দ্বারা যতদূর বুঝিয়াছি, তাহাতে আমার দৃঢ় বিশ্বাস, যে পূর্ব্ব হইতে সাবধানতার সহিত উক্তরূপে ঔষধ প্রয়োগ করিলে, প্রায় রোগীই মারাত্মক পরিণামের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িবে না। প্রায় সকলেই আরোগ্য লাভ করিবে। ইহা অপেক্ষা জটিল অবস্থা প্রকাশ পাইলে ডাক্তার দেখান উচিত।

নিরাশ প্রণয়।

লেখক,—শ্রীনারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

(১)

পরীক্ষা সাগর উত্তীর্ণ হওয়ার পর চাকরির জন্য দরখাস্ত পেশ করিয়া যখন আমি অধৈর্য্য ভাবে দীর্ঘদিন গুলাকে গণনা করিতে করিতে তাহার উত্তরের প্রতীক্ষা করিতেছিলাম, তখন সহসা একদিন নিদাঘার্ত্ত চাতকের সম্মুখে নবীন জলদোদয়বৎ একখানা সরকারী চিঠি আসিয়া আমার হাতে পড়িল। চিঠি খানা দেখিয়াই আনন্দে আমার হৃদয়টা ফুলিয়া উঠিল। তখন যথা সম্ভব ধৈর্য্য সহকারে চিঠি-খানা খুলিয়া ব্যগ্র দৃষ্টিতে তাহা পাঠ করিলাম, দেখিলাম, আমার প্রার্থনা মঞ্জুর হইয়াছে। আমি সাঁওতাল পরগণার মহকুমায় যাইয়া কার্য্য ভার গ্রহণের জন্য আদিষ্ট হইয়াছি। আমি যেন একবারে মর্ত্ত্য রাজ্য ছাড়িয়া কোন্ অত্যুচ্চ স্বর্গ রাজ্যে উপস্থিত হইলাম। বাটীর সকলেরও আনন্দের সীমা রহিল না। আমার স্ত্রী ললিতা তো হাসিয়াই অস্থির।

কথাটা ক্রমে রাষ্ট্র হইয়া পড়িল। তখন গ্রামের বাল বৃদ্ধ যুবা নারী সকলেই আগ্রহ সহকারে আমাকে দেখিতে আসিল। কারণ আমিই প্রথম এ গ্রামে এই উচ্চ সম্মানিত পদ অধিকার করিলাম। আমার পূর্ব্বে একব্যক্তি মাত্র এফ, এ, পাশ করিয়া এক মাইনর স্কুলের হেড-মাষ্টার হইয়াছিল।

কয়েক দিন পরে এক শুভদিন দেখিয়া আমি ললিতার সহ কার্য্যস্থলে যাত্রা করিলাম। যাইবার সময় পিতা বিশেষ করিয়া বলিয়া দিলেন, বিনোদ! খুব সাবধানে থাকিবে, চোয়াড়ের দেশ। তাঁহার কথা শুনিয়া আমি একটু গর্ব্ব মিশ্রিত হাসি হাসিলাম মাত্র।

(২)

কার্য্যে নিযুক্ত হইবার পর ছয় মাস কাটিয়া গিয়াছে। বাসের জন্য আমি যে বাঙ্গালা পাইয়াছি, তাহা আফিস হইতে কিঞ্চিৎ দূরে। বাঙ্গলাটি ক্ষুদ্র হইলেও বেশ পরিষ্কার। স্থানটিও মনোরম। বাঙ্গলার চারি পার্শ্বে সুবিন্যাস্ত ঘন বৃক্ষশ্রেণী, তাহার পর কঙ্করময় প্রান্তর; প্রান্তরের এক পার্শ্বে বিস্তৃত শালবন, অপর পার্শ্বে কঙ্করময় ক্ষুদ্র বৃহৎ পাহাড় শ্রেণী। স্থানটী অন্যের দৃষ্টিতে নীরস হইলেও আমার নিকট মনোহর ও আরামদায়ক হইল। বাল্যকাল

হইতেই আমি কবিত্বপ্রিয় ছিলাম; সুতরাং অন্যের দৃষ্টিতে যাহা নীরস, আমার দৃষ্টিতে তাহা সরস। কিন্তু কবিত্ব রস বোধ বর্জ্জিতা বাঙ্গালার স্নিগ্ধ শ্যামল অঙ্কে লোকালয় মধ্যে চির পালিতা ললিতা এই নির্জ্জন স্থানে বাস করিতে প্রথম প্রথম বড়ই ভীতা হইল, কিন্তু উপায়ান্তরাভাবে ক্রমে এই নির্জ্জন বাসেই তাহাকে অভ্যস্ত হইতে হইল।

এখানে আসিয়া আমি একজন পাচক নিযুক্ত করিতে চাহিলাম, কিন্তু ললিতা তাহাতে সম্মত হইল না। বলিল,—"এই মাঠের মাঝখানে যদি আমাকে সংসারের কাজ কর্ম্মও করিতে না দাও, তাহা হইলে আমি একা চুপ করিয়া এক দণ্ডও এখানে থাকিতে পারিব না।" অগত্যা আমাকে তাহাই স্বীকৃত হইতে হইল। কেবল একজন পরিচারিকা নিযুক্ত করিলাম। তাহাও কেবল আমার অনুপস্থিতিকালে ললিতার একজন সঙ্গিনীর জন্য। সংসারের কাজ কর্ম্ম ললিতাই প্রায় সমস্তই করিত।

পরিচারিকার নাম মনিয়া। মনিয়া উদ্ভিন্ন যৌবনা, তাহার বয়স এই পঞ্চদশ মাত্র। দেহের বর্ণ—উজ্জ্বল কৃষ্ণ, অবয়ব সুগঠিত, সুঠামযুক্ত। তাহার সেই সুপরিণত পরিপুষ্ট দেহের বর্ণ যদি কিঞ্চিৎ গৌরবর্ণ হইত, তবে আমি নিঃসঙ্কোচে তাহাকে বাঙ্গলার সুন্দরীগণের সহিত তুলনা করিতে পারিতাম, কিন্তু তাহা হইলেও ললিতা এক দিনের জন্যও তাহাকে গৃহে স্থান দান করিত না।

মনিয়ার এখনও বিবাহ হয় নাই। শুনিলাম, তাহার বিবাহের সম্বন্ধ হইতেছে। তাহার প্রতিবাসী ঝড়ু নামে এক যুবক বহুদিন হইতেই মনিয়ার প্রণয় প্রার্থী হইয়াছে। এক্ষণে সে একটা মহিষ, তিনটা শূকর ও চারি টাকা নগদ কন্যাপণ দিতে পারিলেই বিবাহ কার্য্য সুসম্পন্ন হয়। ঝড়ু পণসংগ্রহের চেষ্টায় আছে, সংগ্রহ করিতে পারিলেই বিবাহ হইবে।

তা' মনিয়া পঞ্চদশ বর্ষীয়া হইলেও সে এখনও যেন বালিকা, সংসারের লজ্জা, সঙ্কোচ প্রভৃতি কিছুই তাহার সরল হৃদয় অধিকার করিতে পারে নাই। ললিতা কৌতুক করিবার জন্য আমার সাক্ষাতেই তাহাকে তাহার বরের রূপ গুণ বয়স প্রভৃতির কথা জিজ্ঞাসা করিত! মনিয়া হাসিতে হাসিতে নিঃসঙ্কোচে সমস্ত ব্যক্ত করিত! যেন তাহার মধ্যে গোপন করিবার কোন কথাই নাই, লজ্জার কোন কারণই নাই! এই সংসার জ্ঞানাবিরহিতা মরু প্রদেশ পালিতা মনিয়ার সরল হৃদয় খানি দেখিয়া আমি বড়ই তৃপ্তি অনুভব করিতাম। একদিন ললিতা মনিয়াকে জিজ্ঞাসা করিল,—'তুই তোর বরকে ভালবাসিস?

মনিয়া বলিল,—"আমি ভালবাসি না; কিন্তু সে আমাকে বড় ভালবাসে।"

ললিতা বলিল,—"তুই তাহাকে কেন ভাল বাসিস না ?

মনিয়া বলিল,—"সে বড় রাগী।"

ল।—তবে তাহাকে বিবাহ কর্‌বি কেন ?

ম।—মা বলেছে।

ল।—তুই যখন ভাল বাসিস না, মা বল্লেও তারে বিবাহ করিস না।"

আমি বলিলাম,—"ছিঃ ললি !"

ললিতা হাস্যপূর্ণ কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া বলিল,—"তোমার গায়ে বাজলো কেন ? পুরুষ এমনই বটে।"

আমি বলিলাম,—"এখানে দোষটা কার ?"

ললিতা বলিল,—"দোষ বরের। ও যখন ভালবাসে না, তখন সে ওর মাকে ঘুষ দিয়ে বিবাহ করতে চায় কেন ?"

মনিয়া একটু হাসিয়া বলিল,—"আমি তাকে একটু একটু ভালবাসি।"

ললিতা বলিল,—"দূর পোড়ারমুখী।"

মনিয়া সর্ব্বদা আমাদের বাড়ীতে থাকিত না। সকালে আসিত, তাহার পর আমি আফিস হইতে ফিরিলেই চলিয়া যাইত। রবিবারে কোন দিন আসিত, কোন দিন আসিত না। আমাদের বাঙ্গলা হইতে প্রায় আধ মাইল দূরে একটা ছোট পাহাড়ের গায়ে তাহাদের কুটীর। কুটীরে তাহার মা এবং একটী ছোট ভাই, ব্যতীত আর কেহ ছিল না, মনিয়ার বেতনই তাহাদের জীবিকা ছিল।

(৩)

সেদিন রবিবার। অপরাহ্ণ কালে আমি অশ্বারোহণে বেড়াইতে বাহির হইয়াছিলাম। তখনও সন্ধ্যা হইতে বিলম্ব আছে। দূরে একটা বড় পাহাড়ের উচ্চ শৃঙ্গের পাশ হইতে রক্তিম শৌরকর আসিয়া শালবনের উপর পড়িয়াছিল, শাল ফুলের স্নিগ্ধ সৌরভে প্রান্তরটা আমোদিত হইতেছিল। রাখালেরা মধুর, বংশী ধ্বনিতে দিগন্ত কাঁপাইয়া মহিষ দল লইয়া পল্লী অভিমুখে যাইতেছিল, দুই একজন সাঁওতাল রমণী কাষ্ঠভার মস্তকে লইয়া আপন মনে সন্ধ্যা সঙ্গীত গাহিতে গাহিতে মন্থর গমনে পাহাড়ের উপর হইতে নামিতে ছিল। দূর হইতে তাহাদের সেই সঙ্গীত ধ্বনি অপ্সরা কণ্ঠের মধুর প্রতিধ্বনির ন্যায়

শ্রুত হইতেছিল। এই সকল দৃশ্য দেখিতে দেখিতে আমি মুগ্ধ হৃদয়ে একটী পাহাড়ের পাদদেশে উপস্থিত হইলাম।

সেখানে বন্যলতাচ্ছাদিত কয়েক খানি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুটীর। ক্ষুদ্র হইলেও কুটীর গুলি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। তথায় কতকগুলি সাঁওতাল নরনারী আপন আপন কার্য্যে ব্যস্ত। কিন্তু সহসা সেস্থানে আমার আবির্ভাব দর্শনে সকলেই সভয়ে কুটীর মধ্যে প্রবেশ করিল। কেবল কতকগুলি বালক বালিকা কুটীর দ্বার হইতে আগ্রহ পূর্ণ দৃষ্টিতে অশ্বপৃষ্ঠস্থিত আমার গম্ভীর মূর্ত্তির দিকে চাহিয়া রহিল। সেই ক্ষুদ্র পল্লীর সরল শান্ত চরিত্র দর্শন করিতে করিতে আমি আরও অগ্রসর হইলাম।

ক্রমে আমি একটী নির্জ্জন স্থানে উপস্থিত হইলাম। একটা ক্ষুদ্র পাহাড় ঘুরিয়াই দেখিতে পাইলাম, অদূরে এক মাহুয়া বৃক্ষতলে এক রমণী ও এক পুরুষ দণ্ডায়মান। আমি ধীরে ধীরে সেই দিকে অশ্ব চালনা করিলাম। আমাকে দেখিয়া তাহারা কেহই পলাইল না দেখিয়া, একটু বিস্মিত হইলাম। আরও নিকটস্থ হইতেই চিনিলাম, সে রমণী মনিয়া। তাহার সম্মুখে এক পরিণতকায় বলিষ্ঠ যুবক একখানি ক্ষুদ্র যষ্টির অগ্রভাগে স্বীয় চিবুক সংস্থাপন করিয়া নত বদনে দণ্ডায়মান। আমি নিকটস্থ হইলেই মনিয়া একটু অগ্রসর হইয়া সহাস্যে বলিল,—"বাবু, এই আমার বর।"

যুবক চমকিত হইয়া মুখ তুলিল, তারপর একবার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে চাহিয়া, সসম্ভ্রমে আমাকে অভিবাদন করিল। আমি চিনিলাম, ইহারই নাম ঝড়ু। এ দিকে সন্ধ্যা সমাগত দেখিয়া আমি অশ্ব ফিরাইলাম। কিয়দ্দূর আসিয়া একবার পশ্চাৎ ফিরিয়া চাহিলাম। দেখিলাম, মনিয়া ও ঝড়ু পরস্পর হস্ত ধারণ করিয়া ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছে। ঝড়ু বাম হস্তে বাঁশীটা লইয়া একটা সুর ধরিয়াছে। আমার বোধ হইল বাঁশীটা যেন কাঁপিয়া কাঁপিয়া গাহিতেছে; "পরাণ ঢালিনু চরণে তোহারি তব তুঁহু ফিরি না চাহিলা।" শান্ত প্রকৃতিকে কম্পিত করিয়া সুরটা যেন পাহাড়ের গায়ে আছাড়িয়া পড়িতেছে।

(৪)

ইহার পর আরও দুই তিন মাস কাটিয়া গেল। মনিয়ার এখনও বিবাহ হয় নাই। তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলে সে কোন উত্তর করিত না। কেবল নীরবে আমার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিত। আমি মনে করিতাম, হয়তো এখন তাহার বিবাহের কথা বলিতে লজ্জা হয়। কিন্তু হায়, তখন আমি বুঝিতে পারি নাই যে, তাহার হৃদয়ে কি ভীষণ কাল সর্প প্রবেশ করিয়াছে।

কিছু দিন হইতে মনিয়ার একটা ঝোঁক হইয়াছে, সে প্রত্যহ কোথা হইতে রাশি রাশি বন ফুল আনিয়া উপস্থিত করে। একটু অবসর পাইলেই কতকগুলা বা মালা গাঁথে, কতকগুলা আমার শয়ন গৃহে টেবিলের উপর রাখিয়া দেয়।

ললিতা কখনও কখনও এজন্য বিরক্ত হয়, তাহাকে তিরস্কার করে, কিন্তু মনিয়া কিছুতেই ছাড়ে না! সে বলে, বাবু যে ফুল ভাল বাসে। ললিতা অধিক তিরস্কার করিলে বা ফুল আনিতে নিষেধ করিলে সে কাঁদিয়া ভাসাইয়া দেয়। কাজেই ললিতা আর তাহার কার্য্যে, প্রতিবাদ করিতে পারে না।

একদিন সন্ধ্যার পূর্ব্বে আমি বাঙ্গলার পশ্চাতে একটা পলাশ গাছের তলায় বসিয়া পাহাড়ের গায়ে সূর্য্যাস্তের শোভা দেখিতে ছিলাম। উচু পাহাড়ের একটী বড় শৃঙ্গের মাথার উপর হইতে রক্তিম সূর্য্য একখানি সোণার থালার মত ধীরে ধীরে নামিয়া যাইতেছিল, লাল মেঘ গুলা পাহাড়ের চারি পাশে সারি দিয়া ঘুরিতেছিল। মেঘের উপর চিত্রিত গৈরিক পাহাড়, পাহাড়ের একটা শৃঙ্গে একটি গাছের নীচে যে একজন মানুষ দাঁড়াইয়া আছে, অদূরে একটী হরিণ শৃঙ্গ হইতে শৃঙ্গান্তরে লাফাইয়া যাইতেছে; দূরে একটা সিংহ বসিয়া তাহাকে লক্ষ্য করিতেছে পাহাড়ের গাত্র বহিয়া স্বর্ণ সলিলা নির্ঝরিনী ছুটিয়াছে। কোন মেঘে একটা কাল চিত্রিত হইয়াছে বৃহৎ অরণ্য, উঁচু উঁচু গাছ, গাছের শাখায় শাখায় পাতায় জড়াজড়ি, কোন মেঘটা বা একটা সুবৃহৎ সৌধের আকৃতি ধারণ করিয়াছে: কোনটার বিস্তৃত প্রান্তরে অসংখ্য মেষ মহিষাদি পশুদল বিচরণ করিতেছে। আমি বিহ্বল ভাবে বসিয়া বসিয়া প্রকৃতির স্বহস্ত নির্ম্মিত এই মনোহর চিত্র দর্শন করিতেছিলাম, দেখিতে দেখিতে আত্মহারা হইতে ছিলাম।

সহসা পশ্চাতে কাহার সতর্ক নিশ্বাসের ক্ষীণ শব্দ আমার কর্ণে প্রবেশ করিল আমি চমকিত হইয়া ফিরিয়া চাহিলাম। দেখিলাম নিকটেই একটী বৃক্ষান্তরালে মনিয়া দাঁড়াইয়া আছে। আমাকে চাহিতে দেখিয়া সে যেন আত্ম গোপনের চেষ্টা করিতেছে। আমি উঠিয়া তাহার নিকটে গেলাম। আমাকে দেখিয়া মনিয়া যেন একটু জড় সড় হইয়া পড়িল। আমি বলিলাম,—"মনিয়া! আজি এখনও বাড়ী যাও নাই?"

মনিয়া একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল,—"এই যাই।"

আমি বলিলাম,—"সন্ধ্যা হইয়া আসিল, একা যাইতে পারিবে?"

মনিয়া বলিল,—"হুঁ, আমি রোজই এমন সময় একা যাই।"

আমি বলিলাম,—"এমন সময় যাও কেন? অনেক আগেতো তুমি ছুটী পাও?"

মনিয়া উত্তর দিতে গেল, কিন্তু থত মত খাইয়া কিছু বলিতে পারিল না। তারপর সে দ্রুত পদে প্রান্তরের পথে নামিল। সে অদৃশ্য হইলে আমিও ফিরিয়া বাঙ্গলায় প্রবেশ করিলাম। তখন সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে।

সেই দিন রাত্রে ললিতা আমাকে বলিল,—"মনিয়া মরিয়াছে।"

আমি সবিস্ময়ে বলিলাম,—"সে কি রকম?"

ললিতা একটু হাসিয়া বলিল,—"সে তোমায় ভাল বাসিয়াছে।"

আমি হাসিতে হাসিতে বলিলাম,—"তবে তো এখন হইতেই তোমার বিশেষ সাবধান হওয়া আবশ্যক!"

ললিতা বলিল,—"আমার সে ভয় নাই, তবে মনিয়ার জন্য বড় ভয় হয়।"

আমি বলিলাম,—"তুমি কি পাগল?"

ল। পরিহাস নয়, সত্যই সে তোমায় ভালবাসে।

আমি। কেন, সে প্রত্যহ আমার জন্য ফুল আনে বলিয়া না কি?

ল। কেবল তাই নয়।

আমি। তবে আর কি?

ল—সে এখন আর ছুটি পাইলেই বাড়ী যায় না।

আ। কোথায় যায়?

ল। তুমি বাহিরে বসিয়া থাক, সে দূর হইতে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া তোমায় দেখে। তারপর তুমি উঠিয়া আসিলে সে বাড়ী যায়।

আমি চমকিয়া উঠিলাম, কিন্তু মনের ভাব গোপন করিয়া বলিলাম, অসম্ভব।"

ললিতা আর কিছু বলিল না।

(৫)

ইহার কয়েক দিন পরে একদিন প্রাতঃকালে আমি বাঙ্গলার সম্মুখে দাঁড়াইয়া ছিলাম। সেই খানে আমি কয়েক ঝাড় গোলাপ পুঁতিয়াছিলাম। মনিয়া তাহাতে জল দিতেছিল নিকটেই একটা গাছে আমার ঘোড়াটাকে বাঁধিয়া সহিস তাহার গাত্র মর্দ্দন করিতেছিল। এমন সময় সহসা একটী তীর আমার কানের পাশ দিয়া সন্ সন্ শব্দে চলিয়া গেল। 'মনিয়া 'বাবু' বলিয়া চীৎকার করিয়াই এক লাফে আমার সম্মুখে দাঁড়াইল। মুহূর্ত্তে সন্ সন্ শব্দে আবার একটী তীর আসিয়া তাহার বক্ষস্থলে বিদ্ধ হইল, মনিয়া চীৎকার করিয়া আমার পদতলে লুটাইয়া পড়িল। একটা ভয়ানক গোল পড়িয়া গেল। আমার সহিস ও আরদালী ছুটিয়া আসিল!

আমি প্রথমে এতদূর বিস্মিত হইয়াছিলাম যে, এক্ষণে কি কর্ত্তব্য তাহা আমার মনেই ছিল না। তারপর মনিয়ার আহত দেহ পদতলে লুণ্ঠিত দেখিয়া আমার যেন চৈতন্য হইল। আমি এক হাতে তাহাকে ধরিয়া অপর হস্তে তাহার বক্ষ বিদ্ধ তীর টানিয়া বাহির করিলাম। তীরের সঙ্গে সঙ্গে হু হু শব্দে রক্ত ছুটিল! আমি ব্যস্তভাবে তৎক্ষণাৎ ডাক্তার সাহেবকে সংবাদ দিবার জন্য আরদালীকে আদেশ দিলাম। আরদালী ছুটিয়া চলিল। তখন উপস্থিত রক্তাস্রাব নিবারণ জন্য সহিসকে বাটীর ভিতর হইতে জল ও বস্ত্র আনিতে আদেশ করিলাম। মনিয়া কাতর ভাবে আমার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল,—"বাবু আমি আর বাঁচবো না, আমি বলিলাম,—"ভয় কি, এখনই ডাক্তার আসবে।"

মনিয়া ক্ষীণকণ্ঠে বলিল,—"ততক্ষণ আমি বাঁচবো না।"

আমি বলিলাম,—"কেন মনিয়া! আঘাত তো তত গুরুতর নয়?"

মনিয়া বলিল,—"তীরে বিষ মাখান আছে।"

যন্ত্রণায় মনিয়া অস্থির হইয়া পড়িল। আমি অশ্রু রুদ্ধ কণ্ঠে বলিলাম,—"কে তোমাকে এমন তীর মারিল মনিয়া?"

জড়িত স্বরে মনিয়া বলিল,—"আমাকে নয়, তোমাকে মারিবার জন্য তীর ছুড়ে ছিল।"

আমি কাঁপিয়া উঠিলাম। মনিয়া বলিল,—"বাবু! বড় যন্ত্রণা!"

আমি কম্পিত কণ্ঠে বলিলাম,—"কেন মনিয়া, আমার জন্য তুমি প্রাণ দিলে?

মনিয়ার আর তখন কথা কহিবার শক্তি ছিল না। সে কেবল একবার ক্ষীণ দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে চ হিল, তাহার নেত্র প্রান্তে দুই বিন্দু অশ্রু গড়াইয়া পড়িল। দেখিতে দেখিতে মনিয়া চক্ষু মুদ্রিত করিল।

এই সময় ডাক্তার আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার সঙ্গে তিন চারি জন কনষ্টেবল আসিল। ডাক্তার মনিয়ার নাড়ী পরীক্ষা করিয়া বলিলেন,—"শেষ হইয়া গিয়াছে।"

আমি তখন কনষ্টেবল দিগকে আততায়ীর অনুসন্ধানের জন্য আদেশ দিলাম। সেই মুহূর্ত্তে অদূরস্থিত বৃক্ষ হইতে একব্যক্তি লাফাইয়া পড়িয়া সেইখানে আসিয়া দাঁড়াইল তাহাকে দেখিয়াই আমি চিনিতে পারিলাম। সে ঝড়ু!

ঝড়ু একবার ভূপাতিত মনিয়ার দিকে চাহিল, তার পর কঠোর দৃষ্টিতে আমার দিকে চাহিয়া বলিল,—"আজ তুই বড় বেঁচে গেলি!"

আমি বলিলাম,—"তুমিই কি তীর ছুড়িয়াছিলে?"

ঝড়ু অকম্পিত কণ্ঠে বলিল,—"হাঁ।"

আমি। কেন?

ঝ। তোকে মারবার জন্য।

আ। কেন আমি তোমার কি করিয়াছি?

ঝ। মনিয়া তোকে ভালবাসত।

আ। কে বলিল?

ঝ। কাল মনিয়া নিজে বলিয়াছে, এই জন্যই সে আমাকে বিবাহ করিতে চায় না।

আমি তখন তাহাকে ধরিবার জন্য কনষ্টেবল দিগকে আদেশ দিলাম। কিন্তু তাহাকে ধরিবার পূর্ব্বেই সে কটিস্থিত একখানা ছোরা বাহির করিয়া আপনার গলদেশে আমূল বিদ্ধ করিয়া দিল। তৎক্ষণাৎ তাহার রক্তাক্ত দেহ মনিয়ার শবদেহের উপর লুটাইয়া পড়িল। মুহূর্ত্তে মনিয়ার বুকে মাথা রাখিয়া ঝড় ও চিরদিনের জন্য চক্ষু মুদিল। আমি একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলাম, "হায় কাল ভালবাসা!"

তাহার পর কত দিন কত বৎসর চলিয়া গিয়াছে! কিন্তু আমি এখনও এই দূর বঙ্গদেশে বসিয়া যেন মাঝে মাঝে মনিয়ার সেই শেষ দৃষ্টিটি দেখিতে পাই, এখনও ঘুমের ঘোরে মাঝে মাঝে যেন শুনিতে পাই, বাবু! বড় যন্ত্রণা!"

JANMI BHUME, REGISTERED No. C. 284.

১৪শ বর্ষ।] ১৩১৩ সাল। বৈশাখ। [১০ম সংখ্যা।

হিন্দুধর্ম্ম ও সমাজের মুখপত্র।

জন্মভূমি

(সচিত্র মাসিক-পত্রিকা ও সমালোচনী)।

	বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
১।	ভারতীয় শিল্প	শ্রীযুক্ত তারকনাথ মুখোপাধ্যায়	৩৬৯
২।	মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গের জন্ম	শ্রীযুক্ত ধর্ম্মানন্দ মহাভারতী	৩৭০
৩।	পরম কল্যাণ গীতা	শ্রীমদ্ শিবনারায়ণ স্বামী	৩৭১
৪।	অভিমান	শ্রীযুক্ত শচীশ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	৩৭৩
৫।	বসন্ত পীড়ার মুষ্টিযোগ	কবিরাজ শ্রীমহেশ চন্দ্র কবিরত্ন	৩৭৯
৬।	নিয়তি	শ্রীসতীশচন্দ্র দত্ত	৩৮০
৭।	মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন	... ...	৩৮১
৮।	হায় দাদা	শ্রীমতীহেমনলিনী দাসী ...	৩৮৪
৯।	পঞ্চ তত্ত্ব মতে চিকিৎসা,	ডাক্তার শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র সেন এম, ডি,	৩৮৬
১০।	গীত	... ...	৩৮৭
১১।	সমালোচনা	পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি	৩৮৮

লেখকগণের মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন।

জন্মভূমি-কার্য্যালয়।

শ্রীনরেন্দ্রনাথ দত্ত দ্বারা প্রকাশিত।

৩৯ নং মাণিক বসুর ঘাট ষ্ট্রীট,

কলিকাতা।

বার্ষিক মূল্য ডাঃ মাঃ সমেত ১৷৷০ দেড় টাকা। — প্রতি সংখ্যার নগদ মূল্য ৶১০ পয়সা।

শ্রী লশ্রীমন্মহারাজাধিরাজ কাশ্মীরাধিপতি তথা শ্রীল শ্রীযুক্ত মহারাজাধিরাজ
বর্দ্ধমান-প্রদেশাধিপতি বাহাদুরের অনুমোদিত ও অনুজ্ঞাত সুপ্রসিদ্ধ
কবিরাজ শ্রীযুক্ত বিনোদলাল সেন মহাশয়ের

আদি-আয়ুর্ব্বেদ ঔষধালয়।

১১৬ নং লোয়ার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।

কুন্তলবৃষ্য তৈল জগতে অমূল্য ও অতুলনীয়—মস্তিষ্ক স্নিগ্ধকর ও স্মৃতিশক্তি বর্দ্ধক—কেশকলাপের কান্তিপ্রদ—খালিত্য ও পালিত্যনাশে অদ্বিতীয়। কেশের কমনীয়তা কান্তি বৃদ্ধি করিতে, চিত্তের নিত্যপ্রফুল্লতা অটুট রাখিতে কুন্তলবৃষ্যের তুলনা নাই ইহা অনুপম আদি ও অকৃত্রিম্ স্নিগ্ধগুণে কুন্তলবৃষ্যের সমতুল কোন তৈলই এ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই।

বর্ত্তমান ভারতের প্রধান ধর্ম্মসংস্কারক, শান্তি-সুখ-সন্তৃপ্ত-বিলাসভোগ বিমুক্ত আধ্যাত্মিক উৎকর্ষের সমুচ্চ সোপানে সমাসীন—পূজ্যপাদ শ্রীমহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর বলিয়াছেন—যে, কুন্তলবৃষ্য তৈল এতদিন আমাকে রক্ষা করিল, আজ তাহাকে পরিত্যাগ করিতে পারি না।”

কুন্তলবৃষ্য—সাহিত্যসেবিগণের মহোপকারক, কারণ ইহাতে মেধা ও স্মৃতি বৃদ্ধি হয়, চিন্তাশীলতা ও ভাবুকতা নবীভূত ও স্ফুরিত হয়।

এক শিশির মূল্য ১৲ টাকা প্যাকিং ও ডাকমাশুলাদি পাঁচ আনা।

উপহার—কুন্তলবৃষ্যের প্রত্যেক গ্রাহক তৈলের সঙ্গে একখানি করিয়া সুন্দর চিত্র উপহার পাইবেন।

সতর্কীকরণ।—দুষ্ট লোকেরা বড়ই জাল করিতেছে; গ্রাহকগণ সাবধান; আমাদের ঔষধালয় ভিন্ন কোথাও “কুন্তলবৃষ্য” কিনিবেন না, কিনিলেই প্রতারিত হইবেন।

কবিরাজ শ্রীআশুতোষসেন চিকিৎসক।

“জননীজন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী”

(মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী।)

১৪শ বর্ষ।	বৈশাখ, ১৩১৩ সাল।	১০ম সংখ্যা।

ভারতীয় শিল্প, কৃষি ও বাণিজ্যের সংরক্ষণ ও উন্নতি।

লেখক,—শ্রীতারক নাথ মুখোপাধ্যায়

(কলিকাতাস্থ “চৈতন্য লাইব্রেরির” বার্ষিক অধিবেশনে প্রথম পুরস্কার প্রাপ্ত।)

“সর্ব্ব মাত্মবশং সুখং সর্ব্বং পরবশং দুঃখং” জীবন যাত্রায় ভারত বাসীর ইহাই আদর্শ। এমন এক দিন ছিল যখন ভারত আপনার অভাব আপনিই পূর্ণ করিত, তজ্জন্য অপরের মুখাপেক্ষী হইত না। দয়াবান্ ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের অনুগ্রহে শত দিকে শত সুবিধা স্বাধীনতা সত্ত্বেও প্রত্যহ প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির জন্য এই ক্রম বর্দ্ধন শীল-পরপ্রত্যাশী অবস্থাই চিন্তাশীল ভারত বাসীর সর্ব্বাপেক্ষা মর্ম্ম পীড়াদায়ক। এ অবস্থা হইতে মুক্তি লাভের উপায় কি?

ভারতীয় শিল্পের আলোচনা করিতে বসিলে, সর্ব্বাগ্রে বর্ত্তমান জাতীয় চরিত্র, আদর্শ, বা বাসনার কথা মনে উঠে। সমাজের প্রাচীন তম অবস্থায়, যখন সমাজ এতটা সংহত ভাব ধারণ করে নাই, তখন নিজেদের অধিকাংশ অভাব নিজেকেই পূর্ণ করিতে হইত। সামাজিক ভাব পরিপুষ্ট হইবার সঙ্গে সঙ্গে এই আপন ও পর জ্ঞানও ক্রমশঃ প্রসারিত হইতে থাকে। স্ব-সমাজস্থ প্রত্যেক ব্যক্তি তখন নিজ নিজ সংসার যাত্রায় ইহাদের মুখাপেক্ষী হইলে কষ্ট হয় না, অনিষ্টেরও আশঙ্কা থাকে না। কিন্তু,

"অয়ং নিজ পরোবেতি গণনা লঘু চেতসাম্।
উদার চরিতানান্ত বসুধৈব কুটুম্বকম্॥"

কথা সত্য। সমাজ বহু বিস্তৃত হইয়া উঠিলে, ক্রমশঃ সমগ্র মনুষ্য সমাজ, বা, জগৎটাই নিজ জন, এইরূপ জ্ঞানও আসে। একটা দেশী দ্রব্য ক্রয়ে আমার অর্থ নষ্ট মনঃ কষ্ট উভয়ই হইবে। সেই অর্থে—উৎকৃষ্টতর দ্রব্য পাইলে আমি কেন না লইব? রামা মিস্ত্রীও আমার যেমন আপনার, টমাস্ বা গ্রেহামই বা পর কিসে? ক্রেতা আমি, তোমরা দু-জন বিক্রেতা। কাহাকে অনুগ্রহ করিব? যাহার গুণ আছে তাহাকেই জগতে তুমিই বা কে, আমিই বা কে, শুধু গুণেরই আদর হউক। প্রবল দুর্ব্বলের প্রতিযোগিতায় দুর্ব্বলের ধ্বংস প্রাপ্তিই প্রাকৃতিক নিয়ম। প্রকৃতির গতি রোধ করিতে সাধ্য কাহার! পাষাণে মাথা ঠুকিলে, নিজের মাথাই ফাটিয়া যাইবে মাত্র। আর ব্যবস্থাটাও সুব্যবস্থা, কারণ-উহার ফলে জগতের ক্রমোন্নতি। স্বার্থের দিক দিয়া দেখিলেও, যাহার নিকট ক্রয়ে আমার সুবিধা তাহার নিকট না লই কেন?

ওরূপ তর্কের ভিতর কতকটা সত্য আছে, অস্বীকার করা যায় না। অস্বীকার করা যায় না বলিয়াই আজ ভারতীয় শিল্প যাইতে বসিয়াছে। কিন্তু কথাটার আর এক দিকও আছে।

উদার প্রকৃতি আমি, একা, বসুধাকেও কুটুম্ব ভাবিলে কি হইবে, বসুধা যদি আমায় কুটুম্ব না ভাবিয়া পর ভাবে? এই জন্যই সমগ্র জগৎ আমার আদর্শ সম্মুখে নিজ জন হইলেও সাংসারিক জীবনে স্ব-সমাজ আমার আরও নিজ জন। ধনী ও দরিদ্রে কচিৎ সদ্ভাব দৃষ্ট হয়। অবস্থারসাম্য না হইলে প্রকৃত পক্ষে কেহ আপনার হয় না। নিজের সমাবস্থ ব্যক্তি মণ্ডলীই এই জন্য কার্য্যতঃ আমার নিজ জন—সমগ্র জগৎ নহে। যে কথা শুক প্রহ্লাদের মুখে শোভা পায়, তোমার আমার মুখে তাহা তোতা পাখীর বুলি মাত্র। শক্তি অর্জ্জন করিয়া ক্ষমা, বা, ত্যাগ

করিতে শিখিলেই, সব দিকে মানায় ভাল। ভারতীয় শিল্পের উচ্ছেদে জগতের ক্ষতি নাই, কিন্তু ভারতের ক্ষতি। এ ক্ষতিও আমি গণনায় আনিতাম না যদি, জগতের সেই অন্যান্য স্থলের শিল্পজাত আমার করায়ত্ব থাকিত, তাহা লাভার্থ যদি—আমাকে ক্ষতি স্বীকার করিতে না হইত। এই জন্যই টমাস্ গ্রেহাম অপেক্ষা রামা মিস্ত্রীর তৈয়ার জিনিষের আদর রামার সমাজের লোকের নিকট বেশী——অন্ততঃ হওয়া উচিত।

ভারতীয় শিল্পের উন্নতিও সংরক্ষণের আবশ্যকতা প্রতিপাদনে চেষ্টা করিয়া, অতঃপর কি উপায়ে তাহা সিদ্ধ হয়,—যথা শক্তি আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব।

দুই শ্রেণীর শিল্প।—শিল্প প্রধানতঃ দুই শ্রেণীর,—ব্যবহারিক ও সুকুমার। দৈনান্দন জীবনে যে সমস্ত শিল্পের প্রয়োজন হয়, তাহাদিগকে ব্যবহারিক শিল্প বলে। সুকুমার শিল্প প্রধানতঃ বিলাসীর আদরণীয়। বিলাসিতা বৃদ্ধি সহকারে অনেক সুকুমার শিল্পও ক্রমশঃ নিত্য ব্যবহার্য্যবৎ হইয়া দাঁড়ায়, দৃষ্টান্ত, মোজা পাদুকা, পিরাণ প্রভৃতি। ব্যবহারিক শিল্প সমুদয়ে দুই ভাবে উৎকর্ষ সাধন হয়। প্রথমতঃ যে উদ্দেশ্যে ব্যবহারিক শিল্পের উৎপত্তি তদুদ্দেশ্য সাধক গুণগুলির অধিকতর সমাবেশ, দ্বিতীয়তঃ তাহাদের আলঙ্কারিক সৌন্দর্য্য বর্দ্ধন দ্বারা। ভাব প্রকাশ জন্যই ভাষার সৃষ্টি। নূতন ভাব, নূতন তত্ত্ব শিখাইতে পারিলেই এই উদ্দেশ্য প্রধানতঃ সিদ্ধ হইল। কিন্তু ইহা ব্যতীত অলঙ্কারাদি গুণ বিশিষ্ট ভাষার ও একটা আদর আছে। তদ্রূপ ব্যবহারিক শিল্প সমুদয়ের ও দুইভাবে উন্নতি সাধন হয়। মনে কর "দা" বা "কাটারি"। এই নিত্য ব্যবহার্য্য বস্তুটির দুইরূপে উন্নতি করিতে পারি। প্রথমতঃ ইহার উপর সুবর্ণ চিত্রাদি অঙ্কিত করিয়া, ইহার দণ্ডাংশ হাস্তিদন্ত বা বহু মূল্য দ্রব্যে নির্ম্মিত করিয়া ও অন্য নানা রূপে ইহার সৌন্দর্য্য বর্দ্ধন দ্বারা "কাটারি"র উন্নতি সাধন করা যায়। এ সমস্ত সুকুমার শিল্পের অন্তর্ভূত। এতদ্ব্যতীত আর একরূপ উন্নতি আছে। ইহাকে যথা সম্ভব তীক্ষ্ণ ধার করা, সহজে দাঁত পড়িয়া না যায় তদুপায় বিধান করা, সহজে ব্যবহার্য্য করিবার জন্য যথা সম্ভব লঘু করিতে চেষ্টা পাওয়া, সাধারণের কার্য্যে আসিবে, সুতরাং যাহাতে সুলভ মূল্যে বিক্রীত হইতে পারে তাহার উপায় করা, ইত্যাদি নানা দিকে উন্নতি করা যায়। এ সমস্ত ব্যবহারিক শিল্পের অন্তর্গত। আমাদের বিবেচনায় এই ব্যবহারিক শিল্পের উন্নতি চেষ্টাই সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজনীয়। সুকুমার শিল্প না হইলেও দিন চলে, ব্যবহারিক শিল্প তদ্রূপ অগ্রাহ্যের বিষয় নহে। কিন্তু ব্যবহারিক ও সুকুমার শিল্পের একত্র সমাবেশই সর্ব্বাধিক স্পৃহণীয়।

প্রথম প্রয়োজন এতৎ সম্বন্ধে সাধারণের অভিজ্ঞতা বৃদ্ধি

সকলেই স্বীকার করিবেন, কোন বিষয়ে উন্নতি সাধনের পূর্ব্বে তৎসম্বন্ধে জ্ঞান লাভ বাঞ্ছনীয়। তাহা হইলে কিরূপ উন্নতির প্রয়োজন সে উন্নতি সাধন পক্ষে অন্তরায় কি, যদি পূর্ব্বাপেক্ষা অবনতি ঘটিয়া থাকে, সে অবনতির কারণই বা কি, ইত্যাদি বহু বহু বিষয়ে সহজে দৃষ্টি পড়ে এবং উন্নতি সম্পাদনও সুসাধ্য হয়।

শ্রেষ্ঠ উপায় শিল্প বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা।—তবেই দাঁড়াইল ভারতীয় শিল্পের উন্নতি ইচ্ছা থাকিলে ও তৎসম্বন্ধে জ্ঞান লাভ অগ্রে করিতে হইবে। কিরূপে ইহা করা যায়? আমাদের ত মনে হয় দেশের সর্ব্বত্র শিল্প বিদ্যালয় সমূহের স্থাপনাই উহার প্রকৃষ্ট পথ। এই সমস্ত বিদ্যালয়ে আমাদেরই দেশী কামার, কুমার, তাঁতি, কাঁসারি, ভাস্কর, চিত্রকর, স্থপতি ও অন্যান্য শিল্পিকুল শিক্ষা দিবে। ছাত্রগণের অভিভাবক বর্গ স্মরণ রাখিবেন, উত্তর কালে যে ব্যবসায়ই অবলম্বিত হউক, ব্যবসায় শিক্ষায় কাহারও লজ্জার কারণ নাই। জ্ঞান সর্ব্বকালে আদর পাইবার যোগ্য।

প্রাগুপ্ত প্রকৃতির বিদ্যালয় সমূহ স্থাপিত হইলে, সমাজের আনুষঙ্গিক অন্য উপকারও হইবে। মধ্যবিত্ত গৃহস্থগণ দু একটা বাজে খরচের দায় হইতে অনেক সময় অব্যাহতি পাইবেন। ফুটা, বা, ভাঙ্গা ঘড়া, গাড়ু, বাক্স, দরজা, জানালাদির মেরামত করিতে মিস্ত্রী ডাকিলে, অনেক সময় সামান্য কার্য্যেও তাহাদের পূরা বা আধা রোজ (দৈনিক বেতনের হার) দিতে হয়। এই সমস্ত ক্ষুদ্র বাজে খরচ গৃহস্থ সংসারে প্রায় নিত্য ঘটিয়া থাকে। যদি ঐ সমস্ত অপব্যয়ে বাধা দেওয়া যায় দোষ কি?

শিক্ষনীয়—বিষয় সম্বন্ধে লোকের ধারণা পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। উদ্ভট শ্লোক রচনা বা দর্শন শাস্ত্রের আলোচনাই এখন আর আমাদের চরম লক্ষ্য নহে। দেশ কাল পাত্র বুঝিয়া ব্যবস্থা করিতে হইলে, যাহাতে আমাদের সর্ব্ববিধ অভাব মোচনের শিক্ষা পাওয়া যায়, দেশের শিক্ষাগারগুলির ক্রমশঃ ক্রমশঃ সেই রূপ সংস্কার করা উচিত। ইউরোপের অন্ধ অনুকরণ করিয়া শুধু কিণ্ডার গার্ডেন প্রথার প্রবর্ত্তনে তাদৃশ লাভ নাই। দৃষ্টান্ত স্বরূপ সাহিত্যাদি শিক্ষার অবসরকালে নাড়ীজ্ঞান, পরীক্ষিত মুষ্টিযোগ, অথবা প্রতিবেশী সহবাস করিতে হইলে জমিজমা সংক্রান্ত যে সমুদয় বিবাদের সম্ভাবনা তৎ-সমুদয় সম্বন্ধে একটু জ্ঞানদান মন্দ পরামর্শ কি? এই সমুদয়ের সহিত হিন্দু সন্তান গণের জন্য যদি একটু স্মৃতি (অশৌচ প্রায়শ্চিত্ত, আচার ব্যবহার, নিত্য পূজা এবং দশবিধ সংস্কার সম্বন্ধে) শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা থাকে, তাহা হইলে লেখকের বিবেচনায়

আমাদের উপযোগী সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর বিদ্যা মন্দিরের প্রতিষ্ঠা করা হয়।

আজ কাল একটা অনুযোগ প্রায়ই শুনা যায় চাষা ভূষার ছেলে লেখা পড়া শিখিয়া শেষে বাবু হইয়া বসে ও স্ববৃত্তি ত্যাগ করে। শিক্ষার্থীর রুচি পরিবর্ত্তনই ইহার একমাত্র কারণ নহে, যথা কালে স্ববৃত্তি শিখিবার ব্যবস্থার অভাবও একটা গৌণ কারণ। পিতৃদেব যথা নিয়মে পূজাহ্নিকাদি করিতেছেন কিন্তু ভট্টাচার্য্য নন্দন তখন স্কুলের শিক্ষা সমাপ্ত করিতে ব্যস্ত এসব জন্য সময় ব্যয় করিতে অক্ষম। ফলে দাঁড়াইল এই, একদিন মারী ভয়ের সময় পিতৃদেব বিসূচিকা রোগে সহসা হয়ত ইহলোক হইতে অপসৃত হইলেন। পুত্রের দশা তখন হইল কি? উপযুক্ত পিতার ঔরসে জন্ম গ্রহণ করিয়াও তিনি তখন হয়ত তর্পণ মন্ত্রটাও জানেন না। পিতৃ পুরুষগণের আশীর্ব্বাদের জোর থাকিলে, পুত্র লজ্জা না করিয়া ইহাকে উহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া কোন রূপে পূজা পদ্ধতি প্রভৃতি একটু আধটু শিখিয়া লইবে। কিন্তু ইহাতে কি মানুষ জন্মায় না শিক্ষা অধিক দূর গড়ায়? আর লজ্জাত্যাগ করিয়া ওরূপ শ্রম স্বীকারই বা কয়টা লোকে করিতে পারে। শিক্ষার বয়সই বাল্যকাল। এই সময়টায় শিক্ষা দানের ব্যবস্থা না করিলে, অসময়ে বীজ বপন করিয়া ফল প্রাপ্তি সম্ভাবনার ন্যায়, ষোল আনা সুফল প্রাপ্তির আশা সুদূর পরাহত।

উপরে যে চিত্র অঙ্কিত করা গেল উহা অতি রঞ্জিত কিনা, সমাজগতি লক্ষ্য করিতে যাঁহার শক্তি আছে তিনিই বুঝিবেন। ব্রাহ্মণ সন্তান সম্বন্ধে যাহা বলা হইল চাষা ভুষার ছেলেদের সম্বন্ধেও ঐ একই কথা। স্কুলে যাইতে হয় বলিয়া গৃহে শিক্ষা হয় না এবং স্কুল ও গৃহ উভয়ত্র এ শিক্ষা লাভে বঞ্চিত হইয়া ছাত্র যে উত্তর কালে স্ববৃত্তি গ্রহণে বাধ বোধ করিবে, বা, উহার সম্যক্ পালনে অপটু হইবে ইহা কি এতই অতর্কিত ঘটনা। আমাদের অভাব বুঝিয়া শিক্ষাগার সমূহের সংস্কার করিলে, কেন যে লোকে আজকাল স্ববৃত্তি ছাড়িয়া শ্ববৃত্তি গ্রহণ জন্য এরূপ ব্যগ্র সে রহস্যের পূর্ণ না হউক আংশিক মীমাংসাও হইবে।

বলা বাহুল্য গৃহে শিক্ষা দিবার সুবিধা হয় না বলিয়াই উপযুক্ত শিক্ষকের শরণ লওয়া হয়, সুতরাং অন্য বিদ্যা শিক্ষা সম্বন্ধে যে ব্যবস্থা বিদ্যমান, শিল্প শিক্ষা জন্যও তাহা করা কর্ত্তব্য অর্থাৎ শিল্প শিক্ষা মন্দির প্রতিষ্ঠা প্রয়োজন।

শিল্প বিদ্যালয় যেন প্রতিষ্ঠিত হইল, এবং সেখানে আমাদের দেশীয় কামার কুমার প্রভৃতি শিক্ষকতা করিতে লাগিলেন, কিন্তু এরূপ ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে ছাত্র জুটিবে কি? শিল্পের বর্ত্তমান অবস্থা জ্ঞাত হইয়া দূর ভবিষ্যতে যদি ইহার কিছু উন্নতি করা যায়—শুদ্ধ এই আশায় বুক বাঁধিয়া, য়ুনিভার্সিটির দাসত্ব শৃঙ্খল ছেদনে

বা, পাপের নাগপাশ কাটাইতে লোকের প্রবৃত্তি হইবে ত ? যেরূপ গতিক দেখা যাইতেছে উচ্চ শিক্ষার পথ দরিদ্রের পক্ষে শীঘ্রই রুদ্ধ হইবে। চাকুরি বা, মাষ্টারী করিয়া জীবন ধারণ ক্রমশঃ এরূপ জীবনান্তক ব্যাপার হইতেছে যে, উহা আত্ম-হত্যারই নামান্তর বলা চলে। তথাপি কামার কুমারের বৃত্তি অপেক্ষা এখনও ঐ গুলিতে অধিক অর্থাগম হয়। সুতরাং শিল্পোন্নতি রূপ মরীচিকার অনুরোধে লোকে ঐ গুলি ত্যাগ করিবে না, শিল্প বিদ্যালয় সমূহ প্রতিষ্ঠিত হইলেও ছাত্রাভাবে চলিবে না। শিল্প বাহুল্যে শিল্প দ্রব্যের উন্নতি হইতে পারে যথার্থ কিন্তু যে কয়জন আছে, তাহাদেরই অন্ন জুটেনা, প্রতিযোগিতা বৃদ্ধি করিয়া লাভ কি ! শিল্পীর অর্থাগমের উপায় করিতে পারিলেই শিল্প দ্রব্যের উন্নতি হইবে।

কি উপায়ে অর্থাগম হয় লেখক নিজেই জানেন না, অন্যকে শিখাইবেন কি। কৃতী পুরুষগণের পরামর্শই এ বিষয়ে গ্রহণীয়—তথাপি চিন্তা করিতে বসিলে সকলেই অনেক দৃষ্টান্ত দেখিবেন যাহাতে বিস্মিত না হইয়া থাকা যায় না। একই ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া কেহ বা কোটিপতি কেহ বা নিঃস্বভিখারী। পাটের ব্যব-সায়ে কেহবা ফাঁপিয়া উঠিয়াছেন, আবার কেহবা সর্ব্বস্ব খোয়াইয়া শেষে আত্মহত্যা অবধি করিয়াছেন। লেখক তাঁহার ক্ষুদ্র অভিজ্ঞতা ফলেই বলিতে পারেন, মুচির ছেলে স্ববৃত্তি ত্যাগ না করিয়া পূজা উৎসবাদি করিতে সমর্থ হইয়া স্ব-সমাজে গণনীয় হইয়াছেন; কাল মশলা বেচিয়া বেণের ছেলে জমিদারী কিনিয়াছেন, এরূপ দৃষ্টান্ত তিনি দেখিয়াছেন। দেশের প্রচলিত প্রবাদ মতেও, বৃত্তি হিসাবে বাণিজ্য, কৃষি রাজ সেবা ও ভিক্ষার স্থান পর পর নিম্নে। এখনও না আসিয়া থাকিলেও এদেশে শীঘ্রই এমন দিন আসিতেছে যখন বহুব্যয় সাধ্য দু একটি বৃত্তি ব্যতীত প্রায় সর্ব্ববিধ বৃত্তিরই অর্থকরী শক্তি সমান দাঁড়াইবে। ধনী দরিদ্রের প্রভেদ ঘুচিয়া যাউক ইহাই প্রার্থনীয় হইলেও আমাদের অবস্থার সহিত উক্ত আদর্শের প্রভেদ এই যে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর পুষ্টি না হইয়া দরিদ্র শ্রেণীরই বৃদ্ধি হইতেছে।

শিল্পী কুলের যথেষ্ট অর্থাগমের ব্যবস্থা রূপ শিল্পোন্নতি চিন্তা স্থানান্তরের জন্য রাখিয়া, প্রথমে শিল্প দ্রব্যের উৎকর্ষ বিধান জন্য শিল্প বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা প্রসঙ্গ পরিসমাপ্ত করা যাউক।

আমাদের ও মনে হয়, স্বতন্ত্র শিল্প বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা চেষ্টা ফলবতী হইবে না, তজ্জন্য উদ্যমও সুতরাং আপাততঃ পরিত্যজ্য। শিল্প সম্বন্ধে সাধারণের জ্ঞান লাভই উদ্দেশ্য, যাহাতে তাহা সিদ্ধ হয় তাহা করিলেই হইল। প্রচলিত শিক্ষা মন্দির গুলির একটু সংস্কার সাধন করিলেই আমাদের কার্য্য চলিতে পারে, খেলিবার ছুটির

সময়, স্কুল বন্ধের পর অতিরিক্ত এক ঘণ্টা, শনিবারে বা রবিবারে শিল্প শিক্ষার ব্যবস্থা করা চলে। পূর্ব্বকালে কামার পাড়া, কুমার পাড়া, ধোপা পাড়া, তাঁতি পাড়া, প্রভৃতি আবশ্যকীয় বিভিন্ন পল্লী গুলির সমাবেশে এক এক গ্রাম বা জন-পদের সৃষ্টি হইত। সেই রূপ ব্যবস্থা এখনও যেখানে বিদ্যমান, শিল্প সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ তথায় সেরূপ দুরূহ ব্যাপার হইবে না। কিন্তু নিকটে যেখানে কোন শিল্পী সংসার নাই, তথায় শিল্প বিদ্যালয়ের অনুরোধে নূতন শিল্পী সংসার প্রতিষ্ঠা করা সহজ কাণ্ড নহে। আবার বিদ্যালয় মধ্যে কারখানা গৃহ ও না থাকলে শিক্ষার্থী হাতে কলমে কাজ শিখিবে কি রূপে ? এরূপ করিতে যাওয়াও অল্প ব্যয় সাধ্য নহে। এ সমস্ত আপত্তিই সত্য, কিন্তু ইচ্ছা থাকিলে, যেখানে যেরূপ সুবিধা ব্যবস্থা করিয়া লওয়া যায়—কারণ আমাদের দেশীয় কারখানা গুলি, বহু ব্যয় সাধ্য প্রতিচ্য কল সমূহের ন্যায় একটা বিরাট ব্যাপার নহে ! বিদ্যালয়ে কারখানা স্থাপন নিতান্ত অসম্ভব হইলে, শিল্পী সহ বন্দোবস্ত করিয়া তাহারই কার-খানা গৃহে শিক্ষালাভ ঘটিতে পারে। আমাদের যাবতীয় শিল্পই প্রায় নিতান্ত সামান্য যন্ত্র সহযোগে ও সহজ প্রণালীতে প্রস্তুত হয়, সুতরাং এ সমস্ত শিখিতে অধিক সময় বা অর্থব্যয় হইবে না।

এ উদ্যম হীন দরিদ্র দেশে যে কোন নূতন কার্য্যের সূত্রপাতে নানা আশঙ্কা আসিয়া উপস্থিত হয়। বিদ্যালয়ে শিল্প শিক্ষা দেশের বর্ত্তমান অবস্থা যদিই সম্ভব না হয় কৃষি বিষয়ক নানা রূপ পরীক্ষা নিশ্চতই অসাধ্য নহে। ইহাতেও এদেশের যথেষ্ট লাভ।

কৃষি বিষয়ক পরীক্ষা নানা রূপে চলিতে পারে। নিম্নে একটা নমুনা মাত্র উদ্ধৃত করিলাম যথা :———

(ক) কোন্ কোন্ গাছ কত দিনে সাধারণতঃ ফুল ফল দেয়।

(খ) কি উপায়ে—যথা কালের পূর্ব্বে, অসময়ে বা, বার মাস উহাদের, উৎপাদিকা শক্তি রক্ষা করা যায়। শজিনা খাড়া, লেবু প্রভৃতি দৃষ্টান্ত।

(গ) কি উপায়ে—অধিক ফুল, ফল, বা ফসল পাওয়া যায়।

(ঘ) কিরূপ মৃত্তিকা, জল, সার প্রভৃতি কিরূপ চাসের পক্ষে উপযোগী।

(ঙ) জাপানীদের ধরণে বাগান বা ক্ষুদ্র কায় বৃক্ষ উৎপাদন এবং পুষ্প ফলাদির বর্ণ, আকার প্রভৃতির পরিবর্ত্তন। পদ্ম করবি, বক গাঁদা, বিভিন্ন বর্ণের অপরাজিতা, কৃষ্ণকলি, সূর্য্যমুখী, জবা প্রভৃতি ফুল এবং দু-রকম শশা, ঝিঙ্গে, মূলা, বেগুণ প্রভৃতি দৃষ্টান্ত।

(চ) কলম প্রস্তুত শিক্ষা।

(ছ) গাছ ছাঁটিবার কৌশল। কোন্ সময়ে এবং কিরূপে গাছ ছাঁটায় কিরূপ ফল দেয়।

(জ) আদা হইতে শুঁঠ, কাঁচা হলুদ হইতে শুষ্ক হলুদ, এরারুট প্রস্তুত, আলু, গুলঞ্চ, শঠি প্রভৃতি হইতে পালো বাহির করা, পাট, কদলি, মুগা, আকন্দ প্রভৃতি হইতে তন্তু বাহির করার কৌশল, লটকান, শেফালি, পলাশ প্রভৃতি হইতে বিবিধ বর্ণ প্রাপ্তি ইত্যাদি সম্বন্ধে বহু বহু জ্ঞাতব্য ও শিক্ষণীয় বিষয়ের উল্লেখ করা যায়। অধিক কথা কি কাষ্ঠ জ্বালাইয়া আমরা যে অঙ্গার প্রাপ্ত হই তাহার মধ্যে ও শিখিবার বিষয় আছে। আমেরিকা দেশে এই কাষ্ঠাঙ্গার প্রস্তুতের সময় কৌশলে Methylated Spirit ও প্রস্তুত করিয়া লওয়া হয়।

(ঝ) কোন কোন গাছ কত রূপে আমাদের কাজে লাগাইতে পারি (মূল, ছাল, পত্র, পুষ্প, ফল ও কাণ্ডের ব্যবহার।)

(ঞ) (১) ঔষধার্থ ব্যবহৃত গাছ পালা ও তাহাদের ব্যবহার।

(২) আহারার্থ-(মানুষ ও পশুর) ব্যবহৃত গাছ পালা ও তাহাদের ব্যবহৃত গাছ পালা ও তাহাদের ব্যবহার।

(৩) শিক্ষার্থ-ব্যবহৃত গাছ পালাদির বিবরণ।

(ট) ঐ সমস্ত বিষয়ের বিদিত ও নবাবিষ্কৃত তত্ত্ব সমূহ।

শিক্ষক যদি সাবধানতা সহকারে তাঁহার বাৎসরিক অভিজ্ঞতা টুকু মাত্র লিপিবদ্ধ করেন তাহা হইলেও চাই কি সাধারণে মূল্য দিয়া সেই পুস্তক ক্রয় করিয়া বিদ্যালয়ের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিতে পারে।

বিদ্যালয়ে শিক্ষা দান সুবিধা না হইলে অগত্যা শিল্প বিষয়ক পত্রিকাদির প্রচারেও কতকটা সুফল হইতে পারে। ইংরাজি Work Shop Receipts এর অনুকরণে এই সমস্ত পত্রিকায় যতদূর সম্ভব শিল্প দ্রব্যাদির পরীক্ষিত প্রস্তুত প্রণালী লিখিত হইবে, সঙ্গে সঙ্গে যাহাতে বালকগণ—সেই সমস্ত দ্রব্য নিজেরা প্রস্তুত করিয়া আনন্দ অনুভব করিতে পারে--তজ্জন্য আবশ্যকীয় দ্রব্যাদির খুচরা বিক্রয়ের বন্দোবস্ত করা উচিত। বলা বাহুল্য শিল্প সম্বন্ধীয় জ্ঞাতব্য অন্যান্য তথ্যও ঐ সমস্ত পত্রিকায় স্থান পাইবে, যথা ভারতের কোথায় কোন দ্রব্য সুলভ এবং কোন্ বস্তু দুর্লভ, কি উপায়ে শিল্পোন্নতি-সাধিত হয় তদ্বিষয়ে মনীষিগণের পরামর্শ একই বস্তু বিভিন্ন স্থানে কি ভাবে উৎপন্ন হয়, কোথায় কোন নূতন শিল্প আবিষ্কৃত হইল এতদ্দেশে সেই সমস্ত নূতন শিল্পের প্রচলনের উপায় কি, ইত্যাদি ইত্যাদি।

এরূপ পুস্তকাদির প্রচার সর্ব্বথা বাঞ্ছনীয়। উৎকৃষ্ট প্রবন্ধাদি স্বতন্ত্র মুদ্রিত হইয়া ট্র্যাক্ট আকারে বিতরিত হইলে আরও ভাল হয়।

মেলা, বা, সাময়িক প্রদর্শনী গুলি দ্বারাও দেশীয় শিল্পের বর্ত্তমান অবস্থা পরিজ্ঞাত হওয়া যায়—কিন্তু সেই সমস্ত শিল্প দ্রব্যের প্রস্তুত প্রণালী শিখিবার তেমন সুবিধা হয় না। উৎকৃষ্ট শিল্প দ্রব্যাদির বহুল বিক্রয় ফলে শিল্পীর উৎসাহ লাভ এবং শিল্পোন্নতি সাধন পক্ষে মেলাগুলি প্রধান সহায়। শিক্ষিত ব্যক্তিগণ মনোযোগী হইলে এই মেলা গুলির সাহায্যেই স্থানীয় শিল্পের যথেষ্ট উন্নতি করিতে পারেন, এবং সর্ব্বত্রই যদি স্থানীয় শিল্পের উন্নতি করা যায়, তাহা হইলে সমগ্র দেশেরই শিল্পোন্নতি হইল। কোন্ স্থানে কোন্ উৎকৃষ্ট দ্রব্য প্রস্তুত হয়, অবগত হইয়া সেই স্থান হইতে কারিকর আনাইয়া বা, তথায় কারিকর পাঠাইয়া ইহাঁরা স্ব-গ্রামের শিল্পোন্নতির জন্য চেষ্টা করিতে পারেন। নবাবিষ্কৃত শিল্পাদি সম্বন্ধে ইহাঁরা যেরূপ সংবাদ রাখিবেন, সাধারণের নিকট তাহা প্রত্যাশা করা যায় না। দৃষ্টান্ত স্বরূপ মনে করুন, কাগজে পড়া গেল ভারত হিতৈষী হাভেল সাহেব আমাদিগকে বলিতেছেন, হাতে বুনিবার কাপড়ের কল য়ুরোরোপে এরূপ উৎকৃষ্ট বাহির হইয়াছে যে, তৎ-সাহায্যে কলজাত বস্ত্র সহ প্রতিদ্বন্দীতা সম্ভব পর হইয়াছে। এখন সেই কলের এদেশে প্রচলন তোমার আমার ন্যায় সাধারণ ব্যক্তির পক্ষে সম্ভব পর নয়, যাঁহারা এসব বিষয়ের খবর রাখেন তাঁহাদের! ইয়োরোপের কথা না হয় ছাড়িয়াই দিলাম, কাগজেই পড়া গিয়াছে দেশীয় কোন কৃতী পুরুষ সহজ উপায়ে কলাগাছ হইতে আঁশ বাহির করিতে সমর্থ হইয়াছেন। তিনি তাঁহার উপায়টি শিখান, না, শিখান, প্রদর্শনী প্রভৃতির সাহায্যে ঐ বিষয়টা সাধারণের গোচরে আনাও ত উচিত। এ সমস্ত শিক্ষিত ব্যক্তি বৃন্দেরই কর্ত্তব্য, অশিক্ষিত জন সাধারণের নিকট ওরূপ প্রত্যাশা করা যায় না।

শিল্পোন্নতির জন্য প্রথমে জন সমূহকে এতদ্বিষয়ে শিক্ষিত করার আবশ্যকতা বলিয়া শেষ করা যায় না। পূর্ব্বে যখন বৃত্তি জন্মানুসারে নির্দ্দিষ্ট ছিল, এবং সকলে যথা শক্তি তাহা পালন করিত; তখন এ চেষ্টার তত প্রয়োজন হয় নাই। উক্ত ব্যবস্থা ছিল বলিয়াই ভারতীয় শিল্প এখনও জীবিত। এখন কিন্তু সেই রক্ষা প্রাচীর ভগ্ন হইয়াছে। বন্যার জল হু হু ঢুকিয়া সব ভাসাইয়া লইয়া যাইতেছে। শিল্পোন্নতি সম্পাদন এখন আর শ্রেণী বিশেষের সাধ্যায়ত্ত নহে। আজ যে কামার, কাল সে কেরাণী বাবু পরশ্ব হয়ত কৃষক হইবে। পিতামহ কর্ম্মকার যদি কিছু উন্নতি আবিষ্কার করিয়া থাকেন, পুত্রদেহে সে জ্ঞান প্রচ্ছন্ন এবং প্রপুত্রে রূপে

যখন তিনি জন্ম গ্রহণ করিলেন, তখন তাহা সংস্কার মাত্রে পর্য্যবসিত—কর্ম্মকার বংশে তাঁহার জন্ম এই পর্য্যন্ত। এই রূপে দেশের শিল্পের ক্রমাবনতি এবং পরিশেষে বিলোপ ঘটিতেছে।

আরও দু একটী দৃষ্টান্ত দিয়া আমরা বিষয়ান্তরের অবতারণা করিব। ইউক্যালিপ্‌টাস তৈল নামে একরূপ গন্ধ দ্রব্যের ব্যবহার সাহেব মহলে, সুতরাং অনেক দেশীয় ব্যক্তির মধ্যেও ক্রমশঃ প্রচারিত হইতেছে। বঙ্গবাসীতে প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে (সম্ভবতঃ সুবিজ্ঞ ত্রৈলোক্য বাবু লিখিত) প্রথম অবগত হইলাম উহা বিল্ব জাতীয় একরূপ বৃক্ষ পত্র হইতে প্রাপ্ত। অষ্ট্রেলিয়া দেশে সেই গাছ উৎপন্ন হয়। ইউক্যালিপ্‌টাস্ তৈলের আঘ্রাণ লইলে শুনা যায়—সর্দ্দি, কাশ, জ্বরভাব প্রভৃতি দূর হয়, এবং উহার গন্ধও অপ্রীতিকর নহে। প্রবন্ধটি পড়িলেই স্বতঃই মনে হয়, এদেশের তুলসি পত্র হইতেও কি ঐরূপ গন্ধ তৈল বাহির করা যায় না? রাম তুলসি, বাবুই তুলসি, এবং আরও দু একটী বন্যগাছ নজরে পড়িয়াছে —যাহার পত্রের গন্ধ অপ্রীতিকর নহে। যদি পত্রাদি হইতে তৈল বাহির করিবার প্রক্রিয়া (মনে করুন দেশীয় চন্দন তৈল) অবগত থাকিতাম এ বিষয়ে পরীক্ষা করিয়া হয়ত ফল পাইতাম।

আরও একটা উদাহরণ লউন। Eno's Frwit Salt নামক একটা ঔষধ এদেশে প্রচলনের চেষ্টা হইতেছে। ঐ Salt বা লবণ কথা হইতে একটা ভাব মনে আসিল। কবিরাজি—"নারিকেল লবণ" নামক ঔষধ হইতেও ঐরূপ গুণ পাওয়া যায় না কি? কবিরাজি পুস্তকাদি প্রকাশিত হওয়ার সৌভাগ্য ক্রমে "নারিকেল লবণ" প্রস্তুত প্রণালী অবগত হওয়া গেল এবং নারিকেলের ন্যায় পেঁপিয়া ফলের সহযোগে প্রস্তুত লবণের গুণ কিরূপ জানিতে ইচ্ছা হইল। যদি "নারিকেল লবণ" প্রস্তুতের সামান্য প্রণালী না জানা যাইত, তাহা হইলে এ ইচ্ছা আদৌ উঠিত কিনা সন্দেহ। এই সময় পেঁপিয়া ফল লইয়া পরীক্ষার ইচ্ছাও পরিত্যক্ত হইয়া নূতন কল্পনা মনে জাগিল। "অর্কলবণ" ঔষধটি প্লীহা যকৃত প্রভৃতি রোগে হিতকর। আকন্দ পত্র ও সৈন্ধব লবণ, আবদ্ধ মুখ পাত্রে দগ্ধ করিলেই উহা প্রস্তুত হইল। আকন্দ পত্র না লইয়া উহা হইতে পটাস্ বা ক্ষার বাহির করিয়া লইলে কি উৎকৃষ্টতর ফল দিবে না? ব্রোমাইড অব পটাস্ ঔষধ ডাক্তারি মতে ব্যবহৃত হয়। লেখক এ বিশ্বাস এখনও ত্যাগ করেন নাই—আমাদের আকন্দ তাল জটা, কেতকী প্রভৃতি হইতে সংগৃহীত পটাস্ বা ক্ষার—শুদ্ধ বা সৈন্ধব সংযোগে প্লীহা যকৃত প্রভৃতি রোগে সমধিক ফল দিতে পারে। পটাস্ প্রস্তুত

প্রণালী জ্ঞাত না থাকায় এ বিষয়ে পরীক্ষা করিতে সমর্থ হই নাই। সুধী ত্রৈলক্য বাবু পটাস্ প্রস্তুত সম্বন্ধেও বঙ্গবাসীকে লিখিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু তখন ওরূপ কল্পনা মনে না আসায়, উহার প্রস্তুত প্রণালী মনে করিয়া রাখা হয় নাই। এখন, মনে করুন বহু ব্যক্তি যদি এ সব তত্ত্বে শিক্ষিত হইত, লেখকের ন্যায় তাহাদেরও মনে উক্তরূপ কল্পনা উদয় হইত, এবং দু এক জনের অবসরাভাব ঘটিলে অন্যে পরীক্ষা করিয়া এ বিষয়ে সত্যাসত্য নির্ণয়ে সুবিধা পাইত। দেশ ব্যাপী অজ্ঞতার জন্য কিছুই হইল না।

পরীক্ষা সমিতি বা Seince Associatin।—বিদ্যালয়ে প্রথম শিক্ষা লাভ করিয়া ভবিষ্যদ্বংশীয়গন শিল্পোন্নতি সাধনে সমর্থ হইবে, সে বহু দিনের কথা। আপাততঃ আমাদের করণীয় হইতেছে, দেশের হিতকারী, উদ্যোগী, কৃত বিদ্য ব্যক্তিবর্গ মিলিয়া নব পরীক্ষা সমিতি গঠন করা। জন সাধারণ প্রবুদ্ধ হইয়া যতদিন না দেশের শিল্পোন্নতির জন্য সচেষ্ট হয়—ততদিন সে ভারটা ইহাঁদিগকেই লইতে হইবে। শিল্পোন্নতি জন্য কি কর্ত্তব্য, নানা পরীক্ষা দ্বারা ইহাঁরা প্রথমে অবধারণ করিবেন, এবং দেশের লোককে তদ্বিষয়ে সুপরামর্শ দিবেন। অধিকাংশ স্থলে পরামর্শ দানের প্রয়োজনও হয় না, দেশের লোক আপনিই শিখিয়া লয়। ডাঃ গুপ্ত পেটেন্ট ঔষধ আবিষ্কার করিয়া অর্থশালী হইলেন, অমনই দেশ মধ্যে হু হু করিয়া পেটেন্ট ঔষধ আবিষ্কৃত হইতে লাগিল। জবা-কুসুম ও কেশরঞ্জনের পর কেশ তৈলে আজ কাল বাজার আচ্ছন্ন। কুন্তলীন তৈল ত পূর্ব্বেও ছিল। যিনি মৃত প্রায় শিল্পকে জাগাইয়া তুলিবার কৌশল জানেন তিনিই ধন্য। উল্লিখিত পরীক্ষা সমিতি যদি এমন কোন বিষয় বাহির করিতে পারেন, যাহা অবলম্বন করিয়া সমিতির যথেষ্ট অর্থাগম হইতেছে, তাহা হইলে দেখিবেন দেশের লোক কত শীঘ্র তাহা গ্রহণ করিতে প্রস্তুত। আমাদের সমিতি গুলি অধিকাংশ স্থলেই প্রথমে সিদ্ধ হইয়া পরে গুরুগিরি করিতে বাহির হন না, সেই জন্য ফলও তেমন পাওয়া যায় না। কিন্তু একটা কথা আছে। দু একটি ক্ষুদ্র সমিতির চেষ্টা বা দু এক দিনে শিল্পোন্নতির পথ বাহির হইবে না। সুতরাং দেশ হিতৈষী কৃত বিদ্যগণ আমাদিগকে পথ দেখাইয়া দিউন আমরা তাঁহাদের অনুসরণ করিব এরূপ ভাবিয়া বসিয়া থাকাও জন সাধারণের কর্ত্তব্য নহে। সিদ্ধির পূর্ব্বে সাধনা চাই। আমাদের সকলকেই সেই সাধনায় প্রবৃত্ত হইতে হইবে, তবে যদি মনোরথ সিদ্ধ হয়। লেখক নিজে অসিদ্ধ হইয়াও এই জন্য এ সমস্ত বিষয়ে কথা কহিতে সাহসী হইয়াছেন।

শিল্পোন্নতি সম্বন্ধে চিন্তা করিলে এই কয়টি বিষয়—আগেই আমাদের মনে আসে।

১। নব নব শিল্প ও শ্রমজাত দ্রব্যের আবিষ্কার।

২। শিল্প ও শ্রম জাত দ্রব্যের উৎকর্ষ বিধান।

৩। বিদেশ হইতে ক্রীত শিল্প দ্রব্যাদি এদেশে প্রস্তুত করা।

৪। বিদেশে বিক্রয়োপযোগী শিল্প দ্রব্যাদি এদেশে প্রস্তুত করা।

৫। দ্রব্যাদি যাহাতে সুলভ হয় তাহার উপায় করা।

৬। দ্রব্যাদির সহজ প্রাপ্যণীয়তা

৭। শিল্পীর পরিশ্রম লাঘবতা, এবং

৮। তাহার যথেষ্ট অর্থাগম।

নব নব শিল্প ও শ্রমজাত দ্রব্যের আবিষ্কার ও প্রচলন জন্য দেখা যায় দেশ মধ্যে ধীরে ধীরে চেষ্টা হইতেছে, কিন্তু সুদক্ষ বৈশ্য বর্ণের অভাবে ঐ চেষ্টা সম্যক্ ফলবতী হইতেছে না। বাল্যে এতৎ অঞ্চলের বাজারে ওলের ডাঁটা কাল কচু, থুল কুড়িশাক কচি নিমপাতা, কুমুদিনী বা "পাতলা" ফুলের ডাঁটা বিলাতী কুমড়ার ফুল তিঁত কৌপা ফুল, শোণ প্রভৃতি বিক্রীত হইত না। ক্রমশঃ রাষ্ট্র হইল একাধিক ব্যক্তি ঐ গুলি আহারার্থ ব্যবহার করেন, বাজারেও এখন ঐ সমস্ত বিক্রীত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। কিছুদিন বাদে বক ফুল বা অশোক ফুলও বোধ হয় বিক্রীত হইতে দেখিব। এখন আমাদের অবস্থার সহিত একবার ইংরাজের অবস্থা তুলনা কর। দু একটি মাত্র দৃষ্টান্ত দিলেই যথেষ্ট হইবে। ভারতের "চা" গাছের পাতা বেচিয়া কত ইংরাজ কোটিপতি হইলেন। প্রাক্ত ওলের ডাঁটা প্রভৃতি যদি যুগপৎ ভারতের সর্ব্বত্র প্রচলন করা যাইত কত দরিদ্রের অন্ন সংস্থান হইত, এবং কতক গুলো নূতন শ্রমজাত দ্রব্য দাঁড়াইয়া যাইত। শিমূলতলা নামক স্থানে একরূপ ঘাসের গন্ধ জনৈক সাহেবের নাসিকার প্রীতিকর বোধ হইল। ক্রমশঃ সাহেব মহলে এবং অনেক বাবু মহলেও উক্ত গন্ধ তৃণের আদর বাড়িতেছে। আমাদের বাবুই তুলসি, রাম তুলসী, ও কত অজ্ঞাত নানা বনজ সুগন্ধ গাছ পড়িয়া কাঁদিতেছে। উহাদের ব্যবহার জন্য চেষ্টা হয় না কেন ? বিক্রয় সম্ভাবনা নাই বলিয়াই হয় না। দেশের এমনই দুর্ভাগ্য সাহেবদের কৃপা ব্যতীত কোন বিষয়েই উন্নতি সম্ভাবনা দেখি না। বহির্ব্বাণিজ্য উহাঁদের হাতে। কোন বস্তুর কাটতি উহাঁরা যত করিতে পারিবেন অন্যের চেষ্টায় তত হইবে না। কোম্পানীর প্রথম আমলে উহাঁদিগকে ধরিয়াই অনেক দেশীয় মহাজন

বড় লোক হইয়াছিলেন। ভারতবাসী বহু পূর্ব্বে এক সময় বহির্ব্বাণিজ্যে লাভবান হইত, কিন্তু সে এখন স্বপ্ন কথা। বর্ত্তমান অবস্থায় বিজ্ঞের উপদেশ এই অপরের হাত দিয়ে এখন আমাদিগকে বহির্ব্বাণিজ্য চালাইতে হইবেক, সুতরাং যে সমস্ত দ্রব্য, বা, পণ্য ইংরাজ মহাজন ক্রয় করিবার সম্ভাবনা অগ্রে সেই গুলির উৎপাদন বা আবিষ্কার জন্য যেন চেষ্টা পাওয়া হয়। কিন্তু এখানে অনেক গুলি ভাবিবার কথা আছে। মনে কর পাট একটা পণ্য, ইহার বিক্রয় জন্য ভাবিতে হয় না, সুতরাং ইহার চাষে লাভ আছে। কিন্তু এলাভ আপাততঃ লাভ মাত্র, পরিণামে ক্ষতিকর। অর্থাৎ যে মূল্য দিয়া আমরা পাট বেচিলাম পরিণামে যদি তাহার অধিক দাম দিয়া ঐ পাট জাত দ্রব্য কিনিয়া লই, তাহা হইলে লাভ না হইয়া ক্ষতিই হইল। এই টুকু দেখিতে হইবে. রপ্তানি ফলে যে অর্থাগম হয়, আমদানি পণ্য সমূহ ক্রয় করিতে তাহার সমুদয়ই ব্যয়িত হয় কিনা। তাহার পর দেখা উচিত রপ্তানিতে যে অর্থাগম হয় তাহারও অধিক হইতে পারে কিনা। আরও একটা বিষয় দেখিবার আছে। আমাদের প্রত্যেক ব্যক্তির যাহাতে ব্যয় অপেক্ষা আয় অধিক হয় তদুপায়ও অবশ্য চিন্তনীয় কারণ জাতি, ব্যক্তি গুলার সমষ্টি ভিন্ন অন্য কিছু নহে। যাহা হউক এ সমস্ত বিষয় শিল্পীর অর্থাগমোপায় চিন্তা করিবার সময় আলোচনার জন্য রাখিয়া দিলাম।

স্বীকার করা গেল বহির্ব্বাণিজ্য সম্বন্ধে বিজেতৃ জাতির প্রসাদ, বা, উচ্ছিষ্ট গ্রহণ ব্যতীত আমাদের গত্যন্তর নাই, কিন্তু অন্তর্বাণিজ্য ব্যাপারে যতটা হয় তাহাই বা না হয় কেন ? দৃষ্টান্ত স্বরূপ "পাচন" পান করার রীতি এদেশে চির পুরাতন প্রথা। "চা" পানে দেশের লোককে অভ্যস্ত করিবার জন্য ইংরাজগণ কিরূপ চেষ্টা পাইতেছেন; এবং ক্রমশঃ কৃত কার্য্যও হইতেছেন। চেষ্টাই আমাদের বা ফল দায়ক হয় না কেন ? প্রবোধ বাবুর আয়ুর্ব্বেদীয় "চা" বাহির হইবার পূর্ব্বেও অন্য কয়েক জন "পল্লবামৃত" নাম দিয়া দেশী "চা" বাহির করেন। বিজ্ঞাপনে অপরাধের মধ্যে লিখিতছিল "চা" পান পাচন প্রথারই পুনরুদ্দীপন মাত্র সুতরাং কবিরাজি বহুগুণ সম্পন্ন নানা বিধ পাচনে নিত্য ব্যবহার করিয়া কি "চা" পান তৃষ্ণা নিবারিত হয় না। "চা" পত্রের এমন কোন গুণ নাই যাহাতে ইহা বীর্যবান্ বহু আয়ুর্ব্বেদীয় তরু লতার সমকক্ষ হইতে পারে। আর যায় কোথা। একদিন ট্রাম গাড়িতে যখন উক্ত মর্ম্মের বিজ্ঞাপন বিতরিত হইতেছিল লেখকের সম্মুখেই আমাদের কয়েক জন স্বদেশী ধুরন্ধর সুখসেব্যনিত্য ব্যবহৃত "চা" এর উক্ত সামান্য নিন্দা পাঠ করিয়াই মহা চটিয়া যান। ইহাতে বুঝিলাম

আমাদের রুচিও বিকার গ্রস্ত, শিল্প দির উন্নত করিতে হইলে, উহারও চিকিৎসা আবশ্যক। দেশের বড় লোকেরাই এজন্য দায়ী। উহাঁরা যদি ক্রমশঃ দেশী দ্রব্য সমূহে অনুরাগ দেখান, সাধারণে উহাঁদের অনুকরণ করিয়া ধন্য মনে করিবে। গোল এই খানে, সাহেবদের সহিত তুলনায়—অন্য সব বড় লোকেই সাধারণের নিকট তুচ্ছ বিবেচিত হয়।

দেখা গেল নব নব শিল্প দ্রব্যাদির আবিষ্কারটা যেমন প্রয়োজন তাহাদের বিক্রয় ব্যবস্থাটাও তদ্রূপ। একের অভাবে অন্যটি পুষ্ট হয় না। কিন্তু বিক্রয় সুবিধা না হইলেও নূতন আবিষ্কার ফলে শীঘ্র বা বিলম্বে দেশ লাভবান হয়। সম্প্রতি টেলিগ্রাফ পত্রে এ বিষয়ে অনেক গুলির দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইয়াছে। আনারস, পেঁপে আতা, আপেল, গোল আলু, ফুল কপি, বাঁধা কপি সিঙ্কোনা, প্রভৃতি এখন এদেশে হইতেছে। ওগুলি বিদেশ হইতে আনীত, সুতরাং নূতন বিক্রেয় পদার্থ। উহাদের সাহায্যে বিদেশের অর্থ দেশে না আসিলেও ঐ গুলির প্রচলন ফলে দেশে যে সুখ ভোগের বৃদ্ধি হইল সন্দেহ নাই। শিমূল আলু কাঁচ কলার ময়দা প্রভৃতি প্রচলিত হইলে, অর্থাগম হউক না হউক পরোক্ষ ভাবে স্বাস্থ্যের উপকার আছে।

নূতন নূতন শিল্পাদি আবিষ্কারের ন্যায় প্রচলিত শিল্পাদির উৎকর্ষ আবশ্যক। রজার্সের ছুরি কাঁচি আসিয়া দেশী উক্ত দ্রব্য গুলা প্রায় লোপ করিতে বসিয়াছিল, অধুনা তীক্ষ্ণ ধার উৎকৃষ্ট দেশী দ্রব্যের আবিষ্কার ফলে উক্ত বৈদেশিক শিল্পের কতকটা ক্ষতি করিয়াছে। কাপড়ের কলে তুলার প্রয়োজন, উৎকৃষ্ট তুলা পাইলে এদেশ হইতেই অভাব মিটান যায়। সর্ব্বদা সর্ব্ব বিষয়েই যদি আমরা পূর্ব্বাপেক্ষা উন্নতি সাধন জন্য সচেষ্ট হইতে শিখি—তবে শিল্পেরও উন্নতি অবশ্যম্ভাবী।

বিদেশ হইতে ক্রীত শিল্পাদি এদেশে প্রস্তত জন্য দেশী শিল্পী যথা শক্তি প্রয়াস পায়। টিনের ও মাটির "চা" দান, দেশী ছাতা, গায়ে মাখিবার জন্য টয়লেট সোপ বা সাবান প্রভৃতি দৃষ্টান্ত। এ সম্বন্ধে উৎসাহ দান আবশ্যক। ভারতীর মাননীয়া শিক্ষিতা সম্পাদিকা ঐরূপ দেশী দ্রব্য কোথায় পাওয়া যায়, সাধারণের বিদিতার্থ তাঁহার পত্রে স্থান ছাড়িয়া দিতেছেন। অন্যেও তাঁহার দৃষ্টান্তের অনুসরণ করেন ইহাই প্রার্থনীয়। চারি আনার তহবিল নামক নব প্রতিষ্ঠিত সমিতির উপর এজন্য বহু ব্যক্তি আশা পূর্ণ মানসে নির্ভর করিতেছে।

বৈদেশীক শিল্প যেমন আমাদের শিল্প জয় করিতে বসিয়াছে; তদ্রূপ আমাদের পেক্ষ বিদেশীয় শিল্পের অনুকরণ কি একে বারেই অসম্ভব। এ সম্বন্ধে একজন

হাসিতে হাসিতে বলিয়াছিলেন, প্রভাতী পথে—যদি আমরা গঙ্গা সন্দেশ রসগোল্লার অথবা ফুলুরি, বেগুনি, পাপর ভাজা প্রভৃতির দোকান খুলি নিশ্চয়ই লাভবান হইতে পারি। ঠিক স্মরণ নাই কিন্তু মনে হইতেছে চিকাগো মহা মেলায় এই রূপ ভারতীয় খাদ্য দ্রব্য করিবা মাত্রই বিক্রীত হইয়া গিয়াছিল। বিদেশে যদি আমাদের মুড়ি মুড়কির চলন করা যায়—মন্দ—কি? প্রচলনের পর উহাঁরা শিখিয়া লইলে আর হয়ত বিক্রীত হইবে না কিন্তু যতদিন না শিখিয়া লয় বিক্রীত হইবার সম্ভাবনা আছে।

একটা নূতন কিছু দেখিলে মানবের কৌতূহল স্বতঃই জাগ্রত হয়। আমাদের তুলনায় প্রতীচ্যগণের অনুসন্ধিৎসা ও জ্ঞান লিপ্সা অত্যন্ত প্রখর। ভারতীয় খেলনা দ্রব্য দেখিয়াছি সাহেবের ছেলেরাও ক্রয় করে। বিদেশে ঐ গুলি বিক্রয় চেষ্টা করিলে আশাতীত ফল পাইতে পারি।

আজ কাল অনেকেই বিদেশ যান। জয় পুরের মহারাজা বহু ব্যয়ে বিলাত গিয়াছিলেন। বিলাতে যদি একটা ভারতীয় আশ্রম থাকে বোধ করি জাতি ধর্ম্ম না হারাইয়া (অন্ততঃ প্রায়শ্চিত্তাতীত না হইয়া) বিলাত যাওয়া চলে। ঐরূপ বৈদেশিক ভারতীয় আশ্রম সমূহ হইতেই আমরা কি কি দ্রব্য বিদেশে বিক্রীত হইতে পারে, তদ্বিষয়ে জ্ঞান লাভ করিতে পারি। বিদেশে বিপনী স্থাপন সকলের সাধ্যায়ত্ত নহে, কিন্তু যদি একটা ভারতীয় দোকান বর্ত্তমান থাকে, তথায় দ্রব্যাদি সরবরাহ করাটা তত কঠিন ব্যাপার নহে।

একটা দৃষ্টান্ত দিব। ঠিক স্মরণ হইতেছে না, ডাক্তার মহাশয়ের নাম বোধ করি শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র মল্লিক মহাশয়। লেখকের জনৈক বন্ধু ইহাঁকে জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠান এদেশে যেমন Cod Liver Oil বিক্রীত হয় বিলাতে তদ্রূপ চ্যবন প্রাস বিক্রীত হইতে পারে কিনা? শুনিয়াছি ডাঃ বাবু উপদেশ দেন বিলাতের লোক বড় বাহ্য চাক্‌চিক্য প্রিয়। বাহিরের কৌটাটি যদি অত্যন্ত সুন্দর হয়—তবেই বিক্রয় সম্ভাবনা। ডাঃ বাবু না বলিলেও আমরা অনুমান করিয়া লইতে পারি "চ্যবন প্রাশের" মসি বিনিন্দিত বর্ণ ও একটা বিষম বাধা। পরলোক গত বিবেকানন্দ স্বামীর "প্রাচ্য ও প্রতিচ্য" পুস্তিকখানি এখনও হস্তগত হয় নাই। শুনিয়াছি তাঁহার ও অনুরূপ মত। থু থু দিয়া প্লেট পরিষ্কারে দোষ নাই, চক্ চকে ঝক্ ঝকে হইলেই হইল।

এ সম্বন্ধে একজন অভিজ্ঞ মহাজন যে পরামর্শ দিয়াছেন সর্ব্বথা শ্রবণ যোগ্য। বৎসর বৎসর তাঁহাদের অনেক পণ্য (মনে হইতেছে পাট) বিলাতে বিক্রীত

হয়। বিক্রয় জন্য ইংরাজ দালালকে কিন্তু কমিশন হিসাবে বহু অর্থ (বার্ষিক প্রায় ৬০।৭০ হাজার টাকা) দিতে হয়। ভারতীয় আশ্রম যদি এই কার্য্যটাও চালাইতে পারেন তাহা হইলেও অনেক লাভ।

বর্ত্তমান প্রবন্ধে লিখিত ১ম হইতে ৪র্থ বিষয় গুলির একরূপ আলোচনা করা গেল। আমরা পুনরায় উহার একটা সংক্ষিপ্ত আলোচনা করিব।

১। নব নব শিল্প ও শ্রমজাত দ্রব্যের আবিষ্কার।

২। প্রচলিত শিল্প ও শ্রমজাত দ্রব্যের উৎকর্ষ বিধান।

৩। বিদেশ হইতে ক্রীত শিল্প দ্রব্যাদি এদেশে প্রস্তুত।

৪। এদেশের শিল্প বিদেশে বিক্রয় চেষ্টা।

আমরা দেখিতেছি উক্ত উদ্দেশ্য গুলি কার্য্যে পরিণত করিতে হইলে এই গুলি আবশ্যক :——

১। বিদ্যালয়ে, বা, পত্রিকাদির সাহায্যে শিল্পাদি সম্বন্ধে শিক্ষা ও সংবাদ লাভ।

২। পরীক্ষা সমিতি সমূহের বা, জন সাধারণের ব্যক্তিগত চেষ্টা।

৩। মেলাদিতে উৎকৃষ্ট ও নূতন দ্রব্য সমূহের সমাবেশ এবং সেই সমস্ত ক্রয়।

৪। দেশ বিদেশের ভাল কারিকর আনাইয়া বা, তাহাদের নিকট গিয়া শিক্ষা।

৫। বিদেশে ভারতীয় সমিতি স্থাপনা।

একটু ভাবিলেই বুঝা যায় ২য় প্রস্তাবটিই সর্ব্ব প্রধান। অবশিষ্ট গুলি উহারই কার্য্য ক্ষেত্রে পরিণত হইবার যোগ্য। বোধ করি ত্রৈলোক্য বাবু এই জন্যই—বহু পূর্ব্বেই পর লোকগত মহেন্দ্র লাল সরকারের বিজ্ঞান সভার শ্রীবৃদ্ধি সাধন জন্য দেশের লোককে মন দিতে বলিয়া ছিলেন।

১ম হইতে ৪র্থ পর্য্যন্ত প্রস্তাব গুলির প্রকৃত পক্ষে কার্য্যে পরিণতিই শিল্পোন্নতি ; কিন্তু অবশিষ্ট কয়টি অর্থাৎ ৫ম হইতে ৮ম টি পর্য্যন্ত সিদ্ধ না হইলে কিছুই হইল না।

দ্রব্যাদির সুলভতা সাধন।—শিল্প যতই উৎকৃষ্ট হউক সুলভ না হইলে সাধারণের গৃহীত হইবার আশা কম। সুলভ জার্ম্মান পণ্য অন্যকে ক্রমশঃ হটাইতেছে, শীত বস্ত্র নীল, প্রভৃতি দৃষ্টান্ত। এ বিষয়ে আমরা সকলেই ভুক্তভোগী সুতরাং অধিক বলা নিষ্প্রয়োজন। দ্রব্যাদির সুলভতা সাধন জন্য কি কি আবশ্যক চিন্তা করা যাউক।

(১) ব্যবসায়ে প্রতিদ্বন্দিতা। এক চেটিয়া জিনিষটা বড় মারাত্মক। মধ্যে ছেলেদের লিখিবার শ্লেটের দর চড়িয়াছিল। জিজ্ঞাসা করিলে সকলেই বলিত এক জন মাত্র আমদানি করে—সুতরাং তাঁহার ইচ্ছামত মূল্য বৃদ্ধি হয়। বাজার করিতে যাইলে দেখিবেন, ফোড়েদের জ্বালায়—কিনিবার যো নাই। বিলাতে পাশা পাশি অনেক কোম্পানির রেল লাইন গিয়াছে তৎফলে প্রত্যেক কোম্পানিই যাত্রিগণের সুবিধার দিকে লক্ষ্য রাখিতে বাধ্য হইয়াছেন। বহু ব্যক্তির একই ব্যবসায়ে যোগদান ফলে দ্রব্যাদি সুলভ হইলেও বর্ত্তমান প্রবন্ধে উহা লক্ষণীয় নহে, কারণ প্রতিদ্বন্দিতার প্রভাবে আমরা সুলভে শিল্প পাইতেছি সত্য, কিন্তু ভারতীয় শিল্প উহাতে পরাজয় স্বীকার করিয়াছে। প্রতিদ্বন্দিতা প্রভাবে যেমন দ্রব্য সুলভ হয়, তেমনি আবার সুলভ দ্রব্য যোগাইতে পারিলেই প্রতিদ্বন্দিতায় সুবিধা হয়। ভারতীয় শিল্প সুলভতায়—বৈদেশিক শিল্পকেও পরাজিত করিতে পারে তদর্থে চেষ্টাই আবশ্যক। অন্যথায় বিদেশের সুলভ শিল্পে আমাদের আনন্দের কারণ নাই।

কলের সহায়তায় শিল্প সহজে প্রস্তুত হয়, অতএব দেশে কলের প্রচলন আবশ্যক। দেশী গেঞ্জি, মোজা প্রভৃতি ক্রমশঃ প্রতি যোগিতায় সমর্থ হইতেছে, কলই তাহার কারণ। বিদেশে যাইয়া কল রহস্য শিখিবার চেষ্টা কতদূর ফলবতী হইবে, সে পক্ষে সন্দেহ থাকিলেও চেষ্টাটা আমরা মন্দ বলি না। ভবিষ্যতের দিকে চাহিয়া আমরা এই পর্য্যন্ত পরামর্শ দিতে পারি, তাড়িত যন্ত্র সম্বন্ধে জ্ঞান লাভই এখন আমাদের প্রয়োজন। যেরূপ গতিক দেখা যাইতেছে সম্ভবতঃ পুরাতন প্রণালীর কল গুলা শীঘ্রই পরিত্যক্ত হইবে।

কাচ প্রস্তুত প্রণালী শিখিতে গিয়াই জনৈক ভারতীয়ের কত নিগ্রহ সহিতে হইল, যন্ত্র রহস্য কি সহজে শিখা যাইবে ? বিদেশ হইতে ভাল কল নির্ব্বাচন ও আনয়ন, তাহাদের পরিচালন কৌশল জ্ঞাত হওয়ায়, ভাঙ্গিয়া গেলে মেরামত করার বন্দোবস্ত করা প্রভৃতি বিষয় গুলি বড়ই গুরুতর। বোম্বের লোকেরা কতকটা কৃত কার্য্য হইয়াছেন, এই মাত্র আমাদের ভরসা। বহু ব্যয় সাধ্য উৎকৃষ্ট কলের এদেশে প্রচলনের অসুবিধা আলোচনা করিয়া হাবেল প্রমুখ ইংরাজগণ স্বল্প ব্যয় সাধ্য, হস্তচালিত উৎকৃষ্ট ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কল গুলির প্রথমে প্রচলন জন্য উপদেশ দিতেছেন। আমাদেরও এই মত। দেশে কিন্তু ঐ গুলি ক্রমশঃ নির্ম্মিত করিতে হইবে। মেলাদিতে যিনি হস্ত চালিত, অথবা স্বল্প ব্যয় সাধ্য কলের আবিষ্কারে কৃতকার্য্যতা দেখাইতে পারিবেন, তাঁহাদিগকে পুরস্কার দানের ব্যবস্থা থাকা ভাল।

দ্রব্যাদি সুলভ হইলে কি হইবে সহজ প্রয়োজনীয় হওয়া চাই। লঙ্কায় সোণা সস্তা হইলে তোমার আমার লাভ কি ? হাতের গোড়ায় যোগাইতে পারিলে বিক্রয়াধিক্য (সুতরাং আরও সুলভে বিক্রয়) সম্ভাবনা। মাড়োয়ারিরা সহায় না হইলে বিলাতী কাপড় এত বিকাইত না। চারিদিকে দেশীয় সর্ব্ববিধ শিল্পীদির দোকান খোলা আবশ্যক। মনে করুন কলিকাতার ইণ্ডিয়ান ষ্টোরস লিমিটেড কোম্পানি ভারতের সর্ব্বত্র অসংখ্য শাখা বিপনী খুলিলেন। এই সমস্ত দোকানে মূল দোকানের ন্যায় দ্রব্যাদি সুলভ হওয়া আবশ্যক ! ইহাতে কতকটা ফল পাওয়া যায় বলিয়া বিশ্বাস করি। এরূপ দোকান সমূহ খুলিতে কি কি অন্তরায় আছে আলোচনার ইহা স্থল নহে।

এইবার শিল্পীর পরিশ্রম লাঘবের চিন্তা করা যাউক। প্রতীচ্য খণ্ড কল সমূহের সমাচ্ছন্ন কিন্তু সেখানে শিল্পীর তেমন সুখ নাই। বাল্যে "চারুপাঠ" পাঠ কালে কাল্পনিক সুখ চিত্রে মুগ্ধ হইয়াছিলাম কল সমূহের সহায়ে মানব অল্প সময়ে ও অল্প পরিশ্রমে নিজ প্রয়োজনীয় দ্রব্য উৎপাদনে সমর্থ হইবে ও অবশিষ্ট সময় কাব্য বিজ্ঞাপনাদির আলোচনায় বা ঈশ্বর চিন্তায় অতিবাহিত করিতে পারিবেক। এ কল্পনা কিন্তু কার্য্যে পরিণত হইয়াছে কি ? কেন হয় নাই সকলেই বলিতে পারিবেন। বহু ব্যয় সাধ্য কল নির্ম্মাণে সকলের শক্তি নাই।

কলের অধিকারী ইহাদিগকে কর্ম্মচ্যুত করিল ও অনেককে স্বীয় দাসরূপে পরিণত করিল। অধিকারী মহাশয়--নিজ লাভার্থ--তাঁহার দাস কুলকে পশুর ন্যায় খাটাইয়া লইতেছেন এবং উপার্জ্জিত অর্থের অধিকাংশ নিজের জন্য রাখিয়া তাঁহার দাসগণকে উহার কণা মাত্র প্রদান করিয়াই ক্ষান্ত হইতেছেন। কলে এত অধিক বস্তু উৎপন্ন হয় যে অধিক কলের—প্রয়োজন হয় না ; সুতরাং দেশের অধিকাংশ লোকেই বৃত্তিচ্যুত, অর্থার্জ্জন শক্তিহীন অবস্থায়—উপনীত হয়। শ্রম জীবীরা যদি পরিশ্রমের মূল্য বাড়ায় উৎপন্ন দ্রব্যেরও মূল্য বৃদ্ধি হয়, আবার এই সব দ্রব্যই পুনরায় কিনিতে হয় বলিয়া শ্রম জীবীর দুঃখ ঘোচে না। আমরা ক্রীতদাস গণের দুঃখ দুর্দ্দশা পাঠ করিয়া অশ্রু সম্বরণ করিতে পারিনা। দগ্ধ উদর চিন্তায় যাঁহাদের প্রায় সমুদয় সময় অতিবাহিত করিতে হয়, তাঁহাদের অবস্থা ক্রীতদাস গণের অবস্থা অপেক্ষা কম শোচনীয় নহে। আলস্য নিন্দনীয় বটে, কিন্তু উদর চিন্তায় সমুদয় সময় ক্ষেপ ততোধিক নিন্দনীয়। যাঁহারা পিপীলিকা বা মধু মক্ষিকা আদর্শ করিতে বলেন আমরা তাঁহাদিগকে আগে-হাড় ভাঙ্গা খাটুনির মজাটা অনুভব করিতে পরামর্শ দিই। জীবনের সর্ব্বক্ষণই পরিশ্রম করিতে প্রস্তুত আছি কিন্তু তাহা ইচ্ছা

মত বিষয়ে ; কোন রূপে বাঁচিয়া থাকা জন্য ওরূপ কঠোর তপস্যার প্রয়োজন কি ? দেবতাত্মা মানব দু এক জনের সুখ ভোগের জন্য তাহার দেহ পাত করুক জগদীশ্বরের কখনই ইহা অভিপ্রেত হইতে পারে না। সুপ্রসিদ্ধ চার্লস ডিকেন্স মহোদয়ের একটি চিত্রের কথা জীবনে বোধ হয়, ভুলিতে পারিব না। "সহরের পর সহর তলি আরম্ভ। এখানে কেবলই পোড়া কয়লা, ছাই-আর ভস্ম, অর্দ্ধ ভগ্ন চিমনিযুক্ত কল। এইরূপ একটি কল ঘরে একজন বুড়া আগুনের সম্মুখে বসিয়া রহিয়াছে। কলে অগ্নিরক্ষাই তাহার কার্য্য। তাহার সহচর হীন জীবনে ঐ অগ্নিই তাহার সহচর ; উহারই শিক্ষা সে নানারূপ কাল্পনিক দেব দানব মূর্ত্তি দেখিতে পায় তাহাদের সহিত কল্পনায় কথা কহে। জিজ্ঞাসা করায় সে তাহার জীবনের একটা অপূর্ণ সাধের কথা বলিল—একবার যদি কিছুক্ষণের জন্য সে এই ছাই ভস্মের মাঝখান হইতে বাহির হইয়া ধরিত্রী দেবীর হরিদ্বর্ণ তৃণ সমন্বিত শস্য ক্ষেত্র দেখিয়া চক্ষু সার্থক করিতে পায়। হায় কোন্ বাল্যে সে এই সকল ঘরে ঢুকিয়াছিল, জীবনে তাহার এই সামান্য সাধটুকুও মিটিল না।" মধ্যবিত্ত ভদ্র কেরাণী আফিসে ঘরে আফিসের কাজ লইয়া ব্যস্ত ; পর্য্যবেক্ষণ অভাবে ছেলে পিলে তাহার যে বাঁদর হইয়া উঠিল, কিন্তু কি করিবে সে নাচার। আফিস এমনই অমানুষ স্থান যে দু দণ্ড কাল খাটিলে না হয়, দু পয়সাই কম দিবে তাহা নহে, তোমার চাকরি লইয়াই টানাটানি। জীবিকার্জ্জন জন্য অল্প বিস্তর পরিশ্রম সকলকেই করিতে হয় কিন্তু একজন ডাক্তার বা এঞ্জিনিয়ারের এক ঘণ্টা পরিশ্রমের মূল্য অত অধিক আর একজন কেরাণী বা কুলিরই অত কম কেন ? যাউক সোসিয়া লিষ্টগণ এ সব তত্ত্বের মীমাংসা করিয়া ভবিষ্যতে প্রয়োজনীয় ধর্ম্মের পুষ্টি করুন। এখানে ঐ সমস্ত কথার আলোচনা করিতে বসিলে আমরা শুধু দিগ্‌ভ্রান্ত হইব। আমাদের এই মাত্র বলা উদ্দেশ্য "পরিশ্রম লাঘব একটা প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত। সহসা মনে হয় বটে অল্প শ্রমে, সুলভে দ্রব্য উৎপাদনের কলই এক মাত্র উপায় কিন্তু প্রতীচ্য খণ্ডের কল সমূহে মানবের সে আশা পূর্ণ হয় নাই। এদেশে ঐ সমস্ত ত্রুটি পরিহার করিয়া কলের প্রচলন হইলে অবশ্য দোষ নাই কিন্তু তাহা হইতে পারে কি ?

একবার প্রশ্নোত্তর ভাবে কলের সুবিধা ও অসুবিধার কথা আলোচনা করা যাউক।

প্র। কল দেন হইল ফল কি ?

উ। দ্রব্য সুলভ হইবে।

প্র। তাহাতে লাভ ?

উ। (১) ব্যয় অল্প সুতরাং প্রকারান্তরে সকলের অর্থাগম হইবে।
চিন্তনীয় ——এখনও আমরা কলজাত সুলভ বস্তুই কিনিতেছি কিন্তু অর্থাগম হইতেছে কি ? দেশী কলে দ্রব্যাদি এতদপেক্ষাও সুলভ তর হইবে ত ?

(২) সুলভ হইলেই বিক্রয়াধিক্য অর্থাৎ বিক্রেতার পক্ষে অর্থাগম। (ইহা ত এখনও হইতেছে—দৃষ্টান্ত মারোয়ারি সম্প্রদায়।)

(৩) কল হইলে যে টাকাটা এখন বিদেশে যায় তাহা দেশেই থাকিবে।

প্রঃ। উহার অর্থ কি ইহাই নহে, জন কতক কলওয়ালা মাত্র ধনী হইবে—আর সামান্য পরিমাণে হইবে উহাঁদের নিযুক্ত শ্রম জীবি সম্প্রদায়। অবশিষ্ট সকলে উপার্জ্জন হীন হইবে ও তাহাদের দুঃখাতিশয্য ঘটিবে।

চিন্তানীয় উৎকৃষ্ট কলের প্রবর্ত্তন বিষয়ে বিলাতী কলওয়ালাকে পরাজিত করিতে পারা যাইবে ত ?

প্রঃ। তবে আমরা চাই কি ?

উঃ। (১ম) দ্রব্যাদি সুলভ হউক।

(২য়) জন কতক পরিবর্ত্তে সকলে ধনী হউক।

প্রঃ। কিসে উহা হইতে পারে ?

উঃ। (১) হাভেল সাহেব সংকল্পিত হস্ত শিল্পের উন্নতি দ্বারা।

(২) সাধ্যানুসারে সকলের দেশী শিল্প ক্রয় (৩) অনাবশ্যক বৈদেশিক শিল্পাদির অব্যবহার ফলে আয়ের বৃদ্ধি দ্বারা।

আহার্য্য সুলভ হইলেও বোধ হয় এই উদ্দেশ্য কতকটা সিদ্ধ হইতে পারে, কথাতেই আছে যে বৎসর চাউল মহার্ঘ হয়, সে বৎসর সব জিনিসেরই দর বাড়ে। পাথুরিয়া করলা যেমন দিন দিন সুলভ হইতেছে তদ্রূপ চাউল দাইল, তৈলাদি যাহাতে উত্তরোত্তর সুলভ হয় যত্ন সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য। আমাদের অল্পে সন্তুষ্ট দেশী শিল্পী তাহা হইলে সুলভে দ্রব্য যোগাইতে বহু পরিমাণে সক্ষম হইবে। প্রাচীন সিধাদান প্রথার পুনরুদ্দীপনে দেশে অধিক আহার্য্য সংস্থান আবশ্যক হয়; এবং জোর করিয়া লোকের ঘরে অন্ন সংস্থান করিয়া তাহার প্রধান অভাব মিটাইয়া দেওয়া হয়, (তারপর তাহার অর্থ থাকে বাজে খরচ করিয়া সখ মিটাক)। নীল চাষের সময় যেমন আপত্তি তুলা হইয়াছিল তদ্রূপ চা, পাট, তুলা প্রভৃতি অন্য দ্রব্যের চাষ হ্রাস করা উচিত, অন্ততঃ দেশের জন্য যাহা প্রয়োজন ততটা করিলেই হইবে। বিদেশে যদি কিছু বিক্রয় করিতে হয় শ্রমজাত চা, পাট, তুলা, রেশম,

প্রভৃতির পরিবর্ত্তে যেন ঐ সমস্ত দ্রব্যে প্রস্তুত শিল্প বিক্রয় জন্যই চেষ্টা পাওয়া হয়।

আচ্ছা, বিদেশী বণিক যদি তাঁহারা সর্ব্বগ্রাসী কলওয়ালার জন্য চড়াদামে তুলা, পাট, প্রভৃতি ক্রয় করেন, তখন উপায় কি ? যদি অন্যদেশ হইতে সুলভে আহার্য্য ক্রয় করা যাইত, তাহা হইলে দেশ মধ্যে চা, পাট, তুলা প্রভৃতিই চাষে পরামর্শ দিতাম। আহার্য্য সুলভ করিবার চেষ্টা সর্ব্বাগ্রে, তারপর অর্থার্জ্জন। আচ্ছা বিদেশী বণিক যদি অত্যন্ত চড়া দামে ধান্য, গোধূমাদি ক্রয় করিয়া উহাদের মূল্য বৃদ্ধি করেন। বেশ ত উহার ফলে দেশ মধ্যে আহার্য্য দ্রব্যের চাস হু হু বাড়িবে। বিদেশ হইতে আসিয়া জাহাজ ভাড়া প্রভৃতি পোষাইয়া উহাঁরা আর কত দর বাড়াইবেন ? তা ছাড়া সিধাদান প্রভৃতি প্রথার প্রবর্ত্তন ফলে দেশ মধ্যে যথেষ্ঠ আহার্য্য সদা সর্ব্বদা সংগৃহীত থাকিবে।

এইবার একটা স্বপ্ন দৃষ্ট ঘটনার উল্লেখ করিয়া পাঠকের নিকট বিদায় গ্রহণ করিব।

দাস বা শূদ্র সম্প্রদায়ের সহিত যেন অন্য সম্প্রদায় সমূহের বিরোধ ঘটিয়াছে। শ্রম জীবীর শ্রমই মূলধন।

তাহারা ইহার মূল্য শুধু বাড়াইয়া দিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই. অতঃপর সমাজস্থ অন্য সম্প্রদায় গুলির জন্য শ্রম করিতে অসম্মত। ভারতের শিল্পীকুলই প্রধানতঃ স্বপ্নের বিষয়ীভূত হইয়াছিল। কৃষক কৃষিকার্য্য নির্ব্বাহ করিবে, লাঙ্গল, ফাল, কুঠার প্রভৃতি তাহার জন্য কেহ করিয়া দেয় না। যে এই সমস্ত নিজে করিতে পারিল, তাহারই কৃষিকার্য্য করা সম্ভব হইল। এইরূপ যুদ্ধে কুশলী শিল্পীরই জয় হইতে লাগিল। অন্যে সামান্য একটী ছুরি করিতে ভাল পারে না, দৈনিক সমুদয় অভাব দূর করাত পরের কথা। বড় বড় কল কারখানা এইরূপে উঠিয়া গেল। বড় জোর এক জনের সাহার্য্যে চলিতে পারে এইরূপ কল গুলাই বাঁচিয়া রহিল—যথা কলুর ঘানি, তাঁতির মাকু—ইত্যাদি ইত্যাদি। সমাজে সাহিত্য বিজ্ঞান প্রভৃতির চর্চ্চা প্রায় উঠিয়া গেল। এইরূপে প্রতিচ্য খণ্ডস্থ মজুরদের ধর্ম্ম ঘটের পরিণামে ক্রমশঃ ভারতীয় প্রাচীন সভ্যতার পুনরাবির্ভাব হইল। শূদ্র দোখল ব্রাহ্মণ তাহাকে অবজ্ঞা করিয়াছে সত্য, কিন্তু তাহার সাংসারিক সুখে বিঘ্ন ঘটায়

নাই, তাহারই ন্যায় দুঃখ ভোগে অগ্রসর হইয়াছে, ক্ষত্রিয় বৈশ্যব ন্যায় সমস্ত সুখ আত্মসাৎ করিতে বসে নাই। অতঃপর একটা আপোষে মিট মাট হইয়া গেল। ত্যাগী ও জ্ঞানী ব্রাহ্মণগণ সকলেরই পূজনীয় দেবতা স্বরূপ হইলেন। শূদ্রগণ অপর সমুদয় বর্ণের প্রতিপালকরূপে গণ্য হইলেন। ইহাঁরা আর কাহারও নিকট ঘৃণিত, বা, অবজ্ঞাত হইবেন না ইহাঁরাই সমাজের পাদ বা স্তম্ভ স্বরূপ। সমাজ ইহাঁদের উপর ভর করিয়াই দাঁড়াইয়া আছে। চরণ নিকৃষ্ট কর্ম্মেন্দ্রিয় নহে। চতু-অপর জীবগণ মুখ ও পাদ সহায়েই সর্ব্ব অভাব পূর্ণ করে। ঠেকিয়া শিখিয়া নূতন অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া সমাজ আবার ব্রাহ্মণকে শিরোমণি করিয়া নূতন সংসার পাতিতে বসিল। অপোষ কালে বৃত্তি ভেদের ব্যবস্থা হইল, একজনের বৃত্তি নিয়মে বদ্ধ হইতে স্বীকৃত হইলেন না; তাঁহারা আর্য্য সমাজ হইতে বহিস্কৃত হইয়া অন্ত্য সংস্কারান্তর্ভুক্ত হইলেন।

স্বপ্ন বিবরণটা ঠিক লিপিবদ্ধ করিতে পারিলাম না। ভাষায় নিজের অনুভব প্রকাশ করা নিতান্ত কঠিন।

মহা প্রভু শ্রীগৌরাঙ্গের জন্ম।

লেখক—শ্রীধর্ম্মানন্দ মহাভারতী।

(বাউলের সুর)

কেনরে মন ভ্রমরা, পাগল পারা,
উড়ে বেড়াও ফুলে ফুলে।
ফুটেছে সোণার কমল, কি নিরমল,
নদীয়াতে ব্রাহ্মণ কুলে॥
কি কব রূপের কথা, শচি মাতা,
বিমোহিতা মনে মনে।

যে তাঁরে দেখ্‌ছে চোখে, বোল্‌ছে মুখে,
এই রূপেতে জগৎ ভোলে।
নদীয়া করি ধন্য, দিতে চৈতন্য,
চৈতন্য নাম ধরেন হরি।
গৌর তাঁর অঙ্গ বোলে, কয় সকলে,
শ্রীগৌরাঙ্গ নামের মূলে॥
এ যে নয়রে মানব; কৃষ্ণ মাধব,
নদীয়াতে অবতরি।
(এ যে) প্রেম বিলাতে, জীব তারিতে,
গৌর রূপে গঙ্গাকুলে।
(ও যে) প্রেমের আকর, দয়ার সাগর,
মুক্তির নাগর মহীতলে।
ধর্ম্মানন্দ বলে, ভাই সকলে,
থেকোনা ঐ (আরে ভাই) থেকোনা ঐ চরণ ভুলে॥

—— ০০০০০ ——

পরম কল্যাণ গীতা।

লেখক,—শ্রীমদ্ শিবনারায়ণ স্বামী।

("বিবাহ সম্বন্ধে ব্যবস্থা বিবরণ")

আপনারা বিচার করিয়া দেখুন যে, এক কুলীন নাম কল্পিত শব্দের এক ব্যক্তি অবিচারে বিশ বিশ বাইশ বাইশ শত শত বংশের কন্যাকে বিবাহ করেন, ঐ ব্যক্তি বৃদ্ধই হউন, আর যুবাই হউন, অজ্ঞান অবস্থাপন্ন মাতা পিতা কেবল কুলীন শব্দ কল্পিত নাম শুনিয়াই উহাকে কন্যা দেন। আর যখন ঐ ব্যক্তি মরিয়া যায়, সেই সমস্ত বেচারী যুবতী স্ত্রীলোক বিধবা—হওয়াতে অনর্থক নানা প্রকার যন্ত্রনা ভোগ করে ও ব্যভিচারিণী হইয়া নানা প্রকার কষ্ট ভোগ করিয়া থাকেন। পুত্র কন্যার পিতা মাতাও ঐ সকল সমাজকে ধিক্কার যে কুলীন নাম শুনিয়া বিনা বিচারে বিবাহ দেন আর এই স্ত্রীলোকগণ যৌবন হইতে বৃদ্ধ বয়স পর্য্যন্ত কষ্ট পান। যথার্থ

কুলীন শব্দের অর্থ এই যে, যাহার নব গুণ—(নয়টী মহৎ গুণ) আছে,—তাহার নাম কুলীন কল্পিত হয় যথা ঃ——

আচারো বিনয়ো বিদ্যা প্রতিষ্ঠা তীর্থ দর্শনং
নিষ্ঠাবৃত্তি স্তপোদানং নবধা কুল লক্ষণং ॥

এইরূপ যে পুরুষের আচার, বিনয়, বিদ্যা, প্রতিষ্ঠা তীর্থ দর্শন অর্থাৎ সাধুসঙ্গ, পর ব্রহ্মেতে নিষ্ঠা, বৃত্তি, তপস্যাআর দান এই নয়টী গুণ থাকে তিনি যে কুলেই জন্ম গ্রহণ করুন, তাঁহাকে কল্পিত কুলীন শব্দ বলা যায়। পুত্র কন্যার শৈশব অবস্থায় বিবাহ দিতেছেন ও দেওয়াইতেছেন ; কিন্তু ঐ কন্যার এ জ্ঞান নাই যে, পতি কাহাকে বলে, আর উহা দ্বারা কি সুখ হয় ; এবং পুত্রেরও এ জ্ঞান নাই যে স্ত্রী কাহাকে বলে, আর উহা দ্বারা কি সুখ হয়। আপনারা পুত্র কন্যাকে বাল্যাবস্থায় বিদ্যাভ্যাস করান না ; এবং সত্য শিক্ষা ধর্ম্ম ও পূর্ণ পরব্রহ্ম—বিরাট জ্যোতিঃ স্বরূপ চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণকে নমস্কার প্রণাম করিতে শিক্ষা দেনওনা। মান মর্য্যাদা রাখিয়া কথা কহিতে, বসিতে শিখান না, এবং সন্তোষ, দয়া, ধৈর্য্য, দান করা, অগ্নিতে আহুতি দেওয়া সত্য কথা বলা, সত্য কথা বলান, সত্য ধর্ম্ম পথে চলা সকলের প্রতি সমদৃষ্টিতে আত্ম ভাব ইত্যাদি শিক্ষা দেন না ; যাহাতে তাহারা পরস্পর সুখে থাকে, এবং তাহাদের বুদ্ধি তীক্ষ্ণ হয়। সকলের প্রতি আত্মদৃষ্টি থাকে, মৃত্যুরভয় থাকে না, নির্ভয় হইয়া বিচরণ করে ও সুখী থাকে। বিদ্যা দ্বারা জ্ঞান উপার্জ্জন হয়, আর পুরুষার্থ করিয়া ধন উপার্জ্জন করে, এবং স্ত্রী, পুত্র পরিবারগণকে প্রতিপালন করে, ক্ষুধার্ত্ত অভ্যাগতগণকে যথা শক্তি দান দেয়, আর মাতা পিতার আজ্ঞানুসরে চলে, ও জ্ঞানবান পুরুষের আজ্ঞা বিচার পূর্ব্বক পালন করে, সমস্ত লোকের উপর দয়া রাখে। এ সমস্ত উত্তম শিক্ষা না দিয়া পুত্র কন্যাকে এই শিক্ষা দিতেছ যে, তোমার বিবাহ হইবেক, উত্তম সুন্দরী পুরুষ পাইবেক, সেই তোমার ইষ্ট। এই রূপে—শয়ন করিবে, বসিবে, কোন ব্যক্তিকে বঞ্চনা করিয়া ধন লইয়া আসিবে, এই সকল নানা প্রকার মিথ্যা পাষণ্ডতা ইত্যাদি প্রপঞ্চ শিখাইতেছ, আর বালক অবস্থাতে বিবাহ দিতেছ। যুবতী হইতে না হইতে কতক বিধবা হইয়া যাইতেছে, আর যৌবন অবস্থা হইতে বৃদ্ধ বয়স পর্য্যন্ত কষ্ট ভোগ করিতেছে। উহাঁদিগকে লোকে কষ্ট—দেয় ; এই নিঃসহায় বেচারা বিধবা স্ত্রী-লোকদিগের প্রতি লোকের তাচ্ছিল্য হওয়াতে সমাজের এত দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে। পরিবারের মধ্যে কেহ স্বচ্ছন্দে থাকে আর কেহ পশুর ন্যায় দুঃরবস্থায় থাকে, ইহার অপেক্ষা নিষ্ঠুর দৃশ্য চিন্তায় আইসে না। ভদ্রোবংশোদ্ভব জ্ঞানবান

মনুষ্যের বিশেষ কর্ত্তব্য এই যে, এই নিঃসহায়া বিধবা স্ত্রীলোক দিগের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি—রাখিয়া যথা সাধ্য তাহাদিগকে স্বচ্ছন্দে ভরণ পোষণ করেন, যাহাতে তাহারা আপনাদের শোচনীয় অবস্থায় সর্ব্বদা কাতর না হয়, বা কষ্ট না পায়। ঐ নিঃসহায়া কত বিধবা ব্যাভিচারিণী হইয়া কুলত্যাগ করিয়া যাইতেছে। এরূপ হওয়া অপেক্ষা রাজা প্রজা পণ্ডিত আপনারা সকলে বিচার পূর্ব্বক যাহাতে এই সকল ঘটনা না ঘটে, তাহার বিধান করা উচিত। যাহাতে আপনার মান মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া কোন উত্তম পাত্রে উহাঁদিগকে প্রদান করিতে, পুত্র ও কন্যার পিতা-দিগের বা সাধারণের অপমান বোধ করা উচিত নহে। আর বিচার করিয়া দেখুন যে, মাতা পিতার এই ধর্ম্ম যে, পুত্র—ও কন্যা কোনও বিষয়ে-কষ্ট না পায়, সকল বিষয়ে সুখী থাকে, এবং পুত্র কন্যার এই ধর্ম্ম যে, যাহাতে পিতা মাতার কোন কষ্ট না হয়, সকল প্রকারে সুখী হন এবং উহাঁদিগের আজ্ঞা পালন করা। আর কুমারী ও বিধবা কন্যা যাহাদের ভোগ সুখের ইচ্ছা হয় নাই—কেবল পতি শব্দতে শুদ্ধ চৈতন্য—পূর্ণপর ব্রহ্ম জ্যোতিঃ স্বরূপ পতিতোদ্ধারণ তাহার প্রতিনিষ্ঠা শ্রদ্ধা হয়, তাহার বিবাহ দেওয়া উচিত নহে। এরূপ কন্যা জগতে ধন্য তাহাকে পূর্ণপরমাত্মা রূপে নমস্কার।

অভিমান।

লেখক,—শ্রীশচীশ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

আমরা একজনের পরিচয় দিতে ভুলিয়া গিয়াছি। তাই তাড়াতাড়ি আনন্দ পুরে ফিরিয়া আসিলাম। কেদার জেঠার পুত্র হরি কিঙ্করের কথা বলিয়াছি, কিন্তু তাঁহার পুত্রবধূ নীহারের কথা বলি নাই।

নীহার অষ্টাদশ বর্ষীয়া সুন্দরী যুবতী। নীহার শান্ত, নম্র, পতি-প্রাণা। বোধোদয় শেষ করিবার পূর্ব্বেই নীহারের বিবাহ হইয়াছিল। পতি-গৃহে কয়েক-খানা নাটক নভেল পড়া ভিন্ন আর কিছুই ঘটিয়া উঠিত না। নীহার গান জানিত, কিন্তু গাহিতে পারিত না। পঞ্চমী ব্রত, বীরাষ্টমী ব্রত করিত ; রাত্রে রামায়ণ পড়িয়া স্বামীকে শুনাইত। কখন কখন স্বামীর সঙ্গে দশ পঁচিশ বা তাস খেলিত।

স্বামী যে জিনিসটি ভালবাসিত তাহা সংগ্রহ করিয়া ঘরে আনিয়া রাখিয়া দিত। কিঙ্কর তামাক খাইত, নীহার স্বহস্তে ফর্সি মাজিয়া, জল ফিরাইয়া, কলিকায় উত্তম তামাক সাজিয়া স্বামীর অপেক্ষায় বসিয়া থাকিত; স্বামী ঘরে আসিলে টিকায় আগুন ধরাইয়া স্বামীর হাতে সট্‌কা তুলিয়া দিত। বৈশাখের দিনে খিড়্‌কির বাগান হইতে অসংখ্য মল্লিকা তুলিয়া, তদ্দ্বারা নানাবিধ অলঙ্কার করিয়া স্বামীকে বিবিধ সাজে সাজাইত। নীহার স্বামী ছাড়া কোন খেলা ধুলা জানিত না। স্বামীকে প্রফুল্ল করা ব্যতীত তাহার আর কোনও আকাঙ্ক্ষা ছিল না—স্বামী ছাড়া তাহার আর কোন চিন্তা ছিল না।

একদিন অপরাহ্ণে নীহার আপন কক্ষে বসিয়া চুল বাঁধিতেছিল; চুল বাঁধা শেষ হইলে পক্ষবিস্তারি উড্ডীয়মান ভ্রূযুগলের মধ্যে টিপ্ পরিল, আয়ত-নয়নের নীল তারার নীচে সুরমা পরিল, সিঁথির মাঝে সিন্দুরের সূক্ষ্ম রেখা সযতনে পরিল। তারপর মুকুরে আপন মুখ দেখিয়া একটু হাসিল। তাম্বুল-রাগে অধর রঞ্জিত করিয়া, কণ্ঠ ও কেশে অলঙ্কার পরিয়া আবার দর্পণে মুখ দেখিল। মনে মনে ভাবিল, "এত'তেও তাঁর মত সুন্দর হইতে পারিলাম না।"

এমন সময়ে সহসা মুকুরের মধ্যে স্বামীর মুখ প্রতিবিম্বিত দেখিল। নীহার চমকিত হইয়া ফিরিয়া দেখিল। দেখিল, পিছনে দাঁড়াইয়া হরি কিঙ্কর টিপি টিপি হাঁসিতেছে। লজ্জায় জড়সড় হইয়া নীহার আবার দর্পণের দিকে চাহিল। দেখিল, দর্পণের মধ্যেও সেই দুষ্ট দুষ্ট হাসি, মিঠা মিঠা চাহনি। তখন নীহার মুকুর উল্টাইয়া ঘোমটা টানিয়া বসিল। হরি কিঙ্কর কাছে আসিয়া ধীরে ধীরে বলিল, "নীহার, তুমি এত সুন্দর তাহা আমি জানিতাম না।"

নীহার ঘোমটা দূর করিয়া স্বামীর পানে ছল্ ছল্ নয়নে চাহিয়া রহিল। কিঙ্কর বলিল, "কি দেখ্‌ছ নীহার?"

নীহার চক্ষু নামাইল; আবার ধীরে ধীরে চক্ষু উঠাইল। গবাক্ষ পথ দিয়া আকাশ দেখা যাইতেছিল; নীহার আকাশের দিকে চাহিয়া দেখিল। এক, দুই, তিন, চার, কত পাখি উড়িয়া যাইতেছে, নীহার তাহাই দেখিতে লাগিল—অনন্য মনে যেন তাহাই গুণিতে লাগিল।

কিঙ্কর ডাকিল, "নীহার।"

নীহার চক্ষু নামাইয়া স্বামীর পানে চাহিল। কিঙ্কর বলিল, "কি ভাব্‌ছ নীহার?"

নী। বল দেখি কি ভাব্‌ছি?

কি। আচ্ছা, তুমি আগে বল।

নীহারের চক্ষু দু'টী নত হইল—রাঙ্গা রাঙ্গা ঠোঁটের উপর একটু লজ্জার হাসি ভাসিয়া গেল। নীহার অবশেষে বলিল, "তা', আমি বল্‌তে পারব না।"

কি। তবে আমি চলিলাম।

নী। বসো, বল্‌ছি।

নীহার, স্বামীর হাত ধরিয়া টানিয়া পাশে বসাইল। আবার একটু হাসি অধরোপরি ভাসিয়া গেল, আবার চক্ষু দুইটি নত হইল। বলিল, ভাবছিলাম এই তুমি—" আর বাক্য সরিল না।

কি। বলিবেনা? তবে আমি চলিলাম।

নী। না, না, বল্‌ছি। এই—এই তুমি কি সুন্দর।

কিঙ্কর সাদরে নীহারের চিবুক উঠাইয়া বলিল, "আর তুমি, নীহার?"

সে কথার উত্তর না দিয়া নীহার বলিল, "আরও ভাবিতে ছিলাম যে—।"

কি। কি, বল।

নী। যদি তুমি সুন্দর না হয়ে কুৎসিৎ হ'তে।

কি। তা'হ'লে কি হইত, নীহার?

নী। তাহ'লে তোমায় বোধ হয় আরও ভাল বাসিতাম।

কি। কেন বল, দেখি?

নী। তা' ঠিক জানিনা। বোধ হয়, তুমি কুৎসিৎ হ'লে আমি ছাড়া আর কেহ তোমায় ভাল বাসিত না।

কি। সে কি, নীহার?

নী। জগত তোমায় সুন্দর দেখে বা তুমি জগতকে সুন্দর দেখ এটা আমার সহ্য হয় না। তোমাকে আমাতেই লুকাইয়া রাখিতে চাই।

কি। এখন তা, পারনা কেন?

নী। এখন তোমার ওই মন ভুলান রূপ শুধু আমার নয়। প্রত্যেক রমণীর চক্ষে তুমি এখন সুন্দর, প্রত্যেক রমণীর কণ্ঠে এখন তোমার রূপ ব্যাখ্যা।

কি। কিন্তু তোমার রূপ ব্যাখ্যা কেহ আমার নিকট করিলে হৃদয় আনন্দে উৎফুল্ল হয়।

নী। পুরুষের মুখে আমার রূপ ব্যাখ্যা শুনিলে কি তোমার আনন্দ হয়?

কি। হয় বই কি?

নী। তবে তুমি আমায় ভালবাস না।

কি। আমি ভালবাসিনে ?

এমন সময় একজন পরিচারিকা আসিয়া বলিল, "দাদা বাবু, তোমায় কর্ত্তা ডাক্‌ছেন।"

দাসী চলিয়া গেল। হরি কিঙ্করও উঠিল। যাইবার সময় বলিয়া গেল, "কাহার কত ভালবাসা বুঝা যাবে, নীহার।"

নবম পরিচ্ছেদ।

হরি কিঙ্কর উঠিয়া পিতার কাছে সদরে আসিল, পিতা বলিলেন, "কিঙ্কর, তুমি এখন উপযুক্ত হইয়াছ। আমি আর সংসারে ক-দিন আছি, বৃন্দাবন বাস করিতে মনস্থ করিয়াছি, তোমার সম্পত্তি তুমি দেখিয়া লও। হরি বোল, হরি বোল।"

গত দশবৎসর হইতে কেদার নাথ বৃন্দাবন যাইবার জন্য দিনস্থির করিতেছেন ; কিন্তু যাওয়া আর ঘটিয়া উঠিতেছে না। মকর্দ্দমায় হারিলে বা গৃহিনীর নিকট লাঞ্ছিত হইলে, অথবা অন্য কোন কারণে মনের পীড়া পাইলে, বৃন্দাবন যাইবার কথা উঠে। কিঙ্কর সেটা জানিত : বুঝিল, পিতার মনে কোন কারণে কষ্ট হইয়াছে। বলিল, "কেন, কি হইয়াছে, বাবা ?"

কেদার বলিলেন, "হবে আর কি ? নির্ম্মলকে যতটা শান্ত শিষ্ট মনে করেছিলাম এখন দেখিতেছি সে ততটা নয়। তুমি ত জানই যে, আমাদের পৈতৃক সম্পত্তি কালীর সঙ্গে ভাগাভাগি হওয়াতে আমার বড় অসুবিধা হ'য়েছে। ষোল আনা সম্পত্তি, নয় কালী নিক্, নয় আমি লই। তা' সেত আর নিতে পারলে না। এখন বিষয়টা সমুদয় সম্পত্তি আমি নিতে চাই। তাতে নির্ম্মল বাধা দিতেছে। কেন, বাপু, আমি যদি বিষয়টা পাই, তাতে তোমার ক্ষতিটা কি ? তোমার ত আর পৈতৃক সম্পত্তি নয়।"

কিঙ্কর বলিল, "নির্ম্মল বাবু কি করেছেন ?"

কেদার। একটা মহালের প্রজা ভাঙ্গিয়া নাবালক হেমের নামে কবুলতি লেখাইয়া লইতেছে।

কিঙ্কর। তবে ত বড় গোল—এখন উপায় ?

কে। উপায়ের কথা পরে হইবে, এখন তুমি এক কাজ কর

কি। বলুন।

কে। হেমেদের সঙ্গে খুব ঘনিষ্ঠত কর। আসা, যাওয়া হ'তে হ'তে ক্রমে ঘনিষ্ঠতা হ'য়ে পড়বে। তখন জজের কাছে নাবালকের অছি হ'বার জন্য দরখাস্ত করব।

কি। মা বর্ত্তমান থাকিতে আপনি কেমন করে অছি হ'বেন ?

কে। মাকে পাগল ব'লে এফি ডেভিট করব।

কি। নির্ম্মল বাবু বাধা দিতে পারেন।

কে। ওদের সঙ্গে এমনি আত্মীয়তা দেখাব যে, নির্ম্মলও তাতে ভুলে যাবে।

পিতার পরামর্শানুসারে কিঙ্কর, কালী খুড়োর বাটীর দিকে গেল। উভয় বাটী পাশাপাশি, মধ্যে প্রাচীর ব্যবধান। কালী ও কেদার উভয়ে জ্ঞাতি, উভয়ের প্রপিতামহ একই ব্যক্তি। কালীর বাড়ী জীর্ণ, পতনোন্মুখ ; কেদারের বাটী মেরামতের গুণে নূতন অবস্থায় আছে।

খুড়িকে ডাকিতে ডাকিতে কিঙ্কর অন্দরে আসিয়া উপস্থিত হইল। দেখিল, খুড়ি, সোহাগের চুল আঁচড়াইয়া দিতেছে ; আর হেম পাশে বসিয়া শিশু শিক্ষা পড়িতেছে মাঝে মাঝে দিদির কাছে কঠিন স্থানের ব্যাখ্যা করিয়া লইতেছে।

কিঙ্কর একটু মুখচোরা, একটু লাজুকে ; নূতন লোকের সঙ্গে কথা কহিতে হইলে বা আলাপ করিতে হইলে কিঙ্করের কথা যোগাইত না। বন্ধুদের মধ্যে কিঙ্করের বড় একটা লজ্জা থাকিত না ; স্ত্রীর কাছে আদৌ না। কিন্তু কথাগুলা গুছাইয়া ঠিক করিয়া সকল সময় বলিতে পারিত না। কিঙ্কর নিতান্ত অশিক্ষিত নয়। প্রবেশিকা পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণ হইয়া অবশেষে পিতার কাছে জমিদারীর কাজ শিখিতেছিল। কিঙ্করের বয়সও তেমন বেশী নয় ; চব্বিশের মধ্যে হইবে। উজ্জ্বল শ্যামবর্ণের উপর সুশ্রী মুখ, সুতরাং নীহার তাহাকে পরম রূপবান বলিয়া মনে করিত।

কিঙ্কর, খুড়িকে দেখিল, হেমকে দেখিল, তারপর সোহাগকে দেখিল। আলুলায়িত নিবিড় কেশরাশি পৃষ্ঠ, স্কন্ধ গণ্ড প্লাবিত করিয়া ধরণী পৃষ্ঠে লুটাইতেছে। কিঙ্কর দেখিল, সেই কেশ দামের মধ্যে একখানি ক্ষুদ্র মুখ ; যেন অমাবস্যা রাত্রিতে মেঘ প্রতি বিম্বিত বাপী হৃদয়ে কে উজ্জ্বল দীপ জালিয়া রাখিয়াছে। যেন খণ্ড খণ্ড কাল মেঘে পূর্ণিমার চাঁদকে ঘিরিয়া রাখিয়াছে। এত সুন্দর বুঝি কিঙ্কর আর কখন দেখে নাই। গঙ্গা বক্ষে আলুলায়িত কুন্তলা ভগবতীর প্রতিমা দেখিয়াছে আকাশের গায় নিবিড় মেঘের কোলে বিদ্যুদ্দাম দেখিয়াছে সরসীর তলে নক্ষত্র ফুটিতে দেখিয়াছে, কিন্তু এমন সুন্দর সে কখনও

দেখে নাই। কিঙ্কর চিত্রার্পিতের ন্যায় দাঁড়াইয়া সেই রূপরাশি দেখিতে লাগিল।

খুড়ি সোহাগের চুল ছাড়িয়া কিঙ্করকে বসিতে আসন দিল। সোহাগ উঠিল না, সলজ্জ ভাবে বসিয়া রহিল। কিঙ্কর বহুকাল এ বাড়ীতে আসে নাই—বহুকাল সোহাগকে দেখে নাই। শৈশবে ধূলা মাখিয়া সোহাগ যখন খেলিয়া বেড়াইত তখন তাহাকে কিঙ্কর দেখিয়াছিল; কিন্তু তখন ভাবে নাই যে, সে কানন-লতিকা একদিন মুকুলিত হইয়া অরণ্য উদ্ভাসিত!

কিঙ্কর বড় একটা কথা কহিতে পারিল না; যা' কিছু কহিল তা' হেম ও খুড়ীর সঙ্গে। সোহাগের সহিত বাক্যালাপও করিল না। স্বল্প কাল তথায় বসিয়া কিঙ্কর উঠিয়া গেল।

রাত্রি কিছু বেশী হইলে কিঙ্কর, ঘরে আসিল। নীহার জিজ্ঞাসা করিল, "এত রাত্রি হ'ল কেন?"

কিঙ্কর বলিল, "খেলা করিতে ছিলাম।"

মিথ্যা কথা। কিঙ্কর, সোহাগের চিন্তায় বিভোর হইয়া, তার মুখখানা ভাবিতে ভাবিতে, চাঁদনি রাত্রে গঙ্গার ধারে বেড়াইতেছিল। কিন্তু কিঙ্কর সে কথা গোপন করিয়া একটা মিথ্যা বলিল।

কিঙ্করকে অন্য মনস্ক দেখিয়া স্ত্রী জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি এত বিষন্ন কেন?"

কিঙ্কর বলিল, "মাথা ধরেছে।"

আবার মিথ্যা। কিঙ্কর আগে স্ত্রীকে প্রতারণা করিত না; এক্ষণে বিনা সঙ্কোচে পতিপ্রাণা স্ত্রীকে মিথ্যা কথায় ভুলাইল। যে বিশ্বাস ঘাতকতা"র আবার মিথ্যা বলিতে সঙ্কোচ! যে মানুষ মারে সে, পদতলে পিপীলিকা দলিত করিল কিনা ফিরিয়া দেখে কি?

অবশেষে কিঙ্কর, পিতার আদেশ নীহারকে জানাইল। খুড়ির সঙ্গে আত্মীয়তা করিবার প্রয়োজনীয়তা স্ত্রীকে বুঝাইল। স্ত্রী তাহা বুঝুক বা নাই বুঝুক, স্বামীর আদেশ শিরোধার্য্য করিল; এবং পরদিন প্রত্যুষে উঠিয়া সোহাগকে ডাকিয়া লইয়া গঙ্গা স্নানে চলিল।

গ্রাম্য পথ আলো করিয়া দুই জনে গঙ্গা স্নানে চলিল। তখনও জ্যোৎস্নার আলো সম্পূর্ণ অন্তর্হিত হয় নাই, তখনও উষার আলো সম্পূর্ণ ফুটিয়া উঠে নাই। উষার আলো চাঁদের গায়ে পড়িয়াছে, জ্যোস্নার ম্লান আভা উষার গায়ে লাগিয়াছে। পৃথিবীর সুদূর পূর্ব্ব প্রান্তে, যেন পতি প্রেম-উৎফুল্লা, লাজ রঞ্জিতা উষা রাণী—গৃহ বহিষ্কৃতা, পতি লাঞ্জিতা সতিনী চন্দ্রিমার

ম্লান মুখ পানে গরব ভরে চাহিয়া টিপি টিপি হাসিতেছে। তাঁর সে গরবের হাসি দেখিয়া চাঁদ যেন আরও ম্লান হইয়া পর্ব্বতান্তরালে বা গাছের আড়ালে বিষন্ন বদন লুকাইবার অভিপ্রায়ে ছুটিয়া পলাইতেছে। দুই-ই সুন্দর তবে যে আদর হারাইয়াছে তার সৌন্দর্য্য দেখে কে? সে কথা এখন যাক।

সেই দিবা রাত্রির সন্ধি সময়ে, উষা জ্যোস্নার সন্মিলিত আলোকে শান্ত, স্থির ভাগীরথীর উপকূলে দাঁড়াইয়া একজন অপরকে বলিতেছে, "দেখ কেমন উষা উঠিতেছে।" অপরে উত্তর দিল, "দেখ, জ্যোস্না কেমন ডুবিয়া যাইতেছে।"

জ্যোস্না, উষার হাত ধরিয়া বলিল, "ঠাকুর ঝি, তুমি এত সুন্দর তাত কখন জানিতাম না!"

উষা বলিল, "বউ দিদি, তোমার গায়ের আলো আমার মুখে পড়েছে, তাই আমায় সুন্দর দেখাইতেছে।"

বসন্ত পীড়ার মুষ্টিযোগ।

লেখক,—কবিরাজ শ্রীযুক্ত মহেশ চন্দ্র কবিরত্ন।

বসন্ত রোগের প্রাদুর্ভাব হইলে পুরুষের দক্ষিণ হস্তে, স্ত্রীলোকের বাম হস্তে হরীতকীর একটী বীজ ধারণ করিলে এই রোগে আক্রান্ত হইবার আশঙ্কা থাকে না। এই রোগ হইলে নিম্নলিখিত মুষ্টিযোগ সকল দ্বারা বিশেষ উপকার হয়। (১) বসন্ত রোগজনিত জ্বর হইলে জল স্পর্শ করিবে না। এবং সর্ব্বাঙ্গে ভাঙ্গ (সিদ্ধি) চূর্ণ মালিশ করিবে ও নির্ব্বাত স্থানে থাকিবে। (২) রুদ্রাক্ষ অল্প ঘসিয়া ২।৩টী গোল মরিচ চূর্ণ ও পর্য্যুষিত জলসহ তিন দিন সেবন করিলে, বিশেষ উপকার হয়। (৩) কুমারিয়া লতার মুল ২ তোলা ৵॥০ অর্দ্ধ সের জল সহ সিদ্ধ করিয়া ৵০ অর্দ্ধ পোয়া থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া খাওয়া। (৪) অনন্তমূল ॥০ অর্দ্ধ তোলা, আতপ চাউলের জল সহ বাটিয়া খাইলে, বিশেষ উপকার হয়, (৫) নিমছাল, ক্ষেতপাপড়ী, আকান্দী কটকী, বাসকপাতা, দুরালতা, আমলকী, বীরণমূল, রক্তচন্দন, শ্বেত-চন্দন এই সমস্ত ২ তোলা পরিমাণ লইয়া ৵॥০ অর্দ্ধ সের জল দ্বারা সিদ্ধ করিয়া ৵০ অর্দ্ধ পোয়া থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া প্রাতঃকালে খাইতে দিবে। (৬) এই রোগে অত্যন্ত দাহ হইলে, পর্য্যুষিত জল মধ্যে

অল্প মধু মিশ্রিত করিয়া খাইতে দিবে। (৭) গায়ে বসন্ত হইয়া অবিরত দাহ হইলে আতপ চাউলের জল দ্বারা ঐ স্থান ভিজাইয়া রাখিবে। আর শুষ্ক কুল চূর্ণ ৵৹ আনা ॥৹ অর্দ্ধ তোলা ইক্ষু গুড় সহ প্রাতঃকালে সেবন করিলে, শীঘ্র শীঘ্র সব প্রকার বসন্ত পাকিয়া উঠে। (৯) টাবা লেবুর রস কাঁজি সহ বাটীয়া প্রলেপ দিলে বসন্ত ও দাহ নিবারণ হয়। (১০) রোগী খুব দুর্ব্বল হইলে, বিবেচনা পূর্ব্বক মাংসের যুষ দেওয়া যাইতে পারে। (১১) কণ্ঠ পরিষ্কারের জন্য পিপুল চূর্ণ ও হরীতকী চূর্ণ মধুর সহিত অবলেহ করিবে।

হরগৌরীর পূজা করিলেও উপকার হয়। ঘণ্টাকর্ণ শিবং গৌরীং বিষ্ণুং বিপ্রঞ্চ পূজয়েৎ। আচরেজ্জপহোমাদীন ব্রতং রোগ হরং তথা। জং:সং।

নিয়তি।

লেখক,—শ্রীসতীশ চন্দ্র দত্ত।

কেনরে হৃদয় মোর এতই চঞ্চল?
নিয়তি চরণ সেবি, মানব জনম লভি,
নিয়তির ইচ্ছা হায় হইবে সফল!
মরুভূমে কেন তবে ঢাল অশ্রু জল?
বারিদ বর্ষণ হবে, চাতক পরাণ পাবে,
নতুবা উন্মাদ চিত্তে থাকিবে কেবল;
নিশি-মণি অস্ত যাবে, সরোজ পরাণ পাবে,
নিয়তির বল যদি এতই প্রবল,
বিফলে ঢালিবে কেন নয়নেরি জল।
নিয়তি নিয়তি সার, মানব জনম ছার,
পূজিতে নিয়তি পদে জনম কেবল;
সময় বহিয়া যাবে, মাথাটি নোয়ায়ে সবে,
ধরিতে হইবে শুধু নিয়তির বল।
বিফলে ফেলিবে কেন নয়নেরি জল।

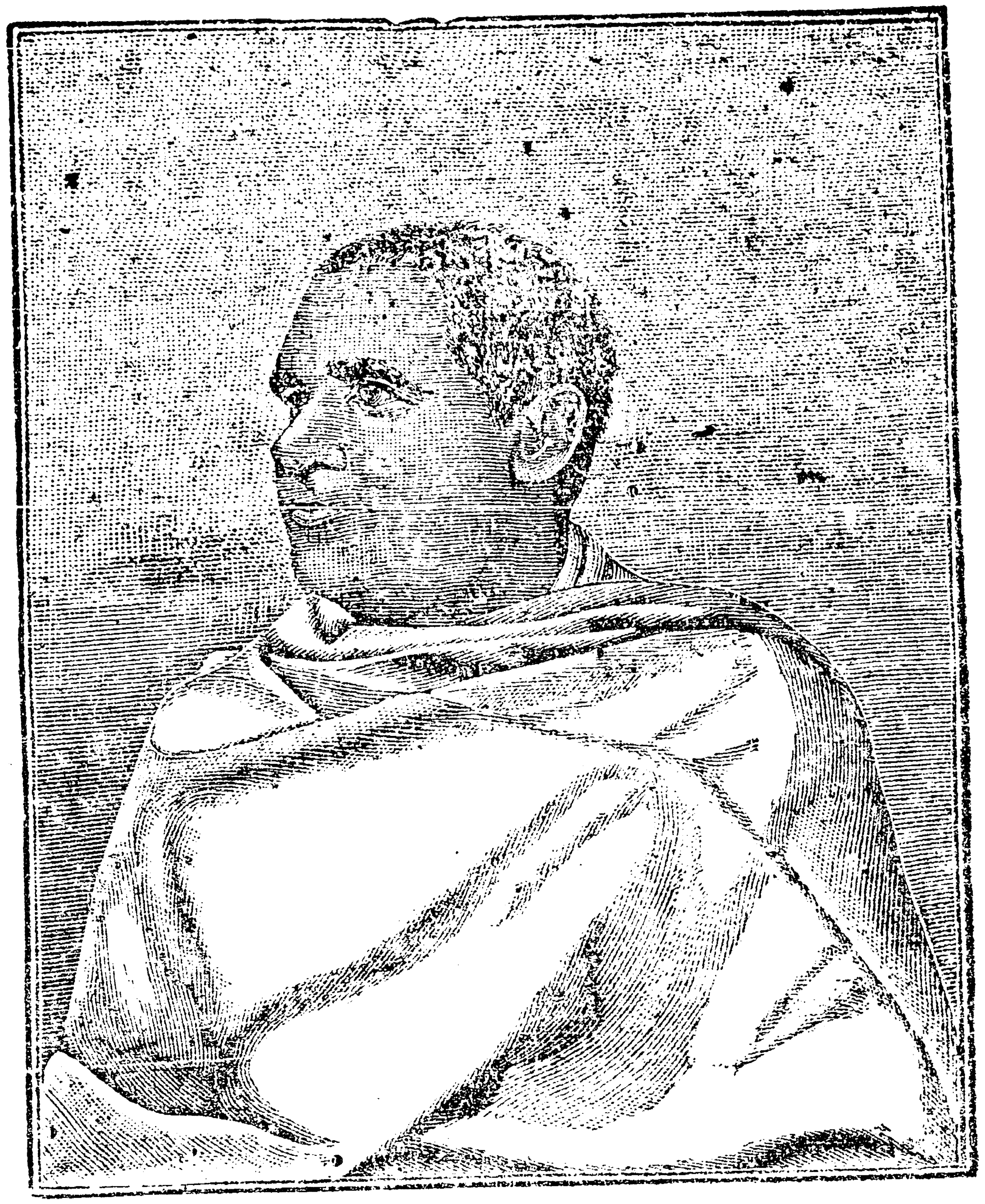

মহামহোপাধ্যায় মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন সি, আই, ই।

এই সুনাম খ্যাত পণ্ডিত প্রবর সম্প্রতি ইহ সংসার পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন ১৩১২ সাল ২৯ শে চৈত্র তারিখে তাঁহার নর লীলা সমাপ্ত হইয়াছে।

১২৪২ বঙ্গাব্দের ১১ই ফাল্গুন সোমবার পণ্ডিত মহেশ চন্দ্র হুগলী জেলার অন্তঃপাতি আমতার নিকটবর্ত্তী নারিট গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন, তাঁহার পিতার নাম হরি নারায়ণ তর্কসিদ্ধান্ত, তিনি একজন গণনীয় অধ্যাপক ছিলেন, নবম বর্ষ বয়ঃক্রমকালে মহেশচন্দ্র প্রথম সংস্কৃত পড়িতে আরম্ভ করেন। দ্বাদশবর্ষ বয়স পর্যান্ত তিনি কোন বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করেন নাই। বাড়ীতেই ব্যাকরণ ও অভিধান শিক্ষা করিয়াছিলেন, বাল্যকালে তাঁহার ধারণাশক্তি অল্প ছিল, তিনি অমরকোষের শ্লোক গুলি মুখস্থ করিতে পারিতেন না, তদ্দর্শনে অধ্যাপক বলিয়াছিলেন মহেশের লেখা পড়া ভাল হইবে না।

দ্বাদশ বর্ষ বয়সে মহেশ চন্দ্র স্বগৃহ ত্যাগ করিয়া মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত ঘাটালের নিকটবর্ত্তী রসিকগঞ্জ গ্রামে অধ্যয়ন করিতে যান সেখানে তখন ঠাকুরদাস চূড়ামণি নামে একজন নৈয়ায়িক পণ্ডিত ছিলেন, চতুষ্পাঠির প্রণালিতে ছাত্রগণকে শিক্ষা দান করা তাঁহার কার্য্য ছিল, ব্যাকরণ শাস্ত্রে তাঁহার সবিশেষ নৈপুণ্য। মহেশ চন্দ্র তাঁহার বাড়ীতে বাস করিয়া তাহারই নিকটে ব্যাকরণ পড়িতে লাগিলেন। দিন দিন তাঁহার জ্ঞানোন্নতি হইতে লাগিল, সেই সময় খানাকুল কৃষ্ণনগর নিবাসী নৈয়ায়িক পণ্ডিত কালিদাস তর্কসিদ্ধান্ত উক্ত চূড়ামণি মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যান, মহেশচন্দ্রের মুখশ্রী ও গঠন প্রণালি দর্শনে তিনি বলেন, এই ছাত্রটি বিশেষ তীক্ষ্ণবুদ্ধি, সময়ে এই বালক ন্যায় শাস্ত্রে পণ্ডিত হইবে।

১৮৫২ খৃষ্টাব্দে সংস্কৃত কলেজে অধ্যয়ন বাসনায় মহেশচন্দ্র কলিকাতায় আগমন করেন। কলেজে প্রবেশ করিয়া নির্দ্দিষ্ট শাস্ত্রাদি অধ্যয়নের আবশ্যকতা না বুঝিয়া কলেজে পড়িবার আকাঙ্ক্ষা তিনি পরিত্যাগ করিলেন, যে যে অধ্যাপক যে যে শাস্ত্রে সুপণ্ডিত সেই সেই অধ্যাপকের নিকটে সেই সেই শাস্ত্র অধ্যায়নে প্রবৃত্ত হইলেন, সুপ্রসিদ্ধ বৈয়াকরণ তারানাথ তর্কবাচষ্পতি তাঁহার ব্যাকরণের গুরু, সুপ্রসিদ্ধ দার্শনিক পণ্ডিত জয় নারায়ণ তর্কপঞ্চানন তাঁহার দর্শন শাস্ত্রের গুরু, ঠাকুরদাস চূড়ামণি তাঁহার ন্যায় শাস্ত্রের গুরু, দুর্গাদাস বাচষ্পতি তাঁহার স্মৃতি শাস্ত্রের গুরু।

এই সময় জ্যোতিঃ স্বরূপ নামক একজন অদ্বিতীয় পাঞ্জাবী পণ্ডিত সন্ন্যাসী বেশে কলিকাতায় থাকিতেন, তর্ক পঞ্চানন মহাশয়ের পরলোক প্রাপ্তির পর মহেশচন্দ্র সেই সন্ন্যাসীর নিকট শিক্ষা লাভ করিতে আরম্ভ করেন, তাঁহার নিকটেই বেদান্ত দর্শন ও শ্রীহর্ষ লিখিত খণ্ডন দর্শন (পাশ্চাত্য দার্শনিক কো-মতের ধ্রুববাদ দর্শন পজেটিভ ফিল জফি আমাদের এই খণ্ডন দর্শনের অনুরূপ অধ্যয়ন করা হয়, ইহার পর তিনি পণ্ডিত কালীনাথ তর্করত্নের নিকট ফলিত জ্যোতিষ শিক্ষা করেন।

এই সকল শিক্ষার পর মহেশ চন্দ্র বারাণসীধামে গমন করিয়া তথাকার অধ্যাপকগণের নিকটে উপনিষদ্ পাতঞ্জল ও মীমাংসা দর্শন অধ্যয়ন করেন, বিশুদ্ধানন্দ স্বামী নামে একজন সুপণ্ডিত দণ্ডী তৎকালে কাশীর দণ্ডী সম্প্রদায়ের নেতা ছিলেন. মহেশ চন্দ্র তাঁহার নিকটে কিছু দিন অধ্যয়ন করেন, স্বামীজী তাঁহাকে বড় ভালবাসিতেন, সুপ্রতিষ্ঠিত পণ্ডিত গ্রিফিৎ সাহেব সেই সময় বারাণসীকলেজের প্রিন্সিপাল। মহেশ চন্দ্র তাঁহারসহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন, বিদ্যা বুদ্ধির পরিচয় পাইয়া গ্রিফিৎ সাহেব তাঁহাকে এক খানি প্রশংসা পত্র দেন।

১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে কাশী হইতে প্রত্যাগমন করিয়া মহেশচন্দ্র কলিকাতায় একটি চতুষ্পাঠি স্থাপন করেন। সেই সময় অবধি তাঁহার আখ্যা হয় মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন। তিনি বিনা বেতনে ছাত্র গণকে নিজ চতুষ্পাঠিতে শিক্ষা দিতেন, শোভাবাজারের মহারাজ কমল কৃষ্ণদেব বাহাদুর তাঁহার চতুষ্পাঠির সমস্ত ব্যয় ভার বহন করিতেন। তৎকালে অধ্যাপক কাউয়েল সাহেব সংস্কৃত কলেজের প্রিন্সিপাল মহেশচন্দ্রের গুণ গ্রাম পরিজ্ঞাত হইয়া ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে তিনি তাঁহাকে সহকারী অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত করেন, ন্যায়রত্ন মহাশয়ের নিকট তিনি হিন্দু দর্শনের কোন কোন অংশ অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, এই সময় হইতে ন্যায়রত্ন মহাশয় কিছু কিছু ইংরাজি অনুশীলনের সুবিধা পান। সহকারী অধ্যাপকের পদের যোগ্যতা দেখাইয়া ক্রমে তিনি অলঙ্কার শাস্ত্র ও দর্শন শাস্ত্র ও দায় ভাগের অধ্যাপক হইয়াছিলেন। ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে সংস্কৃত কলেজের প্রিন্সিপাল হন, সে কার্য্যে তাঁহার বিশেষ সুখ্যাতি হইয়াছিল, ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে তিনি সি. আই, ই, উপাধি এবং ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে মহামহোপাধ্যায় উপাধিতে ভূষিত হইয়াছিলেন।

ন্যায়রত্ন মহাশয়ের অনেকগুলি সৎগুণ ছিল। বঙ্গে সংস্কৃত ভাষার উন্নতি কল্পে তিনি বিশেষ যত্নবান্ ছিলেন।, প্রদেশির চতুষ্পাঠি সমূহে গবর্ণমেণ্টের সাহায্য দান ও চতুষ্পাঠির ছাত্র গণকে উপাধি ও বৃত্তি দান ব্যবস্থা তাঁহারই যত্নের ফল। দেশের শ্রীবৃদ্ধি সাধনেও তাঁহার অনুরাগ ছিল। হাবড়া হইতে আমতা পর্য্যন্ত রেলওয়ে বিস্তারে তিনি বিলক্ষণ উৎসাহ দেখাইয়া ছিলেন। নানা বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া তৎবিষয়ে তিনি কৃতকার্য্য হন। এই রেলওয়ে দ্বারা পার্শ্বস্থ গ্রাম সমূহের যথেষ্ট উপকার হইয়াছে বলা বাহুল্য। এতদ্ব্যতীত সামাজিকতা ও মিষ্ট ভাষিতাগুণে তিনি পরিচিত বন্ধু বান্ধবগণের আদরণীয় হইয়া ছিলেন। পরের উপকার করাও তাঁহার একটি বিশেষ গুণ ছিল। উপকারার্থী জন গণকে কখন তিনি বঞ্চিত করেন নাই। তাই সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষের পদ হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া কয়েক বৎসর পেন্সন ভোগের পর এই মাননীয় পণ্ডিত মহাশয় ৭০ বৎসর বয়সে দেহ ত্যাগ করিয়াছেন। এই প্রবন্ধের শিরোভাগে তাঁহার প্রতিকৃতি প্রদর্শিত হইল।

মানুষ এককালে দোষশূন্য হয় না, ন্যায়রত্ন মহাশয়ের ও দোষ ছিল। ভ্রান্তি

বশে অথবা অনুরোধ বশে কোন কোন বিষয়ে তিনি কতকটা অবিবেচনার কার্য্য করিয়াছিলেন, সত্য, কিন্তু গুণাংশের সহিত তুলনা করিলে দোষাংশ তাদৃশ ধর্ত্তব্য বলিয়া বোধ হয় না।

হায় দাদা ঃ—

লেখিকা,—শ্রীমতী হেমনলিনী দাসী। *

কি হল কি হল হায়, কি হল আমায় ?
ফাঁকি দিয়ে দাদা তুমি, পালালে কোথায় !
এক বৃন্তে দুটি ফুল, ফুটেছিল বনে,
একটীকে ছিঁড়েনিল বিধাতা কেমনে ॥
কোথা দাদা কোথা তুমি, পলাইয়া গেলে !
কোথা পুনঃ দয়া ধর্ম্মে সংসার পাতালে ॥
কে বাঁধিল মায়া পাশে কাহার মায়ায়।
কোথা তুমি লুকাইলে ভুলিয়া সবায় ॥
তোমা বিনে ঘর বাড়ী সব অন্ধকার।
ভুলেছ কি অভাগিরে আসিবে না আর।
বালক বালিকা মুখ করি দরশন।
বুক ফেটে যায় দাদা ঝরে দু-নয়ন।
ছেলে বেলা দুইজনে আনন্দেতে মাতি।
কত খেলা খেলিয়াছি দোঁহে দিবারাতি ॥
সে খেলা কি ভুলে গেলে জনমের মত।
দেখিতে কি আসিবেনা, কাঁদি আমি কত ॥
বড় আদরের তব সরলা খোকন।
তাদের কথা কি মনে পড়ে না এখন ॥

আহা দাদা ভ্রমে ভুলে কত অযতন।
করেছিনু তোমা ধনে ভাবি তা এখন ॥
বড় অভাগিণী আমি অতি শিশুকালে।
জননী ভাসায়ে শোকে গেছেন অকালে ॥
হেরিয়ে তোমার মুখ ছিনু বুক বেঁধে—
আজি দাদা তব শোকে মরিতেছি কেঁদে।
এস দাদা ডাকিতেছে বালিকা তোমায়।
কি হল তাহার দশা হায়! হায়!! হায়!!!
এত শীঘ্র ফুরাল কি সংসারের খেলা।
শিশু পুত্র কন্যা প্রতি এত অবহেলা ॥
গেছ দাদা স্বর্গধামে সুখে থাক তথা
থাক কিন্তু ভুলিওনা আমাদের কথা ॥
হেমের মিনতি দাদা করগো শ্রবণ।
স্বর্গ থেকে আশীর্ব্বাদ কর বরিষণ ॥

---

* যাহার এই রচনা তিনি আমাদের সম্পর্কিয়া পরিচিতা বয়সে বালিকা এ বালিকা কখন কোন বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করে নাই, কখন কোন কাব্য রচনাও করে নাই গৃহে বসিয়া দু-এক খানি পুস্তক পাঠে লেখা পড়ায় ইহার বোধোদয়। এই কবিতাটি ইহার প্রথম রচনা "ছায়া" নামক মাসিক পত্রের সম্পাদক এডওয়ার্ড প্রিণ্টিং ওয়ার্কসের স্বত্বাধিকারী জন্মভূমির পরম হিতৈষী লেখক স্বর্গীয় গিরীন্দ্রনাথ মিত্র বিগত ১৩১১ সালের ১৭ই চৈত্র বৃহস্পতিবার আমাদিগকে শোক সাগরে নিমগ্ন করিয়া অনন্তধামে গমন করায়, লেখিকার হঠাৎ শোকচ্ছ্বাসে অন্তরের ভাব শ্রোত প্রবাহিত হইয়াছে। রচনা দর্শনে আমরা বিস্মিত হইয়াছি শোকের বিষয় হইলেও বিস্ময়ের সঙ্গে সন্তোষের উদয়, যাহা তিনি লিখিয়াছেন, তাহাই আছে, কেবল দু-একটি পদের যৎকিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন করা হইয়াছে মাত্র। জং সং।

পঞ্চ তত্ত্ব মতে চিকিৎসা।

ডাক্তার শ্রীহেমচন্দ্র সেন এম্ ডি।

আমাদের শাস্ত্র মতে সূর্য্যদেব স্থাবর ও জঙ্গম জগতের আত্মা, ইহাঁর অমা নামক কলা হইতে চন্দ্রের উৎপত্তি। এই চন্দ্রের বিকৃতি হইতে পৃথিবীর উৎপত্তি। সূর্য্যকে সপ্তাশ্ব বলিবার কারণ, এই যে সূর্য্য রশ্মিতে রামধনুকের সাতটি বর্ণ আছে। ইংরাজিতে এই সাতটি বর্ণকে যথা ক্রমে—(violet) বেগুণি (indigo) ঘোর নীল (blue) নীল (green) হরিৎ বর্ণ যথা দূর্ব্বা ঘাসের রং (yellow) পীতবর্ণ (orange) কমলা লেবুর বর্ণ এবং (red) রক্ত বর্ণ। সূর্য্যে এই সপ্ত বর্ণ আছে বলিয়া ইহাঁকে সপ্তাশ্ব বলা হয়। এই বর্ণ গুলিতে যে শক্তি নিহিত আছে তদ্বারা সৌর জগতে সৃষ্টি স্থিতি ও প্রলয় কার্য্য চলিতেছে। এই জন্য বিষ্ণু সূর্য্য মণ্ডলের মধ্যস্থিত, এইরূপ ধ্যান করিতে হয়। এই সাতটি বর্ণের মধ্যে তিনটি বর্ণই প্রধান, যথা নীল, পীত, এবং রক্ত বর্ণ, অন্যান্য বর্ণগুলি এই তিনটি বর্ণ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। যথা বেগুনে রং লাল এবং নীল বর্ণের সংমিশ্রণে উৎপন্ন হয়, কমলা লেবুর রং পীত এবং রক্ত বর্ণের সংমিশ্রণে উৎপন্ন হয়।

নীল বর্ণের উপকারীতা।

সূর্য্য রশ্মিতে যত প্রকার বর্ণ আছে তন্মধ্যে নীল বর্ণই সর্ব্বপ্রধান। উত্তাপ হইতে পিত্ত অথবা শরীরের যতপ্রকার ব্যধি হয় তাহাতে এই বর্ণের রশ্মি বিশেষ উপকারী। নীল বর্ণ বোতলের ভিতর জল রাখিয়া তিন ঘণ্টা কাল সূর্য্যের উত্তাপে রাখিলে সেই জল যাবতীয় পিত্ত দোষ ও রক্ত দোষ দূর করে, নীল কাচের লাণ্ঠানের ভিতর আলো রাখিলে সেই আলোকে রোগী থাকিলে পিত্তের প্রকোপ আশু নিবারিত হয়। সবুজ বর্ণের রশ্মি যাবতীয় ক্ষত রোগে বিশেষ ফলপ্রদ, নীলবড়ি রঙ্গের রশ্মি বা জলে যাবতীয় কাশ রোগ আরোগ্য হয়, এই বর্ণের সহিত কিঞ্চিৎ রক্ত বর্ণ মিশ্রিত আছে। কমলা লেবু রঙ্গের বোতলে জল পান করিলে অজীর্ণ রোগ আরোগ্য হয়। ইহাতে সমান বায়ুক্রিয়া সুসম্পূর্ণ হয় এবং কোষ্ঠবদ্ধতা থাকে না।

রক্ত বর্ণ।

এই বর্ণ উত্তেজক, ইহাতে পক্ষাঘাত পর্য্যন্ত আরোগ্য হয়, যাবতীয় শ্লেষা ঘটিত রোগে এই বর্ণ বিশেষ উপকারী। ইহাতে ব্রণ শীঘ্র পাকিয়া উঠে এমন কি হাম ও বসন্ত বসিয়া যাইতে পারে না। মুমূর্ষু রোগী এই রশ্মি প্রভাবে সঞ্জীব হইতে পারে। ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের বোতল জলপূর্ণ করিয়া সূর্য্যের রশ্মিতে তিন ঘণ্টা কাল রাখিয়া অৰ্দ্ধ ছটাক আন্দাজ সেবন করিলে ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের ক্রিয়া দেহে প্রকাশ পায়। ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের আলোকেও ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের ক্রিয়া দেহে প্রকাশ পায়। আমি এই বিষয় অনেক স্থলে পরীক্ষা করিয়া সাধারণকে এই চিকিৎসা করিতে উপদেশ দিতেছি। এই চিকিৎসা বিলাতে বড় বড় হাঁসপাতালেও চলিতেছে। অনেকেই জানেন সবুজ বর্ণ দূর্ব্বাঘাসে রক্ত স্রাবের কি সুন্দর উপকার হয়। অধিকাংশ পীত বর্ণের দ্রব্য অনেক রোগে উপকারী যথা হরিদ্রা যকৃত প্রভৃতি রোগে উপকার করে। রক্ত জবা, ডালিমের কুঁড়ি, রক্ত প্রবালে, রক্ত স্রাব নিবারিত হয়। ওল দেখিতে পীত মিশ্রিত রক্ত বর্ণ, ইহা যকৃত রোগে বিশেষ উপকারী, তজ্জন্য অর্শ রোগেও বিশেষ ফল প্রদান করে। সূর্য্যের সাতটি রশ্মির অধিপতির নাম যথা :—

চন্দ্র (violet) বেগুনি বর্ণের অধিপতি। শুক্র (indigo) গাঢ়নীল বর্ণের অধিপতি। বৃহস্পতি (blue) নীল বর্ণের অধিপতি। শনি (yellow) হরিৎ বর্ণের অধিপতি। সূর্য্য (orange) কমলা লেবুর বর্ণের অধিপতি। মঙ্গল (red) রক্ত বর্ণের অধিপতি।

গীত।

শ্রীকৃষ্ণ বিরহে শ্রীরাধিকা।

পাহাড়ী—আড়াঠেকা।

জগত জননী কালী কি হবে আমার গো।
জগত সংসার মাগো আঁধার রাধার গো॥
কৃষ্ণ মম প্রাণ পাখী, উড়ে গেছে দিয়ে ফাঁকি,
কি সুখে বাঁচিয়া থাকি বহি দেহ ভার গো।
কৃপা কর কাত্যায়ণি, স্তুতি করি যোড় পাণি,
যাচিছে এ অভাগিনী, শরণ তোমার গো॥

আলাহিয়া—যৎ।

বিরহেরি যে অনল জ্বলে দিবা রজনী।
যে জ্বালাতে জ্বলি সদা, কারে বলি সজনী।
প্রিয় সখি তোরা ছিলি, কি করিতে কি করিলি,
শ্রীমাধবে কারে দিলি, বধিলি এ রমণী॥
হায় আমি কোথা যাব, কোথা গেলে কৃষ্ণ পাব,
বিরহে প্রাণ হারাব, ছেড়ে যাব অবনী।
হায় হায় একি দায়, বহ্নিতাপে প্রাণ যায়,
জলে না জুড়ান যায়, পুড়ে মার আপনি॥

——— ০০০০০ ———

সমালোচনা।

লেখক,—শ্রীমহেন্দ্র নাথ শর্ম্মা বিদ্যানিধি।

সচিত্র মেয়েলি ব্রতের ছড়া।

নিজ-নাম প্রথিত শ্রীযুক্ত বাবু বিপ্রদাস মুখোপাধ্যায় মহাশয়, এই সুন্দর গ্রন্থের প্রণেতা। বঙ্গ ভূমি অধুনা নানা কারণেই অধঃপতিতা। সেই অধঃপতনের পরিণাম স্বদেশীয় ধর্ম্ম-কর্ম্মের বিলোপ-সাধন। সুতরাং, এমন সময়ে বিলুপ্ত-প্রায় এই মেয়েলি-ব্রতের "সচিত্র" ছড়া-পুস্তকের প্রচার দ্বারা, আমাদের যে, মহোপকার সংসাধিত করিয়াছেন,—তাহা অ-বর্ণনীয়। এই মহা-গ্রন্থের সঙ্কলন দ্বারা তিনি কিরূপ যশস্বী ও পুণ্য ভাক্ হইলেন, তাহা তিনিই আপন মনে মনে অনুভব করিতেছেন, এবং আমরাও যে বিপ্রদাস বাবুর ন্যায় আন্তরিক সুখানুভবে সমর্থ হইয়াছি এতন্নিবন্ধন আমরা বার বার গ্রন্থকারের নিকট সর্ব্বাগ্রেই অকপট ধন্য-বাদ ও কৃতজ্ঞতা বিজ্ঞাপিত করিতেছি। পুস্তকের মুদ্রণ, কাগজ, ছবি-ইত্যাদি সমস্তই—সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর। বৈশাখ হইতে চৈত্র পর্য্যন্ত ১২শ (দ্বাদশ) মাসীয় তাবৎ "মেয়েলি ব্রতের ছড়া" ই—এই গ্রন্থে সন্নিবেশিত হইয়াছে দেখিয়া, কিরূপ অপ-রূপ অ-পার আনন্দ লাভ করিয়াছি—তাহা ভাষায় অভিব্যক্ত করা, আমাদের সাধ্যায়ত্ত নয়।—সর্ব্বশেষে মদীয় মন্তব্য এই যে, বর্ত্তমান সময়ে "স্বদেশ-ব্রতের" সমাবেশ হইয়াছে বলিয়া, আমাদের সর্ব্বাপেক্ষা অপরিসীম পরিতৃপ্তি। সর্ব্ব-সমেত ৪৩ (তেতাল্লিশ) টী ব্রত, ইহাতে সন্নিবিষ্ট। গদ্যে ও পদ্যে প্রতিপাদ্য বিষয়টী, বিবৃত হইয়াছে, এই জন্যই অধিকতর মহোল্লাস হইয়াছে।

JANMA BHUME REGISTERED No. C. 284.

১৪শ বর্ষ।] ১৩১৩ সাল। জ্যৈষ্ঠ। [১১শ সংখ্যা।

হিন্দুধর্ম্ম ও সমাজের মুখপত্র।

জন্মভূমি

(সচিত্র মাসিক-পত্রিকা ও সমালোচনী)।

	বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
১।	ঋগ্বেদে রমেশচন্দ্র	শ্রীযুক্ত গোপাল চরণ স্মৃতি ভূষণ	৩৮৯
২।	বঙ্গবধূ ...	শ্রীমতী নগেন্দ্র বালা স্বরসতী	৩৯৪
৩।	উষ্ণ জলের উপকারিতা	ডাক্তার শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র সেন এম, ডি,	৪০৫
৪।	পরম কল্যাণ গীতা	শ্রীমদ্ শিব নারায়ণ স্বামী ...	৪০৭
৫।	যৌবনে যুবক ...	শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্র নাথ মাহিন্ত	৪১০
৬।	বিশুদ্ধ বকুল বৃক্ষ বিলোকনে	শ্রীমতী জ্যোৎস্নাময়ী ঘোষ	৪১০
৭।	প্রায়শ্চিত্ত ...	শ্রীযুক্ত কৃষ্ণ চন্দ্র কুণ্ডু বি, এ, ...	৪১৩
৮।	আমার বালক	শ্রীযুক্ত বিধু ভূষণ ঘোষ ...	৪১৮
৯।	হৃষিকেশ ...	শ্রীযুক্ত হিমারণ্যবাসী পরিব্রাজক	৪২৪

লেখকগণের মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন।

জন্মভূমি-কার্য্যালয়।
শ্রীনরেন্দ্রনাথ দত্ত দ্বারা প্রকাশিত।
৩৯ নং মাণিক বসুর ঘাট ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

বার্ষিক মূল্য ডাঃ মাঃ সমেত ১॥০ দেড় টাকা। — প্রতি সংখ্যার নগদ মূল্য ৵১০পয়সা

বিশেষ কাজের কথা পড়ে দেখুন।

এই ভারতবর্ষে ২৫ কোটী লোকের বাস। একদিন সকলেই এক বাক্যে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন যে দেশী জিনিস ব্যবহার করিব। আজ তাই আমরা একটী "স্বদেশী-বন্ধু-এজেন্সী" নামে একটী এজেন্সী খুলিয়াছি। মফঃস্বলে আমরা অতি সুবিধায় ও সত্বর সমস্ত স্বদেশী দ্রব্য সস্তায় পাঠাইয়া থাকি। যাহার যাহা কিছু প্রয়োজন, আমাদের লিখিয়া পাঠাইবেন। কমিশন হার শতকরা ২॥০ টাকা মাত্র কিন্তু ১০০৲ শত টাকার ন্যূন হইলে ৩৵০ হিসাবে লইয়া থাকি। কোন অর্ডার পাঠাইবার পূর্ব্বে, অগ্রিম কিছু না পাঠাইলে মফঃস্বলে মাল পাঠান হয় না। পত্রের উত্তর চাহিলে রিপ্লাই কার্ড বা পত্রের ভিতর ৴১০ টিকিট পাঠাইতে হয়। নচেৎ কোন পত্রের উত্তর দেওয়া হয় না। দেশী মিলের ধুতি, শাড়ী, থান, লংক্লথ, আদ্ধি, সিল্ক, বম্বে, গরদ, তসর, বেনারশি ও পার্শী সাটী, জামা, জ্যাকেট, ফ্রক, গেঞ্জি, মোজা, স্বদেশী সাবান ফুলের তৈল, আতর, গোলাপজল, কাষ্ঠের ও টিনের বাক্স, ট্রঙ্ক কাগজ নোট বুক, কলম, পেন্সিল, দোয়াত, কালি, পুস্তক, তামাক, পানে খাইবার সুগন্ধি কাশীর সুরতি ও গীত বাদ্যের যন্ত্র ইত্যাদি ইত্যাদি। স্মরণ রাখিবেন দেশী দ্রব্য ভিন্ন অন্য কোনরূপ বিলাতী দ্রব্য পাঠাইনা। যদি কোন বিষয় কিম্বা বাজার দর জানিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে সত্বর উত্তর দিয়া থাকি। মাল কোন রেলওয়ে ষ্টেসনে কিম্বা ষ্টিমার ঘাট ষ্টেসনের যাইবে তাহার নাম স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন।

সস্তার চূড়ান্ত।

স্বদেশী জিনিষের দর দেখুন

সুতী মোজা ৴১০ হইতে ।৴১০ আনা জোড়া।
পশমী মোজা ।৴১০ হইতে ॥৵ আনা জোড়া।
মোজা ৩ জোড়া ৷৴০, মাজারী ৩ জোড়া ॥১০ আনা।
ভাল মোজা জোড়া ৴১০, পশমী মোজা জোড়া ॥৴১০ আনা।
গেঞ্জি ৵১০ হইতে ১৲ টাকা পর্য্যন্ত।
তোয়ালে ৵৫ হইতে ৶০ আনা পর্য্যন্ত।
বোম্বাই মিলের ১০ হাতি ধুতি ১॥০ জোড়া হইতে ২৶০ আনা জোড়া।
মান্দ্রাজ হ্যাণ্ডলুমের ১০ হাতি ধুতি জোড়া ২।০ হইতে ৬॥০ টাকা।

এইচ, ব্যানার্জি এণ্ড কোং।

জেনারেল অর্ডার সাপ্লায়ার্স।

কুটিঘাট রোড, বরানগর পোষ্টাপিস কলিকাতা।

"জননীজন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী"

(মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী।)

১৪শ বর্ষ। | জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৩ সাল। | ১১শ সংখ্যা।

ঋগ্বেদে রমেশচন্দ্র।

লেখক—শ্রীগোপাল চরণ স্মৃতি ভূষণ।

ঋগ্বেদ হিন্দুর পরম পূজ্য ও সর্ব্বপ্রাচীন গ্রন্থ। যাহাদিগের মতে কেবল মাত্র পঞ্চ সহস্র বর্ষ পৃথিবীর সৃষ্টি হইয়াছে, তাঁহারাও স্বীকার করেন যে ঋগ্বেদ চতুঃ-সহস্র বর্ষের পুরাতন। আমরা ত ইহাকে অনাদি এবং ভগবান্ ব্রহ্মার মুখ কমল বিনিঃসৃত বলিয়া বিশ্বাস করিতে বাধ্য।

এই ঋগ্বেদ পৃথিবীর যাবতীয় ভাষাতেই অনুবাদিত হইয়াছে। কিন্তু তাহা আমাদের আলোচ্য নহে। মহাত্মা wilson ইহার প্রথম ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশ করেন। তৎপরে বহুশাস্ত্রবিৎ পণ্ডিত মাননীয় শ্রীযুক্ত রমেশ চন্দ্র দত্ত

মহোদয় ইহার ইংরাজী ও বাঙ্গালা অনুবাদ প্রকাশ করিয়া আর্য্য সমাজের বিশেষ উপকার সাধন করেন। ইংরাজী অনুবাদ সম্বন্ধে আমাদের কিছু বক্তব্য নাই। কিন্তু বাঙ্গালা অনুবাদটী সংস্কৃতানভিজ্ঞ অস্তিত্বপরায়ণ হিন্দু সম্প্রদায়ের একমাত্র উপজীব্য বলিয়া আজি তৎসম্বন্ধে বাধ্য হইয়া দুই এক কথা বলিতে প্রবৃত্ত হইতেছি।

আপাততঃ দ্বিতীয় অষ্টকের দ্বিতীয় মণ্ডল লইয়া কিছু আলোচনা করা যাইতেছে। পরে অবসর মতে আরও আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

"অবা কৃণোঃ প্রথমং বীর্য্যং মহদ্যদস্যাগ্রে ব্রহ্মণা শুষ্ম মৈরয়ঃ"।

২য় অ, ২য় ম, ৬ষ্ঠ অ, ১৭ সূ, ৩,

এই মন্ত্রার্দ্ধের অনুবাদে এইরূপ লিখিত হইয়াছে ;—

"হে ইন্দ্র! তুমিও তোমার মহাবীর্য্য প্রকাশ করিয়াছ! কারণ স্তোত্র দ্বারা প্রীত হইয়া তুমি শত্রু বিনাশক বল প্রকটিত করিয়াছ।"

ইহাতে 'তুমি ও তোমার' এ অংশটুকু উহ্য। সুতরাং বন্ধনী মধ্যে দেওয়া উচিত ছিল।

মন্ত্রে যে 'যৎ' পদটী আছে, তাহার অর্থ করা হইয়াছে, 'কারণ'। কিন্তু পরম পূজ্য টীকাকার সায়ণাচার্য্য ইহার অর্থ করিয়াছেন 'যাহা'। সেই অর্থটীই সঙ্গত বলিয়া বোধ হয়।

তৎপরে মন্ত্র মধ্যে স্থিত 'অস্য অগ্রে' এ টুকুর অনুবাদ একেবারে পরিত্যক্ত হইয়াছে।

এই মন্ত্রার্দ্ধের অনুবাদ এইরূপ হওয়া উচিত।

আর ও (তুমি) শ্রেষ্ঠ প্রভূত সামর্থ্য প্রকাশ করিয়াছ। স্তোত্র দ্বারা ইহার অগ্রে অর্থাৎ স্তবকারক ব্যক্তির সম্মুখে শত্রুশোষক যাহা অর্থাৎ যে সামর্থ্য প্রেরণ করিয়াছিলে।

"সাম্মা অরং বাহুভ্যাং যং পিতা কৃণোদ্বিশ্বস্মাদাজনুষো বেদসম্পরি।"

২য় অ, ২য় ম, ৬ষ্ঠ অ, ১৭ সূ, ৬,

এই মন্ত্রার্দ্ধের অনুবাদ এইরূপ কৃত হইয়াছে ;—

ইন্দ্র এই জগতের পক্ষে পর্য্যাপ্ত হইয়াছেন। তিনি সকলের রক্ষক। তিনি সর্ব্ব জীবের অপেক্ষা উৎকৃষ্ট জ্ঞান বলে নিজ হস্তে জগৎ নির্ম্মাণ করিয়াছেন।

এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে দত্তমহোদয় তিনি সকলের রক্ষক এ অংশটুকু কোথায় পাইলেন? তাহার পরে 'তিনি সর্ব্বজীবের অপেক্ষা' এইখানে তিনি

কে? ইন্দ্র কি? বোধ হয় তাই! কারণ সর্ব্বনামের পূর্ব্বে যে বিশেষ্য আছে তাহাকে বুঝিতে হইলে ইন্দ্রকেই বুঝিতে হয়। সে কথা যাউক। কিন্তু তৎপরে 'জগৎ নির্ম্মাণ' কি প্রকারে করিলেন তাহা বুঝাইয়া দিলে ভাল হয়।

এই মন্ত্রার্দ্ধের অর্থ এইরূপ হওয়া উচিত ;—

তিনি অর্থাৎ ইন্দ্র এই জগতের পক্ষে পর্য্যাপ্ত। পিতা অর্থাৎ পালক (প্রজাপতি) নিজ হস্ত দ্বারা যাঁহাকে অর্থাৎ যে ইন্দ্রকে সমুদয় জন হইতে উৎকৃষ্ট জ্ঞানশালী করিয়া নির্ম্মাণ করিয়াছেন।

দেবাশ্চিত্তে অসুর্য্য প্রচেতসো বৃহস্পতে যজ্ঞিয়ং ভাগ মানশুঃ।

২য় অ, ২য় ম, ৬ষ্ঠ অ, ২৩ সূ, ২,

এই মন্ত্রার্দ্ধের অনুবাদ এইরূপ কৃত হইয়াছে ;—

হে অসুর্য্য, প্রকৃষ্ট জ্ঞান সম্পন্ন বৃহস্পতি! দেবগণ তোমার যজ্ঞীয় ভাগ প্রাপ্ত হইয়াছেন্।

প্রথমতঃ অসুর্য্য পদের দীর্ঘ উকার নয়নে সর্ষপকুসুম সন্দর্শন করাইল। কারণ অসুর্য্য শব্দে সূর্য্য বিরহিত এই অর্থই প্রতীত হয়। তার পর প্রচেতসঃ এটীর অনুবাদ হইয়াছে প্রকৃষ্ট জ্ঞান সম্পন্ন। আবার বৃহস্পতে! এই সম্বোধন পদের বিশেষণ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। কিন্তু প্রথমার বহুবচনান্তপদটী যে কি প্রকারে সম্বোধন পদের বিশেষণ হইল তাহা বুঝিলাম্ না। পরমপূজ্য সায়ণাচার্য্য 'দেবাঃ' এই পদের বিশেষণ করিয়াছেন।

সুতরাং ইহার অনুবাদ এইরূপ হওয়া উচিত ;—

হে অসুর বিনাশক! বৃহস্পতে! প্রকৃষ্টজ্ঞানশালী ত্বদীয় দেবগণ ও যজ্ঞিয় ভাগ প্রাপ্ত হইয়াছেন্।

অধস্নান উদবতা সজোষসো রথং দেবাসো অভিবিক্ষু বাজযুম্।

২য় অ, ২য় ম, ৭ম অ, ৩১ সূ, ২,

ইহার অনুবাদ এইরূপ কৃত হইয়াছে ;—

হে সমান প্রীতিযুক্ত দেবগণ! এক্ষণে আমাদের রথ রক্ষা কর। উহা অন্ন অন্বেষণে জনপদে গমন করিয়াছে।

এক্ষণে আমাদের জিজ্ঞাস্য যে রক্ষা কর এ অংশটী আসিল কোথা হইতে? বোধ হয় মূলে উদবত এই টুকু দেখিয়া এইরূপ অনুবাদ হইয়া থাকিবে। কিন্তু পরম পূজ্য সায়ণাচার্য্য উহার অর্থ করিয়াছেন উদগময়ত। অর্থাৎ গমন করাও। এখানে অবধাতু গমনার্থক। তার পর উহা অন্ন অন্বেষণে জন পদে গমন

তাহা তাহার প্রাপ্তিযোগ্য নয়। 'অপ্যং' এ কথাটীর তাৎপর্য্য এই যে নিজ নিজ কর্ম্মানুসারে যে যাহা পাইতে অধিকারী।

এই মন্ত্রার্দ্ধের অনুবাদ এইরূপ হওয়া উচিত ;—

সূর্য্যের অস্ত হইলে বরুণ জঙ্গমগণের প্রার্থনীয়, প্রাপ্তিযোগ্য, সুখকর আশ্রয় (প্রদান করেন)।

বঙ্গ বধূ।

লেখিকা—শ্রীমতী নগেন্দ্র বালা সরস্বতী।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

মালা বদল।

শেহাড়া গ্রাম খানি ক্ষুদ্র। ক্ষুদ্র হইলেও অধিকাংশ অধিবাসীগণ ভদ্র কুল সম্ভূত এবং অবস্থাপন্ন। তদুপরি এই ক্ষুদ্র গ্রাম খানি সরস্বতী নদী তীরে অবস্থিত সুতরাং গ্রাম খানি ক্ষুদ্র হইলেও চাকচিক্যময়।

বসন্তকাল তাহাতে মধুর প্রাতঃকাল বৃক্ষলতা ফল পুষ্পে পরিশোভিত মধু আশী ভ্রমর গণের মধুর ঝঙ্কারে বনস্থলী প্লাবিত, পিক মুখরিত গীতিকায় উদ্যান আন্দোলিত। সময়টী বড়ই মধুর বড়ই মনোময়।

এই সময় নদী তীরে একটী বকুল বৃক্ষতলে একটী দশম বর্ষীয়া বালিকা বসিয়া মালা গাঁথিতে ছিল, একটী অষ্টাদশ বর্ষীয় বালক পুষ্প চয়ন করিয়া বালিকার সাহায্য করিতে ছিল। বহুক্ষণ এইরূপে অতিবাহিত হইল ; এই সময়ের মধ্যে বালিকা দুই গাছি সুন্দর বকুলের মালা তৈয়ার করিল। বালক জিজ্ঞাসা করিল "শৈলবালা এ মালা কি হইবে ?"

বালিকার নাম শৈলবালা। শৈলবালা বলিল কেন, শ্যামসুন্দরের ঘরে দিব শ্যামসুন্দরের গলায় মালা বড় সুন্দর দেখায় আমি আরও কতদিন শ্যামসুন্দরের জন্য মালা গেঁথে দিয়েছি। শ্যামসুন্দর শৈলবালার পিতৃ বংশের প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহ।

বালক কোন কথা না কহিয়া ধীরে ধীরে এক গাছি মালা লইয়া শৈলবালার গলায় পরাইয়া দিল। শৈলবালা ঈষৎ কুপিত হইয়া কহিল "ছিঃ কিরণ দাদা কি করলে আমার এত পরিশ্রমের মালা গাঁথা তুমি নষ্ট করলে কেন ? এত আর ঠাকুরকে দেওয়া চলবে না। বালকের নাম কিরণ কুমার। কিরণ কুমার কহিল "নষ্ট আবার কি ? শ্যামসুন্দরকে মালা পরাইলে সুন্দর দেখায়, তুমি তাই শ্যামসুন্দরের জন্য মালা গাঁথ তোমার গলায় মালা আমাকেও সুন্দর দেখায়, তাই আমি তোমার গলায় এক গাছি মালা পরাইয়া দিলাম। সত্য শৈলবালা ? বড় সুন্দর দেখাচ্ছে তুমি বড় সুন্দর ! এই সময় মৃদুল প্রভাত সমীরণে শৈলবালার অবিন্যস্ত কেশ গুচ্ছ তালে তালে দুলিতে ছিল। তৎসঙ্গে কিরণ কুমারের হৃদয়খানি ও যেন তালে তালে নাচিয়া উঠিল তিনি একবার স্বীয় হৃদয়ের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া পুনরায় ঊর্দ্ধ দৃষ্টি পূর্ব্বক একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া ধীরে ধীরে বসিয়া পড়িলেন তাঁহার চক্ষে যেন সমস্ত জগত টা ঘূর্ণ্যমান বোধ হইতে লাগিল. তিনি দুই হাতে হৃদয় চাপিয়া ধরিলেন। ইত্যবসরে শৈলবালা নিজ কণ্ঠদেশ হইতে মালা খুলিয়া কিরণ কুমারের গলায় পরাইয়া দিল কিরণ স্নেহ ভরে শৈল বালার কোমল হস্ত খানি ধরিয়া বলিল শৈল বালা একি করিলে ?

শৈল। আমার চেয়ে তুমি সুন্দর এ মালা তোমাকেই বেশী মানাইবে।

কিরণ। না শৈল বালা এ তোমার ভুল এ মালা তোমার গলাতেই সুন্দর দেখাইবে ইহা তোমার গলাতেই থাক। এই বলিয়া কিরণ কুমার নিজ কণ্ঠদেশ হইতে মালা উন্মোচন করিয়া পুনরায় শৈল বালার গলায় পরাইয়া দিল। এই রূপে বালক বালিকার মাল্য বিনিময় কার্য্য সমাধা হইল জানি না ভগবান উভয়ের ভাগ্য সূত্র কোন দিকে আকর্ষন করিবেন।

কিয়ৎক্ষণ উভয়েই নীরব অনন্তর কিরণ কুমার বালিকার পবনান্দোলিত কেশগুচ্ছ নাড়িতে নাড়িতে কহিলেন। শৈল বালা তোমার সম্বন্ধ হচ্চে শীঘ্রই তোমার বিবাহ হবে শুনেছ ?" বিবাহ কি বালিকা তাহা বুঝিত না বটে কিন্তু ইহার মধ্যে যে একটা লজ্জার আবরণ আছে বালিকার তাহা বুঝিতে বাকীছিল না তাই সে লজ্জা বিজড়িত কণ্ঠে কহিল "তুমি ভারি দুষ্টু।"

কিরণ। সত্য বলছি তোমার শীঘ্র বিয়ে হবে তখন আর আমাকে মনে থাকবে কি ?

শৈল বালা। বিয়ে হলে লোকে কি আপনার জনকে ভুলে যায় ?

তাহা তাহার প্রাপ্তিযোগ্য নয়। 'অপ্যং' এ কথাটীর তাৎপর্য্য এই যে নিজ নিজ কর্ম্মানুসারে যে যাহা পাইতে অধিকারী।

এই মন্ত্রার্দ্ধের অনুবাদ এইরূপ হওয়া উচিত ;—

সূর্য্যের অস্ত হইলে বরুণ জঙ্গমগণের প্রার্থনীয়, প্রাপ্তিযোগ্য, সুখকর আশ্রয় (প্রদান করেন)।

বঙ্গ বধূ।

লেখিকা—শ্রীমতী নগেন্দ্র বালা সরস্বতী।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

মালা বদল।

সেহাড়া গ্রামখানি ক্ষুদ্র। ক্ষুদ্র হইলেও অধিকাংশ অধিবাসীগণ ভদ্র কুল সম্ভূত এবং অবস্থাপন্ন। তদুপরি এই ক্ষুদ্র গ্রাম খানি সরস্বতী নদী তীরে অবস্থিত সুতরাং গ্রাম খানি ক্ষুদ্র হইলেও চাকচিক্যময়।

বসন্তকাল তাহাতে মধুর প্রাতঃকাল বৃক্ষলতা ফল পুষ্পে পরিশোভিত মধু আশী ভ্রমর গণের মধুর ঝঙ্কারে বনস্থলী প্লাবিত, পিক মুখরিত গীতিকায় উদ্যান আন্দোলিত। সময়টী বড়ই মধুর বড়ই মনোময়।

এই সময় নদী তীরে একটী বকুল বৃক্ষতলে একটী দশম বর্ষীয়া বালিকা বসিয়া মালা গাঁথিতে ছিল, একটী অষ্টাদশ বর্ষীয় বালক পুষ্প চয়ন করিয়া বালিকার সাহায্য করিতে ছিল। বহুক্ষণ এইরূপে অতিবাহিত হইল ; এই সময়ের মধ্যে বালিকা দুই গাছি সুন্দর বকুলের মালা তৈয়ার করিল। বালক জিজ্ঞাসা করিল "শৈলবালা এ মালা কি হইবে ?"

বালিকার নাম শৈলবালা। শৈলবালা বলিল কেন, শ্যামসুন্দরের ঘরে দিব শ্যামসুন্দরের গলায় মালা বড় সুন্দর দেখায় আমি আরও কতদিন শ্যামসুন্দরের জন্য মালা গেঁথে দিয়েছি। শ্যামসুন্দর শৈলবালার পিতৃ বংশের প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহ।

বালক কোন কথা না কহিয়া ধীরে ধীরে এক গাছি মালা লইয়া শৈলবালার গলায় পরাইয়া দিল। শৈলবালা ঈষৎ কুপিত হইয়া কহিল "ছিঃ কিরণ দাদা কি করলে আমার এত পরিশ্রমের মালা গাঁথা তুমি নষ্ট করলে কেন ? এতে আর ঠাকুরকে দেওয়া চল্‌বে না। বালকের নাম কিরণ কুমার। কিরণ কুমার কহিল "নষ্ট আবার কি ? শ্যামসুন্দরকে মালা পরাইলে সুন্দর দেখায়, তুমি তাই শ্যামসুন্দরের জন্য মালা গাঁথ তোমার গলায় মালা আমাকেও সুন্দর দেখায়, তাই আমি তোমার গলায় এক গাছি মালা পরাইয়া দিলাম। সত্য শৈলবালা ? বড় সুন্দর দেখাচ্ছে তুমি বড় সুন্দর ! এই সময় মৃদুল প্রভাত সমীরণে শৈলবালার অবিন্যস্ত কেশ গুচ্ছ তালে তালে দুলিতে ছিল। তৎসঙ্গে কিরণ কুমারের হৃদয়খানি ও যেন তালে তালে নাচিয়া উঠিল তিনি একবার স্বীয় হৃদয়ের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া পুনরায় উর্দ্ধ দৃষ্টি পূর্ব্বক একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া ধীরে ধীরে বসিয়া পড়িলেন তাঁহার চক্ষে যেন সমস্ত জগতটা ঘূর্ণ্যমান বোধ হইতে লাগিল তিনি দুই হাতে হৃদয় চাপিয়া ধরিলেন। ইত্যবসরে শৈলবালা নিজ কণ্ঠদেশ হইতে মালা খুলিয়া কিরণ কুমারের গলায় পরাইয়া দিল কিরণ স্নেহ ভরে শৈল বালার কোমল হস্ত খানি ধরিয়া বলিল শৈল বালা একি করিলে ?

শৈল। আমার চেয়ে তুমি সুন্দর এ মালা তোমাকেই বেশী মানাইবে।

কিরণ। না শৈল বালা এ তোমার ভুল এ মালা তোমার গলাতেই সুন্দর দেখাইবে ইহা তোমার গলাতেই থাক। এই বলিয়া কিরণ কুমার নিজ কণ্ঠদেশ হইতে মালা উন্মোচন করিয়া পুনরায় শৈল বালার গলায় পরাইয়া দিল। এই রূপে বালক বালিকার মাল্য বিনিময় কার্য্য সমাধা হইল জানি না ভগবান উভয়ের ভাগ্য সূত্র কোন দিকে আকর্ষণ করিবেন।

কিয়ৎক্ষণ উভয়েই নীরব অনন্তর কিরণ কুমার বালিকার পবনান্দোলিত কেশগুচ্ছ নাড়িতে নাড়িতে কহিলেন। শৈল বালা তোমার সম্বন্ধ হচ্চে শীঘ্রই তোমার বিবাহ হবে শুনেছ ?" বিবাহ কি বালিকা তাহা বুঝিত না বটে কিন্তু ইহার মধ্যে যে একটা লজ্জার আবরণ আছে বালিকার তাহা বুঝিতে বাকীছিল না তাই সে লজ্জা বিজড়িত কণ্ঠে কহিল "তুমি ভারি দুষ্টু।"

কিরণ। সত্য বলছি তোমার শীঘ্র বিয়ে হবে তখন আর আমাকে মনে থাক্‌বে কি ?

শৈল বালা। বিয়ে হলে লোকে কি আপনার জনকে ভুলে যায় ?

কিরণ। বিয়ে হলে আর দিন কত বাদে তুমি শ্বশুর বাড়ী যাবে কেনে তোমার আমায় দেখা শুনা ও এক প্রকার বন্ধ হবে। শৈল বালার চক্ষে জল আসিল বলিল কেন?"

কিরণ। সংসারের নিয়মই এই তুমি ছেলে মানুষ এ সংসারের কূটচক্র ভেদ করিতে তোমার এখনও অনেক বিলম্ব।

শৈল বালা। তবে আমি বিয়ে করব না।

কিরণ। সেত আর তোমার ইচ্ছাধীন নয়, তুমি হিন্দু কন্যা পিতা মাতার আদেশ ও ইচ্ছাই তোমার জীবনের উপর প্রভুত্ব করিবে বিবাহ না করিবার তুমি কে?

শৈলবালা। আমি বাবাকে বল্‌ব যদি আমার বিয়ে দেন তবে যেন তোমার সঙ্গেই দেন্ তাহলে ত তোমার কাছে থাকতে পারব তাহলে তুমি এমনি করে ফুল তুলে দেবে আমি মালা গাথব।

কিরণ কুমার বালক হইলেও সংসারের কূট চক্র ভেদ করিতে অনেকটা সমর্থ হইয়াছে বালিকার সরলতায় তাহার হৃদয় বিদীর্ণ হইল চোক ফাটিয়া জল আসিল বলিল; শৈল বিবাহ মুখের কথা নয় এ তোমার পুতুলের বিয়ে নয় যে, যার তার সঙ্গে বিয়ে হবে তোমাতে আমাতে অনেক প্রভেদ; এত প্রভেদ যে বিবাহ হইতেই পারে না তা যাক তার জন্য দুঃখ কি তোমার বাবা ভাল পাত্র দেখিয়া তোমাকে সম্প্রদান করবেন তখন তুমি কত সুখী হবে।

বালিকা কথা কহিল না কেবল দুই বিন্দু অশ্রু বর্ষণ করিয়া কহিল বড় রোদ হয়েছে এখন তবে বাড়ী চল। উভয়ে গৃহাভিমুখে প্রত্যাগমন করিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

বিবাহের কথা।

চন্দ্রনাথ বাবু শেঁহাড়া গ্রামের জমিদার এতভিন্ন তিনি রাজ সরকারে একজন উচ্চ বেতন ভোগী কর্ম্মচারি। তিনি ইংরাজি শিক্ষায় সুশিক্ষিত, এজন্য সাহেব মহলে ও তাঁহার যথেষ্ট প্রতি পত্তি। অনেক সম্ভ্রান্ত, ও বিদ্বান্ ধনাঢ্য ব্যক্তি গণের সহিতই চন্দ্রনাথ বাবুর ঘনিষ্টতা ও কুটুম্বিতা। চন্দ্রনাথ বাবুকে গ্রামের সকলেই শ্রদ্ধা ভক্তি করিত ও ভাল বাসিত। চন্দ্রনাথ বাবুর সহিত যে একবার আলাপ করিত সেই তাঁহার গুণে বিমুগ্ধ না হইয়া থাকিতে পারিত না। চন্দ্রনাথ

বাবু শিষ্ঠ জনের পিতৃবৎ দুষ্ট জনের যম স্বরূপ। চন্দ্রনাথ বাবু অসৎ লোকের সহিত কদাচ মিশিতেন না। তাস পাশা বা কোন রূপ ক্রীড়াদিতে কদাচ সময়ের অপব্যবহার করিতেন না। তিনি অধিকাংশ সময় রাজ কার্য্যে অতিবাহিত করিতেন। তিনি একজন ভাবুক ব্যক্তি অবসর সময়ে কখনও কখনও কবিতা রচনা করিয়াও সময়ের সৎব্যবহার করিতেন।

চন্দ্রনাথ বাবুর বাটিটী জমকাল রকমের। শিপাহি শাস্ত্রী দ্বারা দ্বার সুরক্ষিত বাটিটী দেখিলেই কোন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির বাটী বলিয়া অনুমিত হইত। শৈলবালা এই চন্দ্রনাথ বাবুর প্রথমা কন্যা এতদ্ব্যতীত চন্দ্রনাথ বাবুর আর একটি কন্যা ও একটি পুত্র ছিল, কন্যাটির নাম সুষমা পুত্রটির নাম লালচাঁদ। লালচাঁদ সর্ব্ব কনিষ্ঠ। চন্দ্রনাথ বাবু কর্ম্মোপলক্ষে বিদেশে থাকিতেন, শৈল বালার বিবাহ দিবার জন্য তিনি তিন মাসের ছুটী লইয়া দেশে আসিয়াছেন। ছুটী প্রায় শেষ হইয়া আসিল, অথচ শৈল বালার বিবাহ হয় না। শৈলবালা মাত্র দশম বর্ষিয়া বালিকা তাহাতে কায়স্থ ঘরের মেয়ে সুতরাং বিবাহের এত তাড়া ছিল না। কিন্তু চন্দ্রনাথ বাবুর মাতা এবং পত্নীর একান্ত বাসনা বালিকা কন্যার বিবাহ দিয়া হিন্দু ধর্ম্মের পরাকাষ্ঠা লাভ করিবেন।

মধ্যাহ্ন আহারাদি শেষ করিয়া চন্দ্রনাথ বাবু শয়ন প্রকোষ্ঠে বসিয়া তামাকু সেবন করিতেছেন পত্নী কুসুমিকা আসিয়া নিকটস্থ টেবিলে এক ডিপিয়া পান রাখিয়া বলিলেন, "তুমি ত বেশ নিশ্চিন্ত মনে তামাকু দেবীর আরাধনা করিতেছ এ দিকে ছুটী যে ফুরাইয়া আসিল, শৈল বালার বিবাহের কি কোচ্ছ?"

চন্দ্র। চেষ্টার ত ত্রুটি করিতেছি না আজ কালের দিনে কায়স্থ ঘরের অত ছোট মেয়ে কেউ নিতে চায় না আমি কি করব?

কুসুমিকা। তবে এখন স্থির করলে কি?

চন্দ্র। এখন বিবাহ বন্ধই রহিল, বছর বার না হলে আর শৈল বালার বিবাহের চেষ্টা করব না মনে করেছি ওর লেখা পড়ায় ভারি ইচ্ছা, একটু ভাল কোরে লেখা পড়া ও শিখুক।

গৃহিনী রাগিয়া উঠিলেন, বলিলেন লেখা পড়া শিখিবার জন্য মেয়ের বিবাহ দিবে না। লোকে একথা শুনলে কি বল্‌বে ওত আর চাকরী করে এনে খাওয়াবে না যে ওর লেখা পড়ার এত দরকার।"

চন্দ্র। তোমাদের ঐ এক ধারণা লেখা পড়া শিক্ষা কি কেবল চাকরীর জন্য? লেখা পড়া শিক্ষা না হইলে নিজ ধর্ম্ম শাস্ত্র সম্যক্ রূপ অনুশীলিত হয় না স্বীয় ধর্ম্ম

শাস্ত্র পরিজ্ঞাত হইয়া তদনুযায়ী জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করা স্ত্রী পুরুষ সকলেরই কর্ত্তব্য। ধর্ম্ম শাস্ত্রে প্রবেশ না থাকিলে কর্ত্তব্য জ্ঞানের বিকাশ হয় না, কর্ত্তব্য জ্ঞানের অভাব ঘটিলে সংসার বিষম অশান্তিময় হয়, এই সকল অশান্তি নিবারণের জন্য স্ত্রী পুরুষ সকলেরই বিদ্যা শিক্ষা আবশ্যক কেবল চাকরী করিবার জন্য লেখা পড়া নয়। কুসুমিকা বিরক্ত হইয়া কহিলেন, তবে এতদিন কেবল আমাদের মন দিয়া রেখেছ তা যাই হোক আমি এবার মেয়ের বিয়ে না দিয়ে ছাড়চি না। কালই পদ্ম ঘটককে লাগাইব এখনও ত, ফাগুন মাসের পনের দিন আছে।

চন্দ্র। এত ব্যস্ত কেন? মেয়েটার মাথা খাইয়া ফল কি? এত বাল্যি বিবাহে কত যে অনিষ্ট হয় তা কি খবর রাখ?

কুসুমিকা। অনিষ্ট আবার কি?

চন্দ্র। বাল্য বিবাহ হইতেই রোগের সংখ্যা বৃদ্ধি হইয়া দুর্ভিক্ষের সৃষ্টি হয়। পুরুষ বা স্ত্রী যৌবন রাজ্যে পঁহুছিতে না পঁহুছিতেই সংসারের চিন্তায় বিব্রত হইয়া পড়ে তাহাদের দ্বারা সংসার বা সমাজের অণু উপকার হয় না।

কুসুমিকা। তোমার ও সভ্যতার কথা রাখিয়া দাও এ সংসার তোমার সাহিত্যের পুষ্পময় রাজ্য নয় আমি তোমার কোন কথা শুনতে চাই না, আমি শীঘ্রই শৈল বালার বিবাহ দেব।

চন্দ্রনাথ বাবু কোন কথা না কহিয়া বিরক্তি চিত্তে কিয়ৎক্ষণ শান্তি লাভের জন্য প্রগাঢ় রূপে তামাকু দেবীর আরাধনা করিতে লাগিলেন। এমন সময় এক-খানি নূতন পুস্তক হস্তে লইয়া শৈলবালা সেই কক্ষে আসিয়া পিতার গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল "বাবা কেমন সুন্দর বই দেখ।"

চন্দ্র। কি বই পড় দেখি।

শৈল। "বীরাঙ্গনা কাব্য" এই শোন পড়ি। "ছিনু মোরা সুলোচনে গোদাবরী তটে।"

চন্দ্র। এ বই কোথা পেলি?

শৈল। কিরণ দাদা দিয়েছে।

চন্দ্র। কিরণ তোকে খুব ভাল বাসে নয় শৈলবালা?

শৈলবালা হাঁ আমাকে কত নূতন নূতন বই এনে দেন কত ভাল ভাল গল্প বলেন; কাল গীতার কথা কেমন সরল ভাবে বুঝিয়ে দিলেন তা এক প্রকার আমার মুখস্ত হয়ে গেছে।

চন্দ্র। যাদের বাড়ী বিয়ে হবে তাদের অনুমতি অনুসারে চোলতে হবে তারা যদি পছন্দ না করে তবে তোমার লেখা পড়া ত্যাগ করতে হবে বৈ কি?

শৈল বালার চক্ষে জল আসিল বলিল, তবে বাবা আমার বিয়ে দিওনা"।

কুসুমিকা ক্রুদ্ধ হইয়া শৈল বালাকে একটা চাপড় মারিয়া কহিলেন, বুড় মেয়ে একটু লজ্জা শরম নেই পোড়ার মুখী বাপের গলা ধরে কেমন বিয়ের কথা বলছে দেখ। অনন্তর চন্দ্র নাথ বাবুর প্রতি ভ্রুকুটি নিক্ষেপ করিয়া কহিলেন,- "মেয়ের দোষ দেব কি তুমিই ত মেয়ের মাথা খেলে!"

চন্দ্র। তোমারা ত মানুষ নও মনুষ্যত্ব বুঝিবে কি? মনে করে ছিলাম মেয়েটীকে মানুষের মত করে তুলব তা আর করতে দিলে না! মাতার নিকট তিরস্কৃত হইয়া শৈলবালা ছল ছল চক্ষে চিরুনী লইয়া পিতার কেশ বিন্যাস করিতে বসিল। গৃহিণী কক্ষান্তরে গমন করিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

নলিনী।

আমাদের এই আখ্যায়িকা আরম্ভ হইবার পর, চারি বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে। এই চারি বৎসরের মধ্যে সংসারে কত বিপর্য্যয় না ঘটিয়াছে। কত বালিকা নব স্বামি সম্মিলিত হইয়া নব তরু বেষ্টিত লতিকার ন্যায় পরি শোভিত হইয়াছে, কত যুবতী অকালে স্বামিরত্ন হারাইয়া নৈরাশ্য দহনে প্রপী-ড়িত হইয়া সংসার ও নিজ জীবনকে ধিক্কার দিয়া নীরব রোদনে হৃদয় বিদীর্ণ করিতেছে। কত রমণী নব কুমার লাভ করিয়া কুসুমিতা লতার ন্যায় পরি শোভিত হইয়া সংসারের চক্ষে প্রীতি প্রদান করিয়া আপনার জীবনকে কৃতার্থ মনে করিতেছে। কোন জননী অকালে উপযুক্ত পুত্ররত্নকে নিষ্ঠুর করাল কালের হস্তে সমর্পন করিয়া ক্ষিপ্ত প্রায় হইয়াছেন॥ সংসারের নিয়মই এই কেহ হাসে কেহ কাঁদে। রবিঅস্তাচল গমন করিয়াছেন বিরহিনী নলিনী ভগ্ন হৃদয়ে বদন বিমর্ষ করিয়াছে। প্রাণেশের অতুল্য মাধুর্য্য দর্শনে কুমুদিনী হাসিয়া উঠিয়াছে; সংসারে কেহ কাহারও জন্য কাতর নয় একের অশ্রু জলে অন্যের হৃদয় ভাঙে না, কে বলিবে জগতে কেন এ বৈষম্য! হে সরলবিশ্বাসি

তুমি হয় ত বলিবে কর্ম্ম ফল। কিন্তু এ কর্ম্ম ফল কোথা হইতে আসিল। যে নিতান্ত বালিকা কর্ম্মে যাহার কিছু মাত্র অধিকার হয় নাই; কর্ম্ম কাহাকে বলে কিছু মাত্র বুঝিবার ক্ষমতাও যাহার নাই সে কেন সংসারের কঠোর পেষণে দগ্ধ হয়? ইহা কি তাহার কর্ম্মফল! তবে কর্ম্ম ফল কি অনাদি! হে রহস্যময় তোমার অপার রহস্য বুঝিবার ক্ষমতা আমাদের নাই। সরলা শৈলবালার চক্ষে জল কেন? কে বলিবে ইহা কোন দুর্নিবার কর্ম্ম ফলের অলঙ্ঘ্য ফল।

চন্দ্রনাথবাবু গৃহিণীর ইচ্ছার ব্যতিক্রম করিতে পারেন নাই, তাঁহার অনিচ্ছা সত্বেও গৃহিণীর ইচ্ছানুযায়ী শৈলবালার বিবাহ হইয়া গিয়াছে, শৈলবালা এখন বাল্যসীমা অতিক্রম করিয়া যৌবন রাজ্যে প্রবেশোন্মুখী হইয়াছে, শৈলবালার বয়স এখন চতুর্দ্দশ বৎসর।

মনোহরপুর পল্লীগ্রাম হইলেও গ্রামখানি প্রশস্ত ধনী লোকের সংখ্যাই এগ্রামে অধিক মজুমদার বাবুরা এগ্রামের বিশেষ সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি শুধু এগ্রামে কেন দেশে বিদেশেও তাঁহাদের বংশ মর্য্যাদার যথেষ্ট সম্মান আছে, তবে বাহিরে তাঁহাদের আর্থিক স্বচ্ছলতা যে পরিমানে দৃষ্ট হইয়া থাকে, ভিতরে সেরূপ নহে। শৈল বালা এই সুপ্রসিদ্ধ মজুমদার গৃহের বধু হইয়াছেন।

চন্দ্র নাথ বাবু ইহাদের বাহ্যিক অবস্থা দৃষ্টে ও সুনাম শ্রবণে এবং নলিন চন্দ্রের সচ্চরিত্রতা দৃষ্টে বিমুগ্ধ হইয়া নলিনের হস্তে শৈলবালাকে সম্প্রদান করিয়াছেন। সংসারে অনেক জিনিস বাহির হইতে সুন্দর দেখায়, কিন্তু অন্তঃপুরে শূন্য চন্দ্র নাথ বাবুর পরিস্কৃত মস্তিষ্ক এ কথা বুঝিতে পারে নাই।

নলিন এক্ষণে বিংশ বর্ষীয় যুবক তাহার আরও দুইটী ভ্রাতা এবং দুইটী ভগ্নী আছেন। বিপিন চন্দ্র নলীনের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা নলীন মধ্যম, কনিষ্ঠের নাম সুশীল। জ্যেষ্ঠ ভগ্নীর নাম সরলা কনিষ্ঠের নাম তরলা। নলিন বাল্যেই পিতৃহীন মাতা বর্ত্তমান। বিপিন চন্দ্র কলিকাতার কোন আফিসে ৩০৲ টাকা বেতনে ক্লার্কের পদে নিযুক্ত ছিলেন; মাতাকে কখন একটী পয়সা দিতেন না, তাহাদের সংসারিক ব্যয় বৈষয়িক আয় হইতে এক প্রকার নির্ব্বাহ হইত।

এই প্রথম দ্বিরা গমনে শৈলবালা স্বশুরালয়ে আসিয়াছেন। বঙ্গবধূগণ অনেক দিনাবধি পরাধীনতা এবং শাশুড়ী ননদ প্রভৃতির নিকট হইতে সামান্য কারণে প্রায়ই লাঞ্ছিত হইতে হইলেও দ্বিরা গমনে আসিয়া বধু দিগকে কোন রূপ নির্য্যতন সহ্য করিতে হয় না। এসময় আসিয়া তাহারা যে ২।৩ মাস অবস্থান করে, সে কয় মাস বেশ আদরের সহিত কাটিয়া যায়। বঙ্গবধুর পক্ষে

সাধারণতঃ বঙ্গ দেশের ইহাই নিয়ম। কিন্তু শৈলবালার ভাগ্যে এ নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে। শৈলবালা পিত্রালয়ে অবস্থান সময়ে চন্দ্র নাথ বাবু মধ্যে মধ্যে জামতাকে লইয়া যাইতেন, স্বামির নিকট যত সোহাগ স্নেহ পাওয়া উচিত শৈলবালা তাহা পাইত না। নলিন তাকে কেমন যেন ঘৃণার চক্ষে দেখিত। বালিকা শৈলবালা সে ভাব স্পষ্ট উপলব্ধি করিতে পারিত না, পারিলেও নলিন যে তাহাকে ভাল বাসে নাই, একথাটী সে বেশ অনুভব করিত। বালিকা মনের ব্যথা কাহাকে ও বলিত না, কেবল গোপনে কাঁদিয়া বুক ভিজাইত। অবসর মত কিরণ তাহাকে স্বামির স্নেহ সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন করিলে বালিকা কোন উত্তর দিত না, কেবল নীরবে অশ্রুপাত করিত। সে নীরব রোদনের অর্থ কিরণের বুঝিতে বাকী থাকিত না।

তার পর শৈলবালা শ্বশুরালয়ে আসিল, কিন্তু হায়! বালিকার একি দুর্ভাগ্য বিধাতা কি কেবল এ সুন্দর কুসুমটীকে অনলে দগ্ধ করিবার জন্যই সৃষ্টি করিয়াছেন। শৈলবালা আসিয়াবধি সাশুড়ীর নিকট শ্রদ্ধা ভক্তির বিনিময়ে কেবল অনাদর লাঞ্ছনা লাভ করিতে লাগিল। বালিকার ভগ্ন বুক আরও ভাঙ্গিল বদনের বিষাদময় কাল ছায়া আরও ঘনীভূত হইল।

বৈশাখ মাস বেলা দ্বিপ্রহর আহারাদি সম্পন্ন করিয়া সকলেই নিজ নিজ স্থানে গৃহের গবাক্ষ প্রভৃতি রুদ্ধ করিয়া নিদ্রা দেবীর আরাধায় নিযুক্ত, কেবল মজুমদার বাটীতে একটী বালিকা বধু দ্বিতলের একটী প্রকোষ্ঠে বসিয়া নীরবে রোদন করিয়া বক্ষ স্থল প্লাবিত করিতেছে, বালিকার চক্ষে নিদ্রা নাই, বিশ্রামের চেষ্টা নাই চক্ষু রক্ত বর্ণ দেখিলেই বুঝিতে পারা যায়, বালিকা বহুক্ষণ রোদন করিয়াছে।

বালিকা একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিল, আমার ভাগ্য এমন কেন? সংসারে কেহ হাসে কেহ কাঁদে, আমি কেবল কাঁদি কেন? সংসারে পরস্পর পরস্পরের ভাল বাসায় আবদ্ধ কিন্তু এ সংসারে আমাকে ভাল বাসিতে কে আছে! শুনিয়াছি, জগতে মাতৃ স্নেহ সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, কিন্তু আমি আজ তিন মাস এখানে আসিয়াছি আসিয়া অবধি নানা প্রকার পীড়ায় কেবল ভুগিতেছি তাত মা জানেন, আমাকে লইয়া যাইতে বলিলাম; তিনি বলিলেন মেয়ে মানুষ চঞ্চলা হওয়া ভাল নয়, অসুখ হয়েছে, সেরে যাবে আসবার জন্য এত তাড়া কেন? হায় এই কি মাতৃ স্নেহ! শুনিতে পাই স্বামির স্নেহে রমণীর জগত মধুময় কিন্তু আমার ভাগ্যে একি! কৈ তিনি ত আমাকে এক বিন্দু স্নেহ করেন না, আমি

তাঁহাকে একটিবার দেখিবার জন্য আকুল হইয়া থাকি, তিনি ত সকল দিন একবার দেখাও দেন না কেন? আমার কি অপরাধে এমন হইল। বালিকা আর ভাবিতে পারিল না, হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইতে লাগিল; সেই শূন্য কক্ষে কিয়ৎক্ষণ পদ চারণা করিয়া রমনী আবার ভাবিল সাশুড়ীর কাছেই বা কি অপরাধ করিলাম কেন তিনি প্রতি নিয়ত আমাকে এমন যন্ত্রণা দেন। আমি কি কেবল যন্ত্রণা ভোগ করিবার জন্যই এসংসারে আসিয়াছি, হায়! কিরণ দাদা আমার এ যন্ত্রণা যদি তুমি একবার স্ব চক্ষে দেখ্‌তে তবে নিশ্চই দুই বিন্দু অশ্রুপাত না করে, থাক্‌তে পার্‌তে না। এ রমনী আর কেহ নয়, আমাদের পরিচিতা শৈল বালা।

———o———

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

কলিকাতার কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটের একটি মেসের একটি কক্ষে এক খানি চৌকির উপর অর্দ্ধশায়িত ভাবে একটি যুবক সেক্সপিয়র পাঠ করিতে ছিলেন, পাঠ করিতে ছিলেন কিনা একথা ঠিক বলা যায় না, কেন না যুবকের চক্ষুর স্থিরতা ছিল না, চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল যেন প্রিয় বস্তুর অন্বেষণে ব্যস্ত। কিয়ৎক্ষণ পরে পুস্তক বন্ধ করিয়া একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ পূর্ব্বক যুবক বলিল, "হায়! ভুলিব মনে করিলেও কেন তাকে ভোলা যায় না, আবার যদি মনেই হয় তবে এক সময় সেই সুকোমল কায়াটীর সমস্ত মূর্ত্তি খানি মনে করিতে পারি না কেন? সমস্ত মূর্ত্তি খানি দূরে থাক্‌ সমস্ত মুখ খানিও ত মনে পড়ে না, কখন সেই সরলতা মষ কপোল দুখানি মনে হয়, কখনও বা সেই স্নেহের নিঝর স্বরূপ আয়ত নয়ন দুটি নয়নে ফুটিয়া উঠে; কখন সেই ছোট নাসিকাটি মনে পড়ে যদি একাধারে সমস্ত মুখ খানি মনে পড়িত, তবে মরি মরি কি সৌন্দর্য্য প্রতিমাই দেখিতাম, কিন্তু হায়! আমার ভাগ্যে তাহাও হয় না। যাহাকে এত ভাল বাসি প্রাণ ভরিয়া ভাল বাসি তাহার মুখ খানি মনে করিতে পারি না; বিধাতার একি বিচিত্র বিধি। কোন কবি বলিয়াছেন "কেমন করিয়া বলিবে কেমন সেই মুখ খানি" তবে কি যাহাকে ভাল বাসি, তাহার রূপ বর্ণনা করা যায় না; তাকে একবারে স্মরণ হয় না সে কি কেবল অনুভবের সামগ্রী। "হাঁ তাই বটে"

যুবক আবার সেক্সপিয়র খুলিলেন, এবার যুবকের ম্লান মুখে একটু ক্ষীন হাসি দেখা দিল বলিলেন, রসিক কবি এখানে রসের চূড়ান্ত করিয়াছেন :—

"প্রণয় তোমার প্রকৃতি, যদি হে
নিষ্ঠুর অতি, তুমিও
কঠিন হও নিষ্ঠুর প্রণয়ে"।"

অপূর্ব্ব যুক্তি বটে! কিন্তু হায়, তা কি হয়! এ যে বিষম কণ্টক একবার হৃদয়ে বিদ্ধ হইলে আর কি উৎপাটন করা যায়। ইহা সামান্য কণ্টক নয়। ময় দানবের শক্তি সেল সজোরে উৎপাটন করিতে যাও হৃদয় ভাঙ্গিয়া যাইবে। হায় সে যদি সুখে থাকিত, তবে আজ তাহার জন্য এত কাঁদিতাম না। তাহাকে শয্যা সঙ্গিনী রূপে নাই পাইলাম, তজ্জন্যত দুঃখ নাই, তাহাকে ভগ্নী রূপে ভাল বাসিয়াই কৃতার্থ হইতাম, কিন্তু সে যে অহোরহ যন্ত্রনায় দগ্ধ হইতেছে, যাহার জন্য হৃদয় সিংহাসন উন্মুক্ত করিয়া রাখিয়াছি তাহার এ যন্ত্রণা কোন প্রাণে সহিব। কত সাধ করিয়া তাহাকে লেখা পড়া শিখাইলাম, বড় সাধ ছিল, আমার সেই শিক্ষা এক দিন অমৃত ময় ফল ফলিবে, উপযুক্ত জমি-তেই শস্যের বীজ রোপিত হইয়াছিল, সুবৃষ্টির অভাবে আমার চির পোষিত আশা ভস্মীভূত হইল। যে স্থলে শৈলবালা পড়িয়াছে, সেত উত্তপ্ত মরুভূমি। হায়, চন্দ্র নাথ বাবু এই কি তোমার পিতৃ বাৎসল্য! হায় শৈলবালা তোমার ভাগ্যে এই ছিল! ধিক আমার ভাগ্যকে তোমার এত কষ্টও দেখিলাম। এ যুবক আমাদের সুপরিচিত কিরণ কুমার। কিরণ কুমার আর ভাবিতে পারিলেন না, তাঁহার নয়ন হইতে দর দর ধারায় অশ্রু পতিত হইয়া বক্ষঃস্থল প্লাবিত করিতে লাগিল, তিনি দুই হাতে কপাল টিপিয়া নিকটস্থ একখান চেয়ারে গিয়া বসিলেন। এমন সময়ে ডাক পিয়ন আসিয়া তাঁহার হাতে দুই খানি পত্র দিয়া গেল।

তিনি এক খানি পত্র খুলিলেন, পত্রে লেখা ছিল, "কিরণ দাদা তুমি কেমন আছ, আর কি আমায় মনে কর, আমি যে কত দুঃখে দিন যাপন করিতেছি, তোমাকে কি বলিব। সকল কথা শুনিলে হয়ত তুমি চক্ষের জল সম্বরণ করিতে পারিবে না। স্বামির অনাদর, সাশুড়ীর লাঞ্ছনা, আমাকে প্রতি নিয়ত দগ্ধ করিতেছে। প্রত্যেক বঙ্গ বধুর কি এই অবস্থা না, আমারই এই পরিণাম। স্বামির চক্ষের কণ্টক স্বরূপ হইয়াছি, কেন হইয়াছি জানি না! তবে আমার রূপ হীনতাই ইহার প্রধান কারণ বলিয়াই বোধ হয়। কি করিলে স্ত্রী লোক রূপবতী হয় বলিতে পার?"

তোমার স্নেহের—শৈল বালা।

কিরণের হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া গেল। হৃদয় হীনতা কি আশ্চর্য্য! রূপ কাহাকে বলে নলিন কি কিছু বুঝে না? কেবল কটা চামড়া হইলেই কি সুন্দর হয়? না হয় স্বীকার করিলাম শৈলবালার রূপ নাই; কিন্তু তেমন গুণবতী স্ত্রী আর আছে কি? নলিন তাহার গুণের মূল্য বুঝিল না, নলিন কি অন্ধ! হায়। ভগবান যাহাকে পাইলে অহোরহ প্রেম পুষ্পে পূজা করিতাম, তার আজ এই দশা। অনন্তর তিনি দ্বিতীয় পত্র খানি খুলিলেন, এ খানি তাঁহার এক বন্ধুর পত্র। এ পত্রে লেখা আছে, "কিরণ, তুমি কি আমাদের পরিত্যাগ করিতে চাও? তুমি বিবাহ করিতে চাও না তোমার হৃদয়ে কি ব্যথা, জিজ্ঞাসা করিলে উত্তর পাওয়া যায় না। তোমার এ ভাব দেখিয়া তোমার মায়ের মনে এক বিন্দু সুখ নাই, তিনি কেবল রোদন করেন। তোমার মত সর্ব্বগুণান্বিত পুত্রের কি ইহা কর্ত্তব্য কর্ম্ম? তোমার গুন অতুলনীয় তোমারে বন্ধু রূপে পাইয়া আমরা কৃতার্থ কিরণ তুমি অমূল্য জিনিস, তুমি শোকার্ত্তের সান্তনা, রোগীর পিতা, দীনের আশ্রয় দেশের গৌরব; তোমার এ হেন নির্ম্মল চরিত্র, জননীকে কাঁদাইয়া কলঙ্কিত হই-তেছ ইহা আমাদের অসনীয় তুমি বিবাহ করিয়া সংসারী না হইলে, তোমার জননী ক্ষিপ্ত প্রায় হইবেন, তাঁহাকে এরূপ ক্লেশ দেওয়া তোমার মত পুত্রের উচিত কি? সম্প্রতি তুমি এই পত্র পাঠ এক বার বাড়ী আসিবে, ইহা তোমার মাতার আদেশ বলিয়া জানিবে ভরসা করি ভাল আছ।

তোমার—শ্রীশ।

কিরণ পত্র পড়িয়া কিয়ৎক্ষণ ইতস্ততঃ করিয়া ভাবিলেন বিবাহ! শৈলবালাকে হৃদয়ে আসন দিয়া আবার বিবাহ করিতে হইবে! বিবাহ মানব জীবনের প্রধান সুখ সত্য, কিন্তু শৈল বালার জন্য যদি সেই সুখ বিসর্জন করিতে পারি, তাহা হইলেও অনেকটা সুখী হই, কিন্তু এত হইল নিজের সুখের কথা। মাতার জন্য কি করিলাম। পরের জন্য আত্ম বলি করাই মনুষত্ব আর আমি এমন নরাধম যে নিজের সুখের জন্য মাকে কাঁদাইব। তবে কি বিবাহ করিব। শৈল বালা কি বলিবে! শৈল বালা কিছু বলিবার মেয়ে নহে, বিশেষতঃ তাহার মত গুন বতা রমণী আত্ম বলি প্রদান করিতেই উপদেশ দিবে। তবে আর কাহার জন্য জননীর প্রাণে আঘাত দিই। একবার তো মায়ের কাছে যাই, তাঁহার অবস্থা দেখিয়া ব্যবস্থা করা যইবে। তৎপর দিন কলেজ হইতে এক সপ্তাহের ছুটী গ্রহণ করিয়া বাটীতে গমন করিলেন।

উষ্ণ জলের উপকারিতা।

লেখক,—ডাক্তার শ্রীহেমচন্দ্র সেন এম, ডি,

বঙ্গদেশের অনেক স্থলেই অজীর্ণ রোগ, ম্যালেরিয়া এবং কলেরায় (বিসূচিকায়) অনেক লোক অকালে মরিতেছে। আমি বহুদিন হইতে দরিদ্র পল্লিবাসীদিগকে কি সহজ উপায়ে রক্ষা করা যায় এই বিষয় চিন্তা করিতেছি। চিকিৎসকেরা অনেক বিষয় জানেন, কিন্তু সে জ্ঞান দরিদ্র কৃষকগণ কিয়ৎ পরিমাণে জানিলে অনেক বিপদ হইতে রক্ষা পাইতে পারেন। এই উদ্দেশ্যে দেহ রক্ষা করিবার কতকগুলি সদুপদেশ জনসাধারণকে জানাইবার জন্য প্রবৃত্ত হইলাম। অধিকাংশ রোগই জলের দোষে হইয়া থাকে, সুতরাং জল সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলিব। জলকে ফুটাইয়া ছাকিয়া লইলে সে জলে কোন সংক্রামক রোগ হইতে পারে না। কলেরা, ক্রিমিরোগ, অনেক প্রকার জ্বর, উদরাময় প্রভৃতি রোগ দূষিত জল হইতে উৎপন্ন হয়। সুতরাং জলের দোষ নিবারণ করিবার জন্য জলকে ফুটাইয়া তৎপরে ছাকিয়া ব্যবহার করা আবশ্যক। প্রতিদিনের ব্যবহারোপযোগী জল ফুটাইয়া লইয়া শীতল করিয়া রাখা উচিত।

অজীর্ণ রোগে উষ্ণ জলের আবশ্যকতা :—

১। খালি পেটে উষ্ণ জল পান করিলে অম্লপিত্ত জনিত বুকজ্বালা, ও অম্ল উদ্গার হয় না।

২। উষ্ণ জল আমাশয় (Stomach) হইতে গাঢ় শ্লেষ্মা দূর করে, বলিয়া আহারীয় দ্রব্য শীঘ্র হজম হয়, উদরে শ্লেষ্মা থাকিলে পরিপাক হইতে দেয় না।

৩। পরিপাক না হইলে এক প্রকার বিষাক্ত পদার্থ জন্মায়। উষ্ণ জল পান করিলে সেই বিষাক্ত পদার্থ মলদ্বার দিয়া নির্গত হইয়া যায়। গরম জলে কোষ্ঠ পরিষ্কার থাকে।

৪। আমাশয় ও পক্কাশয় হইতে উষ্ণ জল যকৃত প্রভৃতির অভ্যন্তরে গমন করতঃ পিত্ত-নিঃসরণ ক্রিয়া বৰ্দ্ধিত করে।

৫। যাঁহারা শুষ্ক কাসে কষ্ট পান, অর্থাৎ যাঁহাদের কাসিয়া বিশেষ কিছু উঠে না তাঁহাদের পক্ষে রাত্রিকালে শয়নের পূর্ব্বে ২টী অঙ্গুলিতে যতটুকু সৈন্ধব লবণ লওয়া যায়, সেই পরিমাণ লবণ এক গ্লাস উষ্ণ জলের সহিত পান করিলে, কাশির বিশেষ উপকার হয়। ইহাতে শ্বাস নলির শ্লেষ্মা তরল হয়, এবং কাশির কষ্ট অনেক

পরিমাণে হ্রাস হয়। হাঁপানি রোগেও এইরূপ জলপান করিলে উপকার হয়।

৬। উষ্ণ জল পান করিলে শরীরের বাত প্রভৃতি ব্যাধি বিষ ধৌত হইয়া নির্গত হইয়া যায়।

৭। খালি পেটে উষ্ণ জল পান করিলে, মূত্র নিঃসরণ ক্রিয়া বর্দ্ধিত হয়। যাঁহাদের প্রস্রাব অল্প পরিমাণ হয়, তাহাদের সেই প্রস্রাব প্রায়ই রক্ত বা পীতবর্ণ এবং অত্যন্ত ক্ষারযুক্ত হইয়া থাকে; এইরূপ অবস্থায় প্রস্রাব করিতে জ্বালা বোধ হয়, এই প্রকার মূত্র দোষ দুর করিতে উষ্ণ জল বিশেষ ফলপ্রদ।

৮। শীতল জলের পরিবর্ত্তে গরম জল পান করিলে মেদ বৃদ্ধি আরোগ্য হয়।

৯। গরম জলের সহিত কিঞ্চিৎ পরিমাণে সোডা চূর্ণ পান করিলে যকৃতের ভিতর পিত্ত জমিয়া প্রস্তর হইতে পারে না। অবরুদ্ধ পিত্ত জনিত যকৃত শূল নিবারনার্থ ভূয়ো ভূয়ঃ এইরূপ জল পানে অনেক উপকার হয়।

১০। জ্বরে বিসূচিকা রোগে বা রক্ত স্রাবে ঈষৎ উষ্ণ লবণ মিশ্রিত জল পান করিলে রোগী সুস্থতা লাভ করে। এক ছটাক জলে ২ রতি লবণ দিলে এই প্রকার লবণাক্ত জল প্রস্তুত হয়। এই জল পান করিলে বা পিচকারি দিয়া অভ্যন্তরে প্রয়োগ করিলে, মৃতপ্রায় রোগীও জীবিত হইতে পারে।

১১। বমি নিবারণ করিবার জন্য অল্প পরিমাণ অত্যুষ্ণ জল পান করায় বিশেষ ফল হয়। রোগী যত উষ্ণ সহ্য করিতে পারে ত এইরূপ জল এক এক চামচ্ পান করাইলে বমন রোগে আশাতীত ফল পাওয়া যায়।

১২। ঘর্ম্ম নিঃসরণ ক্রিয়া বর্দ্ধিত করিবার জন্য, মূত্র যন্ত্র প্রদাহে এবং জ্বরে উষ্ণ জল বিশেষ উপকারি।

১৩। উষ্ণ জলের ভাপ্‌রা কিম্বা নিম ও নিসিন্দা পত্র সিদ্ধ জলের ভাপ্‌রা বাত রোগে এবং রক্ত দুষ্টি রোগে বিশেষ ফলপ্রদ। আমি অনেক বাত রোগে নিম ও নিসিন্দার ভাপ্‌রায় যথেষ্ট ফল পাইয়াছি। উষ্ণ জলের বাষ্প কোন প্রকারে গলার ভিতর প্রবেশ করাইতে পারিলে, অনেক প্রকার গল রোগে, স্বর ভেদ প্রভৃতি রোগে উপকার দৃষ্ট হয়।

বিচার করিয়া দেখিলে অধিকাংশ রোগই ভালরূপ পরিপাক না হওয়াতে উৎপন্ন হয়। যদি ক্ষুধা ভাল থাকে, ভালরূপ পরিপাক হয়, এবং শরীরের মল নির্ব্বিঘ্নে নির্গত হয়, তাহা হইলে প্রায়ই রোগ হয় না। আমাদের এই বঙ্গদেশে অজীর্ণ রোগগ্রস্ত ব্যক্তির সংখ্যাই অধিক। এই সকল লোক যদি যথাসাধ্য ব্যায়াম করে, এবং অভুক্ত অবস্থায় /০ এক পোয়া কিম্বা /৶০ দেড় পোয়া পরিমাণে উষ্ণ জল

পান করে, তাহা হইলে অনেক প্রকার স্বচ্ছন্দে থাকিতে পারে। উষ্ণ জল চার মত করিয়া অল্প অল্প পান করিলে, অধিক ফল হয়। উষ্ণ জল-পানের ২।৩ ঘণ্টা পরে আহার করা বিধেয়। আমি অনেক সময়ে দেখিয়াছি যে, সায়াহ্নে (বেলা ৩।৪ টার সময়) পুনর্ব্বার উষ্ণ জল সেবন করিলে, অম্লপিত্ত রোগ সাম্য থাকে। এই সকল রোগীরা আহারের সহিত বা আহারের অব্যবহিত পরে জলপান করিবে না।

মুর্চ্ছা, পিত্তাধিক্যে, দাহে, রক্ত দুষ্টিতে, সুরাপান জনিত রোগে, শ্রমে, গাত্র ঘূর্ণন রোগে এবং রক্ত স্রাব রোগে শীতল জল ব্যবহার করা শ্রেয়ঃ।

শীতল জল নিষেধ, ঃ———পার্শ্ব শূলে, প্রতিশ্যায়ে, বাত রোগে, গলগ্রহে, আধ্মানে, স্তিমিত কোষ্ঠে, বিরেচনাদি গ্রহণের পর, এবং নব জ্বর, অরুচি, গ্রহণী, গুল্ম, শ্বাস, কাস, ও বিদ্রধি রোগে শীতল জল বর্জ্জন করিবে।

জল পরিপাকের কাল ঃ—কাঁচা জল দুই প্রহরে পরিপাক হয়, গরম জল শীতল করিয়া পান করিলে, এক প্রহরে এবং ঈষদুষ্ণ জল পান করিলে অর্দ্ধ প্রহরে পরিপাক হয়।

অম্লপিত্ত রোগে জল ও চাউলের ব্যবহার ঃ—আমি অনেক স্থলে ৫।৬টী চাউল চর্ব্বন না করিয়া উষ্ণ বা শীতল জলের সহিত গ্রাস করিতে পরামর্শ দিই, ইহাতে, আমাশয়ের (Stomach এর) অজীর্ণ জনিত যাবতীয় পদার্থ শীঘ্রই পক্কাশয়ে নির্গত হইয়া যায়। আমি অনেক স্থলে মুর্গিগণকে ছোট ছোট প্রস্তর খণ্ড গ্রাস করিতে দেখিয়াছি, ইহাতে ইহাদের অগ্নি দীপ্ত হয়। ইহা হজম না হইলেও পক্কাশয় ও আমাশয়কে উত্তেজিত করিয়া পরিপাক শক্তি বৃদ্ধি করে এবং কোষ্ঠ পরিষ্কার করে।

আশা করি আমার এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে অক্ষম রোগীদিগের উপকার হইবে। যাঁহারা এই প্রবন্ধ পাঠ করিবেন, তাঁহাদের প্রতি সবিনয়ে এই অনুরোধ যে তাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া ইহার মর্ম্ম নিরক্ষর দরিদ্র পল্লিবাসিগণকে বুঝাইয়া দিবেন।

পরম কল্যাণ গীতা।

লেখক—শ্রীমদ্ শিবনারায়ণ স্বামী।

যজ্ঞতত্ত্ব বর্ণন।

জগতের মঙ্গল, চিত্তশুদ্ধি ও পরমেশ্বরের প্রীতির জন্য যজ্ঞাহুতি করিবার বিধি আছে। যাহা দ্বারা ব্যবহারিক ও পারমার্থিক কার্য্য উত্তমরূপে সমাধা হয়,

তাহাই যজ্ঞাহুতি জানিবে। প্রধানতঃ যজ্ঞাহুতি তিন প্রকার, উত্তম উত্তম
পদার্থ সমুদয় অগ্নিতে হোম জীব পালন ও আত্মজ্ঞান লাভ বা ব্রহ্ম প্রাপ্তি। উত্তম
উত্তম দ্রব্য ঘৃতাদি অগ্নিতে হোম করিলে, জগতের দুঃখ সৎ কার্য্যের বিঘ্ন ও অসৎ
প্রবৃত্তির লয় এবং সুবৃষ্টি হইয়া অপরির্য্যাপ্ত ফল মুল অন্নাদি উৎপন্ন হয়। ইহাতে
প্রজা সুখে থাকিবে, জীব মাত্রকে আহার দিলে পরমাত্মাকেই আহার দেওয়া হয়।
অগ্নি ব্রহ্মই উদরাগ্নি রূপে জীবের উদরে অন্ন পরিপাক করেন। জীব পালনই
সকল যজ্ঞের উদ্দেশ্য। অবিদ্যা আশা তৃষ্ণা লোভ মোহ-দ্বৈত অদ্বৈত নিরা-
কার সাকার প্রভৃতি ভ্রম ও মনের সহিত সমস্ত ইন্দ্রিয়ের আশক্তি. পূর্ণ পর ব্রহ্ম
জ্যোতি স্বরূপ গুরু মাতা পিতাতে লয় করা পরম যজ্ঞ জানিবে। ইহাতে জীব
পরম আনন্দও শান্তি পায়।

শাস্ত্রে গোমেধ অশ্বমেধ নরমেধ বাজ পেয় গোষ্টমঅ গ্নিষ্টোম জ্যোতিষ্টোম প্রভৃতি
যজ্ঞ কথিত আছে। গো মাংস দ্বারা অগ্নিতে হোম করার নাম গোমেধ যজ্ঞ বলেও
বিশ্বাস করে। কথিত আছে পুর্ব্ব পুর্ব্ব যুগে প্রধান প্রধান ঋষিগণ এই যজ্ঞ করিতেন,
এবং ইহা দ্বারা ব্রহ্ম জ্ঞান লাভ ও পরমানন্দ পাইতেন, কিন্তু ইহাকে যথার্থ গোমেধ
যজ্ঞ বলে না। জ্ঞানাগ্নিতে ইন্দ্রিয়ের সমস্ত আশক্তি হোম করাকে গোমেধ বলে।
গো অর্থে ইন্দ্রিয়, বিচার দ্বারা জ্ঞান ও জ্ঞান হইতে সুখ দুঃখ বিশেষ অবগত হওয়া
যায় এই জ্ঞান লাভ করিয়া দুঃখ দায়ক ইন্দ্রিয় প্রবৃত্তিকে নিরোধ করিয়া সত্যোস্থিত
করাকেই গোমেধ যজ্ঞ জানিবে। নচেৎ গো মাংস হোম করাকে গোমেধ যজ্ঞ
বলা হয় না।

প্রবাদ আছে রাজাগণ অশ্ব মাংসে হোম করিতেন, উহার নাম অশ্বমেধ যজ্ঞ।
অনিয়মিত বেগশালী মনরূপ অশ্ব জগতের নানা বিষয় ভোগের জন্য দৌড়াইতেছে,
ঋষিগণ ইহাকে ধরিতে ধরিতে হার মানিয়াছেন, অর্থাৎ প্রবৃত্তি সকলকে নিবৃত্তি বা
মনকে জয় করিতে পারেন না। এই মন রূপ অশ্বকে ব্রহ্ম অগ্নিতে হোম করা অর্থাৎ
উপাসনা দ্বারা মনকে ব্রহ্মে লয় এবং মনকে ব্রহ্ম হইতে পৃথক না জানা। ইহাই
অশ্বমেধ যজ্ঞ। অশ্ব মাংসে হোম করাকে অশ্বমেধ যজ্ঞ বলে না।

অগ্নি ব্রহ্মে ব্রাহ্মণের মাংস হোম করাকে নরমেধ যজ্ঞ কল্পনা করে। অহমস্মি
বলিয়া যে অহংকার ইহাই যথার্থ নরভাব। এই অহংকার পর ব্রহ্মোলয় করা।
নিরাকার সাকার অখণ্ডাকারে পূর্ণপর ব্রহ্মই—একমাত্র আছেন তাহা জানা এবং
সকলকেই আপনার আত্মা পরমাত্মার স্বরূপ বোধে সম দর্শী-হওয়াও ভেদ জ্ঞান না
করা, ইহাই নরমেধ যজ্ঞ। নচেৎ ব্রাহ্মণ—বধে নরমেধ যজ্ঞ হয় না।

অগ্নিতে বাজ পক্ষী-দগ্ধ করাকে বাজপেয় যজ্ঞ বলিয়া থাকে, কিন্তু তাহা নহে।

মায়াকে বাজ পক্ষী জানিবে যেমন বাজ পক্ষী, পক্ষী আহার করে সেই প্রকার ব্রহ্ম
শক্তি মায়া, ব্রহ্ম জ্ঞানকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখে। এই মায়া আপনাদিগকে গ্রাস-
করিতে সচেষ্ট। এবং বাজ পক্ষীর ন্যায় তোমাদিগকে ছোঁ মারিতেছে অর্থাৎ অসৎ
পদার্থে আশক্তি জন্মাইয়া, অজ্ঞানে রাখিয়াছে। এই মায়ারূপ বাজ পক্ষীকে ধৃত
অর্থাৎ অবগত হইয়া শুদ্ধ চেতন পূর্ণ পর ব্রহ্ম জ্যোতিঃ স্বরূপে হোম কর অর্থাৎ
মায়াকে ব্রহ্মের সহিত অভেদ জান ইহাই বাজ পেয় যজ্ঞ।

অগ্নিতে হোম করাম নাম অগ্নিষ্টোম। ইহা তিন প্রকার প্রথম ভৌতিক অগ্নি
ব্রহ্ম উত্তম উত্তম দ্রব্য আহারীয় বস্তু হোম করা, যাহাতে সুবৃষ্টি ও প্রজা পালন
বিবেক এবং মন পবিত্র হয়। দ্বিতীয় চন্দ্রমা সূর্য্য নারায়ণ জ্যোতিঃ স্বরূপ জ্ঞান
অগ্নিতে, আশা, তৃষ্ণা, লোভ, মোহ, কাম, ক্রোধ, অবিদ্যা, দ্বৈত, অদ্বৈত, জয়,
পরাজয়, প্রভৃতি সমস্ত আশক্তি হরণ করা অর্থাৎ সূর্য্য নারায়ণের সংসর্গ—করিয়া
এই সকলতে অতীত হওয়া। তৃতীয় পূর্ণ পর ব্রহ্ম আত্মা বা কারণ অগ্নিতে
"অহমস্মি ব্রহ্ম এই সূক্ষ্ম অজ্ঞান লয় করা। সাধনা দ্বারা আত্ম জ্ঞান হইলে জীব
আপনাকে ব্রহ্ম-রূপ জ্ঞাত হন। এই অবস্থায় আপনাকে ব্রহ্ম মনে করিয়া সূক্ষ্ম
অজ্ঞানে বদ্ধ হয়। যখন ব্রহ্ম ব্যতীত অন্য কিছুই—নাই—তখন ব্রহ্মের মধ্যে
"অহমস্মি আমি ব্রহ্ম এ অজ্ঞান কেন? অর্থাৎ যখন আমা ব্যতীত আর কিছুই
নাই, তখন কাহাকে জানাইবার জন্য বা আমা হইতে কি পৃথক অব্রহ্ম দেখিতেছি,
যাহার জন্য আমি আপনাকে ব্রহ্ম বলিয়া মনে করি। এই ভাব অন্তরে আসিয়া
যখন সর্ব্ব প্রকার অভিলাষ হইবে ও আপনাকে ব্রহ্ম বা অব্রহ্ম কিছুই মনে করি-
বেন না, তখন জীবাত্মা পুর্ণ রূপেই স্বয়ং যাহা তাহাই প্রকাশ মান থাকিবেন, এই
প্রকারে কারণ পুর্ণ পরব্রহ্মেস্থিত হওয়ার নাম কারণ অগ্নিতে হোম করা জানিবে।
এই প্রকার ব্যক্তি কোটি মধ্যে একজন মাত্র হয়, কিন্তু পরমাত্মার কৃপায় সকলেরই
এ অবস্থা হইতে পারে, ইহাতে আশ্চর্য্যতা নাই।

পূর্ণ পর ব্রহ্ম জ্যোতিঃ স্বরূপের শরণাগত হইয়া শরীর মন প্রাণ ধন সমস্তই
তাঁহাতে অর্পণ করার নাম জ্যোতিঃষ্টোম্ অর্থাৎ আমি রিক্ত হস্তে—আসিয়াছি ও
রিক্ত হস্তে যাইব, আমার কিছুই নাই ও থাকিবেক না, সমস্তই পরমাত্মার আমারা
কিছুই নাই। বৃথা আসক্ত হইয়া কেন হায় হায় করি। তাঁহার ইচ্ছায় সমস্ত
হইতেছে ও হইবে। এই প্রকার জ্ঞান লাভ করিয়া, আপনার সুখ, দুখ, শান্তি,
অশান্তি, মন, প্রাণ সমস্তই পরমাত্মার হস্তে অর্পণ করাকে জ্যোতিঃষ্টোম যজ্ঞ বল
হয়। এই যজ্ঞসাধক সহজেই শান্তি লাভ করেন।

পরমাত্মার কৃপায় সকল যজ্ঞ সিদ্ধ হয়, নচেৎ নহে। এজন্য পরমাত্মাকে যজ্ঞেশ্বর বলা হয়। ভক্তি শ্রদ্ধা সহকারে পরমাত্মার শরণাগত হও এবং যথা শক্তি অগ্নিতে আহুতি দেও সহজেই কার্য্য সিদ্ধ হইবেক। ইহা ধ্রুব নিশ্চয় বলিয়া জানিবে।

যৌবনে—যুবক।

লেখক,—শ্রীদেবেন্দ্র নাথ মাহিন্তি।

যৌবনে যুবক হাসি
কহিলেন——হে যৌবন !
রমণীয়-ক্রমণীয় তুমি,
বসন্তের প্রীতি তুমি,
লাবণ্যের লীলাভূমি,
শ্রেষ্ঠ তুমি, ———তব দাস আমি।

বার্দ্ধক্যে—যৌবন।

বার্দ্ধক্যের অভিশাপে
রুদ্ধ-কণ্ঠে অশ্রু ভরে
কহিলেন——রে মহাপাতক !
রে যৌবন ! জানি আমি
পিশাচের লীলা ভূমি
নিরদয় বিশ্বাস ঘাতক।

বিশুদ্ধ-বকুল-বৃক্ষ বিলোকনে।

লেখিকা,—শ্রীমতী-জ্যোৎস্নাময়ী ঘোষ।

হেরিয়াছি পূর্ব্বে———অতি উল্লাস-অন্তরে
ফল-পুষ্পে সুশোভিত, সুচারু-দর্শন

কোমল হরিত পত্র শাখা-প্রশাখায় ;
বিরাজিত নিত্য নব সৌন্দর্য্য কোমল
তো'রে ওরে তরুবর ! হয় রে স্মরণ।
হইত বর্দ্ধিত কত পক্ষি-পরিবার
তোমার আশ্রয় করি,—আনন্দ-অন্তরে ;
বাঁধি' নীড় উচ্চ শাখে পরিপাটি করি'—
পালিত শাবকে তাহে কত বিহঙ্গিণী
গাইত সুযশঃ তব———প্রভাত-প্রদোষে
খাইত সুপক্ক মিষ্ট সু-রসাল ফল।
অতীব আনন্দে তা'রা কাটাইত কাল
কতই উল্লাস-ধ্বনি উঠিত নিয়ত,
পড়ে মনে, বৃক্ষবর ! পূর্ব্বের ব্যাপার।
কত পান্থ শ্রান্ত-দেহে স্নিগ্ধ ছায়াশ্রয়ে
আসিয়া বিশ্রান্তি দূর করিত হরষে ;——
নিদাঘের নিদারুণ তপনের করে
প্রপীড়িত হ'য়ে সবে, বসিত সুস্থিরে,
পাইতে পরমা তৃপ্তি সুশীতল-তলে।
দূর-প্রান্ত হ'তে কত আসিত তরণী,
নীর-তরে, কুম্ভ কক্ষে পার্শ্ব-সরোবরে,
বসিত ছায়ায় তোর—লভিতে বিরাম ;—
মিলিলে সুযোগ কভু, কহিত কৌশলে
সতর্কে রসের বার্ত্তা কোন প্রিয়জনে।
ফুটিত বদনে হাস্য——কোমল মধুর—
হাসে যথা সরোজিনী, নিশা-অবশানে।
ঝরিত নীরবে পুষ্প গভীর-নিশীথে
তব পাদ-মূলে, তরু ! বিতরি' সৌরভ——
আসিত কুড়া'তে পুষ্প——পুলক-হৃদয়ে
'সোণালী' 'রুপালী' দু'টী মেয়ে মনোরমা
(কনক-কমল যুগ্ম হৃদি-স্নেহ-সরে)
যামিনী-বিগতে নিত্য ; হাসিতে হাসিতে

আসিত আমার পার্শ্বে পুষ্প-রাশি-সহ।
করিত কতই ক্রীড়া তোমার দুয়ারে।
গাঁথিয়া চিকণ মালা পরিত গলায়
ছুটিত-সৌরভ রাশি সুমধুর বায়
দগ্ধ হয় দুঃখে দেহ, দেখিয়া এক্ষণে
তোমার নীরস-তনু——বিগত জীবন।
বান্ধব-বিভব-হীন; নাহি মিত্র কেহ
লইতে উদ্দেশ্য তব; রাখিতে তোমার
পরম পবিত্র স্মৃতি,—ভবে কোন রূপে।
মনে হয় বক্ষঃ খোদি' যত্নে রাখি লিখি'
তোমার পুণ্যের গাথা——লোক-শিক্ষা-হেতু!
কিন্তু, হায়! কহ মোর, কত কাল ভবে
বাঁচিব এ ক্ষুদ্র প্রাণ ধরি' এ শরীরে?
যাইব অচিরে চলি' অনন্ত-নিলয়ে
চির-যুগ-তরে আমি—ধরাধাম হ'তে
না রহিবে চিহ্ন মোর এ মর জগতে।
তরু-জন্মে—সহিষ্ণুতা, নম্রতা স্বভাব—
পরোপকারিতা আদি দেখা'য়েছ যাহা,
সহস্র নরের মধ্যে কভু এক জন
নাহি হেরি নেত্র-পথে, মানব-সমাজে।
রহে যদি পুণ্য, আর দয়া করে ধাতা,
হেরিব তোমারে পুনঃ পবিত্র-'নন্দনে';
ত্রিদিবের রম্যস্থলে——সভক্তি অন্তরে,
রবে বিরাজিত যথা চারি-যুগ-তরে।
নারিবে হরিতে কাল, সু-নাম তোমার—
পবিত্র-কর্ম্মের স্মৃতি, রবে সমভাবে
নরের অন্তরে নিত্য,—লোক-পরম্পরা
নর হ'তে আসি' নরে—ধারাবাহিরূপে।
তব পুণ্যময়ী গীতি গাহিবে সকলে;
এখনও গাহে যাহা, লোকে কুতুহলে;
ভুলিবে না পল্লিবাসী তোমা' কোন কালে।

প্রায়শ্চিত্ত।

লেখক,—শ্রীকৃষ্ণ চন্দ্র কুণ্ডু বি, এ,

মোহিত ও নগেন দু'জনেই এক কাগজে লেখে, তবে মোহিত লেখে গল্প ও নগেন লেখে গল্প।

মোহিত একটু নেশা করে, তার নেশা না করলে কবিতা বেরোয় না; নগেন মদকে বিষ ঠাওরায় এমন কি তামাক-টী পর্য্যন্ত খায় না।

নগেন ও মোহিতের চেহারাটা অনেকটা এক রকমের, দুজনেই সুপুরুষ—তবে নগেন একটু ফর্সা, মোহিত একটু কাল। লোকে সেইজন্য নগেনকে ধাদা-মোহিত ও মোহিতকে কাল-নগেন বলিত।

মোহিত ছিল বিবাহিত ও নগেন অবিবাহিত, মোহিত বিবাহের পর প্রথম শ্বশুরবাড়ী যাইবার সময় অল্প একটু নেশা করিয়া গিয়াছিল—শ্বশুর মস্ত বড়লোক,-সেথাকার জমীদার, তাহাকে নাকি সেইজন্য, অপমান করিয়াছিলেন কি মোহিত রাগ করিয়া রাত্রের ট্রেনেই ফিরিয়া আসে। সেই অবধি মোহিত আর শ্বশুর-বাড়ী যায় না। তাঁরাও ডাকিতে আসেন না।

নগেন মাঝে মাঝে সুবিধা পেলে রাত্রে বাড়ী থাকিত না। সুতরাং মোহিত বিবাহিত হইয়াও অবিবাহিত, ও নগেন অবিবাহিত হইয়াও বিবাহিত।

নগেনের চরিত্রটা পূর্ণ চন্দ্রের ন্যায় কলঙ্ক-যুক্ত; মোহিতের চরিত্রটা পূর্ণচন্দ্রের জ্যোৎস্নার ন্যায় পবিত্র ও নির্ম্মল।

দার্শনিকেরা বলেন পুরুষ ও প্রকৃতির সংযোগে এই বিশাল জগতের সৃষ্টি হইয়াছে। সেইরূপ পরস্পর বিরুদ্ধ গুণের উদ্বাহ হইলে তবে অবিনশ্বর ভাল-বাসার সৃষ্টি হয়, প্রমাণ যথা—এই ধরুণ স্বামী ও স্ত্রী দু'জনেই তুল্যগুণ সম্পন্ন, দুজনেই সমান কলহ কুশলী; তবে তাহাদের ভিতর ভালবাসার পরিবর্ত্তে ঘৃণা ও শান্তির পরিবর্ত্তে অশান্তি আসিয়া পড়ে; কিন্তু তাহাদের মধ্যে একজন যদি নির্ব্বি-বাদে সকল বহন করে তবে কলহের কোনও কারণ থাকে না। ভালবাসার উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হয়।

অতএব নগেন ও মোহিতের ভিতর যে নিবিড় বন্ধুত্ব হইবে ইহা ন্যায়ানু-মোদিত ও অবশ্যম্ভাবী—তবে তাহাই হইল।

মোহিত প্রতিদিন আফিস হইতে আসিয়া নগেনদের বাড়ী যাইত, নগেনকে আফিস যাইতে হইত না সে সমস্ত দিন বাড়ী থাকিত।

মোহিত বলিত, "নগেন! সবই যখন কুচ্ছ মদটা খেতে দোষ কি?

নগেন বলিত, "আজ বেশ চাঁদ্‌নি রাত্তির আছে চল না একটু গান শুনে আসা যাক।'

বলা বাহুল্য কেহ কিন্তু কাহারও প্রসঙ্গে রাজী হইল না।

(২)

এইরূপ করিয়া অনেক দিন কাটিয়া গেল। নগেন 'বহু-বিবাহ' 'প্রতিভা' ও উন্মাদ, "মনুসংহিতা" ইত্যাদি কতকগুলি গ্রন্থ সঙ্কলন ও প্রণয়ণ করিয়াছে, "সুরাপানের অপকারিতা" লেখা চলিতেছে; মোহিতের ১২শ ভাগ কাব্য গ্রন্থাবলী দপ্তরীর কাচে স্বর্ণমণ্ডিত হইতেছে, এমন সময় নগেনরা কলিকাতার বাড়ী পূর্ণ-সংস্কার করিবার জন্য বেলগাছিয়ার বাগানে উঠিয়া গেল।

মোহিতের আর আফিস হইতে আসিয়া অতদূর যাইবার সুবিধা হইত না। নগেন প্রায়ই মোহিতের সঙ্গে দেখা করিতে আসিত।

ইতি মধ্যে নগেনের দু'তিনটা বিবাহের সম্বন্ধ আসিয়া জুটিল।

মোহিতের শ্বশুর দিন কতক কলিকাতায় আসিয়াছিলেন, কোনও বন্ধুর বাগানে থাকেন, মোহিতকে ডাকিয়া পাঠাইলেন।

নগেন বিবাহ করিতে রাজী হইল না। মোহিত শ্বশুর বাড়ীর লোককে অপমান করিয়া তাড়াইয়া দিল।

(৩)

হঠাৎ একদিন কবিতা রাণী দ্বিতীয়-পক্ষের তরুণী ভার্য্যার ন্যায় নগেনের স্কন্ধে আশ্রয় লইলেন। এই হঠাৎ আক্রমণের জন্য নগেন পূর্ব্ব হইতেই প্রস্তুত ছিল না, নিধিরাম সর্দ্দার' হইলে কি হয়, তাহার হস্তে ছন্দোবদ্ধ রূপ ঢাল তরবারি নাই, সুতরাং তাহাকে একখানি বাঁধান খাতা কিনিয়া মোহিতের সাহায্য ভিক্ষা করিতে হইল।

নগেন তাহার মনের ভাবগুলি সম্পূর্ণরূপে কবিতায় ব্যক্ত করিতে পারিত না, মোহিত তাহার বন্ধুর ছড়ানভাব গুলি কাটিয়া ছাটিয়া এমন করিয়া তুলিত, যে নগেন যাহা বলিতে চাহিত তাহাই ফুটিয়া উঠিত। এইরূপ করিয়া মোহিত নগেনের কল্পনা স্রোত মুখের প্রস্তর খণ্ড ঈষৎ হেলাইয়া দিল, আর নগেনের রুদ্ধবেগ ভাব তরঙ্গগুলি নাচিতে নাচিতে ছুটিল—নগেন একটু লিখিতে শিখিল।

বন্ধুর এই হঠাৎ কবিতা প্লাবন দেখিয়া মোহিত বড়ই বিস্মিত হইয়াছিল। এই বিরহ বিধুর মিলন-মধুর কবিতাগুলি কাহার উদ্দেশ্যে লিখিত, একদিন জিজ্ঞাসা করিল। নগেন যদি কবি হইত ত বলিত হৃদয়ের মানসী প্রতিমার উদ্দেশে, কিন্তু সে কবি নহে সুতরাং ধরা পড়িল। সে একদিন মোহিতকে চুপি চুপি সব

কথা খুলিয়া বলিল।

সেই দিন হইতে মোহিত দ্বিগুণ উৎসাহে নিজেই লিখিতে আরম্ভ করিল; নগেন লিখিতে পারিলেও তাহাকে লিখিতে দিত না। সে কেবল সৌখীন চিঠির কাগজে নকল করিত মাত্র।

তার পর একদিন কথায় কথায় মোহিত বলিল, "একটু খাও তা না হলে কবিতা বেরুবে না।" নগেন অম্লান-বদনে রাজী হইল। মোহিত কাহারও কাছে বাধ্য-বাধকতা রাখিতে ইচ্ছুক নহে—সে সেই রাত্রেই গান শুনিতে যাইবার প্রস্তাব উত্থাপন করিল।

এই অভূত-পূর্ব্ব পরিবর্ত্তনে দু'জনেই পরস্পরের মুখের দিকে চাহিয়া প্রথমে বড়ই লজ্জিত হইল। অচিরে কিন্তু উভয়েই কবি উচ্ছৃঙ্খল ও মদ্যপায়ী হইয়া উঠিল। তাহাদের ভিতর আর বিভিন্নতা রহিল না।

গভীর রাত্রে নগেন মোহিতকে আসিয়া ডাকিল। মোহিত পূর্ব্ব হইতে প্রস্তুত ছিল দু'জনে বাহিরে আসিয়া একখানি গাড়ী ভাড়া করিল। গাড়ীখান নগেনদের পাশের বাগানের কাঁঠাল-তলায় আসিয়া দাঁড়াইল। বন্ধুদ্বয় গাড়ীর ভিতর বসিয়া রহিল।

সপ্তমীর চাঁদ একটু একটু করিয়া জামরুল গাছ ছাড়াইয়া উঠিল। মোহিত চাঁদের দিকে মাঝে মাঝে দেখিতেছিল। অনেকক্ষণ বসিয়া বিরক্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল কি হে আজ আস্‌বে না? শুধু কাদা ঘাঁটাই সার হয়। নগেন খুব জোরের সহিত বলিল "নিশ্চয়ই আস্‌বে সে যখন আমায় এই কাঁঠাল তলায় রাত্রি এক-ঘণ্টার সময় আসিবে, লিখিয়াছে তাহার কথার নড় চড় হইবে না।"

মোহিত অনেকক্ষণ চুপ করিয়া রহিল, তার পর আমায় জিজ্ঞাসা করিল 'সে কেমন দেখ্‌তে' নগেন বলিল 'এলেই দেখিতে পাইবে'

মোহিত এই কথা অনেকবার জিজ্ঞাসা করিয়াছিল। আবার কি জিজ্ঞাসা যাইতেছিল এমন সময় সেই বাগানের গেট খুলিবার মত মৃদু আওয়াজ হইল। মোহিত ও নগেন উৎকর্ণ হইয়া শুনিল।

একটি খণ্ডমেঘ চাঁদের বুকে ভাসিয়া আসিল। চারিদিকে ছায়ালোক পরি-ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। সেই ক্ষীণ আলোকে নগেন ও মোহিত দেখিল একটি রমণীমূর্ত্তি সর্ব্বাঙ্গে বসনাবৃত করিয়া ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছে।

নগেন বলিল, ওই আসিতেছে

মোহিত বলিল, 'হুম্'।

গাড়ী ছুটিয়া ছুটিয়া অবশেষে শ্রান্ত হইয়া মোহিতের বাড়ীর সম্মুখে আসিয়া থামিল। তিনজনেই একে একে অবতরণ করিয়া মোহিতের শয়ন কক্ষে প্রবেশ করিল। উপাদেনর উপর একটি কিরসিনের আলোক মিট মিট করিয়া জ্বলিতে-ছিল, মোহিত তাহা বাড়াইয়া দিল, চারিদিক উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, ঘড়ীতে দেখিল তখন দুইটা বাজিয়াছে।

ভিত্তিগাত্রে রবি বর্ম্মার একখানি ছবি লম্বিত ছিল। রমণী কি জানি কি ভাবিয়া চমকিয়া দ্বারপ্রান্তে দাঁড়াইয়া পড়িল। মোহিত ডাকিল, ভিতরে আসুন; রমণী পুত্তলিকাবৎ শয্যাপ্রান্তে আশ্রয় গ্রহণ করিল। নগেন ও মোহিত বস্ত্র-পরিবর্ত্তন করিতে বাহিরে গেল।

নগেন বাহিরে গিয়া মদ খাইল। মোহিত আজ মদ খায় নাই, তখনও খাইল না। অল্পক্ষণ পরেই দুজনে সেই প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিল।

তাহারা দেখিল যুবতী পূর্ব্ববৎ বসিয়া আছে—নির্ব্বাক্, নিশ্চল; মাঝে মাঝে শুধু পদদ্বয় ঈষৎ আলোড়িত হইতেছে, নগেন ভাবিল আনন্দে। তাহাদের অলক্ষ্যে যুবতীর অবগুণ্ঠনের ভিতর অজস্রধারে অশ্রুজল ঝরিয়া পড়িতেছিল, তাহা তাহারা জানিতে পারিল না, মোহিত একখানি ইজি-চেয়ারে বসিল, নগেন যুবতীর পার্শ্বে শয্যার উপর আশ্রয় লইল।

তবুও কোনও ভাবান্তর হইল না দেখিয়া নগেন ধীরে ধীরে হস্ত প্রসারণ করিল। এবার কে যেন সেই মর্ম্মর পুত্তলিকাবৎ যুবতীমূর্ত্তিকে আহতা মিতু-সিংহিনীর প্রাণ দিয়া সজীব করিয়া তুলিল: যুবতী সগর্ব্বে উঠিয়া দাঁড়াইল। অব-গুণ্ঠন খানি মুখ হইতে ঈষৎ হেলিয়া পড়িল। ফুল্লার বিম্ববৎ সুন্দর মুখখানি আরও বিকশিত হইয়া উঠিল। বক্ষস্থল আরও স্ফীত হইয়া তরঙ্গায়িত হইতে লাগিল মস্তক একবার একটু বামে টলিল—তারপর দক্ষিণ হস্তে দ্বার নির্দ্দেশ করিয়া বলিল দূর হও; স্বর-স্থির অবিচল সুস্পষ্ট। সেই শব্দ এই নিশীথ নিশার অনেকদূর পর্য্যন্ত ঘুরিয়া আসিল।

নগেন দেখিল তাহার নয়নদ্বয় জ্বলিতেছে। সেই রণরঙ্গিণী চামুণ্ডামূর্ত্তি দেখিয়া ভীত হইল। আর দাঁড়াইতে সাহস করিল না, প্রহৃত কুক্কুর পলাইল।

মোহিত সে দৃশ্য দেখিয়া শিহরিয়া উঠিল। আর একটি অমনি আয়ত-লোচনা বালিকার কথা মনে পড়িল।

যুবতী আবার অবগুণ্ঠনখানি টানিয়া শয্যাপ্রান্তে পূর্ব্ববৎ বসিল কনিষ্ঠাঙ্গুলিস্থ হীরকাঙ্গুরীয় আলোককণা শতধা বিচ্ছুরিত করিয়া জ্বলিয়া উঠিল

মোহিত যে ক্ষীণ অস্পষ্ট স্মৃতি রেখা মনে আনিবার শত চেষ্টা করিতেছিল, চকিতে বিদ্যুৎ স্ফুরণের ন্যায় মনে পড়িল। সেই স্বর্ণ সর্প মস্তকস্থিত হীরক খণ্ডের আলোক কণা যেন নিখিল ব্রহ্মাণ্ডে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিয়া দিল; সেই অগ্নি প্রবাহ তাহার শিরায় শিরায় ছুটিতে লাগিল। সে আর সহ্য করিতে পারিল না উঠিয়া দাঁড়াইল। আবার তখনই মনে হইল যেন পৃথিবীটা একটা বিস্ফোরক গোলার ন্যায় দ্বিধা হইয়া গেল—মস্তক ঘুরিয়া আসিল—টলিতে টলিতে বসিয়া পড়িল।

কিঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হইলে মোহিত ডাকিল ‘সরযূ’ স্বর কঠোর ও গম্ভীর। যুবতী নির্ব্বাত নিষ্কম্প প্রদীপবৎ নিশ্চল।

মোহিতের আবার নিজের নষ্ট চরিত্রের কথা মনে পড়িল, শত ধিক্কারে হৃদয় পূর্ণ হইয়া আসিল; অপেক্ষাকৃত কোমল কণ্ঠে ডাকিল ‘সরযূ’।

সেই করুণাপূর্ণ বাষ্পারুদ্ধ কোমল কণ্ঠ তাহার কর্ণে যেন স্বপ্নশ্রুত চির পরিচিত দেবতার স্বরের ন্যায় বাজিল। সে আর স্থির থাকিতে পারিল না। ছুটিয়া গিয়া মোহিতের পদদ্বয় প্রাণপণে হৃদয় মাঝে চাপিয়া ধরিল, অনুতাপাশ্রুজলে সিক্ত করিয়া দিল। তারপর ধীরে ধীরে বলিল, “স্বামীন্-প্রভূ-দেবতা আমি কলঙ্কিনী আমি পাপিয়সী আমায় ক্ষমা” * * * আর বলিতে পারিল না কণ্ঠ বাষ্পরুদ্ধ হইয়া আসিল।

* * * * * * * * * *

মোহিতের শেষ রাত্রে একটু তন্দ্রা আসিল। সরযূ তখন ভূমিশয্যা হইতে উঠিয়া দূর গগনের দিকে চাহিল! দেখিল পূর্ব্বদিক অরুণাভ হইয়া আসিতেছে।

অঞ্চল-প্রান্ত হইতে কিসের শ্বেত চূর্ণ একটি পান পাত্রে জলের সহিত মিশা-ইয়া নিঃশেষে পান করিল। অধর প্রান্তে আনন্দের রেখা ফুটিয়া উঠিল। তার-পর ধীরে স্বামীর চরণ মস্তকে রাখিয়া শয়ন করিল।

তাহার উষ্ণ অশ্রু-জল স্পর্শে মোহিতের তন্দ্রা ভাঙ্গিয়া গেল। পত্নীকে পদতলে দেখিয়া বুকের উপর টানিয়া লইল। স্বামীর সোহাগ পাইয়া ধীরে ধীরে অগ্রসর হইল কিন্তু পারিল না ফিরিয়া আসিল।

সরযূ তাহা দেখিতে পাইল না। সে জীবন মরণের সঙ্গমস্থলে দাঁড়াইয়া মৃত্যুলোকের কথা ভাবিতেছিল। স্বামীর কোমল কর স্পর্শে তাহার মনে হইল যেন তাহারা দুটীতে মৃত্যুর পারে কোন্ স্বপ্নলোকে আসিয়া পড়িয়াছে।

সহসা কি ভাবিয়া একবার স্বামীর বাহু পাশ মুক্ত করিয়া প্রাণপণ বলে

দাঁড়াইয়া উঠিল পরক্ষণেই ছিন্ন ব্রততীর ন্যায় স্বামীর চরণ-প্রান্তে পড়িয়া গেল।

বাতায়ান পথে সূর্য্যের প্রথম কিরণ জ্যোতির্ম্ময় রেখার মত তাহার মুখে আসিয়া পড়িল, মোহিত দেখিল মুখ নীলবর্ণ, সভয়ে গায়ে হাত দিয়া দেখিল অনেকক্ষণ হিম হইয়া গিয়াছে।

—০০০০—

আমার বালক।

"অমৃতং বাল—ভাষিতং"

আমার বালকটীর বয়স এই চারি বৎসর। ইহার মধ্যেই সে যেন কতই কি বুঝিয়াছে, কতই কি বলিতে পারে। কলির ধর্ম্মানুসারে সে এমনই সকল প্রসঙ্গ উত্থাপিত করে, যে তাহা শ্রবণ করিলে তাহার পূর্ব্ববার্ত্তিতা অনুভূত হয়। সংসার উন্নতি-পথে ছুটীতেছে, মনুষ্যের পূর্ব্ব-জীবনের সংস্কার বর্ত্তমানের উন্নত আদর্শের সহিত মিলিত হইয়া তাহাকে অল্পসময়েই বৃদ্ধের বুদ্ধি প্রদান করে। সেইজন্য পুত্রাপৌত্র সন্তানগণ জনককে অতিক্রম করে। বাল্য-কাল হইতেই সেলক্ষণ পরিস্ফুট হইতে থাকে। শিশুকাল হইতে তাহারা "কি," "কে" "কোথায়" ইত্যাকার প্রশ্ন দ্বারা আত্মীয় স্বজনকে নিয়ত ব্যতিব্যস্ত করে। তাহাদের জ্ঞানানুরূপ উত্তর-দানে জ্ঞানলিপ্সা বৃদ্ধি করাই কর্ত্তব্য। আমি প্রশ্নের গুরুত্ব দেখিয়া যতদূর সম্ভব, প্রকৃত উত্তরটী বুঝাইতে চেষ্টা করি। আমার বিশ্বাস, এই ধারণাটী তাহার কোমল চিত্ত-ফলকে যেরূপ অঙ্কিত হয়, ভবিষ্যতে সহস্র শিক্ষালাভেও তাহা অপনীত হইতে চায় না। বিজয় ভুবনের একটী মুখ্য দোষ, সে উত্তরে তৃপ্ত না হইলে, ছাড়ে না; মারিয়া, ধরিয়া, কাঁদিয়া আকুল হয়। কিছু দিন পূর্ব্বে "স্বপ্ন দেখা" বুঝাইতে বড়ই বিব্রত করিয়াছিল। অত্যুৎপন্ন মতির গুণে "হলদে পাখী" বলিয়া গৃহিণী সে যাত্রা আমাকে রক্ষা করেন, সে প্রশ্ন করিলেই ভয় হয়, পাছে বুঝাইতে না পারি।

একদিন বিজয় তাহার ছোট ভগ্নিকে লইয়া খেলা করিতে করিতে সহসা বলিল, "বাবা, তোমাকে মারিলে বুড়ী (ভগ্নিটির নাম) কাঁদে কেন?" আমি বলিলাম, "তাহার প্রাণ পোড়ে।" বালক বলিল, "প্রাণ কি, বাবা? পোড়ে কেমন করিয়া?" পাঠক বুঝিতেছেন, এই প্রশ্নদ্বয় শিশুর মুখ দিয়া বহির্গত হইলেও, ইহা তাহাকে বুঝাইতে আমার বিলক্ষণ মস্তক ঘূর্ণনের অভিনয় দেখা-

ইতে হইল! একটী শিশুর নিকট হতভম্ব হইয়া কি উত্তর দিব ভাবিতেছি, এমন সময় পুনর্ব্বার সে বলিল, "বাবা, বল, প্রাণ কি, কোথায় থাকে?

আমি। "বুকের মধ্যে থাকে, খুব ছোট, দেখা যায় না।" শিক্ষকতা ব্যবসা বলিয়া বালকের মনোভাব হৃদয়ঙ্গম করিবার শক্তি আছে, তাই রক্ষা। পুনরায় এ ভাবের শাখা-প্রশ্ন আর না উঠায়, এই ভাবিয়াই আমি উত্তরের শেষ টুকু বলিলাম, কিন্তু 'বাছা' ছাড়িবার পাত্র নহে; সে বলিল "বাবা, আমার কি প্রাণ আছে?"

আমি। "আছে বৈ কি? সকলেরই আছে। না থাকিলে কথা বলিতে, নড়া চড়া করিতে পারিতে না।" "মরা" শব্দ প্রয়োগ করিলাম না। একটী অষ্টম বর্ষীয়া বালিকার হাতে একজন প্রসিদ্ধ ইংরাজ কবি, এই কথা লইয়া বড় নাকাল হইয়াছিলেন, স্মরণ হইল।

শিশু। "বাবা, আমার প্রাণও কি পোড়ে? কেমন করিয়া?" আমি "হাঁ। যে দিন আমি বাড়ী হইতে এখানে আসিতাম, সেদিন পুড়িত, তখন তুমি কাঁদিতে।"

শিশু এবার চঞ্চল হইয়া বলিল, "বাবা, সত্য আমার বুকের মধ্যে কেমন করিত, প্রাণ ত ভাল না! আমি আমার প্রাণকে তোমার এই আলমারীতে রাখিব। আর পুড়িবে না!"

আমি। "বাপু, প্রাণ কি আলমারীতে ধরে?",

শিশু। "তুমি যে বলিলে প্রাণ ছোট? তোমার আছে?

আমি। "সকলেরই আছে, বাতাসের মত, দেখা যায় না।

শিশু। "তবে তোমার পোড়ে না কেন? তোমার প্রাণ ভাল আমার ভাল না!

আমি। "লেখা পড়া না শিখিলেই মন্দ হয়।

শিশু। আমার প্রাণটা দেখাও দেখি। এই বলিয়া সত্য সত্যই সে তাহার ক্ষুদ্র বক্ষটা ধরিয়া আমার নিকট আসিল। পাঠক বুঝিতেছেন, যে ভয়ে উহা দেখা যায় না, বলিয়া প্রশ্নের উপসংহার করিতে যাইতেছিলাম, বালক সেখানে থামিল না। সে আরও অগ্রসর হইয়াছে। "দেখাইতে গেলে পুড়িতে হয়," "শিশুকালে প্রাণ দেখা যায় না, ইত্যাদি বহুতর অবান্তর কথার অবতারণা করিয়া তবে তাহাকে নিরস্ত করিতে হইল।

বিজয় প্রবুদ্ধ হইল বটে, কিন্তু আমি হইলাম কৈ? সত্যই ত প্রাণ ভাল

নয়। উহা যে পোড়ে! যাহা পুড়িবার আশঙ্কা আছে, তাহা ভাল কে বলে? যাহাতে না পোড়ে, সেরূপ করিতে পারিলেই ভাল, নতুবা উহা আল্‌মারীতে রাখাই সুযুক্তি। চৈতন্য, বুদ্ধ, মুসা, মহম্মদ প্রভৃতি মহাপুরুষগণ উহার দহনশীলতা নষ্ট করিবার জন্য অনেক প্রয়াস পাইয়াছেন, কখন ফল মূল খাইয়া, কখন অনাহারে, বনে বনে, পর্ব্বতে পর্ব্বতে, তীর্থে তীর্থে পর্যটন করিয়াছেন, তবে পোড়ার জ্বালা হইতে শেষে অব্যাহতি পাইয়াছেন। আমরা কি করিলাম? কিছু না করিতে পারিলে ত পোড়ার হাতে নিস্তার নাই?

বাহ্য সংস্কার-বিহীন, শুধু প্রকৃতি-পরিচালিত শিশুগণ ও অজ্ঞ সাধারণ লোকের নিকট হইতে বৈজ্ঞানিক রহস্য নিষ্কাষিত করিতে বিজ্ঞানবিদ্ রিড্ সাহেব ভাল বাসিতেন। উহারা প্রকৃতির নিকট শিক্ষা পায়, সুতরাং উহাদের কার্য্যাদি হইতে প্রকৃতির পরিচয় পাওয়া যায়। অজ্ঞ বালকের কথায় আমার উদ্বোধিত হইল, প্রাণ কি, পোড়েই বা কেমন করিয়া? যাহা দেখা যায় না, লক্ষণ বা গুণ দেখিয়া অনুভব করিতে হয়। তাহা ত ভাব রাজ্যের বিষয়। জড় ধর্ম্মে পুড়িতে পারে না ভাব দ্বারাই পোড়ে। সুতরাং তাহার দহন নিবারণ করিতে হইলে সেই ভাব-রাজ্যের কর্ত্তার শরণ লইতে হয় উপায়ান্তর নাই। তবেই ত, দেখিতেছি বিরাট ব্যাপার! যাহার জন্য ত্রৈলঙ্গ স্বামী, ভাস্করানন্দ, রাম-কৃষ্ণ প্রভৃতি জীবন্মুক্ত মহাত্মাগণ আজন্ম কত তপ, জপ, কত সংযম, কত কঠোর তপস্যা করিয়াছেন, সংসার-সুখোন্মত্ত আমরা তাহার কি করিব? তাঁহারাই বা শেষে কি করিলেন? তাহাও ত বুঝিলাম না? কি করিব, করিব কি না, জল্পনা করিতে করিতেই ত লীলা শেষ হইয়া আসিল! আর কবে কি করিব? পুড়িয়াই যদি জীবন কাটাইলাম, তবে নিবাইবার চেষ্টা কবে করিব?

জড়-ধর্ম্মে জড় পোড়ে, উহা নিবারণ করাও দুঃসাধ্য নহে। নিজের শক্তিতে না কুলাইলে প্রতিবাসীর সাহায্য পাই, মিনিসিপালীটীর দমকলও আনিতে পারি। প্রাণ পোড়া নিবারণের উপায় কি? ইহাতে অন্যের সাহায্য খাটে না। নিজেই রোগী, নিজেই চিকিৎসক, সুতরাং ইহার প্রতিকার করিতে হইলে আপনাকেই করিতে হইবে, কোন ব্যথার জন নাই, যে অনুমাত্রও অংশভাগী হয়। তোমার কোন বাহুবল তাহা সাধিতে পারে না। মনে ভাবিতেছ,—তুমি কত বড়, কত মহৎ, কিন্তু তোমার দেহের বাহিরে তোমার কি আছে? ঐ যে মায়ার সামগ্রী চলিয়া গেল, রাখিতে পারিলে কি? তবে তোমার বল কত টুকু? বন্ধু, বান্ধবই বা কোথায়?

পরদিন কার্য্যানুরোধে কয়েক ঘন্টার জন্য আমাকে স্থানান্তরে থাকিতে হইয়াছিল। বাটীতে আসিয়া শুনিলাম, বালকটী আমার জন্য বড়ই রোদন করিয়াছিল, আর মধ্যে মধ্যে তাহার সহচর মতুল পুত্রকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল "ষতিন দাদা, আমার চোক দিয়া জল পড়ে কেন? তোমার ত পড়ে না?" তাহার বিশ্বাস আমার অনুপস্থিতিতে প্রাণ থাকিলেই কাঁদিতে হইবে। আহা! শিশুকালের সরল প্রাণে এমনই সরল বিশ্বাস, এমনই সর্ব্বজনীন ভাব বটে! এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ "আমরা শিশু হইতে নিম্ন স্তরে যাইতেছি। আমাকে পাইয়া বড় খুসী হইয়া বলিল "বাবা, দাদা কাঁদে না কেন?" আমি বলিলাম—উহাদের প্রাণ কঠিন, তাই কাঁদে না। বালক কহিল—"তবে ত কঠিন প্রাণই ভাল, আমাকে ঐ প্রাণটা দেও।" মহা বিপদে পড়িলাম। এইরূপ ধাঁ ধাঁ মাঝে মাঝে সে আমাকে ফেলিয়া থাকে, তবে অদ্যকার ধাঁধাঁটী একটু অধিক মাত্রায় উঠিয়াছে। প্রাণ-বিনিময়ের গোলে আর কোন দিন পড়িতে হয় নাই। যাহা হউক, সর্ব্বজ্ঞের ন্যায় উত্তর দিতেই হইবে, তাই তাড়াতাড়ি বলিলাম "কঠিন প্রাণ, বাহির করাও কঠিন; কেমন করিয়া তোমাকে দিব?"

বালক। "তবে আমার প্রাণ বাহির কর দেখি।" তাহার প্রাণ যখন কোমল বলিয়াছি, তখন তাহাতে আপত্তি খাটে না। আমার যে বিপদ, সেই বিপদ। শাঁখের করাত! একটু চিন্তা করিয়া বলিলাম—"বাপু, আমার উহা করিতে নাই, তুমি কর।"

এবার বাবাজী একটু ফাঁফরে পড়িলেন, প্রাণ চেনেন না। অথচ বাহির করিতে হইবে। সমস্যা যতই বিষম হউক, সে অগ্রপশ্চাৎ না ভাবিয়া স্বীয় সুকোমল কর-পল্লব দ্বারা আপনার বক্ষঃস্থল চাপিতে লাগিল। মুখ—ভঙ্গিমার সহিত বল-প্রয়োগ করিতেও বাকি রাখিল না, কিছুতেই প্রাণ বাহির হইল না। বালক অপ্রতিভ হইল।

ক্ষণপরেই বলিয়া উঠিল, তবে আমার প্রাণ কি কঠিন বাহির হয় না কেন? এবার আমি সাহস পাইয়াছি, বলিলাম "বাবা, কাহারও প্রাণ বাহির করা যায় না। এক জনের প্রাণ অন্যকে দেওয়াও যায় না। হরি ঠাকুর যাহার যেমন প্রাণ দিয়াছেন, তাহার সেইমত হইয়াছে। তোমাকে কোমল প্রাণ দিয়াছেন, তাহাই পাইয়াছ।" এবার পুত্রের বিম্বাধরে ক্রোধ ও দুঃখের ছায়া প্রকটিত হইল।

এখন আমি মুক্তি পাইয়াছি, অন্তত অর্দ্ধেক পাইয়াছি। দোষ এখন হরি

ঠাকুরের। তিনি একজনকে কঠিন, অন্য জনকে কোমল প্রাণ দেন কেন? যদি দিলেন, তবে ভাল যে কঠিন প্রাণ, তাহা তাহাকে না দিলেন কেন? সরল হৃদয় শিশু না চটিবে কেন? তাহার সরল প্রাণের নিকট আজ হরি পরাস্ত! সংসারে বৈষম্য দেখিবার অভ্যাস, এখনও তাহার পবিত্র হৃদয়ে প্রবেশ করে নাই! সর্ব্ব-জনীন সাম্যে তাহার ক্ষুদ্র হৃদয় খানি পরিপূর্ণ। সেইজন্য আজ এই বিভিন্ন ভাব দেখিয়া চমকিয়া উঠিল। সাক্ষাৎ পাইলে সে সময় হরি ঠাকুরের কি দুর্গতি হইত, জানি না; আমি একটু স্বস্ত্যাগতি পাইলাম।

এই অবসরে একটু ধূমপান করিতেছিলাম, বালক নিজে খাইবার জন্য হস্ত প্রসারণ করিল। সে ছোট, তাহার খাইতে নাই, এইরূপ নিষেধার্থক ব্যবস্থা ও ছোট বড় বৈষম্য দেখিয়া হরি ঠাকুরের চরিত্র বুঝিতে তাহার আর বাকি থাকিল না। হরি ঠাকুরের এইরূপ লীলায় যে সংসার পূর্ণ, তাহার সরল হৃদয়ে এই প্রথম অঙ্কিত হইল! বাঞ্ছিত পদার্থ পাইতে পদে পদে বাধায় হিংসাবৃত্তিও ধীরে ধীরে জাগিয়া উঠিল। ছোট ভগ্নিকে স্তন্য পান করাইতে দেখিয়া, চপেটাঘাতে হরি ঠাকুরের উপর যত ক্রোধ, বুড়ীর উপর নিপতিত হইল! সে কাঁদিয়া উঠিল, হাত তালি দিয়া বিজয় সরিয়া গেল. আমিও হাঁক ছাড়িলাম।

শিশু হৃদয়ে ঐশ মহিমাও উদিত হয়, তাহার প্রমাণ পাই। একদিন বালকটী পূর্ণচন্দ্রকে গগন-পটে জন মনোহর বেশে স্বীয় রজত কিরণ বিকীরণ করিতে দেখিয়া বলিল, "বাবা, আজ চাঁদ এত বড় হইল কেন? উহার গায়ে আমার হাত দিতে ইচ্ছা করে।

আমি। "চাঁদ যে আকাশে? ওখানে কি যাওয়া যায়?

বিজয়। কেন? নারিকেল গাছটীর মাথায় উঠিয়া ধরিব।

গিরিরাজ-কুমারী উমাকে লইয়া তাঁহার জননী এই চাঁদ ধরার বিপদে পড়িয়া-ছিলেন। আর একটু কম হইলে আমিও উহার হাতে দর্পণ দিয়া সে চেষ্টা করি-তাম! যাহা হউক, একটু সহজ উপায় পাইলাম, বলিলাম, "অগ্রে গাছেই উঠ, শেষে চাঁদ ধরিবে।

বালকটী এবার আমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল; একটু ভাবিয়া বলিল। আচ্ছা, চাঁদ কোন পথ দিয়া উঠিল? বিষম মুস্কিলে পড়িলাম! না বুঝাইতে পারিলে সে বড় রাগে, রোদন করে। বুঝিয়া আবার সেই লজ্জা নিবারণ বিপদ-ভঞ্জন হরি ঠাকুরের শরণ লইলাম। বলিলাম হরি ঠাকুর উহাকে আকাশে চালাতে দিয়াছেন. তাই পড়িয়া যায় না!

এখন বিজয় ভূষণ সেই পরাৎপর হরির অশেষ প্রশংসা করিয়া বলিল, আমা-দিগকে তবে ওখানে যাইতে দেন না কেন? সে অবশ্য সরল বিশ্বাসেই ইহা বলিল, আমি কিন্তু দিশাহারা, চুপ করিয়া থাকিবার যো নাই, যখন 'বাবা হইয়াছি, তখন "জানি না" বলিবার পথও ঘুচাইয়াছি। কাজেই বলিতে হইল "তোমার বাবা, ভগিনী সকলে নীচে থাকে, তাহাদিগকে ফেলিয়া যাইতে নাই। চাঁদের বাপ, মা, ছেলে, মেয়ে সকলে আকাশে থাকে, সেইজন্য সেও সেখানে থাকে, বিজয় বাবাকে ফেলিয়া কোথাও থাকিতে পারে না, বিশেষতঃ বাপ-মা-না-থাকা অবস্থা স্মরণ করিতেই তাহার চক্ষুঃ জলে পূর্ণ হইয়া যায়। সে উহা শুনিতেই চায় না। সেইজন্য সে দিন এ পর্য্যন্ত হইয়াই শেষ। ভাবিতে ভাবিতে বালক ঘুমাইয়া পড়িল।

অদ্য দুর্গাষ্টমী; বালক এখন পঞ্চম বর্ষে পদার্পণ করিয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে তাহার চিন্তাশীলতাও বাড়িয়াছে। পুরোহিত আসিয়াছেন, দেখিয়া আমি বলি-লাম, "দেবতাকে একটু তামাক দেও, বিজয় নিকটে ছিল, অমনি বলিল, "দেবতা? তবে তুমি আকাশে গেলে না কেন?" ঠাকুর বলিলেন, "আগে তোমাদের এখানে পূজা সারিয়া লই, শেষে আকাশে যাইব। এবার তাঁহাকে ছাড়িয়া আমাকে ধরিল, "বাবা, তবে ত আকাশের পথ আছে, ঠাকুর কেমন করিয়া এসেছে, দেখি নাই, আজ দেখিব। আমি তাহার মনোভাব বুঝিয়া. পাছে পুরোহিতের সহিত কোন গোলযোগ ঘটায়, ভয়ে বলিলাম, তুমি ঠাকুরের কথা শুনিও না, আকাশে যাইতে শক্তি লাগে, তোমার গায়ে সেরূপ শক্তি হয় নাই, আমারও নাই, এখন উঠিতে যাইয়া কি পড়িয়া মরিব? বিজয় নিরস্ত হইল, আকাশে উঠিতে আর ইচ্ছা করে নাই।

পুরোহিত পূজায় বসিয়াছেন, বালকটী নিবিষ্টচিত্তে তাহার কার্য্যরহস্য উদ্ভেদ করিতে বসিল। পার্শ্বে লক্ষ্মীপূজার স্বতন্ত্র ব্যবস্থা দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল লক্ষ্মী কখন আসিবেন, দেখিব। দৃঢ় সঙ্কল্প করিয়া পার্শ্বে বিজয় বসিয়া রহিল। বিধাতা এরূপ শিশুর চঞ্চল চিত্ত দিয়াছেন, তাই রক্ষা। কিয়ৎক্ষণ স্থির থাকিয়া আর পারিল না। নতুবা ঠাকুরের সহিত গোল বাধাইত, সন্দেহ নাই। তিনি লক্ষ্মী দেখাইতে পারিতেন না, সেও ছাড়িবার পাত্র নয়।

পাঠকের ধৈর্য্যচ্যুতি হইয়াছে, শিশুর কথা লইয়া আর কতক্ষণ থাকা যায়? সরল শিশুদিগের কার্য্য কলাপ, কথা লইয়া আলোচনা করিতে আমি ভালবাসি-তাই এত কথা লিখিলাম। কেহ যে ইহাতে আমার ন্যায় আনন্দানুভব না

করিবেন, এমন বিশ্বাসও নাই। বস্তুতঃ অনেক সময় প্রকৃতির প্রিয়তম বস্তু এই শিশুরা এমন প্রশ্ন করিয়া ফেলে, যে তাহাতে অভিনব ভাবের উদ্রেক করে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলিতেছি, একদিন বিজয় কহিল, "বাবা আকাশের মত বড় হইব, কেমন করিয়া? আকাশ কি? ক্ষুদ্র মস্তিষ্কে আকাশের মহত্ত্ব জাগিয়াছে, তাহার স্বরূপ জানিতে ঔৎসুক্য জন্মিয়াছে, দেখিয়া হৃষ্ট হইলাম বটে, কিন্তু মাথা ঘুরিয়া গেল। দার্শনিকগণ যাহাকে জ্ঞানাতীত বলিয়াছেন, তুমি আমি তাহার কি বুঝিব? বলিলাম, "বড় হইয়া খুব লেখা পড়া শিখিলে, হরি ঠাকুর নক্ষত্রে বসাইয়া সব দেখাইয়া দিবেন। তখনি দেখিতে পাইবে।

একদিন পূর্ণ চন্দ্রকে দেখিয়া বলিল, "চাঁদের রৌদ্রে গা পোড়ে না কেন?" ভাবিলাম সত্যই ত নির্ব্বাত, নির্জ্জন নির্জ্জীব, পর্ব্বতাদি সমাকীর্ণ জড়-পিণ্ড চন্দ্র, কিরণ বিকীরণ শক্তি কোথায় পাইল? সূর্য্যের কিরণ পাইয়া কে আলোকিত, কিন্তু অস্বচ্ছ দেহ হইতে কিরণ বিকীর্ণ হয় কি? বুঝিলাম না সংবাদ পত্রে দিয়াও উত্তর পাই নাই। পাঠক দিবেন কি?

শ্রীবিধু ভূষণ ঘোষ।

হৃষীকেশ।

হিমারণ্য বাসী কোন পরিব্রাজকের লিখিত।

হিন্দু-জগতে এই স্থানের মাহাত্ম্য অনুপম, কিন্তু ইহার নামটী লইয়া মহাগোল যোগ উপস্থিত হইয়াছে. এখানকার সকলেই "হৃষিকেশ" কহেন, অর্থ জিজ্ঞাসা করিলে বলেন, ঋষি—মুনি, আর কেশ—চুল ঋষিরা এখানে আসিয়া মস্তক মুণ্ডন করত বানপ্রস্থাশ্রমে প্রবেশ করিতেন, বলিয়া এই স্থানের নাম-"ঋষিকেশ" হইয়াছে, কথাটা কথঞ্চিৎ সঙ্গত হইলেও মূলত ঠিক নহে, কারণ শাস্ত্রে 'হৃষীকেশ" বলিয়াই উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, ইহার শব্দার্থ=(হৃষীক + ঈশক = ঈশ্বর, বিষ্ণু, নারায়ণ, পরমাত্মা-রূপ,) "বিষ্ণু" হইলে ইহাকে কি "বিষ্ণুলোক" বা বৈকুণ্ঠ বলা যাইবে? সম্ভব মত কেদার খণ্ডে এ বিষয়ের বিস্তারিত বিবরণ থাকিতে পারে, কিন্তু তাহা শ্রবণ বা পঠন এখনও আমার ভাগ্যে ঘটে নাই আপনি কি আপনার সুযোগ্য পাঠক এই নামের প্রকৃত বিবরণ কি বলিতে পারেন?

প্রয়াগের ন্যায় "হৃষীকেশে" মাঘমেলার মহতী আয়োজন হইয়া থাকে, তাহা দেখিবার জন্য সম্প্রতি আমরা এখানে আসিয়াছি, বিস্তর সাধু সর্ব্বত্র হইতে এইস্থানে এই সময়ে সমাগত হইয়া গঙ্গার উপকুলে-ঝাড়ীর মধ্যে পর্ণ কুটীর নির্ম্মান করিয়া অবস্থিতি করিতেছেন, উত্তরাখণ্ড হইতেও অনেক সাধু সমাগত হইয়া থাকেন, তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ পর্ব্বত-গুহায় বাস করেন, সে সকল গুহা নিবিড় অরণ্য মধ্যে এখনও শূন্য পড়িয়া রহিয়াছে, আমরা একদিন গবর্ণমেণ্টের রক্ষিত অরণ্যে (Pesved Lovith) ভ্রমন করিতে গিয়া তাহার কএকটা গুহা দেখিয়া আসিয়াছিলাম, সে সকল অতি বিচিত্র ভাবে-সংগঠিত (C[illegible]ved out) সমাধির উপযোগী নিভৃত নিকেতন, শুনিতে পাই মাঘ পর্য্যন্ত এই স্থানে সহস্রাধিক সাধুর সমাগম হইয়া থাকে, তাঁহাদিগের ভিক্ষার নিমিত্ত এইস্থানে চতুর্দ্দশটী অন্নসত্র উন্মুক্ত থাকে, শীতবস্ত্র প্রচুর পরিমাণে সঞ্চিত হয়, প্রয়োজনীয় নানাপ্রকার ঔষধ প্রস্তুত থাকে কলিকাতার পঞ্চায়ত ধর্ম্মশালা ও সত্র তাহার প্রধান আদর্শস্থান অনেকে যে কম্বলী বাবার কথা শুনিয়াছেন, তিনিই তপবনের লছমন ঝোলায় গঙ্গার প্রলম্ব-সেতু এবং এই সত্রের সংস্থাপয়িতা কলিকাতার কএক জন-ধন-পতি-ধার্ম্মিক মহাজনের সাহায্যে এই বিচিত্র কীর্ত্তি-সংরক্ষিত হইয়া আসিতেছে।

হরিদ্বার হইতে হৃষীকেশ প্রায় ১৪ মাইল, ঠিক উত্তর গঙ্গার ধার ধরিয়া জঙ্গল পথ অতিক্রম করিয়া যাইতে হয়, পথ শ্বাপদ পশু সকল সর্ব্বদা সশঙ্ক হইয়া যাত্রা করিতে হয়, হরিদ্বার হইতে প্রায় ৪ মাইল পথ সপ্তধারা মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র লৌহ-ভীম বিচূর্ণিত করিয়া লজ্জিত হইলে বিদুর এবং বেদব্যাসের পরামর্শে বানপ্রস্থাশ্রম অবলম্বন করিতে এইস্থানে আসিয়া অবস্থিতি করিয়াছিলেন। গঙ্গার সপ্তধারা ব্যতীত তাহার অন্যচিহ্ন কোথাও বর্ত্তমান নাই। সম্প্রতি এক মহাজন এইস্থানে একটী ক্ষুদ্র ধর্ম্মশালা নির্ম্মান এবং একটী কুপ খনন করিয়া দিয়াছেন। জনবল প্রবাহ বৃদ্ধি করিবার নিমিত্ত, সুকৌশলী ইঞ্জিনীয়ার সাহেবেরা তাহার গতি একটী ধারার পরিণত করায়, ক্রমে পুরাণ সপ্তধারা বিলুপ্ত প্রায় হইয়া আসিয়াছে, সুতরাং আর কিছুদিন পরে সপ্তধারার নাম মাত্র অবশিষ্ট থাকিবে। সপ্তধারা হইতে প্রায় ৩।৪ মাইল দূরে এক নূতন পান্থশালা সংস্থাপিত হইয়াছে তাহাকে 'সত্য-নারায়ণ" কহে, কলিকাতার পঞ্চায়ত ধর্ম্মশালার অধিপতিরা এইস্থানে "সত্য-নারায়ণ" দেবের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠীত করিয়া তাঁহার, সেবার জন্য যে সদাব্রত খুলিয়াছেন, তাহাতে যাত্রীদিগের সমূহ কষ্ট নিবারিত হইয়া থাকে, আবাসের স্থান এবং ভোজনোপযোগী বস্তু প্রচুর পরিমাণে প্রাপ্ত হওয়া যায়, তদ্ব্যতীত গৃহস্থ যাত্রীদিগের

প্রয়োজন সাধন করিবার নিমিত্ত, একটা সামান্য দোকান আছে, এই ঘোর জঙ্গলা পথ অতিক্রম করিয়া বেলা ১১।১২টার সময় এই স্থানে উপস্থিত হইলে এইরূপ প্রতিষ্ঠার উপযোগিতা সহজে অনুভব করা যায়। বর্ষাকালে গঙ্গা প্রবাহ বিস্তার করিয়া এই সকল স্থান প্লাবিত করেন বলিয়া ধর্ম্মশালাটীর সৌন্দর্য্য রক্ষা হইতেছে, উপস্থিত অবস্থা দেখিয়া বোধ হইল, ইহার প্রতিকার করা সহজ-সাধ্য নহে, এই ৭।৮ মাইল পথ অতিক্রম করিয়া আসিতে পারিলে আবার যে কুল আবর্ত্তে আসিয়া পড়িতে হয়, তাহার আর কুল কিনারা কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না, ক্রমাগত কুশর অরণ্যে পড়িয়া পথিকদিগকে দিগভ্রান্ত হইয়া পড়িতে হয়, দেরা-দূনের রেলপথ এই কুশর বনের মধ্য দিয়া চলিয়াছে, তথায় একটী ষ্টেশন আছে, তাহার নাম রাইওয়ালা (এখন এই নামের পরিবর্ত্তে "হৃষিকেশ পথ" বলিয়া নামিত হইয়াছে।) এই ষ্টেশন হইতে একটী পথ কুশারণ্য ভেদ করিয়া (Firder Road) হৃষিকেশ পর্য্যন্ত আসিয়াছে, সেই পথ অবলম্বন করিয়া আসিতে পারিলে অনেক শঙ্কা বিদূরিত হইতে পারে, আসিবার সময় আমরা এই পথে বন্য হস্তির পদচিহ্ন এবং তাক্তমল দেখিয়াছিলাম, হরিদ্বার হইতে রেল পথ দিয়া আসিতে হইলে এই ষ্টেশন পর্য্যন্ত আসিতে হয়, ভাড়া তৃতীয় শ্রেণীর ৶০ মাত্র কিন্তু এইস্থানে ভারবাহী কোন প্রকার যান্ বাহন উপস্থিত না থাকায় দ্রব্যাদি লইয়া যাত্রীদিগকে অনেক কষ্ট ভোগ করিতে হয়, এবং এই জন্যই হরিদ্বার হইতে ৪.৫।৬ টাকা ভাড়া দিয়া গোযানে সেই শঙ্কা সঙ্কুল অরণ্য পথ দিয়া এখানে আসিতে হয়, "রাইওয়ালা" ষ্টেশন হইতে হৃষিকেশ ৭।০ মাইল মাত্র পদব্রজে ৩।৪ ঘণ্টায় আসা যায়, এইস্থানে যান বাহনের সুবন্দোবস্ত হইলে অনেক কষ্টের অবসান হইতে পারে ; রেল বিভাগের কর্তৃপক্ষের এবিষয়ের উপায় উদ্ভাবন করা উচিত।

জঙ্গলপূর্ণ এই ১৪ মাইল পথ অতিক্রম করিতে প্রায় সমস্ত দিন লাগিয়া থাকে, উত্তর হিমালয়ের যে পথ দিয়া গঙ্গা সর্পের ন্যায় বক্রগতি হইয়া ক্রমে দক্ষিণাভি মুখী হওত হরিদ্বারের দিকে ক্ষর বেগে অগ্রসর হইয়াছেন, তাহারই উপকূলে (পশ্চিম-পার্শ্বে) ঋষিকেশ ক্ষেত্র এই ক্ষেত্রের পূর্ব্ব পশ্চিম এবং উত্তর ভাগ গিরিমালায় আবৃত দক্ষিণভাগ উপরোক্ত কুশর বনে আচ্ছন্ন সুতরাং দূর পথ হইতে ইহার কোন চিহ্ন দৃষ্টি পথে পতিত হয় না, ইহার প্রায় ১ মাইল পথে কতকগুলি কুষ্টরোগাক্রান্ত লোকের পর্ণকুটীর দৃষ্ট হইয়া থাকে, যাত্রী দেখিলে রোগীরা অগ্রসর হইয়া বহুতর কাতর বচনে ভিক্ষা প্রার্থনা করে, তাহাদের গ্রাসা-চ্ছদনের ভারসত্র স্বামীবাদিগের উপর ন্যাস্ত তাহারা এইস্থানে নিরাপদে বাস করিতেছে

বটে.কিন্তু দক্ষিণ বায়ু প্রবাহমান কালে (যাহা এইস্থানে নিরন্তর প্রবাহিত) তাহা-দের দূষিত বায়ু যে সমস্ত হৃষীকেশ আচ্ছন্ন করে, তাহার আর ভুল নাই ; সত্র স্বামীগণ এবং সাধুরা এবিষয়ে যে কিছুই চিন্তাকরেন না, তাহাই বিচিত্র। এই কুষ্টা-শ্রম অতিক্রম করিয়া কিয়দ্দূর গমন করিলেই সম্মুখে ৫।৬টী সত্রশালা নয়ন পথে পতিত হয়, তাহাতে যাত্রীগণ অবস্থিত করিয়া থাকেন, ইহারই অপর প্রান্তে কএকটী পণ্যবীথিকা তাহার পর একটী পথ পশ্চিম পূর্ব্ব দিকে প্রলম্বিত, সেই পথ অবলম্বন করিয়া ভরত জিউর মন্দিরে এবং গঙ্গাতীরে যাইতে হয়, ভরত জিউর মন্দিরের ঠিক উত্তর পূর্ব্ব এবং দক্ষিণ প্রান্তে গঙ্গা বিভিন্ন গতিতে প্রবাহিত তাঁহারই পশ্চিম পার্শ্বের তটোপরি যে সকল ঝাড়ী বন আছে ; তাহারই মধ্যেসাধুগণ পর্ণকুটীর নির্ম্মান করিয়া অবস্থিতি করিতেছেন ; এই অনতি প্রশস্ত স্থানের পরিমাণ প্রায় ২ মাইল হইবে, ইহার মধ্যে তিনটী পার্ব্বতীয় শুষ্ক নদীগর্ভ উপকুল খণ্ডে পূর্ণ হইয়া নিরন্তর ঐ সকল আশ্রম স্থান বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিয়াছে, বর্ষাকালে এই সকল নদী জলে প্লাবিত হইয়া উঠিলে উপরোক্ত ঝাড়ী মালা সমাকীর্ণ আশ্রম সকল নব নব দীপরূপে পরিণত হয়, তখন পারাপার সুদুষ্কর হইয়া পড়ে, ভিক্ষার জন্য আর ভারতাশ্রমে গমনাগমন করা যায় না, সুতরাং বর্ষারম্ভের পূর্ব্বেই সাধুরা অন্যান্যতীর্থস্থানে যাত্রা করেন, আর এক উৎপাৎ সেই সময়ে বর্ষারজলে গাঁছ গাছড়া পাতালতা পঁচিয়া কোটী কোটী কাঁকড়া বিছা, উৎপন্ন হইয়া জলস্থল পূর্ণ করিয়া ফেলে, তাহাদের দংশন ভয়ে আরো ভীত হইতে হয়, তাহার উপর প্রচণ্ড ম্যালে-রিয়া জ্বরের আক্রমণ আরম্ভ হয় ; এই ভয়ে ভীত হইয়া অধিবাসীগণ স্থানান্তরে পলায়ন করিলে হৃষীকেশ প্রায় ৪।৫ মাস কাল জনশূন্য পড়িয়া থাকে, যাহারা এ কষ্ট স্বীকার করিয়া এই ৪ মাস এই স্থানে অবস্থান করে, তাহাদের হাল দেখিলে হৃদয় বিদীর্ণ হয়, কিন্তু বর্ষার অপগমে পার্ব্বতীয় নদী সকল বিশুষ্ক হইতে আরম্ভ হইলে পূর্ব্বোক্ত উৎপাত ক্রমে উপশমিত হইতে থাকে, তখন আবার ধীরে ধীরে হৃষিকেশ জনাকীর্ণ হইয়া পড়ে, এখন আমরা তাহাই দেখিতেছি উপরোক্ত সল্লায়তন স্থানে সাধুদিগের আশ্রম আবদ্ধ থাকিলেও প্রকৃত হৃষীকেশের পরিমাণ অত সামান্য নহে, ইহার পূর্ব্বভাগে গঙ্গার পরপারে যে শৈলমালা গগন ভেদ করিয়া দণ্ডায়মান্ তাহার শিখরোপরি "নিলকণ্ঠ" মহাদেব তপস্যায় নিমগ্ন উত্তরে "ব্রহ্মপুরী" ভক্ত প্রধান ধ্রুব এইস্থানেই তপস্যা করিয়া সফলকাম হইয়াছিলেন, পশ্চিমে "ভোগপুরী" পুরাকালে এইস্থানে বিষ্ণুলোক বাসী দেবতারা বিরাজ করিতেন, দক্ষিণে বীর-ভদ্রেশ্বর দক্ষযজ্ঞ বিনাশ করিয়া এইস্থানে শিবাদেশে সমাধীস্থ হয়েন, এই চতুসীমার

ব্যাবধান স্থান (Circumteree) প্রায় চতুর্দ্দশ মাইল হইবে অধিকাংশ স্থানে বল্যাকীর্ণ এবং হিংস্র জন্তুর আবাস স্থান, বলিয়া মনুষ্যেরা তাহার সকল স্থানে বাস করিতে পারে না ; এত ভয় সঙ্কুল স্থান হইলেও নিলকণ্ঠে এক ব্রহ্মচারী ব্রহ্মপুরে কএকজন সাধু ভোগপুর জলস্থলা বলিয়া পরিচিত এবং বীরভদ্রে কএক-জন সন্ন্যাসী অবস্থিত করিয়া থাকেন।

হৃষীকেশের আদি মন্দির "ভরত মন্দির" বলিয়া প্রসিদ্ধ তন্মধ্যে বিষ্ণুর বিগ্রহ মূর্ত্তি প্রাতষ্ঠিত কে সে, মন্দির নির্ম্মান কারয়া বিষ্ণুর প্রাতষ্ঠা করেন, কেহই তাহা বলিতে পারে না, স্থানীয় আধুনিক বৈষ্ণবেরা বলেন, ভগবান শঙ্করাচার্য্য এই মূর্ত্তির প্রতিষ্ঠাতা সেই সুত্র ধারয়া গণনা কারলে স্থানটি ভারতী সম্প্রদায়ের মঠ বলিয়া প্রতীত হয়, তাহার পর উক্ত সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসী গোস্বামী মহান্ত পদ ধারণ করিয়া দার পরিগ্রহ করিলে অদ্বৈত বাদী সন্ন্যাসী দিগের তাড়নায় বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া শ্রীবিষ্ণুর মাহাত্ম্য বিস্তার করেন, এই মহান্ত মহাশয় দিগের বংশা-বতংশেরা এখন এই ভরত মন্দিরের অধিকারী রাজার ন্যায় সম্মানিত বর্ত্তমান মহান্তের নাম "রামদাস" রামদাস সম্মানে উচ্চাধিকারী হইলেও প্রভাব বিস্তারের জন্য একজন চতুর লোকের সহরতায় নিজ কার্য্য সম্পাদন করিতেছেন, তাঁহার এই ক্ষুদ্র রাজ্য জঙ্গলেই পরিপূর্ণ সাধুদিগের কুটীর নির্ম্মানের জন্য ঘাস বাঁস এবং কাষ্ঠ বিনামূল্যে বিতরিত হইয়া থাকে, রামদাসের পূর্ব্বপুরুষ বহুযত্ন করিয়া যে সকল দোকান পাঠ নির্ম্মান করিয়া গিয়াছিলেন, এখন ইহার যত্নে সে সকল স্থান রেয়তী আবাদ হইতেছে কালে তাহার আয় এবং জঙ্গলের রাজকর (Royalty) বিশেষঃ বৃদ্ধি হইবে তদ্ব্যতীত সুপ্রসিদ্ধ তপবনের বাসমতী ধান্য তাঁহারই এক চেটীয়া আর বৎসর বৎসর লক্ষাধিক যাত্রির সমাগম হয়,বলিয়া পূজা এবং ভোগের ব্যয়ও প্রচুর অনেক রাজা-মহারাজেরা যথেষ্ট বার্ষিক বৃত্তিও প্রেরণ করিয়া থাকেন, শান্তিরক্ষার জন্য গবর্ণমেণ্টের একটী থানা আছে বটে, কিন্তু ইহা ব্যতীত গবর্ণমেণ্টের অন্য কোন বিষয়ে দৃষ্টি নাই,তাহা না থাকিলেও প্রার্থনীয় হইলেও যাত্রী দিগের আরামের জন্য মহান্ত রাজের দৃষ্টী রাখা উচিত ; যে স্থানে প্রতিবৎসর লক্ষাধিক লোকের সমাগম হইয়া থাকে, সেখানে একটী চিকিৎসালয় থাকা নিতান্ত প্রয়োজন, সেদিকে সত্রস্বামী দিগের কি মহান্ত মহারাজের ও দৃষ্টি নাই, অথচ তাঁহাদিগের বাসের এবং ভিক্ষার বিপুল আয়োজন দেখিলে অবাক্ হইতে হয়।

ক্রমশঃ——

JANMA BHUME REGISTERED No. C. 284.

১৪শ বর্ষ।] ১৩১৩ সাল। আষাঢ়। [১২শ সংখ্যা।

হিন্দুধর্ম্ম ও সমাজের মুখপত্র।

জন্মভূমি

(সচিত্র মাসিক-পত্রিকা ও সমালোচনী)।

	বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
১।	পরম কল্যাণ গীতা ...	শ্রীমদ্ শিবনারায়ণ স্বামী	৪২৯
২।	গীত ...	... ...	৪৩২
৩।	প্রাচীন বৈষ্ণব কবিদিগের স্মৃতি (পদ্য)	শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম	৪৩৩
৪।	জনক (পদ্য)	শ্রীযুক্ত অমরনাথ বসু ...	৪৩৩
৫।	প্রতিভা	শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্র কুমার রায়	৪৩৪
৬।	জামাই বাবু (গল্প)	... ...	৪৩৮
৭।	বিরহ (পদ্য)	... ...	৪৪৫
৮।	আত্মহত্যা ও আত্মবলিদান	রাজা শ্রীযুক্ত বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুর	৪৪৮
৯।	চতুর্দ্দশ বর্ষের সূচীপত্র		

লেখকগণের মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন।

জন্মভূমি-কার্য্যালয়।
শ্রীনরেন্দ্রনাথ দত্ত দ্বারা প্রকাশিত।
৩৯ নং মাণিক বসুর ঘাট ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

বার্ষিক মূল্য ডাঃ মাঃ সমেত ১৷৷০ দেড় টাকা। — প্রতি সংখ্যার নগদ মূল্য ৵১০ পয়সা।

বিশেষ কাজের কথা পড়ে দেখুন।

এই ভারতবর্ষে ২৫ কোটী লোকের বাস। একদিন সকলেই এক বাক্যে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন যে দেশী জিনিস ব্যবহার করিব। আজ তাই আমরা একটী "স্বদেশী-বন্ধু-এজেন্সী" নামে একটী এজেন্সী খুলিয়াছি। মফঃস্বলে আমরা অতি সুবিধায় ও সত্বর সমস্ত স্বদেশী দ্রব্য সস্তায় পাঠাইয়া থাকি। যাহার যাহা কিছু প্রয়োজন, আমাদের লিখিয়া পাঠাইবেন। কমিশন হার শতকরা ২।৵ টাকা মাত্র কিন্তু ১০০৲ শত টাকার ন্যূন হইলে ৩৵০ হিসাবে লইয়া থাকি। কোন অর্ডার পাঠাইবার পুর্ব্বে, অগ্রিম কিছু না পাঠাইলে মফঃস্বলে মাল পাঠান হয় না। পত্রের উত্তর চাহিলে রিপ্লাই কার্ড বা পত্রের ভিতর ৴১০ টিকিট পাঠাইতে হয়। নচেৎ কোন পত্রের উত্তর দেওয়া হয় না। দেশী মিলের ধুতি, শাড়ী, থান, লংক্লথ, আদ্ধি, সিল্ক, বম্বে, গরদ, তসর, বেনারশি ও পার্শী সাটী, জামা, জ্যাকেট, ফক, গেঞ্জি, মোজা, স্বদেশী সাবান ফুলের তৈল, আতর, গোলাপজল, কাষ্ঠের ও টিনের বাক্স, ট্রঙ্ক কাগজ নোট বুক, কলম, পেন্‌সিল, দোয়াত, কালি, পুস্তক, তামাক, পানে খাইবার সুগন্ধি কাদীর সুরতি ও গীত বাদ্যের যন্ত্র ইত্যাদি ইত্যাদি। স্মরণ রাখিবেন দেশী দ্রব্য ভিন্ন অন্য কোনরূপ বিলাতী দ্রব্য পাঠাইনা। যদি কোন বিষয় কিম্বা বাজার দর জানিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে সত্বর উত্তর দিয়া থাকি। মাল কোন রেলওয়ে ষ্টেসনে কিম্বা ষ্টিমার ঘাট ষ্টেসনের যাইবে তাহার নাম স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন।

সস্তার চূড়ান্ত।

স্বদেশী জিনিষের দর দেখুন

সুত্রী মোজা ৴১০ হইতে ।৴১০ আনা জোড়া।
পশমী মোজা ।৴১০ হইতে ॥৶ আনা জোড়া।
মোজা ৩ জোড়া ৶০, যাজারী ৩ জোড়া ॥১০ আনা।
ভাল মোজা জোড়া ৴১০, পশমী মোজা জোড়া ॥৴১০ আনা।
গেঞ্জি ৵১০ হইতে ১৲ টাকা পর্য্যন্ত।
তোয়ালে ৵৫ হইতে ৸০ আনা পর্য্যন্ত।
বোম্বাই মিলের ১০ হাতি ধুতি ১॥০ জোড়া হইতে ২৸০ আনা জোড়া।
মান্দ্রাজ হ্যাণ্ডলুমের ১০ হাতি ধুতি জোড়া ২।০ হইতে ৬॥০ টাকা।

এইচ, ব্যানার্জি এণ্ড কোং।

জেনারেল অর্ডার সাপ্লায়ার্স।

কুটিঘাট রোড, বরানগর পোষ্টাপিস কলিকাতা।

"জননীজন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী"

(মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী।)

১৪শ বর্ষ। | আষাঢ়, ১৩১৩ সাল। | ১২শ সংখ্যা।

পরম কল্যাণ গীতা।

লেখক—শ্রীমদ্ শিবনারায়ণ স্বামী।

নীচ ও মহৎ স্বভাবের তাৎপর্য্য।

দরিদ্র কাহাকে বলে ? যাহার ব্রহ্মাণ্ডের অশেষ ঐশ্বর্য্য সত্ত্বেও উহাতে সন্তুষ্ট না হইয়া আরও ইচ্ছা রাখে। যে, আরও অধিক ঐশ্বর্য্য হয় তাহার চেষ্টা করে। বিষয় তৃষ্ণা দূর হয় না, সেই ব্যক্তিই মহাদরিদ্র আর দুঃখী জানিবেক। এবং যাহার সত্য পূর্ণ পরব্রহ্মে নিষ্ঠা আছে, কিঞ্চিৎ অর্থে অর্থাৎ নির্ব্বাহ মাত্রতে সন্তুষ্ট থাকেন বা যাহাকে যাহাকে পরমাত্মা দিয়াছেন,যিনি তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকেন,তিনিই সন্তোষী মহা ধনীও সুখী যথা—

"কেবা দরিদ্রা, যস্য বিশালতৃষ্ণা।
শ্রীমাংশ্চ কো, যস্য সমস্ত তোষঃ।"

চোর কাহাকে বলে? এক কড়িরও চোর ও এক কোটী টাকার চোর উভয়ই সমান, যে চুরি করে সেই চোর। অসত্যবাদী, মিথ্যুক কে? যে এক কড়ির জন্য মিথ্যা বলে সেও মিথ্যুক। এবং যে মিথ্যা বলিয়া কাহারও অর্থ অপহরণ করিয়া লয় সেও মিথ্যুক। যেমন এক কড়ির মিথ্যুক, সেইরূপ লক্ষ টাকার মিথ্যুক উভয়ই সমান। সত্যবাদী পুরুষ কে? যে সত্য কথা বলে, আর অন্যে যাহাতে সত্য বলে, তাহার চেষ্টা করে সেই সত্যবাদী। আর সত্যশুদ্ধ চৈতন্য পূর্ণ পরব্রহ্মে নিষ্ঠা রাখে, ধন্য ধন্য সেই পুরুষ যিনি সত্যাসত্যের বিচার করিয়া সত্যশুদ্ধ চৈতন্য পূর্ণ পরব্রহ্মে যাহার শ্রদ্ধা প্রীতি পূর্ব্বক নিষ্ঠা হয়, সমস্ত চরাচরে সমদৃষ্টি রাখে। সকলকেই আপন আত্মা জানেন। সকলের প্রতি দয়া করেন এবং পরোপকারী হয়। তিনি জগতে ধন্য ও তিনিই যথার্থ সত্যবাদী ধনী ও সুখী।

শত্রু মিত্র শব্দের তাৎপর্য্য।

শত্রু কাহাকে বলে? যে অসত্যতে নিষ্ঠা করায় তাহাকেই শত্রু বলা হয়। আর তিনিই মিত্র যিনি সত্যশুদ্ধ চৈতন্য পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ গুরু মাতা পিতা আত্মাতে নিষ্ঠা করেন ও করান। এবং আশাতৃষ্ণা, কাম, ক্রোধ, আদিরূপ দ্বৈত জ্ঞান অবিদ্যা ভক্তি শ্রদ্ধা হীনতা অহঙ্কার অভিমান আদির নাম শত্রু। আর সন্তোষ, ধৈর্য্য, পরমাত্মায় ভক্তি শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠা অদ্বৈত ভাব, ব্রহ্মজ্ঞান, বিবেক আদির নাম মিত্র। ব্যবহার কার্য্যে বিপদকালে যথা সময় যিনি সহায় হন তাঁহার নাম মিত্র। আর যিনি বিপদগ্রস্থ করেন তাহাকে শত্রু বলে।

সৎ অসৎ কার্য্যের বিবরণ।

জ্ঞানবান অর্থাৎ স্বরূপ অবস্থাপন্ন ব্যক্তিগণ বিচার করিয়া যে ব্যবহার কর্ম্ম করিয়া থাকেন,তাহার নিষেধ বিধি কিছুই নাই। তিনি নিজে বেদও বিধি বিচার করিয়া যে কার্য্য করা উচিৎ তাহাই বিধি অনুযায়িক অর্থাৎ পরব্রহ্মের আজ্ঞানুসারিক কার্য্য। যাহাতে কাহারও কোন প্রকার দুঃখ না হয়,কিম্বা আপনারও কোন প্রকার দুঃখ না হয়,সেই কার্য্য করা উচিৎ,উহাতে কোন সংশয় নাই। জ্যোতিঃস্বরূপ পরব্রহ্ম গুরু আত্মার প্রতাপে আপনার যে নানাপ্রকার ভোগ করিতেছ, ও যাহার প্রতাপে কৈলাস বৈকুণ্ঠ এবং নানা অপ্সরা ইত্যাদি ভোগ হইতেছে ঐ ভোগকে সত্য বলিয়া মনে না করিয়া উহাতে আসক্ত না হইয়া প্রয়োজনানুসারে ব্যবহার করিয়াও শুদ্ধ

চৈতন্যে নিষ্ঠা রাখিবেক। যে পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ গুরু আত্মার প্রতাপে অর্থও সুখ ভোগ করিতেছ, তাঁহাকেও বিস্মৃত হইও না। কারণ বিচার করিয়া দেখ যে, এই সময় যে সকল দাসদাসী আদি তোমার ঐশ্বর্য্য আছে আর আতর, গোলাপ; কেওড়া আদি যাহা কিছু গাত্রে লাগাইতেছ ও হুকুম চালাইতেছ কিন্তু যে সময় তোমার মৃত্যু হইবে, সে সময় তোমার সম্মুখেই তোমার ঐশ্বর্য্য সকল দ্রব্যই পড়িয়া থাকিবে। অথচ এ সকল দ্রব্যের মধ্যে এমন একটীও নাই যে, সে সময় তোমাকে এক মুহূর্ত্তের জন্য ও বাঁচাইয়া রাখিতে পারিবে। ক্ষমতা প্রভাবে সকলেরই উপর আপনার হুকুম চলিতেছে অনেককে দণ্ড (শাস্তি) দিতেছেন, ফাঁসি দিতেছেন, কিন্তু সেই সময় (মৃত্যুকালে) আপনারও সামর্থ্য থাকিবে না যে, আপনি ইচ্ছামত এক মুহূর্ত্তও বিলম্ব করিতে পারেন, কিম্বা বাঁচিতে পারেন। পরমাত্মার নিয়মানুসারে ঐ সময় প্রাণ বহির্গত হইয়াই যাইবে। যখন চিকিৎসকগণ আপনারাই মরিয়া যাইতেছেন, তখন অন্য লোকের কথা আর কি বলিবার আছে। যতক্ষণ আপনারা জীবিত রহিয়াছেন, ততক্ষণ অহঙ্কার করিতেছেন যে, আমি ধনী মহাজন আমার সমান কেহই নাই,আমি ধনী,আমি বিপুল অর্থের অধিশ্বর আমার এই সমস্ত সম্পত্তি, সকলেই আমার প্রজা, আমি সকলই করিয়াছি। আমার মত বিদ্বান আমার সমান রাজা কেহই নাই। যদ্যপি এই সমস্ত আপনাদের হইত, তবে মরিবার সময় এই সকল সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইতেন। কিন্তু একটুকু জীর্ণ বস্ত্রখণ্ড ও স্থূল শরীর সঙ্গে যায় না। আপনার অর্থ ঐশ্বর্য্যকে ত্যাগ করিয়া যায়? এইজন্য এখন হইতেই আপনাদের অহঙ্কার, মদ, পক্ষপাত পরিত্যাগ করা উচিৎ। যে উদ্দেশ্যে তোমাদিগকে যে সকল দ্রব্য দিয়াছেন, বিচার পূর্ব্বক সেই উদ্দেশ্যে প্রীতিপূর্ব্বক লাগান উচিৎ। পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ গুরুর শরণ লউন, তাহাহইলে করুণা নিধান পরমাত্মা রাজা প্রজা আদি সকলের সমস্ত দুঃখ, ভয়, মৃত্যু ইত্যাদি নিবারণ করিবেন। তিনি সকল দণ্ড নিবারণ করিবার জন্য দণ্ডায়মান আছেন (অর্থাৎ প্রস্তুত রহিয়াছেন) বিচার করিয়া দেখুন! এক পরব্রহ্ম বিরাট চন্দ্রমা সূর্য্য নারায়ণ জ্যোতিঃস্বরূপ অনাদিকাল হইতে সদাই একইরূপ প্রকাশমান রহিয়াছেন। এবং পৃথিবী যেরূপ সেইরূপই রহিয়াছেন। যত মূর্ত্তি চরাচর দশদিকে দেখা যাইতেছে, সকলই বিষ্ণুভগবান অর্থাৎ পরব্রহ্মের মূর্ত্তি। সকলই আপনারই আত্মা কাহারও সহিত শত্রুভাব করিবেন না। বিচার করিয়া সকলকেই জানিবেন। (চিনিয়া লইবেন)

হিন্দু আর্য্যদিগের দুঃখের কারণ এই যে, সকল জাতি মিলিয়া পরস্পর সনাতন সৎকর্ম্ম পালন না করা, এবং সৎপথে না চলা, যাহাতে সকলে সকল বিষয় সুখে থাকিতে পারে। পরস্পর হিংসাই অনর্থের মূল। এরূপ বিচার না করিয়া চলায় কেবল পরস্পর পরস্পরের প্রতি দ্বেষ হিংসা করিতেছেন। কেহ বলে ও বেটা মেড়ুয়াবাদি কেহ বলেন ওরা বাঙ্গালি এবং এক বাঙ্গালি অন্য বাঙ্গালীকে বলেন ও বেটা বাঙ্গাল ইত্যাদি এরূপ বুদ্ধিকে ধিক্কার। বিচার করিয়া দেখেন না যে, সকলই আমার আত্মা পরব্রহ্মের স্বরূপ যাহার যে দ্বীপেতে জন্ম হউক না কেন, সকলেই আমার আত্মা সকলে মিলিয়া সৎধর্ম্ম পালন করা উচিৎ। ইত্যাদি এইরূপে সর্ব্বভাব বুঝিয়া লইবেন।

শুদ্ধ অর্থাৎ পরিষ্কার।

যে বস্তু দ্বারা বস্ত্র এবং শরীর ও মন শুদ্ধ অর্থাৎ পরিষ্কার হয়, তাহাকেই শুদ্ধ বস্তু জানিয়া তাহার দ্বারা ব্যবহার কার্য্য উত্তমরূপে করিবেন। যেমন জ্ঞানরূপ সাবান দ্বারা মনের ময়লা পরিষ্কার হয়। তাহা কখনই অশুদ্ধ হইতে পারে না, কারণ যে অপর বস্তুকে শুদ্ধ করিতে পারে, সে নিজে কিরূপে অশুদ্ধ হইবেক? নিজে অধিকতর শুদ্ধ না হইলে অপর বস্তুকে কখনই শুদ্ধ করিতে পারে না। যে বস্তু দ্বারা শরীরের ময়লা পরিষ্কার ও সৌগন্ধ বৃদ্ধি করে, তাহা ব্যবহার করা আবশ্যক। ইহাতে মনের স্ফূর্ত্তি হয় এবং আয়ু বৃদ্ধি করে, তাহাকে ঘৃণা অথবা লজ্জা প্রযুক্ত ত্যাগ করা উচিৎ নহে। এইরূপ ব্যবহার কার্য্য এবং পরমার্থ বিষয়ে বুঝিয়া কার্য্য করিবেন।

গীত।

শঙ্করা—আড়াথেম্টা।

আর কি রাধার সাধের পশার বৃন্দাবনে তেমন আছে।
অক্রুর এসে রাহু হয়ে কৃষ্ণচন্দ্র গ্রাস করেছে॥
আশা ছিল ধরা বাঁধা, রাধারি শ্যাম, শ্যামের রাধা,
সে সাধে পড়েছে বাধা, সকল আশা ফুরিয়ে গেছে।
জান্তেম যদি এমন হবে, কাঁদাতেম কি মান্ গরবে,
আবার কৃষ্ণ দেখ্‌ব বলে আশার আসে প্রাণ রয়েছে॥

প্রাচীন বৈষ্ণব কবিদিগের স্মৃতি।

লেখক,—শ্রীনগেন্দ্র নাথ সোম।

পিকগীত ভৃঙ্গরব হরি কি তোমরা,
বঙ্গদেশে মধুকণ্ঠে ঝঙ্কার তুলিলে!
কিম্বা ছদ্মবেশে সবে পশিয়ে অমরা
দেবছলে-ত্রিদিবের রত্ন লুটি নিলে!
কুসুম পরাগ,—রেণু ছাঁকিয়া যতনে,
বিতরিলে চারিধারে অপূর্ব্ব সৌরভ।
কুঞ্জে কুঞ্জে কুহরিলে বিহঙ্গ কুজনে,
কোথা আজ তোমাদের স্মৃতির গৌরব?
দারিদ্র্য-দানব ছিল জীবনের সাথী,
অন্নবিনা অনশনে কাতর পরাণ;
যেমতি কীটাণু কাটি পুষ্প নানা জাতি,
শ্রীহীন করিয়া দেয় প্রফুল্ল উদ্যান!
ভুলি সে দুরন্ত জ্বালা-মালা গাঁথি ফুলে!
রাখিলে অক্ষয় নাম কীর্ত্তিমঞ্চে তুলে!

জনক।

লেখক,—শ্রীঅমর নাথ বসু।

তুমি দেব, মহাদেব সৃষ্টির প্রধান।
বিশাল জগত মাঝে জন্মদাতা মোর,
পালিছ সযত্নে তব অধম সন্তান,
উপদেশি পুত্র তব দিবা নিশি ভোর।
তুমি স্বর্গ, তুমি ধর্ম্ম, তুমি পরন্তপ,
বিশ্বের অপূর্ব্ব সৃষ্টি হৃদয় মহান।
পুত্রের মঙ্গল হেতু সদা যত্নবান,
সেই তরে করে সবে তব জপ তপ।
তুমি সত্য, তুমি নিত্য, তুমি গো সাকার।
অসীম ভুবন মাঝে দেবের আধার॥
তুমি তুষ্টেহি, ঈশ তুষ্টি বেদের কথন।
দাও মোরে প্রাণ ভরে পূজিতে চরণ॥

প্রতিভা ।

লেখক,—শ্রীহেমেন্দ্র কুমার রায় ।

অসংখ্য অসংখ্য, মহাবুদ্ধিবান ও মহাপ্রতিভাশালী ব্যক্তি এই সুবৃহৎ জগতের মহাবিশাল পরিধি মধ্যে আপনাদের মহান চরণ-চিহ্ন-সমূহ সংস্থাপন পূর্ব্বক সেই মহাদয়াবান ও ন্যায়বিধাতা জগত নিয়ামকের সুপবিত্র শ্রীপাদযুগের শান্তি-প্রদ ছায়ানিম্নে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। আর অসংখ্য অসংখ্য যুগযুগান্তরের এবং বহু বহু শতাব্দীর ব্যবধান পথে দণ্ডায়মান হইয়া, অজ্ঞান জীবিতগণ অদ্যাপি ঐ সমূহ মহাপুরুষগণের চরণ-চিহ্নের অনুসরণ করিতেছে এবং ঐ সকল মহাত্মা-গণের পবিত্র স্মৃতির উদ্দেশ্যে ভক্তিভরে কোটি কোটি প্রণাম করিতেছে।

এমন গৌরবময় মহীয়ান আসন প্রাপ্ত হইবার জন্য কাহার চিত্তে না প্রবল আকাঙ্ক্ষা জন্মে ? কিন্তু আশঙ্কা মাত্রই ফলপ্রদ হয় না। তাহার জন্য কঠোর সাধনার আবশ্যক করে। প্রতিভাই সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিবার জন্য সাধকের সহায়তা করে। প্রতিভাই সাধককে সিদ্ধির পথে অগ্রসর করাইয়া পরিশেষে মহত্বের উচ্চগ্রামে পঁহুছাইয়া দেয়। প্রতিভা নহিলে কোন রূপ মহৎ কর্ম্মে সফল মনোরথ হওয়া যায় না।

এই জন্যই সর্ব্বত্র প্রতিভার এত আদর, এত পূজা। এই জন্যই সকলে প্রতিভাবান হইবার জন্য লক্ষোয়িত হয়। এই জন্যই উক্ত প্রতিভাবান মহা-জনগণের এত সম্মান। কিন্তু স্বাভাবিক প্রতিভাই সম্যক কার্য্য করি। এবং জগতের নিয়মই হইতেছে, অস্বাভাবিক কোন রকম অনুষ্ঠান কার্য্যকালে মনোমত সুফল প্রসব করে না, অথবা কচ্চিৎ ? তাহা হইলেও উক্ত অনুষ্ঠান অধিকদিন প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন থাকে না। সেই জন্য সকলে স্বভাবের পূজা করে।

বলিতেছিলাম, স্বাভাবিক প্রতিভাই কার্য্য করি। সত্যই তাই। এই একমাত্র কারণেই প্রতিভা সকল ক্ষেত্রে সমভাবে প্রস্ফুটিত হয় না। স্বাভাবিকী প্রতিভা যাহার আছে, তাহার আশ্রয়েই থাকিলে, প্রতিভা সম্যকরূপে বিকশিত হয়। তখন, সেই বিকশিত প্রতিভার মানস প্রফুল্লকর, প্রাণ স্নিগ্ধকর সৌরভে সমগ্র-জগত জন মাতিয়া উঠে। এই রকম ক্ষেত্রেই প্রতিভার মাহাত্ম সম্যক-রূপে প্রতিভাত হয় ; নহিলে নয়।

কিন্তু অনেক সময় এই স্বাভাবিকী প্রতিভা অনুকুল সময় না প্রাপ্ত হইলে আদৌ বিকশিত হয় না। নতুবা স্বাভাবিকী প্রায় সকলেরই অন্তঃকরণে নিহিত

আছে। কিন্তু এমন অবস্থায় প্রতিভা থাকা, না থাকা উভয়ই সমান ! যাহা কার্য্যকরি নয়, যাহা হইতে কোন ফল প্রাপ্ত হইলাম না, তাহাতে নামের সার্থকতা কোথায় ? সচরাচর ইহাই পরিদৃষ্ট হয় যে, যে ব্যক্তি দরিদ্র, যাহার বহু অভাব, যাহার কোন দিন অর্দ্ধাশন, কোনদিন অনসনেই কাটিয়া যায়, বৃথা মূলই যাহার বিশ্রাম কালীন বিলাস শয্যা, এমন ব্যক্তিই অধিকাংশ সময়ে প্রতিভারূপ মুল্যবান সম্পত্তির উত্তরাধিকারি হয়। দরিদ্র ভবনই প্রতিভার উপযুক্ত জন্মস্থান, একথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

প্রতিভা-মানবকে মহান্ উচ্চ, উপযুক্ত করিয়া তুলে। কিন্তু অলসের কাছ হইতে প্রতিভা শত যোজন অন্তরে অবস্থান করে। তুমি অলস! তোমার কার্য্যে শক্তি নাই, মনে সাহস নাই, হৃদয়ে বল নাই, তুমি ছিন্নকন্থায় শয়ন করিয়া লক্ষ মুদ্রা প্রাপ্তির স্বপন দেখ, তুমি যদি প্রতিভার অধিকারি হইতে প্রয়াসী হও, তাহা হইলে তোমার সকল বাসনা, সকল চেষ্টা সকল প্রয়াস বিফল হইবে। তোমার মনের আশা মনেতেই লয় প্রাপ্ত হইবে। অধিকন্তু জন সমাজে বামন হইয়া সুধাকর স্পর্শোদ্যত হওয়ার জন্যউপহাসাস্পদ হইবে। অতএব হয়, প্রতিভাবান হইবার উপযুক্ত সদ্‌গুণরাজি সঞ্চয় কর, মানস ক্ষেত্রকে সরসোজ্জ্বল করিয়া তুল, আলস্য পরিত্যাগ কর, লোকের উপহাস তীব্র বচন বিফল কর, নয় সকলই পরিত্যাগ করিয়া, গৃহকোনে পালিত, পদলেহনকারি কুক্কুরের মতন অপরের গলগ্রহ হইয়া,তোমার ঘৃণিত জীবনের শেষ অঙ্ক সমাপ্তির অপেক্ষায় পড়িয়া থাকো। অযথা লোকের বিরাগোৎপাদন করিয়া প্রতিভার নাম কলঙ্কিত করিও না।

সর্ব্বাঙ্গীন বিকশিত প্রতিভা বড় একটা নয়ন গোচর হয় না। ভূমণ্ডলে যত সুপ্রসিদ্ধ ব্যক্তি আজ অবধি জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, এবং তাঁহাদের অপূর্ব্ব শক্তির পরিচায়ক স্বাভাবিকী প্রতিভার পরিচয় প্রদানে মানবগণের ভক্তিশ্রদ্ধাপ্লুত অন্তঃকরন আপন সমীপে আকর্ষণ করিয়া আনিয়াছেন, দেখা যায় যে, তাঁহারা প্রত্যেকেই প্রতিভার বহু সংখ্য উচ্চ স্তরের এক একটী কেন্দ্র আপনাদের উপ-যোগী করিয়া লইয়া, তৎসহায়তায় জগতকে বিস্মিত করিয়া তুলিয়াছেন। র‍্যাফেল চিত্রশিল্পে আপনার প্রতিভাকে বিকশিত করিয়া, আপনার অপরূপ শক্তির পরিচয় প্রদানে জগতকে স্তম্ভিত করিয়াছেন। র‍্যাফেল চিত্রিত আলেক্ষ্যের মানসমোহন সৌন্দর্য্য কর দৃষ্টে, তাহাতে প্রকৃতির স্বাভাবিক স্বভাব দৃষ্টে, তাহাতে উপযুক্ত গম্ভীরতার সমাবেশ দৃষ্টে, কত শতাব্দীর পর শতাব্দী ভাসিয়া গেল, পৃথিবীতে কত

বিষয়ের কত পরিবর্ত্তন হইয়া গেল, কত রকম নূতন রুচির আকর্ষণে মানব-মন কতবার ধাবিত হইয়াছিল, কিন্তু আজিও সকলের কাছে র‍্যার্ফেল লিখিত চিত্রের সমাদর বিন্দুমাত্র কমে নাই। তাঁহার চিত্রদর্শনের জন্য ব্যগ্রতা, আগ্রহ, আজিও সামান্যরূপ মন্দীভূত হয় নাই, আজিও তাঁহার চিত্র যে দেখিতেছে, সেই চিত্র-সৌন্দর্য্যের অভ্যন্তরে দিশাহারা হইয়া ডুবিয়া পড়িয়া, কত অননুভবনীয় নূতন সুখের আস্বাদ পাইয়া বিকসিত হইতেছে। তদীয় "মাতৃমূর্ত্তির" নাম জগতে কে শ্রবণ করে নাই ? এখনও প্রতিদিন তাঁহার অঙ্কিত "মাতৃমূর্ত্তি" দর্শন করিবার জন্য বিভিন্ন প্রদেশ হইতে শত সহস্র যোজনান্তর হইতে কত অর্থব্যয় করিয়া যাত্রিবৃন্দ, তৃষিত হৃদয়ে ছুটিয়া আসিতেছে।

র‍্যার্ফেলে আপনার প্রতিভাকে অতি অল্প বয়ঃক্রম হইতে স্বীয় কার্য্য সহচরি করিয়াছিলেন। কথিত আছে, র‍্যার্ফেল চারি বৎসর বয়ঃক্রম সময়ে আপনার অঙ্কিত চিত্রসৌন্দর্য্যের দ্বারা, তদানীন্তন বহু প্রসিদ্ধ চিত্রকরকে পরাজিত করিয়া লোকের প্রসাদভাজন হইয়াছিলেন।

কিন্তু সকলের ভাগ্যে এমন মাহেন্দ্র সুযোগ, এমন সৌভাগ্য, এমন সুবর্ণ কাঞ্চন সংযোগ বড় একটা ঘটিয়া উঠে না, বিশেষতঃ যাঁহার আবার স্বাভাবিক প্রতিভা নাই।

মাইকেল এঞ্জিলো কলাশিল্পের অন্যতম প্রতিভাশালী অগ্রণী। বাল্যকালে পাঠশালায় যাইতেন না, পিতা কতরকমে শাসন করিতেন ; কিন্তু কিছুই আপনার বিবেকবুদ্ধির ভিতরে আনিতেন না, পাঠে কখনই তাঁহার মননিবিষ্ট ছিল না। প্রকৃতি যাহার বিরুদ্ধ, সে কার্য্য কখনই সফল হয় না—এঞ্জিলোর প্রতিভা কলা শিল্পের উপযুক্ত প্রগঠিত ছিল, কাযেই বহু ভৎর্সনায়, বহু প্রহারে, বহু অনুযোগে এঞ্জিলোর সুকুমার অন্তঃকরণ আদৌ বিকৃত হয় নাই। পরে উপযুক্ত বিষয়ে অভিভাবকগণ কর্ত্তৃক নীত হইয়া, ভাস্কর কল্পে আপনার প্রতিভাকে প্রস্ফুটিত করিয়া তুলিলেন। প্লেটো, সক্রেতিনা, সেক্সপীয়র সুইডেনমার্গ গেটে, চাণক্য-পণ্ডিত, ভাস্করাচার্য্য কালিদাস, বঙ্কিমচন্দ্র, বিদ্যাসাগর, স্কট, অর্জ্জুন, হানিবল, নেপোলিয়ান, প্রতাপসিংহ, তানসেন, ফ্রাঙ্কলিন, এডিসন প্রভৃতি সকলেই প্রতিভায় এক একটি বা ততোধিক স্তর গ্রহণ করিয়া, আপনাদের নাম জগত প্রসিদ্ধ করিয়া তুলিয়াছেন।

ইহাঁদের ভিতরে কেহ জ্ঞানবিজ্ঞানের রাজ্যে উধাও হইয়া, উড্ডীয়মান হইয়া, স্বীয় জ্ঞানপিপাসার নিবৃত্তি সাধন করিয়াছেন, কেহ গণিত বিদ্যায়, কেহ বৈজ্ঞানিক

আবিষ্কার সাধন জন্য, তাহাতে একান্তে সংরত হইয়া, কঠিন পরিশ্রম করিয়া সাধনায় প্রাণ পর্য্যন্ত পণ রাখিয়া মানব জাতির উন্নতির অনুকূলে কত রকম সহায়তা করিয়াছেন। কেহ সাহিত্যে, কাব্যে, দর্শনে, কেহ শিল্পবিদ্যায় আবার কেহ বা সঙ্গীত সাধনায়, স্বীয় স্বাভাবিকী প্রতিভাকে নিয়োগ রাখিয়া আপনার বুদ্ধি বৃত্তির অশেষ বিধ উন্নতি সাধন করিয়া, মানব-জনম সফল করিয়া ধন্য হইয়াছেন।

এইরূপে কত মহৎ ব্যক্তি কত রকম বিভিন্ন উপায়ে, আপন আপন প্রতিভা সহায়তায় আপনাকে বিশ্ব-বরেণ্য করিয়া তুলিয়াছেন, তাহা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বর্ণনা করিতে গেলে প্রবন্ধ দীর্ঘ হইয়া উঠে, অতএব এরূপ দুরুহ বিষয় হইতে বিরত হইলাম। জনৈক সুপ্রতিষ্ঠ গ্রন্থকার কহিয়াছেন—"আমি বিলাসী, সুখ পরায়ণ অতিথি সেবক ব্যক্তিকে দেখিবার জন্য, বা স্বাস্থ্যকর জলবায়ু সেবন করিতে অথবা স্বর্ণ আহরণের জন্য অর্থ ব্যয় করিতে অভিলাষী নহি। যদি এমন চুম্বক পাথর পাই, যাহাদ্বারা প্রকৃত প্রতিভাশালী, শক্তিবিশিষ্ট মানবগণের আবাসের সঙ্গে পরিচিত হইতে পারি, তবে আমার সকল সম্পত্তি ব্যয় করিয়া, তাহা ক্রয় করি এবং আজই পথে বহির্গত হই।"

বাস্তবিকই তাই। উক্ত বিজ্ঞ লেখকের উক্তিটী যেমন মনোরম—তেমনই মহামূল্য সন্দেহ নাই।

যে সৌভাগ্যশালী ব্যক্তি এই উক্তির প্রকৃত মর্ম্ম গ্রহণ করিতে সক্ষম হইয়াছেন এবং এই উপদেশানুযায়ী স্বীয় জীবনের স্রোতকে যথানির্দ্দিষ্ট পথে পরিচালিত করিয়াছেন, তিনিই ধন্য।

প্রতিভাবানের আদর নাই কোথায় ? তিনি নিখিলের দ্বারা সম্পূজিত হন। তাঁহার সুধানিঃসৃত কণ্ঠের দুটা প্রবোধ বাক্য শুনিতে সকলেই আগ্রহান্বিত। তাঁহার সঙ্গে জ্ঞানবৃদ্ধি কল্পে সহবাসের বাসনায় সকলেই আগ্রহান্বিত। তাঁহাকে সামান্য সুখী বা তাঁহার সহমর্ম্মিতা লাভ করিতে সকলেই আগ্রহান্বিত। তাই বলিতেছিলাম প্রতিভাবানের আদর সর্ব্বত্র।

অপিচ ভূমণ্ডলে এমন অনেক প্রতিভাশালী ব্যক্তি আছে, যাহারা আপনাদের সর্ব্বনাশী প্রতিভা সহায়তায় কত ব্যক্তিকে যন্ত্রনার মুর্ম্মুরদাহে নিক্ষেপ করে, কত ব্যক্তির হৃদয় দুঃখ বিষ-দগ্ধ শলাকা দ্বারা বিদ্ধ করে, কত ব্যক্তি উৎপীড়িত হইয়া জীবন নাটকের শেষ অভিনয় সমাপন করে। ইহা বিকৃত প্রতিভা।

এই বিকৃত প্রতিভার সহায়তায় সম্পন্ন হয় না, এমন কুকর্ম্ম ভূমণ্ডলে বড় অধিক নাই। যে ব্যক্তি এমন প্রতিভাকে অন্তরাভ্যন্তরে পোষণ করিয়া রাখে, তাহার নিকটস্থ হওয়াও অপর ব্যক্তির পক্ষে সঙ্কটজনক। ধরিত্রী ঈদৃশ পাপিষ্ঠের বিষময়, জ্বালা প্রদায়ক নিঃশ্বাসের যন্ত্রনায় সতত ভীতা, সন্ত্রস্তা থাকে। এতাদৃশ ব্যক্তির জীবন বহন করাও এক মহা ভার স্বরূপ।

যদি মানব নামের সার্থকতা সম্পাদন করিতে ইচ্ছুক হও, তাহা হইলে এমন বিষময়ী প্রতিভাকে পরিত্যাগ করিয়া স্বর্গীয় প্রতিভার আশ্রয় গ্রহণ কর।

উপরে যে মহানুভব মীনর্ষী গ্রন্থকারের উক্তি প্রকটিত করিয়াছি, তিনি যাহা বলিয়াছেন, তাহা কিছু নূতন কথা নয়। এমন মহৎ উক্তি আমাদের স্বজাতীয় নীতিশাস্ত্র অন্বেষণ করিলেও অনেক পাওয়া যাইতে পারে। ঐ সকল নীতি এক একটী মহামূল্য রত্নস্বরূপ।

উক্ত গ্রন্থকার যাহা বলিতেছেন, তাহার প্রকৃতার্থ সকলেরই উপযুক্ত জ্ঞানবলে গুরুর উপদেশ গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। কেননা মুর্খ লোকের সহবাসে বুদ্ধিবৃত্তিও হীনাবস্থাপন্ন হয়। হিন্দীতেও এ সম্বন্ধে একটা কথা আছে ঃ—

"সদ্‌গুরু পাওয়ে ভেদ বাতাঁওয়ে
জ্ঞান করে উপদেশ।
কোয়লা কো ময়লা ছুটে
যব্ অাঁগ্ করে পরবেশ॥"

—:*:—

জামাই বাবু।

(১)

কোন এক জেলার এক গ্রামে এক জমিদারের বাড়ীতে একটি ঘর জামাই ছিলেন। বাড়ীর লোকের মুখে, পল্লীবাসীর মুখে সেই জামাইটির ডাক নাম "জামাই বাবু।"

জমিদারের নাম সদাশিব, জামাইবাবুর নাম নটবর। জামাই বাবু গরীবের ছেলে, এ কথা বোধ হয় বলিতে হইবে না, শতকরা দুই একটি ব্যতীত-পোষ্য পুত্র, ঘর জামাই আর মোশাহেবগুলি প্রায় সকলেই গরীবের ছেলে, ইহা অনেকেই জানেন, বেশী বলা বাহুল্য, নটবরটি গরীবের ছেলে।

সদাশিব বাবুর একটি কন্যা, তিনটি পুত্র। কন্যাটি বড়, ছেলে তিনটি ছোট। কন্যার বয়ঃক্রম সপ্তদশ বর্ষ, জ্যেষ্ঠ পুত্রের বয়ঃক্রম পঞ্চদশবর্ষ। কন্যার নাম কুঞ্জ-কামিনী, পুত্র তিনটির নাম রাম সুন্দর, শ্যাম সুন্দর, সারদা সুন্দর।

শ্বশুরের ভালবাসা জামাই বাবু। বড়ই ভালবাসা। পুত্র অপেক্ষা অধিক, এ কথা বলিলে, যদি দোষ না হয়, তবে ধরুন তাহাই।

কুঞ্জ-কামিনী সুরূপা, গৌরাঙ্গী, জামাইবাবু কিছু কালো, নাকটি কিছু ছোট, বুক খানা কোল কুঁজো। রূপ এই, গুণের মধ্যে চতুর, জমিদারী কাগজ পত্র বুঝিতে পারেন, শ্বশুরের খোসামোদ করিতে পারেন, এই তিন গুণে তিনি শ্বশুরের ভালবাসা। জামাই বাবু তহবিল রাখেন, হিসাব পত্র দেখেন, সকলের উপর কর্তৃত্ব করেন, কথায় কথায় শালা তিনটিকে ধমক্ দেন, জামাইবাবুর দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে সকলেই তাঁহার আজ্ঞাবহ।

(২)

যেখানে আদর, সেইখানে আব্দার। জামাইবাবুর বয়স বত্রিশ বৎসর, কিন্তু বাড়ীর ভিতর তিনি ক্ষুদ্র শিশুর ন্যায় আব্দার ধরেন। একদিন একটা তরকারি খারাপ হইলে, কিংবা ঘৃতের পাক একটু কড়া হইলে থালা, বাটী গেলাস, পা দিয়া ঠেলিয়া ফেলিয়া দেন, চীৎকার করিয়া গালাগালি দিয়া বাড়ী কাঁপান। সকল কাজেই প্রায় ঐ রকম। কথায় কথায় রাগ।

শ্বশুরের চেষ্টায় জামাই বাবুর কিঞ্চিৎ লেখা পড়া শিক্ষা হইয়াছিল। শ্বশুর অত্যন্ত কৃপণ, তিনটি ছেলের শিক্ষার জন্য বাড়ীতে সতন্ত্র টিচার না রাখিয়া জামাই বাবুকে সেই কার্য্য দিয়াছিলেন। জামাই বাবুরও সুবিধা হইয়াছিল। তাঁহার মনে মনে কামনা ছিল, শালা তিনটে মরিয়া যাউক, তাহার স্ত্রী একাকিনী বিষয়ের অধিকারিনী হউক। আপনি সংসারের সর্ব্বেসর্ব্বা কর্ত্তা হইবেন। ছেলেরা মরিবে কিরূপে? জামাই বাবু কাটিয়া ফেলিতে পারেন না, বিষ দিতে পারেন না, কৌশল অন্বেষণ করেন। সন্ধ্যার পর পাঠ দিতে বসিলে, মিথ্যা ছল ধরিয়া ছেলে তিনটিকে তিনি বেদম প্রহার করিতেন, এক এক দিন নাক মুখ দিয়া রক্ত বাহির করিতেন, প্রহারের ধমকে ছোট ছেলেটির মধ্যে মধ্যে জ্বর হইত। কর্ত্তা কিছুই বলিতেন না। ছেলেদের গর্ভধারিনী ক্রন্দন করিলে, কর্ত্তা বলিতেন, "বিনা প্রহারে লেখা পড়া হয় না।"

(৩)

কর্ত্তার আসন্ন কাল উপস্থিত। ছেলেরা নাবালক তিনি এক উইল করিয়া জামাই বাবুকে একজন অছি নিযুক্ত করিলেন, উইল করিবার একমাস পরে কর্ত্তার মৃত্যু হইল, জামাই বাবু কর্ত্তা হইলেন। কর্ত্তা বর্ত্তমানেই তিনি একজন ম্যানেজার হইয়া বসিয়াছিলেন, এই সময় স্বয়ং কর্ত্তা হইয়া আমলাবর্গের উপর, ভৃত্যবর্গের উপর, পরিবার বর্গের উপর ভয়ানক দৌরাত্ম্য আরম্ভ করিলেন, তাঁহার দাপটে সকলেই অস্থির হইয়া পড়িল।

জামাই বাবু একটা বড় এষ্টেটের কর্ত্তা, নিত্য নিত্য অনেক টাকা হাতে পড়ে, কাহাকেও নিকাশ দিতে হয় না, তিনি স্বচ্ছন্দে আপন উদর পূর্ণ করিতে লাগিলেন। শালারা মূর্খ হইলে, হিসাব বুঝিয়া লইতে পারিবে না, এই মতলবে তিনি শালাদের লেখা পড়া বন্দ করিয়া দিলেন, তাহারা ঘুড়ী উড়াইয়া, ডাণ্ডাগুলি খেলিয়া পরের পুকুরে মাছ ধরিয়া, নানা প্রকার আমোদ করিয়া বেড়াইতে লাগিল। জামাই বাবুর প্রবল প্রতাপ।

(৪)

অতি উচ্চ হইলেই শীঘ্র পতন হয়, প্রত্যক্ষ প্রমাণে শাস্ত্রকারেরা এই কথা বলিয়াছেন। দাশুরায়ের পাঁচালীতে আছে—

"দর্প ঘটে যার, বৃথা কি বাহার,
নর কিংবা সুরাসুর।
গোলোক বিহারী, হরি দর্পহারী,
সে দর্প করেন চূর॥"

সদাশিব বাবুর মৃত্যুর এক বৎসর পরে, কুঞ্জ-কামিনী হঠাৎ প্লেগরোগে প্রাণ-ত্যাগ করিল, জামাই বাবুর বিষ দাঁত ভাঙ্গিয়া গেল। ভাঙ্গিলে কি হয়, গর্জ্জন থামিল না। শ্বশুরের এষ্টেটের পূর্ণ ক্ষমতা প্রাপ্ত অছি, তিনি, বিষয় কর্ম্ম তাঁহাকে দেখিতেই হইবে। যাহার মানে মান, যাহার খাতিরে খাতির, তাঁহার মরণেও তিনি অছি গিরীত্যাগ করিতে পারিলেন না।

আর এক বৎসর গেল। পৌষ মাস। কালেক্টারির লাটবন্দির সময় মফঃস্বলের ভিন্ন ভিন্ন জমিদারী হইতে বিস্তর টাকা ইরশাল হইতে লাগিল। লাটের টাকা কালেক্টারিতে দাখিল হইবার দুইদিন অগ্রে হঠাৎ বাড়ীতে একরাত্রে ডাকাত পড়িল, সর্ব্বস্ব লইয়া গেল। ছিরু দারোগা নামে একজন পাকা দারোগা তখন সেই এলাকার থানার চার্জ্জে ছিলেন, বিস্তর অনুসন্ধানে তিনি একমাস

পরে তিনজন দরয়ানকে গ্রেপ্তার করিলেন। শুনা আছে, চোর ডাকাত ধরা পড়িলে, সঙ্গী লোকের নাম বলে না, কিন্তু ঐ তিনজন ডাকাতের মধ্যে একজন সঙ্গীলোকের নাম না বলিয়া, দ্বারোগার সাক্ষাতে এইরূপ জবাব করিল, কর্ত্তা বাবুর জামাই বাবু ঐ কার্য্য করিতে উপদেশ দিয়াছিলেন। একজনের কবুল জবাবে অপর দুইজনও অগত্যা তাহার পোষকতা করিল।

কর্ত্তার জ্যেষ্ঠ পুত্র রাম সুন্দরের বয়স্ তখন অষ্টাদশ বর্ষ, শাস্ত্র অনুসারে তিনি তখন বয়ঃপ্রাপ্ত। নিত্য, নিত্য, তিনি স্বয়ং খাতা পত্র দর্শন করেন, হিসাব পত্র বুঝিবার চেষ্টা করেন, তহবিল মিলাইবার সুবিধা পান না। জামাই বাবু তহবিলদার। জামাই বাবু এখন রূপস্। ডাকাতেরা পুলিশে তাঁহার নাম বলিয়া দিয়াছে, তাহা তিনি শ্রবণ করেন নাই, তথাপি তিনি রূপস্।

বাড়ীর প্রাচীন দেওয়ান ত্রিগুনাচরণ, একদিন রামসুন্দরকে বলিলেন, জমা খরচে "মোকর্দ্দমা খাতে খরচ" বলিয়া যাহা যাহা লেখা আছে, তাহা মিথ্যা। পাঁচ বৎসরের মধ্যে গোটাকতক বাকী খাজনার মোকর্দ্দমা ভিন্ন অন্য কোন বড় মোকর্দ্দমা উপস্থিত হয় নাই, অথচ ইহার মধ্যে সেরেস্তাদার পাঁচশত, নাজির দেড়শত, মহাফেজ আশী, মুহুরী পঁচিশ, পিয়াদা আঠার টাকা নটবরের উদরসাৎ হইয়াছে। ইহা আমি শপথ করিয়া বলিতে পারি। ইহা ভিন্ন এষ্টেটের কতটাকা যে, সেই ব্যক্তি চুরি করিয়াছে, তাহার নিকাশ পাওয়া যাইবে না।

রামসুন্দর বলিলেন, "যে ব্যক্তি পলাতক তাহার কথা লইয়া এখন আন্দোলন করাতে কি ফল?

দেওয়ানজী বলিলেন, "ফল নাই ইহা সত্য, কিন্তু তুমি বালক ঐ কথা গুলা তোমাকে জানাইয়া রাখা আমার কর্ত্তব্য।

এই সকল কথা বলিয়া দেওয়ানজী মহাশয়, মাথা হেঁট করিয়া গালে হাত দিয়া খানিকক্ষণ নীরব রহিলেন।

রাম সুন্দর জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কি ভাবিতেছেন?"

দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া দেওয়ানজী উত্তর করিলেন, ভাবিতেছি, লাটবন্দীর কথা। কালেক্টারির টাকা কোথা হইতে আসিবে, তাহা ত ভাবিয়া পাইতেছি না, কর্ত্তার আমলে একবার দৈব দুর্ব্বিপাকে, মহলের ফসল জন্মে নাই, প্রজারা খাজনা দিতে পারে নাই। আখেরি লাট বন্দীর সময় তিনি মাথায় হাত দিয়া বসিয়াছিলেন, সমস্ত জমিদারী নিলাম, হইয়া যাইবে এককালে নিরুপায়। নিরুপায়ের উপায় হরি শ্রীমধুসূদন। সেই বিপদ সময়ে শ্রীমধুসূদন আমাদের

কর্ত্তাকে একটি বুদ্ধি দিয়াছিলেন। বাড়ীর পরিবার গণের অঙ্গে ও সিন্দুক বাক্সে যে সকল অলঙ্কার ছিল, দাঁড়ি পাল্লায় ওজন করিয়া সেই সকল অলঙ্কার অর্দ্ধমূল্যে তদপেক্ষা কম মূল্যেও বিক্রয় করা হয়, তাহাতেই লাট বন্দীর দায় হইতে উদ্ধার হওয়া গিয়াছিল। এবারে সে উপায় নাই। ডাকাতেরা একখানিও গহনা রাখিয়া যায় নাই। পিতল কাঁসার বাসন পর্য্যন্ত লুট হইয়া গিয়াছে। করা যায় কি? এইবার সব গেল।

রাম সুন্দর বলিলেন, ডাকাতেরা বলিয়াছে, "জামাই বাবুর উপদেশে ডাকাতি, ইহাতে জানা হইল; জামাই বাবুই সর্দ্দার ডাকাত, জামাই বাবু ধরা পড়িলে—

* * * *

দুঃখে হাস্য করিয়া দেওয়ানজী বলিলেন, "এখনও তুমি খুব ছেলে মানুষ, পুলিশের লোকেরা কত কাল পরে চোর ডাকাতের কিনারা করে, সর্ব্বস্থলে তাহা পারেও না, এ ক্ষেত্রে জামাই বাবুর গ্রেপ্তারের আশা করিয়া বসিয়া থাকিলে, লাট বন্দীর উপায় হইবে কি?

রাম সুন্দর এ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিলেন না; নিরুপিত দিবসের সূর্য্যাস্তের পর লাটের খাজনা বন্ধ হইল। সদাশিবের জমিদারি গুলির সহিত আরও জন কয়েক জমিদারের নম্বরি মহল লাটে উঠিল, নির্দ্দিষ্ট সময়ে নিলাম হইয়া গেল, সদাশিব বাবুর পরিবারেরা বিষম দুর্দ্দশায় পড়িলেন।

(৫)

সাত মাস পরে জামাই নটবর ওরফে ডাকাত নটবর, কলিকাতা হইতে গ্রেপ্তার হইয়া গেল, দুইজন সুদক্ষ গোয়েন্দার কৌশলে ও সন্ধানে তাহাকে একটা বেশ্যালয় হইতে পাওয়া গিয়াছিল।

সমস্তই প্রমাণ হইল, নিরুপায় হইয়া নটবর শেষকালে অপরাধ স্বীকার করিল, ডাকাতেরা দলে অনেক লোক ছিল, সকলকে পাওয়া গেল না, পাওয়া গেল কেবল তিনজন দরয়ানকে, আর নটবর জামাইকে। যে দরয়ানটা প্রথমে কবুল করিয়া নটবরের নাম বলিয়া ছিল, ইংরাজী আইন অনুসারে তাহাকে সরকারি সাক্ষীগণ্য করিয়া বিনাদণ্ডে অব্যাহতি দেওয়া হইল। বাকি দুইজন দরয়ানের সাত, সাত বৎসর কারাবাস; আর বিশ্বাস ঘাতক ডাকাত নটবরের চির জীবন দ্বীপান্তর বাসের আজ্ঞা হইল। অপরাপর পলাতক ডাকাতের উদ্দেশ্যে পরয়ানা জারি হইয়া রহিল। হাকিমের কার্য্য হাকিমেরা করিলেন, কিন্তু সদাশিবের টাকা গুলি পাওয়া গেল না।

এক জেলায় কেবল ঐ একটি নটবর প্রকাশ পাইয়াছিল, আর কোথাও তেমন নটবর নাই ইহা যেন কেহ অনুমান করিয়া না লন। সহরে ও মফঃস্বলে অনেক বনিয়াদী এবং অবনিয়াদী বড়মানুষের বাড়ীতে অনেক রকমের অনেক জামাইবাবু থাকে, তাহারা ঘর জামাই উপাধিতে বিখ্যাত, তাঁহাদের দলে ঐ রকমের নটবর আছে কি না? শ্বশুর মহাশয়েরা এক একবার পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন।

(৬)

সংসারী পুরুষেরা এক একজনের কন্যা বিবাহ করিয়া, জামাই নাম ধারণ করেন, যাঁহারা বিবাহ করেন না, কুমার ব্রহ্মচারী হইয়া থাকেন, তাঁহারা কাহারও জামাই নহে। নতুবা সকলেই এক একজনের জামাই।

বুঝিতে হইল, প্রায় সকলেই জামাই, শ্বশুর বাড়ীতে প্রায় সকলেরই আখ্যা জামাই বাবু কেবল গরীবের গৃহে ঐ আখ্যার বড় একটা আদর নাই।

যাঁহারা জামাই হন, তাঁহারা স্ব স্ব পত্নীকে গৃহে লইয়া গিয়া গৃহবাসী হইয়া থাকেন। তাঁহাদের সম্বন্ধে বেশী কিছু বলিবার নাই, এ গল্পে লক্ষ্য হইতেছেন, ঘর জামাই।

ঘর জামাই মহাশয়েরা আমাদিগকে ক্ষমা করিবেন. আমরা আমাদের নিজের কথা বলিতেছি না, দশ মুখে যাহা রাষ্ট্র হয়, তাহাই প্রাণে লাগে, তাহাই পাকা হইয়া দাঁড়ায়।

নব্য বিজ্ঞানের একজন নব্য উপাসক সম্প্রতি জন্তু বিজ্ঞানের একটি নব্য তত্ত্বের আবিষ্কার করিয়াছেন, তিনি বলেন, বঙ্গের অরণ্য মধ্যে অনেক প্রকার জানোয়ার থাকে, সৌখিন গৃহস্থেরা তাহাদের কতক গুলিকে লোকালয়ে আনিয়া গ্রাম্য করিয়া রাখেন, এক প্রকার জীবের আমদানি হইয়াছে, তাহাদের নাম জামাই, নূতন আখ্যা গ্রাম্য গণ্ডার, সেই সকল গণ্ডারের চর্ম্মে ঢাল হয়, অঙ্গের অস্থিতে শীকারী ব্যাধের ধনুকে বান হয়, হাটুর মালাই চাকীতে গরুর গাড়ীর চাকা হয়, কেহ হয়ত জিজ্ঞাসা করিবেন,—গণ্ডারের মাথায় খড়্গ থাকে, গ্রাম্য গণ্ডারের খড়্গ কোথায়? উক্ত বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিত বলিয়া দিতেছেন, গ্রাম্য গণ্ডারের খড়্গ নাই, খড়্গের বদলে শিং আছে, সে সকল শিং বাহির হইতে দেখা যায় না। মস্তকের কেশ গুচ্ছে ঢাকা থাকে, সেই শিং দিয়া তাহারা মানুষকে গুতায়, জামাই রূপ গণ্ডারের দৌরাত্ম্যে অনেক শ্বশুর অস্থির, তাহারা মানুষকে মনুষ্য জ্ঞান করে না, মদগর্ব্বে মত্ত হইয়া গোঁ-ভরে শ্বশুরের উপর দৌরাত্ম্য করে।

সহরে ও মফঃস্বলে কতকগুলি পরিবারে ঘরজামাই রাখা কুল প্রথা, পুরুষানুক্রমে তাঁহাদিগকে ঘরজামাই পুষিতেই হয়। শ্বশুরের কেহ না থাকে, অনেক ঘর জামাই এইরূপ কামনা করেন, যদি থাকে, তাহারা শীঘ্র মরে ইহাও তাঁহাদের কামনা, যাহাদের কেহ নাই, তাহারা শ্বশুরের বিষয়ে—শ্বশুর অবর্ত্তমানে স্ত্রীরবিষয়ে পূর্ণ কর্তৃত্ব করে,সেরূপ কর্তৃত্বের কিরূপ ফল, যাঁহারা সমাচার রাখেন, তাহা তাঁহারা বিশেষরূপে অবগত আছেন, তাদৃশ ঘর জামাই সচরাচর বাড়ীর মধ্যে—পল্লিমধ্যে জামাই বাবু নামে বিখ্যাত তাঁহাদের গাম্ভীর্য্যের নিকটে মা লক্ষ্মীর বাহনেরাও লজ্জা পায়!

একটা গল্প আছেঃ— একটা উদ্ভট শ্লোকের শেষ চরণটি—এতদ্দেশে এক প্রকার প্রবাদ বাক্যের মধ্যে গণ্য হইয়া আছে যথাঃ— "প্রহারেণ ধনঞ্জয়ঃ।" যে শ্লোকের শেষ চরণ ঐ টুকু, সেই শ্লোকের পূর্ণপদ নিম্নভাগে প্রকটিত হইল ঃ—

"হবি-র্বিনা হরির্যাতি,
বিনাপীঠে ন মাধবঃ।
কদন্নে পুণ্ডরী কাক্ষঃ
প্রহারেণ ধনঞ্জয়ঃ॥"

গল্পটি এই যে,এক বাবুর চারিটি কন্যা, চারিটি ঘর জামাই, বাবু যতদিন জীবিত ছিলেন, ততদিন জামাই গুলির প্রকৃত জামাই আদর ছিল, বাবুর মৃত্যুর পর তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্র,—জামাই দিগের বড় শালা, সংসারের কর্ত্তা হইলেন, এক বৎসরের মধ্যে জামাই বাবুদের জ্বালায় তিনি জ্বালাতন হইয়া উঠিলেন, জামাই বাবুরা কোন কার্য্যই করে না, দিবা রাত্রি বাবু সাজিয়া ঘরে বাহিরে ইয়ারকী দেয়, শালাদের হিংসা করে, সোজা মুখে কথা কহে না; বিষয় কর্ম্মের কথার উপর টীকা টিপ্পনী ছাড়িয়া মুরুব্বিআনা দেখাইতে চায়।

বড় বাবু মহা বিরক্ত। তিনি ঐ জামাই গুলাকে তাড়াইবার কৌশল করিতে লাগিলেন। জামাই বাবুদের একজনের নাম হরি, একজনের নাম মাধব, একজনের নাম পুণ্ডরীকাক্ষ, একজনের নাম ধনঞ্জয়।

বড় বাবু একদিন পাচক ব্রাহ্মণকে হুকুম দিলেন, জামাই বাবুদের আহারের সময় ঘৃত দিও না। পাচক সেই হুকুম মান্য করিল, অযত্ন বুঝিয়া বড় জামাই (হরি) পলায়ন করিল, এক সপ্তাহ গেল, ঘৃত বন্ধ, তথাপি বাকী জামাই বাবুরা বাড়ী ছাড়িল না বড় বাবু হুকুম দিলেন, জামাই বাবুদের বসিবার পীড়ি দিও না। সেই অপমানে মাধব পলাইল, তুইজন রহিল, এক সপ্তাহ পরে বড় বাবু আবার হুকুম দিলেন, জামাই বাবুদের মোটাচালের ভাত দিও, সেই কষ্টে পুণ্ডরীকাক্ষ পলায়ন করিল, ধনঞ্জয় কিছুতেই নড়িল না, শেষকালে প্রহারের ব্যবস্থা হইল, উত্তম প্রহার প্রাপ্ত হইয়া ধনঞ্জয় শেষকালে পলাইয়া গেল।

বিরহ।

(ললিতার প্রতি শ্রীমতী।)

নিশি শেষে প্রিয়সখি হেরেছি স্বপনে।
আসিয়াছে, কালাচাঁদ,-মুঞ্জ-কুঞ্জ বনে॥
আমি যেন পাশে বোসে, খুলিয়া নয়ন,
হেরিতেছি উর্দ্ধমুখে, সুধাংশু বদন।
কত কথা কহিতেছি, প্রেমানন্দে ভাসি।
উত্তরিছে রাধানাথ, মৃদু মৃদু হাসি॥
চক্ষে আসিতেছে জল, প্রেম অশ্রুধারা।
কাঁদিতেছি আমি যেন, প্রেমে মাতোয়ারা॥
কেঁদে কেঁদে বলিতেছি, ধরিয়ে চরণ।
কোথা পলাইয়াছিলে, রাধিকারমণ ?
অক্রুরের রথে চড়ি, কাঁদায়ে রাধায়।
কংস যজ্ঞে গিয়াছিলে, সুখে মথুরায়॥
কত যে কেঁদেছি শ্যাম! বিরহে তোমার।
কত খুজিয়াছি! কি বলিব আর!!
ঠিক যেন চেয়ে আছি, কৃষ্ণ মুখ পানে।
কত যে প্রেমের ঢেউ, খেলিতেছে প্রাণে॥
বলিতেছি কৃষ্ণ তুমি, নামে দয়াময়।
অবলার প্রতি কেন, এত নিরদয় ?

কতদিন বৃন্দাবনে, বাঁশরী নীরব।
বৃন্দাবন বাসিগণে, ছিল যেন শব॥
ধেনু চরিত না বনে, তৃণ খাইত না।
ডাকিলে রাখালগণে, ঘরে যাইত না॥
ডাকিত না শাখে পাখী গাহিত না গান।
দিবানিশি যমুনায়, বহিত উজান॥
নাচিত না শিখিকুল, মেঘ দরশনে।
নীরব কোকিল কুল, তোমার বিহনে।
পশিত না কর্ণমূলে, ভ্রমর গুঞ্জন।
অন্ধকার হয়েছিল, মধুবৃন্দাবন!!
আজি কুঞ্জে আসিয়াছে বৃন্দাবন চাঁদ!
প্রেমে উথলিল চিত, ঘুচিল বিষাদ॥
শোভাময় হবে এবে, কদম্বের তল।
নাচিবে তরঙ্গবেগে, কালিন্দীর জল॥
তমালে কোকিল পুন, আরম্ভিবে গান।
ঝঙ্কারিবে কোকিলেরা, জুড়াইবে প্রাণ॥
ফলে গুঞ্জরিবে অলি, মধুপান করি।
সুরে সুর মিশাইয়ে, বাজিবে বাঁশরী॥
বাজাও মুরলী, মধু, মুরলী বদন।
পাশে বসি বাঁশী রবে, জুড়াই শ্রবণ॥
কতদিন শুনি নাই, বাঁশরীর গান।
যে রবে মাতায় মন, কেড়ে লয় প্রাণ॥
বাজাও মোহন বাঁশী, প্রাণ কৃষ্ণধন!
সজীব হউক পুন, মরা বৃন্দাবন!!

——o——

এই সব কথা আমি, বলিতেছি শ্যামে।
কোন দুঃখ মনে নাই, রহিয়াছি বামে॥
স্বপনের কথা সখি, কিছু মনে নাই।
ঠিক যেন সেই কৃষ্ণ, ঠিক আমি রাই॥

ঠিক যেন জেগে আছি, বসেছি দু-জনে।
রঙ্গ-রস করিতেছি, সেই নিধুবনে॥
আচম্বিতে একি সখি! চেতনা পাইয়া,
আঁখি কচালিয়া যবে, উঠিনু জাগিয়া,
কি যে দেখিলাম আমি, কি কহিব আর!
কোথা কৃষ্ণ, কোথা আমি, সব অন্ধকার!!
নীরবেতে কাঁদিলাম, ফেলি অশ্রুধার,
মনে মনে হাহাকার, করিলাম সার!!
ফোটে ফোটে মুখে বাক্য, বাহির না হয়।
ঘরে আছি, ঘরে আছে ননদীর ভয়॥

——

কি করি উপায় সখি! বলনা ললিতে!
এখনো স্বপন যেন, পারি না চলিতে॥
বল সখি, কোথা গেলে, কৃষ্ণধনে পাই!
বল যদি, ছুটে আমি মধুপুরে যাই!!
পাগলিনী হইয়াছি, বাধা মানিব না!
মন্দ কথা যদি শুনি, কাণে আনিব না!!
বল যদি, কুঞ্জবনে, যাই সঙ্গী বিনা;
খুঁজে আসি, সত্য কৃষ্ণ এসেছিল কিনা?
গাছেদের, পাখিদের! করিব জিজ্ঞাসা,
তারা যদি পুরাইতে পারে মম আশা॥
ক্রন্দনিয়া সুধাইব, কেলী কদম্বেরে,
দেখেছে কি না দেখেছে, বনে মাধবেরে!!
বল সখি, কি করিব, উপায় কি আর?
কৃষ্ণ বিনা, দেহে প্রাণ, রবে না রাধার॥

——o:*:o——

ললিতার উত্তর।

কেন সখি! ব্যাকুলিনী, শ্রীকৃষ্ণের তরে?
ভেবে দেখ, কৃষ্ণচন্দ্র, উদয় অন্তরে!!

শুনিয়াছ শ্রীকৃষ্ণের, শ্রীমুখের বাণী,
তুমি যদি নাই জান, আমি ভাল জানি ॥
কংসযজ্ঞ অবসানে, বিদায়ের কালে,
বলেছিলা বংশীধারী, ব্রজের রাখালে,
যেথানে যা করি আমি, যেথানে বা রই,
মধুবৃন্দাবন ছাড়া, কভু আমি নই ॥
তবে কেন ভাব রাধে রাজার কুমারী ?
এই বনে বিহরেন, সেই বংশধারী !
সুখের শ্রীবৃন্দাবন, পরিহার করি'
কোথাও কখন নাহি, থাকিবেন হরি ॥
বিরহ ভেব না রাধে ! কহিনু তোমারে,
কৃষ্ণের বিরহ নাই, অখিল সংসারে !!

সমাপ্ত।

আত্মহত্যা ও আত্মবলিদান।

লেখক—রাজা শ্রীযুক্ত বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুর।

আমি আজ এই প্রস্তাবের অবতারণা করিতে অভিলাষ করিয়াছি, ইহা কৌতুহল উদ্দীপন উদ্দেশ্যে লিখিত হয় নাই। চিত্তবিনোদনার্থ ও এই প্রসঙ্গের উত্থাপন করি নাই। আমরা দেখিব যে, এই প্রসঙ্গের অনুশীলনে চিন্তা করিবার অনেক বিষয় আমাদিগের নেত্রপথে সম্মুখীন হইবে। শিক্ষালাভ করিবার সামগ্রী, ইহাতে বিস্তর আছে। বস্তুতঃ নানা উপদেশে ইহা পরিপূর্ণ। মানব-চরিত্রের উপায় ইহা হইতে প্রাপ্ত হওয়া যায়। সভ্যতার সহিত ইহার অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। আমরা দেখিতে পাইব যে, প্রাচ্য, ও পাশ্চাত্য সভ্য জাতির মধ্যে নিরবচ্ছিন্ন জ্ঞানান্বেষনে নীতিও ধর্ম্মের উৎকর্ষ সাধনে, স্বজাতি প্রেমিকতায় বীরভাবের উদ্দীপনায়, গার্হস্থ্য ও সমাজিক রীতি স্থাপনে ইহার কিরূপ মীমাংসা হইয়াছে। যে দুরূহ প্রসঙ্গ লইয়া আমি আপনাদের সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছি, তাহাতে কৃত-কার্য্যতা লাভ করিতে পারিব এরূপ আশা করি না। অথবা এ বিষয়ে চিন্তা করিয়া

আমি যাহা বুঝিয়াছি, তাহা যে পরিস্ফুট ভাবে ব্যক্ত করিতে পারিব, এ আশাও আমার নাই, এবং কি ভাবে, আমার এই প্রবন্ধ আপনারা গ্রহণ করিবেন, তাহাও জানি না। তবে ইহা নিশ্চয় যে, কোনরূপ অসাধু অভিপ্রায়ে ইহা লিখিত হয় নাই।

ইহার আলোচনায় মনোমধ্যে স্বতঃই জাগরূক হয় যে, বিধাতার সৃষ্টি-মধ্যে সকল জীবই মৃত্যুর অধীন, মহাভারত পাঠে এই জ্ঞান লাভ হয় যে, পরম কারুণিক সৃষ্টিকর্ত্তাই জীবগণকে তাঁহার অধীন করিয়াছেন। অতএব মৃত্যু-শোকাচ্ছন্ন জীবের মনে, মৃত্যু কল্যাণ বা অকল্যাণকর, এই গম্ভীর সমস্যার উদয় হয়। বোধ হয়, ধর্ম্মশাস্ত্রের ইহাই মীমাংসা যে মৃত্যু ভিন্ন আত্মার সদ্গতি লাভের অন্য পথ নাই। সংসারের সকল অনুষ্ঠানগুলির প্রতি দৃষ্টি করিলে ইহা অনুভূত হয় যে, এই গুলিও ঐ নিয়মাধীন। আংশিক ক্ষয় হইতে রক্ষা করিবার নিমিত্ত যদিও সময় সময় সংস্কার করিলে চলিতে পারে, কিন্তু জীর্ণতা অধিক দূর অগ্রসর হইলে সম্পূর্ণ ধ্বংসসাধন ও নব প্রণালীর পুনর্গঠন ব্যতিরেকে উপায়ান্তর নাই। সৃষ্টি-কাল হইতে অদ্যাবধি বিভিন্ন জাতিরও মনুষ্য সমাজের মধ্যে যে সমস্ত বিপ্লব ঘটিয়াছে, তাহাই ইহার সত্যতা প্রমাণ করিতেছে। শাসনপ্রণালী, সমাজগঠন, ধর্ম্মভাব ও রীতি নীতির পরিবর্ত্তন, নগর ও রাজ্য-স্থাপন প্রভৃতি যে কোন বিষয়ে দৃষ্টি করিলে, ইহার উপলব্ধি হইবে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ মৃত্যুকে এই ভাবে বর্ণন করিয়াছেন যে, দেহী যেরূপ জীর্ণবস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া নূতন বস্ত্র ধারণ করে, আত্মাও সেইরূপ জীর্ণ শরীর ত্যাগ করিয়া নূতন শরীর ধারণ করে। ফলতঃ মৃত্যুই যে নিঃশেষ জীর্ণতা হইতে জীবের একমাত্র পরিত্রাতা ও সংসার রক্ষার উপায় তদ্বিষয়ে সন্দেহ কি! স্বেচ্ছায় মৃত্যুকে আলিঙ্গন বা আপনাকে মৃত্যুমুখে পতিত হইবার সম্ভবজনক অবস্থায় আনয়ন করিয়া তজ্জনিত মৃত্যু মুখে পতিত হওয়াই আত্মহত্যা এবং দেহ ক্ষয়। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই, মৃত্যুর নিমিত্ত অপেক্ষা না করিয়া স্বেচ্ছায় দেহের ধ্বংস সাধন করিবার জীবের কি অধিকার বা আবশ্যকতা আছে। এ সম্বন্ধে চিন্তাশীল মনীষিগণের মতবাদ ও আচরণ প্রদর্শিত হইল। পণ্ডিত পিথাগোরাস বলেন যে, মনুষ্য ঈশ্বরের সৈনিক স্বরূপ, তাঁহার নিকট কার্য্যভার প্রাপ্ত হইয়া মনুষ্য এই জগতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছে। আত্মসংহার করিলে মনুষ্যের পক্ষে ঈশ্বরের নিকট বিদ্রোহিতাচরণ করা হয়। অথচ ডিওজিনাস লেটিরাস্ বলেন যে, পণ্ডিত পিথো-গোরাস অনশন-ব্রত অবলম্বন-পূর্ব্বক আত্মসংহার করেন। মনীষি প্লেটোর রচনা-বলী পাঠে অনুভব হয় যে, মূলতঃ তিনি আত্মহত্যা বিষয়ে অনুকূল মত প্রদান

করেন নাই। স্থলাবিশেষে এ বিষয়ে তিনি অনুকূল মত দিয়াছেন। এই মর্ম্মে তিনি বলিয়াছেন যে. সঙ্কটাপন্ন বিপদে পতিত হইলে এবং তাহাহইতে পরিত্রাণ লাভ দুরূহ হইলে অথবা দারিদ্র্য দুঃখের জ্বালায় জীবন ধারণ অসহনীয় হইয়া উঠিলে, আত্মহত্যা করা দূষণীয় নহে। প্রাচীন কালে গ্রীক ও রোমান জাতির মধ্যে আত্মহত্যার প্রচলন ছিল। জীনো, ক্লিন-থিয়াস্ প্রভৃতি মহাত্মারা আত্ম-হত্যা করিয়াছিলেন। সিসিরো আত্মহত্যা অতি ঘৃণিত কার্য্য বলিয়া নিন্দা করিয়া-ছেন। ধীমান্ কেটোর আত্মসংহার সাধন বিষয় লইয়া সিসিরো তাঁহাকে প্রশংসা করিয়াছেন। কোন কোন খৃষ্টধর্ম্মযাজক এই নিমিত্ত কেটোকে নিন্দা করিয়াছেন। ফরাসী বিদুষী মহিলা মাদাম দিষ্টায়েল কেটোর নিন্দাকায়ী খৃষ্টি-য়ান পণ্ডিতদিগের প্রলাপ-যুক্তির সমালোচনা তীব্র ভাষায় করিয়াছেন। আরি-ষ্টটল বলেন যে, মনুষ্যমাত্রই সমাজেব নিকট ঋণী ; সমাজের উন্নতিকর কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া আমরা এই ঋণ পরিশোধ করিয়া থাকি, আমাদিগের পক্ষে ইহা একটী কর্ত্তব্য কর্ম্ম। আত্মহত্যা করিলে এই ঋণ পরিশোধ হয় না। সেই মনুষ্য ঋণী-অবস্থায় দেহ ত্যাগ করে ; অতএব আত্মহত্যা গর্হিত কার্য্য। সিজ্রার অভিড ও তৎশ্রেণীর পণ্ডিতেরা আত্মহত্যার নিন্দা করিয়া কহিয়াছেন যে, ক্লেশ-সহিষ্ণুতা দ্বারাই মনুষ্য চরিত্র গঠিত হয়, প্রকৃত সাহস ইহাতে প্রকাশ পায়। কবি ভার্জ্জিল আত্মহত্যাকারীদিগের নরকযন্ত্রণার বিষয় স্বীয় জ্বলন্ত কবিতায় লোম-হর্ষণ ভাবে অঙ্কিত করিয়াছেন।

ষ্টয়িক সম্প্রদায় কর্ত্তৃক এক সময়ে পাশ্চাত্য জগতে আত্মহত্যার প্রচলন হয়। অথচ আমার বোধ হয় পাশ্চাত্য জগতে এমন কোন সম্প্রদায় ছিল না যাহাদিগের মধ্যে কর্ত্তব্য জ্ঞানের প্রাবল্য এত অধিক পরিমাণে ছিল। জীবনকে তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া অভীষ্ট সাধন জন্য সহাস্য বদনে অবলীলা-ক্রমে নিজপ্রাণ ধ্বংস করিবার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত এই সম্প্রদায় প্রদর্শন করিয়াছে। ষ্টয়িক সম্প্রদায় কর্ত্তব্যকর্ম্ম সম্বন্ধে দৃঢ়নিশ্চয় থাকিলেও প্রত্যেক মনুষ্যের নিজ জীবন নষ্ট করিবার অধিকার আছে। ষ্টয়িক পণ্ডিত জ্ঞানী সেনেকা এতৎ সংক্রান্ত নানা প্রবন্ধ প্রকটন করিয়াছেন। তাঁহার সকল মতবাদের উল্লেখ ও আলোচনা এ স্থলে দুঃসাধ্য। এই মহাত্মা স্থলবিশেষে আত্মহত্যা করা কাপুরুষের লক্ষণ বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। সেনেকা কহেন, আশঙ্কা প্রযুক্ত, দারিদ্র্য দুঃখ নিবন্ধন এবং প্রাণ-দণ্ডীর পক্ষে আত্মহত্যা অবিধেয়। এপিকিউরিয়াস্ এ সম্বন্ধে বিশেষ বিরোধী ছিলেন। তাঁহার মতবাদে ইহা অবগত হওয়া যায় যে, মৃত্যুর

নিমিত্ত ব্যস্ত ভাবে অগ্রসর না হইয়া ধীর ও প্রশান্ত ভাবে তাহার প্রতীক্ষা করা সমীচীন। কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, তাঁহার প্রিয় ছাত্র লিউক্রেসিয়াস্ আত্মহত্যা করিয়াছিলেন; কেসিয়াস এণ্টিক্যাস্ম (সিসিরোর বন্ধু,) প্যেট্রো নিয়াস, ডিওডোরাস্ প্রভৃতি অনেকেই আত্মহত্যা করেন। পেট্রো নিয়াসের কাহিনী এ স্থলে যৎকিঞ্চিৎ বিবৃত হইল। এই মহাত্মা সম্রাট নীরোর রাজত্বকালে বিথী-নীয় প্রদেশের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। ইহাতে বিশেষ দক্ষতার পরিচয় প্রদান ও ও সুযশঃ লাভ করেন। ইনি অতি সুমিষ্টভাষী ও মধুর প্রকৃতি ছিলেন। তদা-নীন্তন কালে সৌখীনতায় ও বিলাসিতায় ইনি অদ্বিতীয় হইয়া উঠেন, এবং সকলের আদর্শ স্বরূপ ছিলেন। মার্জ্জিতরুচি বলিয়া ইনি সাধারণের বিশেষ প্রিয়পাত্র হন। একমাত্র জঘন্য লাম্পট্য দোষে ইহাঁর জীবন কলুষিত হয়। সম্রাট নীরোর বিরাগ ভাজন হইয়াছেন, তাঁহার প্রতি সম্রাট কুপিত হইয়াছেন, এই আশঙ্কায় তিনি আত্মহত্যা করেন। তাঁহার আত্মহত্যার প্রক্রিয়া বিচিত্র। তিনি আত্মীয় স্বজন ও মিত্রবর্গকে আহ্বান পূর্ব্বক নিজ বিষয় সম্পত্তির বন্দোবস্ত করিয়া সহাস্য-বদনে ছুরিকা দ্বারা নিজ শিরাগুলি কর্ত্তন করিতে আরম্ভ করেন ও সেই সময়ে বিলাসিতার দ্রব্য উপভোগ করিতে করিতে প্রাণত্যাগ করেন। তিনি অন্তিম কালে ভগবানের নাম স্মরণের পরিবর্ত্তে অশ্লীল আমোদে লিপ্ত হইয়া জীবনলীলা সমাপ্ত করেন।

ইতঃপূর্ব্বে বলিয়াছি যে, ষ্টয়িক সম্প্রদায় কর্ত্তৃক আত্মহত্যার বহুল প্রচার হইয়াছে। প্লিনী সুস্পষ্ট ভাবে ও ওজস্বিনা ভাষায় বলিয়াছেন যে, ইহা আমা-দিগের অনুভূত হইবে যে, করুণাময় ঈশ্বর এক বিষয়ে স্বীয় ভাগ্য অপেক্ষা করুণাময় ঈশ্বর মনুষ্যের ভাগ্য অনেক সুবিধাজনক করিয়া দিয়াছেন। এই যে অগণিত উদ্ভিদ-রাজির সৃষ্টি হইয়াছে, বিবেচনা করিয়া দেখ, উহা মনুষ্যের পক্ষে কত কল্যাণকর, ইচ্ছা করিলে, অনায়াসে অণুমাত্র ক্লেশভোগ না করিয়া এই উদ্ভিদরাজির সাহায্যে আমরা নিজ প্রাণ ধ্বংস করিতে সমর্থ। প্রাচীন রোমান দিগের ইতিবৃত্তের প্রামাণ্য" নামক পুস্তকে স্যায় কর্ণিয়াল লুইস্ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, দেবতার নিকট "বলিদান" করিবার প্রথা বহু প্রাচীনকালের চিহ্ন। কার্টিয়াস্ ও ডিসিয়াসের দেবতার নিকট আত্মবলিদান তৎকালে ধর্ম্মানুমোদিত ও ধর্ম্মকার্য্যের অঙ্গীভূত বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে, এবং এই যে আত্মহত্যা ইহা আর কিছুই নহে, আত্মবলিদানের ব্যভিচার মাত্র। এক সময়ে আর্য্য হিন্দুদিগের নিকট দেবতার সম্মুখে আত্মবলিদানের প্রচলন ছিল। পণ্ডিত মহাশয়দিগের নিকট শুনা

সিয়াসকে নগর হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেন। হিজিসিয়াসের সংক্ষেপ বিবরণ এস্থলে যাহা আমি বলিলাম, উহা হইতে স্পষ্টভাবে ইহা বুঝা যায় যে অনেক সময়ে জাতি বিশেষ কোন মতবাদ সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেও তদনুসারে কার্য্য করিতে সক্ষম হয় না। ইহা যে নানা বিষময় ফলের কারণ তাহা বেশ বুঝা যায়। জীবনের সুখ সম্বন্ধে হিন্দু দার্শনিকদিগের সহিত হিজিসিয়াসের কোন মত বৈষম্য নাই; অথচ উভয়ের মধ্যে কার্য্যফলের কত প্রভেদ। হিজিসিয়াস ও তাঁহার দলস্থ ব্যক্তিগণ পাশ্চাত্য প্রাচীন সুধীদিগের মৃত্যু বিষয়ের মত গ্রহণ এবং সুখ ও মৃত্যু এই দুই মতের সম্মিলন করিয়া আত্মহত্যা কি খরতর বেগে প্রবাহিত করিয়াছিল? মৃত্যু সম্বন্ধে প্লিনী ও লিউক্রেশিয়াস বলেন যে ইহার আগমনে সকল বিষয়ের লয় হয় (All things ended with death post mortem nihilest ipsaque mors nihil.) ইহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ ইহাও বলিয়াছেন যে আত্মার লয় না হইলেও মৃত্যু কর্ত্তৃক আত্মা এমত স্থলে নীত হয় যথায় আত্মা অনন্তকাল বাস করে। হিন্দুদিগের মধ্যে কর্ম্মফল হেতু জীবের পুনঃ পুনঃ জন্ম গ্রহণ অপরিহার্য্য। সুতরাং হিন্দু জন্মান্তর বাদী। কর্ম্মফলে ইহাদিগের দৃঢ় বিশ্বাস। জীবন যে দুঃখ জ্বালাময় এই বিশ্বাস বদ্ধমূল থাকিলেও হিন্দুরা কর্ম্মবাদে চালিত হইয়া আত্মহত্যার পরিবর্ত্তে বিবেকের পথ অনুসরণ শ্রেয়স্কর বিবেচনা করে। রোমসম্রাট্ মহামতি বিজ্ঞ মারকস্ অরুলিয়াস্ এণ্টনি "নিভৃত-চিন্তা" (Meditation) নামক গ্রন্থে আত্মহত্যার অনুকূল ও প্রতিকূল উভয় পক্ষেই মতবাদ প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি বলেন, ষ্টয়িকদিগের ইহাই অভিমত, যে আত্মহত্যা দ্বারা সমাজের অনিষ্ট সাধিত হয়, তাদৃশ আত্মহত্যা দূষণীয়। আবার অন্য স্থলে ইহা বলিয়াছেন যে, চরিত্রবান্ ব্যক্তির নৈতিক অবনতির সূচনা হইলে তাহার পক্ষে আত্মহত্যা করাই শ্রেয়স্কর। সম্রাট্ এণ্টনির খুল্লতাত রোম সম্রাট্ হেড্রিয়ানকে আত্মহত্যা করিতে অনেক বার নিরস্ত রাখিয়াছিলেন। ক্যাপিটোলিনস্ বলেন, শেষ রোগাবস্থায় ইচ্ছাপূর্ব্বক অনশনব্রত ধারণ করিয়া সম্রাট্ এণ্টনি মহোদয় আপনার মৃত্যুসাধন করিয়াছিলেন।

নায়কের বিরহে গ্রীক-মহিলা বিদুষী সেফো প্রাণত্যাগ করেন। ব্রুটাসের পত্নী পোরসিয়া (কেটোর কন্যা) স্বামীর বিপক্ষদলের বিজয়-সংবাদ শ্রবণে মনোদুঃখে প্রাণত্যাগ করেন। ব্রুটাস শত্রুকর্ত্তৃক বন্দী হইবেন, এই আশঙ্কায় নিজ জীবন নাশ করেন। রোমান বীর লঙ্গিনিয়াস ডেসিয়ানদিগের সহিত যুদ্ধে বন্দী হন। ডেসিয়ানেরা রোমান সম্রাট্ ট্রেজানের নিকট এই মর্ম্মে প্রস্তাব করেন যে, যদি সম্রাট্ তাহাদিগের বিরুদ্ধে কোন ক্ষতিজনক কার্য্য করিবেন না,

এইরূপ অঙ্গীকার করেন, তাহা হইলে তাঁহারা লঙ্গিনিয়াসকে মুক্তি প্রদান করিবেন। ইতিমধ্যে লঙ্গিনিয়াস বিষপান পূর্ব্বক আত্মহত্যা করিয়া সম্রাটকে এই সমস্যা হইতে নিষ্কৃতি প্রদান করিলেন। পাশ্চাত্য সাহিত্যে ওথোর আত্মহত্যা স্বজাতিপ্রেমিকতার আদর্শ বলিয়া কীর্ত্তিত। দেশমধ্যে পুনর্ব্বার অশান্তি ও আত্মকলহ উপস্থিত হইলে, তিনিই ইহার মূল কারণ এইরূপ ধ্রুববিশ্বাসে ওথো আত্মনাশ সাধন করিয়াছিলেন। তাঁহার দলস্থ সেনাগণ আপনাদের নেতাকে প্রাণত্যাগ করিতে দেখিয়া ক্ষোভে ওথোর মৃতদেহের সম্মুখে নিজ নিজ প্রাণ ধ্বংস করিয়াছিল। সৈনিকেরা তাঁহাকে এত অধিক ভক্তি ও যত্ন করিত যে, সিউটোনিয়স্ বলেন, এই অশুভ সংবাদ সৈন্যশিবিরে প্রচারিত হইলে অনেকে প্রভু-বিচ্ছেদে প্রাণ বিসর্জ্জন করে। এডিসন স্বীয় প্রবন্ধে ব্যক্ত করিয়াছেন যে, ওলিম্পিয়াড হইতে আড়াই শত বিরহকাতর পুরুষ ও রমণী ঝম্প প্রদানপূর্ব্বক প্রাণ পরিত্যাগ করেন। তন্মধ্যে একশত চব্বিশ জন পুরুষ এবং একশত ছাব্বিশ জন স্ত্রীলোক। কথিত আছে, পুরাকালে এক সময়ে স্পার্টানদিগের মধ্যে চৌর্য্যবৃত্তি প্রচলিত ছিল, অথচ চুরি করা তৎকালে তাহাদিগের ভিতর নিন্দনীয় কার্য্য বলিয়া পরিগণিত হইত। জনৈক স্পার্টান যুবক একটী ক্রোষ্ঠু অপহরণ করিয়া নিজ পরিধেয় বস্ত্রমধ্যে লুক্কায়িত রাখেন। স্পার্টানদিগের আত্মাভিমান এত অধিক ছিল যে, উক্ত জন্তু কর্ত্তৃক ঐ যুবকের উদর বিদারিত হইয়া তাহার প্রাণনাশ ঘটিলেও তিনি চৌর্য্য-অপরাধে ঘৃণ্য হইবার আশঙ্কায় ক্রোষ্ঠুকে বস্ত্রমধ্য হইতে বাহির করেন নাই।

গ্রীক ও রোমানদিগের মধ্যে ষ্টয়িকদিগের বিধিব্যবস্থা ও ধর্ম্মনীতি বিশেষ সমাদৃত ছিল। উহা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জাতীয় চরিত্র গঠন ও মনুষ্য-জীবনের আদর্শ ও উদ্দেশ্য হইয়া উঠে। জীনোর বিধিপ্রণালী এই সম্প্রদায়ের প্রথম ধর্ম্মনীতির সূচনা। সিসিপিও এমিলী এনাসের অনুকম্পায় রোমরাজ্যে এই ধর্ম্মের প্রথম প্রচার হয়। রোডস্ নিবাসী পেণ্টিয়াস্ ও পসিডিনিয়াস্ নামা প্রসিদ্ধ সিরিয়্যানের অধ্যাপনায় ইহা শিক্ষিত সম্প্রদায়ের ধর্ম্ম বলিয়া অভিহিত হয়। জ্ঞানের চর্চ্চা ও তাহার উৎকর্ষে এবং যুক্তির সাহায্যে প্রকৃতির নিয়মগুলিতে চেতনা লাভ হয়, এবং এই প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে অথবা সুখঃ ও দুঃখের প্রতি দৃক্পাত না করিয়া ও লাভালাভের প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া কার্য্য করিতে সক্ষম হইলে মনুষ্য ধার্ম্মিক হইয়া থাকে। এই সম্প্রদায়ের মধ্যে নীতি-চর্চ্চা অপেক্ষা সংযম শিক্ষার প্রাবল্য ছিল। কামনাকে সম্পূর্ণরূপে যুক্তির বশীভূত করা প্রবৃত্ত ধর্ম্ম। কল্পনা ও অনুরাগাদির প্রাবল্য ব্যাধির চিহ্নমাত্র।

সিয়াসকে নগর হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেন। হিজিসিয়াসের সংক্ষেপ বিবরণ এস্থলে
যাহা আমি বলিলাম, উহা হইতে স্পষ্টভাবে ইহা বুঝা যায় যে অনেক সময়ে জাতি
বিশেষ কোন মতবাদ সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেও তদনুসারে কার্য্য করিতে সক্ষম
হয় না। ইহা যে নানা বিষময় ফলের কারণ তাহা বেশ বুঝা যায়। জীবনের সুখ
সম্বন্ধে-হিন্দু দার্শনিকদিগের সহিত হিজিসিয়াসের কোন মত বৈষম্য নাই, অথচ
উভয়ের মধ্যে কার্য্যফলের কত প্রভেদ। হিজিসিয়াস ও তাঁহার দলস্থ ব্যক্তিগণ
পাশ্চাত্য প্রাচীন সুধীদিগের মৃত্যু বিষয়ের মত গ্রহণ এবং সুখ ও মৃত্যু এই দুই
মতের সম্মিলন করিয়া আত্মহত্যা কি খরতর বেগে প্রবাহিত করিয়াছিল? মৃত্যু
সম্বন্ধে প্লিনী ও লিউক্রেশিয়াস বলেন যে ইহার আগমনে সকল বিষয়ের লয় হয়
(All things ended with death post mortem nihilest ipsaque mors
nihil.) ইহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ ইহাও বলিয়াছেন যে আত্মার লয় না হইলেও
মৃত্যু কর্ত্তৃক আত্মা এমত স্থলে নীত হয় যথায় আত্মা অনন্তকাল বাস করে। হিন্দু
দিগের মধ্যে কর্ম্মফল হেতু জীবের পুনঃ পুনঃ জন্ম গ্রহণ অপরিহার্য্য। সুতরাং হিন্দু
জন্মান্তর বাদী। কর্ম্মফলে ইহাদিগের দৃঢ় বিশ্বাস। জীবন যে দুঃখ জ্বালাময় এই বিশ্বাস
বদ্ধমূল থাকিলেও হিন্দুরা কর্ম্মবাদে চালিত হইয়া আত্মহত্যার পরিবর্ত্তে বিবেকের
পথ অনুসরণ শ্রেয়স্কর বিবেচনা করে। রোমসম্রাট্ মহামতি বিজ্ঞ মারকস্ অরুলিয়াস্
এণ্টনি- "নিভৃত-চিন্তা" (Meditation) নামক গ্রন্থে আত্মহত্যার অনুকূল ও
প্রতিকূল উভয় পক্ষেই মতবাদ প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি বলেন, ষ্টয়িকদিগের
ইহাই অভিমত, যে আত্মহত্যা দ্বারা সমাজের অনিষ্ট সাধিত হয়, তাদৃশ আত্মহত্যা
দূষণীয়। আবার অন্য স্থলে ইহা বলিয়াছেন যে, চরিত্রবান্ ব্যক্তির নৈতিক
অবনতির সূচনা হইলে তাহার পক্ষে আত্মহত্যা করাই শ্রেয়স্কর। সম্রাট্ এণ্টনির
খুল্লতাত রোম সম্রাট্ হেডিয়ানকে আত্মহত্যা করিতে অনেক বার নিরস্ত রাখিয়া-
ছিলেন। ক্যাপিটোলিনস্ বলেন, শেষ রোগাবস্থায় ইচ্ছাপূর্ব্বক অনশনব্রত
ধারণ করিয়া সম্রাট্ এণ্টনি মহোদয় আপনার মৃত্যুসাধন করিয়াছিলেন।

নায়কের বিরহে গ্রীক-মহিলা বিদুষী সেফো প্রাণত্যাগ করেন। ব্রুটাসের
পত্নী পোরসিয়া (কেটোর কন্যা) স্বামীর বিপক্ষদলের বিজয়-সংবাদ শ্রবণে
মনোদুঃখে প্রাণত্যাগ করেন। ব্রুটাস শত্রুকর্ত্তৃক বন্দী হইবেন, এই আশঙ্কায়
নিজ জীবন নাশ করেন। রোমান বীর লঙ্গিনিয়াস ডেসিয়ানদিগের সহিত যুদ্ধে
বন্দী হন। ডেসিয়ানেরা রোমান সম্রাট্ ট্রেজানের নিকট এই মর্ম্মে প্রস্তাব
করেন যে, যদি সম্রাট্ তাহাদিগের বিরুদ্ধে কোন ক্ষতিজনক কার্য্য করিবেন না,

এইরূপ অঙ্গীকার করেন, তাহা হইলে তাঁহারা লঙ্গিনিয়াসকে মুক্তি প্রদান করিবেন। ইতিমধ্যে লঙ্গিনিয়াস বিষপান পূর্ব্বক আত্মহত্যা করিয়া সম্রাটকে এই সমস্যা হইতে নিষ্কৃতি প্রদান করিলেন। পাশ্চাত্য সাহিত্যে ওথোর আত্মহত্যা স্বজাতিপ্রেমিকতার আদর্শ বলিয়া কীর্ত্তিত। দেশমধ্যে পুনর্ব্বার অশান্তি ও আত্মকলহ উপস্থিত হইলে, তিনিই ইহার মূল কারণ এইরূপ ধ্রুববিশ্বাসে ওথো আত্মনাশ সাধন করিয়াছিলেন। তাঁহার দলস্থ সেনাগণ আপনাদের নেতাকে প্রাণত্যাগ করিতে দেখিয়া ক্ষোভে ওথোর মৃতদেহের সম্মুখে নিজ নিজ প্রাণ ধ্বংস করিয়াছিল। সৈনিকেরা তাঁহাকে এত অধিক ভক্তি ও যত্ন করিত যে, সিউ-টোনিয়স্ বলেন, এই অশুভ সংবাদ সৈন্যশিবিরে প্রচারিত হইলে অনেকে প্রভু-বিচ্ছেদে প্রাণ বিসর্জ্জন করে। এডিসন স্বীয় প্রবন্ধে ব্যক্ত করিয়াছেন যে, ওলিম্পিয়াড হইতে আড়াই শত বিরহকাতর পুরুষ ও রমণী ঝম্প প্রদানপূর্ব্বক প্রাণ পরিত্যাগ করেন। তন্মধ্যে একশত চব্বিশ জন পুরুষ এবং একশত ছাব্বিশ জন স্ত্রীলোক। কথিত আছে, পুরাকালে এক সময়ে স্পার্টানদিগের মধ্যে চৌর্য্যবৃত্তি প্রচলিত ছিল, অথচ চুরি করা তৎকালে তাহাদিগের ভিতর নিন্দনীয় কার্য্য বলিয়া পরিগণিত হইত। জনৈক স্পার্টান যুবক একটী ক্রোষ্টু অপহরণ করিয়া নিজ পরিধেয় বস্ত্রমধ্যে লুক্কায়িত রাখেন। স্পার্টানদিগের আত্মা-ভিমান এত অধিক ছিল যে, উক্ত জন্তু কর্ত্তৃক ঐ যুবকের উদর বিদারিত হইয়া তাহার প্রাণনাশ ঘটিলেও তিনি চৌর্য্য-অপরাধে ঘৃণ্য হইবার আশঙ্কায় ক্রোষ্টুকে বস্ত্রমধ্য হইতে বাহির করেন নাই।

গ্রীক ও রোমানদিগের মধ্যে ষ্টয়িকদিগের বিধিব্যবস্থা ও ধর্ম্মনীতি বিশেষ সমাদৃত ছিল। উহা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জাতীয় চরিত্র গঠন ও মনুষ্য-জীবনের আদর্শ ও উদ্দেশ্য হইয়া উঠে। জীনোর বিধিপ্রণালী এই সম্প্রদায়ের প্রথম ধর্ম্মনীতির সূচনা। সিসিপিও এমিলী এনাসের অনুকম্পায় রোমরাজ্যে এই ধর্ম্মের প্রথম প্রচার হয়। রোডস্ নিবাসী পেণ্টিয়াস্ ও পসিডিনিয়াস্ নামা প্রসিদ্ধ সিরিয়্যানের অধ্যাপনায় ইহা শিক্ষিত সম্প্রদায়ের ধর্ম্ম বলিয়া অভিহিত হয়। জ্ঞানের চর্চ্চা ও তাহার উৎকর্ষে এবং যুক্তির সাহায্যে প্রকৃতির নিয়মগুলিতে চেতনা লাভ হয়, এবং এই প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে অথবা সুখঃ ও দুঃখের প্রতি দৃক্পাত না করিয়া ও লাভালাভের প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া কার্য্য করিতে সক্ষম হইলে মনুষ্য ধার্ম্মিক হইয়া থাকে। এই সম্প্রদায়ের মধ্যে নীতি-চর্চ্চা অপেক্ষা সংযম শিক্ষার প্রাবল্য ছিল। কামনাকে সম্পূর্ণরূপে যুক্তির বশী-ভূত করা প্রকৃত ধর্ম্ম। কল্পনা ও অনুরাগাদির প্রাবল্য ব্যাধির চিহ্নমাত্র।

ঈশ্বরের আদেশ ও অভিপ্রায়সম্পাদন প্রভৃতির প্রতি ষ্টয়কদিগের আস্থা ছিল না। আকাঙ্ক্ষা ও অনুরাগ প্রভৃতির উচ্ছেদসাধনও সংকল্প দৃঢ় করা ষ্টয়িকদিগের জীবনের উদ্দেশ্য ছিল। তাহাদিগের মতে এইভাবে চরিত্র সংগঠনও জীবনের কার্য্য পরিচালিত করিতে পারিলে মনুষ্য ধর্ম্মের উচ্চতম সোপানে আরোহণ করিতে সক্ষম হইত। মৃত্যুভয়ে ইহাঁরা ভীত হইতেন না, এবং আত্মজীবনান্ত করিবার অধিকার সকলের আছে, ইহাই তাঁহাদের উপদেশ

ষ্টয়িকদিগের ধর্ম্মনীতিপ্রণালী আমি অতি সংক্ষিপ্ত ও সামান্যভাবে আপনাদিগের নিকট ব্যক্ত করিলাম। ইংরাজি হইতে অনুবাদ যথাযথ হইল কি না, বলিতে পারি না। কোন কোন পণ্ডিত বলেন যে, ষ্টয়িকদিগের ধর্ম্মনীতি ও কার্য্যগুলি মানবের হৃদয়ে আশা বা শান্তিবারি প্রদান না করিতে পারে, কিন্তু ইহা অঙ্গীকার করিতে আমরা বাধ্য যে, আত্মসম্মান বোধ, বীরভাব ও নৈতিক বল ইহাঁরা মনুষ্য হৃদয়ে বিশেষরূপে দৃঢ়তর করিয়াছেন। রোমানদিগের জাতীয় চরিত্র মধ্যে ষ্টয়িক নীতি দেদীপ্যমান। রোমান-নেতারা এই ধর্ম্মনীতির অনুসরণ দ্বারা জগতে অতুলনীয় হইয়াছেন। কোন চিত্রকরকে রোমান-চিত্র অঙ্কিত করিতে বল, চিত্রকর পটে এমন একটী আলেখ্য চিত্রিত করিবে, যেন তাহার বদনমণ্ডল হইতে বীরত্বব্যঞ্জক জ্যোতিঃ বিনির্গত হইতেছে, নির্ভীকতা ও সগর্ব্ব তেজোভাব যেন তাহার আকার হইতে তড়িৎ-বেগে প্রবাহিত হইতেছে, দৃঢ়সঙ্কল্পতা, ক্লেশসহিষ্ণুতা তাহাতে দেদীপ্যমান এবং সেই আদর্শ আলেখ্যটি প্রতিজ্ঞা পালনে তৎপর ও মৃত্যুকে ভ্রূভঙ্গী করিয়া তন্নিমিত্ত প্রস্তুত রহিয়াছে।

খৃষ্টধর্ম্মের আবির্ভাবে ইউরোপে মৃত্যুসম্বন্ধে নূতন মতের প্রচার হয়। গ্রীক ও রোমান দার্শনিকগণ বলেন, "মৃত্যু স্বাভাবিক নিয়ম, জীবের পক্ষে শাস্তি নহে।" খৃষ্টিয়ান প্রচারক দিগের মতে আডামের পাপের দণ্ডস্বরূপ পৃথিবীতে মৃত্যুর অধিকার হইয়াছে? * পূর্ব্ব দার্শনিকগণের মতে মৃত্যু যন্ত্রণার বিরামদায়ক ও তাহার পরে আর কোন যন্ত্রণা থাকিতে পারে না। খ্রীষ্টিয়ানগণের মতে অধিকাংশ মনুষ্যের পক্ষে মৃত্যু অমানুষিক ভীষণ যন্ত্রণার দ্বারস্বরূপ। এক দলের

* এস্থলে বলা আবশ্যক যে, ভূতত্ত্ব দ্বারা ইহা প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, বাইবেল নির্দিষ্ট আডামের আবির্ভাব হইবার বহু শত বৎসর পূর্ব্বে হইতে মৃত্যু জীবকে অধিকার করিয়াছে এবং ভূতত্ত্বের প্রচলনে গ্রীক ও রোমান দার্শনিকদিগের মত অর্থাৎ মৃত্যু স্বাভাবিক নিয়ম ইহা প্রতিপন্ন হইয়াছে।

মতে মনুষ্য নিষ্পাপ হইয়া জন্ম গ্রহণ করে, অপরের মতে মনুষ্য শাপগ্রস্ত পাপী হইয়া জন্মগ্রহণ করে। একের মতে মনুষ্য ধর্ম্মের বিশেষ বিশেষ ক্রিয়া ও আচরণ না করিলেও কেবল সৎকর্ম্ম দ্বারা ঈশ্বরের প্রিয় হইয়া মুক্তিলাভ করিতে পারে, অপরের মতে মনুষ্য যতই ধার্ম্মিক হউক না কেন, খৃষ্টিয়ানধর্ম্মে সম্পূর্ণ বিশ্বাস ভিন্ন মুক্তি পাইতে পারে না। দার্শনিকগণ মৃত্যুসম্বন্ধে মনুষ্যের ভয় দূর করিবার চেষ্টা করিয়াছে, আর খৃষ্টিয়ানগণ মৃত্যুকে বিশেষ ভয়াবহ করিয়া তুলিয়াছেন।

ইহাঁরা মৃত্যু ভয় অপনীত করিবার নিমিত্ত সচেষ্ট ছিলেন। ফলতঃ সংসারে বিশেষ শোক দুঃখ ভোগ না করিয়া অন্তিম সময়ে সন্তানসন্ততি পরিবৃত হইয়া বৃদ্ধ বয়সে মুক্তপ্রাণ হইতে পারিলে সাধারণতঃ তাহা পুণ্য লক্ষণ বলিয়া প্রশংসিত হয়। নানা আনুষঙ্গিক ঘটনার সহিত বিজড়িত ও সংমিশ্রিত হইয়া মৃত্যু ভীষণ ভাব ধারণ করিয়াছে। সিসিরোর এতৎসংক্রান্ত রচনাবলী মহান্ গভীর ভাব ও সদুপদেশে পরিপূর্ণ। সম্রাট মার্কাস্ এন্টনীর "নিভৃতচিন্তা" (Meditation) এই বিষয়ের মতবাদের বিলক্ষণ পরিচায়ক। খৃষ্টিয়ানদিগের "গাথা" (Psalms) মার্কাস এন্টনীর গভীর ভাবের অপরিস্ফুট ছায়া মাত্র (Only the faintest and most dubious glimmer of such a belief can be traced in the Psalms in which countless generations of Christians have found the fullest expression of their devotional feelings) শেক্সপিয়ার ও গার্থ হৃদয়গ্রাহিনী কবিতায় গ্রীক ও রোমানদিগের এতদ্বিষয়ক প্রস্তাবের প্রতিবিম্ব প্রতিফলিত করিয়াছেন। নিম্নে দুই একটী উদাহরণ প্রদত্ত হইল :—

স্বপ্ন উপাদানে মোরা, সবে হইয়াছি গড়া,
স্বপ্নে যেন দেহ পরকাশ,
নিদ্রার কোমল বেড়া, চতুঃপার্শ্বে আছে ঘেরা,
যথা ক্ষুদ্র অস্তিত্ব বিকাশ।

We are such stuff
As dreams are made on, and our
little life
Is rounded with sleep

Shakespear (*The Tempest.*)

সতত মনেতে হয়, ভুঞ্জি নিদ্রা সুখময়,

কিন্তু যেতে করে ভয়, মরণের প্রশান্ত নিলয় ?
যথায় অনন্ত শান্তি লভিবে নিশ্চয়।

The best of rest is sleep.
And that thou oft qrovokst,
Yet grossly fearst
Thy death, which is no more.

Shakespear. Measure for Measure.

সেই নিরঞ্জন স্থানে, নাহি পশে এ শ্রবণে,
উর্ম্মি কিংবা প্রলয়ের আবার ভীষণ।
বুঝি বা সেখানে গেলে, লোকে তারে মৃত বলে,
এমনই মায়ার মোহে জড়িত জীবন॥

To die is landing on some silent shore
Where billows never break nor
tempests roar

Garth.

খৃষ্টীয়ানেরা বলিয়া থাকেন যে, তাঁহাদিগের ধর্ম্মপ্রণালীর দ্বারা ইউরোপখণ্ডে আত্মহত্যার উপশম হইয়াছে। ইহা যে সম্পূর্ণ সত্য, তাহা আমি বিবেচনা করি না। ইহা স্বীকার করিতে হয়, পাশ্চাত্যখণ্ডে খৃষ্টধর্ম্মযাজকদিগের মৃত্যু বিষয়ের মতবাদে মৃত্যুভীতির সঞ্চার বিশেষ ভাবে হইয়াছিল। আত্মহত্যা যে একটী গুরুতর মহাপাপ, খৃষ্টীয়ানেরা তাহা বলেন। আমি ইতঃপূর্ব্বে প্রাচীন চিন্তাশীল গ্রীক ও রোমান পণ্ডিতদিগের মতবাদ উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছি যে, তাঁহারাও আত্মহত্যাকে দূষণীয় ঘৃণিত কার্য্য, বলিয়া পরিগণিত করিয়াছেন। সুতরাং একমাত্র খৃষ্টীয়ানেরা যে আত্মহত্যাকে নিন্দা করিয়াছেন, এমন নহে। ইয়োরোপখণ্ডে খৃষ্টীয়ানেরা আত্মহত্যা দমনহেতু নানা কঠোর অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, এবিষয়ে কেহ কোন তর্ক উত্থাপন করিতে পারেন না। অবশ্য প্রাচীন কালে এতৎসম্বন্ধে যে কোন প্রতিকার-বিধি ছিল না, তাহা নহে। কিন্তু বোধ হয়, খৃষ্টীয়ানদিগের ন্যায় এরূপ কঠোর প্রতিষেধ-বিধি ছিল না। রোমানদিগের গ্রন্থপাঠে জানা যায় যে, রোমসম্রাট হাড্রিয়ান এই ব্যবস্থা প্রণয়ন করেন যে, কোন সৈনিক আত্মহত্যা করিলে তাহার শবের প্রতি দণ্ড বিধান হইবে। সিউটোনিয়াস্ বলেন কোন ব্যক্তি আত্মনাশ সাধনে উদ্যত হইলে ধর্ম্মাধিকরণে

তাহাকে অভিযুক্ত করা হইত, স্থলবিশেষে গ্রীক জাতির আইন পুস্তকে ইহার প্রতিষেধ বিধি দৃষ্ট হয়। জোসেফিয়াস্ বলেন, তৎকালে কোন কোন জাতির মধ্যে আত্মহত্যাকারীর দক্ষিণ হস্ত কর্ত্তন করা হইত। জুডিয়া নগরীতে আত্মহত্যাকারীর মৃত্যুদেহ সন্ধ্যা উত্তীর্ণ না হইলে সমাধিস্থ করিবার নিয়ম ছিল না। ব্লাকষ্টোন তাঁহার আইন পুস্তকে আত্মহত্যা বিষয়ক অধ্যায়ে প্রাচীন গ্রীক ও রোম্যান বিধির উল্লেখ করিয়াছেন। ইউরোপখণ্ডে খৃষ্টীয়ানেরা নানা প্রকার আইনদ্বারা মনুষ্যের এই অধিকার নষ্ট করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। আত্মহত্যাকারীর মৃতদেহের প্রতি নানা প্রকার বীভৎস অত্যাচার ও লাঞ্ছনা করা হয়। তাহাদিগের উত্তরাধিকারিগণকে বিষয় সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত করা হইত। সবে মাত্র অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ হইতে আত্মহত্যাকারী সম্বন্ধে আইনের অত্যাচার দূরীকরণের সূত্রপাত হয়। অধুনা ফরাসী রাজ্যে আত্মহত্যাকারীর পক্ষে আর কোন নির্য্যাতন বিধি নাই। ইংলণ্ডে চতুর্থ জর্জ্জের রাজত্ব কালে আত্মহত্যাকারীর মৃতশরীরের প্রতি অত্যাচারবিধির বিলোপ হয়, এবং উহা ১৮৭০ খৃঃ আইন পুস্তক হইতে তুলিয়া দেওয়া হয়। পাশ্চাত্য ইউরোপ খণ্ডে খৃষ্টধর্ম্মযাজকগণকর্ত্তৃক আত্মহত্যা নিবারণ উদ্দেশ্যে কঠোর বিধিব্যবস্থা প্রচলন হইলেও কার্য্যক্ষেত্রে উহা কতদূর সফলতা লাভ করিয়াছিল, তাহা বলা যায় না। ইতিহাসে পাঠ করা যায় পেগান বা পৌত্তলিকদিগের সহিত ধর্ম্ম সম্বন্ধে তর্কবাদ ও কলহপ্রযুক্ত বিচারালয়ে নীত হইলে তাঁহারা পৌত্তলিক বিচারপতিদিগের সহিত তর্ককলহ করিয়া নিজ নিজ জীবন বিনষ্ট করিতে উদ্যত হইতেন। ধর্ম্মযাজকেরা এই সকল মহাত্মকে ধর্ম্মবীর (Martyr) ও উহাদিগের কার্য্য কলাপ ধর্ম্মানুমোদিত বলিয়াছেন। পেগানদিগের হস্তে অত্যাচার প্রাপ্ত হইয়া অনেক খৃষ্টীয়ান প্রাণ বিসর্জ্জন করিত। সতীত্বরক্ষার নিমিত্ত বহু খৃষ্টীয় মহিলা তৎকালে নিজ জীবন বিসর্জ্জন দিয়াছিল! সেণ্ট আগষ্টাইন্ ও তদীয় মতানুবর্ত্তীরা এরূপ আত্মহত্যাকেও দূষণীয় বলিয়া পরিগণিত করিয়াছেন। অথচ এই মহাত্মারা আবার যে সকল খৃষ্টীয়ান কঠোর সংযম অবলম্বনপূর্ব্বক অকালে জীবন বিসর্জ্জন করিয়াছিল, তাহাদের ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন।

চতুর্থ শতাব্দীতে আর কমসিলিনিও নামক এক সম্প্রদায় খৃষ্টীয়ান ছিল। পৌত্তলিকদিগের সহিত তর্কবাদ উপস্থিত করিয়া উভয় দলে ধর্ম্মোন্মত্ততা প্রযুক্ত উচ্চ পর্ব্বতশৃঙ্গ হইতে ঝম্প প্রদানপূর্ব্বক নিম্নে পতিত হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিত। সেণ্ট আগষ্টাইন্ ও সেণ্ট অপটেটাস্ বলেন, এই শত সহস্র খৃষ্টীয়ানের

ক্ষতস্থান হইতে রক্তস্রোত প্রবাহিত হইয়া পর্ব্বতের নিম্নপ্রদেশ রক্তিমাকার ধারণ করিয়াছিল। ইহার বহু পরবর্ত্তী সময়ে আলবী জেন্‌সেস্‌গণ (Albigenses) দুরন্ত ব্যাধিগ্রস্ত হইলে অনশন বা রক্তমোক্ষণ দ্বারা আপনাদের প্রাণনাশ করিত। এইরূপ প্রাণনাশকে এন্‌ডিউরা (Endura) বলা হইত। এই সম্প্রদায়ের মধ্যে ইহা প্রথাস্বরূপ হইয়াছিল। টড্‌ প্রণীত সেন্‌প্যাটরিকের জীবনীতে ইহা বিবৃত আছে ইহুদীগণ তৎকালে দলে দলে আত্মনাশ করিত। ১০৯৫ খৃঃ ফরাসী রাজ্যে শত সহস্র ইহুদী খৃষ্টিয়ান অত্যাচারে প্রাণনাশ করে। এই কারণে ইয়র্ক নগরীতে ৫০০ ইহুদীও উক্ত পথানুসরণ করে, খৃষ্টিয়ান সেপাড়দিগের দ্বারা অত্যাচার প্রপীড়িত হইয়া ১৩২০ খৃঃ ৫০০ ইহুদী প্রাণ ত্যাগ করিয়াছিল। গথিকদিগের রাজত্বের শেষ সময়ে স্পেনের অধিবাসীরা আত্মহত্যা করিত। চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে ইংলণ্ডের মড়কের (Black death) প্রাদুর্ভাব হইলে শত শত ইংরেজ জীবন বিসর্জ্জন করিয়াছিল। কথিত আছে, মিলিটিসে এক সময়ে অল্পবয়স্কা রমণীগণ দলে দলে জীবন বিসর্জ্জন করিত। মধ্যবর্ত্তী সময়ে অনুতপ্ত হৃদয়ে বা মুক্তিলাভ কামনায় খৃষ্টিয়ান মঙ্কেরা তাঁহাদিগের মঠাশ্রমে আত্মসংহার সাধন করিতেন।

মৃত্যু বিষয়ে খৃষ্টিয়ান ধর্ম্মযাজকেরা লোকের মনে যেরূপ সংস্কার বদ্ধমূল করুক না কেন এবং সেই সঙ্গে রাজ্য মধ্যে নানাপ্রকার বীভৎস লোমহর্ষজনক অত্যাচার সম্পাদিত হউক না কেন, আত্মহত্যা যে ইহাদিগের মধ্যে একেবারে উঠে নাই তাহার উদাহরণ আমি সংক্ষেপে এস্থলে আপনাদিগের নিকট উপস্থিত করিতে সক্ষম হইয়াছি। ইহা এস্থলে স্বীকার্য্য যে, খৃষ্টিয়ান ধর্ম্মযাজকের উপদেশ ও প্রভাবে ইউরোপ খণ্ডে জনসাধারণ মধ্যে এক অতি অজ্ঞান ভীতি উৎপাদন করিয়াছিল। কেবল জ্ঞানালোক প্রভাবে ও রাজনৈতিক আন্দোলনে এবং সেই সঙ্গে দেশের শাসনশক্তিতে খৃষ্টিয়ান পুরোহিতদিগেয় প্রভাব ও ক্ষমতা অবসন্ন হইলে ইহার ভীতির কারণ অপনীত হয়। তমসাচ্ছন্ন মধ্যযুগের অবসানের পর ইউরোপ খণ্ডে গ্রীক ও লাটিন সাহিত্যের পুনরনুশীলন আরম্ভ হয়। ইউরোপ মধ্যে ইহাতে নানা সুফল দর্শে। আত্মহত্যা বিষয়ে ইহাদিগের মতবাদের পরিবর্ত্তনও লক্ষিত হইয়াছে। গ্রোসিয়াস্‌ পুফেন ডাক্‌বলেন, সতীত্ব রক্ষা, পাপ হইতে মুক্তিলাভ, নিশ্চিত মৃত্যু অবধারণ করিয়াও সৈনিকের কার্য্যে নিযুক্ত হওয়া বন্ধুর নিমিত্ত প্রাণত্যাগ এবং প্রাণদণ্ডীর পক্ষে যন্ত্রণা হইতে মুক্তিলাভ হেতু আত্মহত্যা দূষণীয় নহে। স্যার টমাস্‌ মূর ইউটোপিয়া নামক পুস্তকে এই মত প্রকাশ করিয়াছেন যে দুরারোগ্য রোগ হইতে নিষ্কৃতিলাভ উদ্দেশ্যে রাজকীয় আদেশ গ্রহণ করিয়া

আত্মহত্যা সাধন হইতে পারে। ইংলণ্ডে সেণ্টপল গির্জ্জার সাধু ও সুধী ডিন্‌ ডাক্তার ডন মহোদয় এ বিষয়ে অনুকূল একটী প্রবন্ধ রচনা করেন। ১৬৪৪খৃঃ এই মহাত্মার পুত্র উহা প্রচার করেন। তাহা লইয়া খৃষ্টিয়ান পুরোহিত দিগের মধ্যে এক মহাতর্ক উঠে। ডনের ন্যায় সাধু খৃষ্টীয়ান উহা লিখিলেও তাঁহারা তাঁহাকে তিরস্কার করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। "অহিফেন সেবীর প্রলাপ" (Confession of an opium-eater) পুস্তকে টমাস ডিকুইনসে ডনকে সমর্থন করিয়া একটী প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। ফরাসী বিদুষী মাদাম দি ষ্টায়েল অনুরাগ (Passions) সূচক প্রবন্ধে আত্মহত্যার অনুশীলন করিয়া ইহাতে অনুকূল মত প্রদান করিয়াছেন। তাঁহার এই পুস্তকখানি শুদ্ধ চিন্তাশীলতা ও গবেষণার পরিচায়ক নহে। ইহাদিগের প্রাচীন মত "দেহনাশ মাত্রেই আত্মাকে হত্যাকরণ (Murder) আত্মহত্যা যে সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর পাপ ও সর্ব্বদা কাপুরুষের লক্ষণ, ইহা ঠিক নহে, এইরূপ স্বীকার করিয়া তিনি সহজ অথচ ধীর যুক্তি দ্বারা প্রাচান মতগুলির পরিত্যাগ করেন। অতি সুন্দর উৎকৃষ্ট মনোমুগ্ধকর ভাষায় ক্লেশ ও দুঃখ হইতে মনুষ্যচরিত্র কিরূপ নম্র, বিশুদ্ধ ও সুদৃঢ় হয়, তাহা তিনি সুনিপুণভাবে বর্ণন করিয়াছেন। তিনি ইহা পরিস্ফুটভাবে বুঝাইয়াছেন যে, মনুষ্যের পক্ষে নম্রভাবে সকল অবস্থা গ্রহণ করা অপেক্ষা অধিকতর পবিত্র কর্ত্তব্য অথবা সান্ত্বনাদায়ক কিছুই হইতে পারে না। "ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদিস্থিতেন যথা নিযুক্তোস্মি তথা করোমি" ইহা তাঁহার পুস্তকেব্যাখ্যা করিয়াছেন। বাইবেলেরমত সমালোচনা করিয়া ইহা পরে প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, নিঃস্বার্থপরায়ণতাই মনুষ্যের মহত্ত্বের পরিমাণ। দেহক্ষয় জনিত আত্মনাশ এবং আত্মোৎসর্গ এই দুইটী যে বিভিন্ন, তাহা বুঝাইবার প্রয়াস পাইয়াছেন। কেটোর ও কার্টিয়াসের দেহত্যাগ রোমের উন্নতিকল্পে সাধিত হইয়াছিল বলিয়া তিনি প্রশংসা করিয়াছিলেন। "পরোপকারায় সতাংহি জীবনং" এইটী তাঁহার পুস্তকের মূলমন্ত্র। জীবের কল্যাণ হেতু অশেষ প্রকার সুখশান্তি পরিত্যাগ করিয়া নিজ জীবন ত্যাগ করা অথবা এই নিমিত্ত অশেষ দুঃখ যন্ত্রণা ভোগ করিয়া প্রাণধারণ করা সাধুজনের কার্য্য, ইহা তিনি বলিয়াছেন। দেখা যায়, অনেক ফরাসী পণ্ডিত ইহার অনুকূলে মত দিয়াছেন। মণ্টেনের অভিমত এই শ্রেণীর একটি। রুসো নিজের প্রথম পত্রে ইহার অনুকূল পক্ষ অবলম্বনপূর্ব্বক লিপিচাতুর্য্যের পরিচয় দিয়াছেন। এস্কুইরেল নামক জনৈক ফরাসী লেখক বলেন এই পত্রপাঠ করিয়া ত্রয়োদশ বর্ষীয় জনৈক ব্যক্তি আত্মহত্যা করে। অবশেষে

দ্বিতীয় পত্রে রুসো ইহার প্রতিকূলে লেখনী চালনা করিয়াছিলেন। ভ্রান্তসংস্কার-বশতঃ ও কাল্পনিক আকাঙ্ক্ষায়, হতশ্বাসে প্রণোদিত এবং অন্ধ কুটিল স্বার্থে দিগ্বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হইয়া মনুষ্য এই দুষ্কার্য্য করিয়া থাকে, তাহা তিনি জ্বলন্ত ভাষায় অঙ্কিত করিয়াছেন। ভল্টেয়ার তাঁহার কেটন ও আত্মহত্যা প্রবন্ধে সাধারণতঃ ইহার প্রতিকূল মত প্রদান করিয়াছেন। তিনি স্থলবিশেষে ইহার আবশ্যকতা স্বীকার করেন। ডেলাম্বে হলব্যাকদিগের মত আর আমি উল্লেখ করিলাম না। ইহাঁরা সকলেই নিরীশ্বরবাদী ছিলেন। ইহাঁরা উৎসাহ ও আগ্রহ সহকারে এ বিষয়ে মত প্রদান করিয়াছেন। ১৭৩৫ খৃষ্টাব্দে রোবেক নামক জনৈক সুইস ইহার অনুকূলে এক পুস্তক প্রচার করেন। সুইজারলাণ্ড প্রদেশে এক সময়ে এই পুস্তক আদৃত হয়। রোবেক অবশেষে জলনিমগ্ন হইয়া নিজ জীবন পরিত্যাগ করেন।

লাটিন ও গ্রীক সাহিত্যের পুনরনুশীলনে পশ্চিম ইউরোপে প্রাচীন গ্রীক ও রোমানদিগের জীবনসংগ্রামের সকল অবস্থার সকল প্রকার বীরত্ব অনুকরণীয় হইয়া উঠে। কি দেশহিতৈষিতা, স্বজাতিপ্রেমিকতা, অমানুষিক উৎকর্ষ, সকল বিষয়েই ইহাদিগের প্রভাব লক্ষিত হয়। কর্ত্তব্যকর্ম্ম হেতু প্রাণ বিসর্জ্জন জীবনের একটি মহৎ কার্য্য এ ধুয়াও হয়। আবার মুসলমানজাতির সংঘর্ষসূত্রে ইউরোপে জ্ঞানালোক বিভাষিত হওয়ায় নবজীবন লাভ করে। বোধ হয় অধুনাতনকালে এই সুসভ্য জাতি পাশ্চাত্যজগতে আত্মহত্যার বিরুদ্ধ মতবাদ বিশেষভাবে প্রচার করিয়াছেন। পণ্ডিতেরা বলেন, মুসলমানদিগের ধর্ম্মপুস্তকে আত্মহত্যার বিরুদ্ধে মতবাদ প্রচারিত হইয়াছে। দেখা যায়, অধুনাতনকালে কত শত মহাত্মা ধর্ম্ম, সমাজ, শাসনপ্রণালীর সংস্কার হেতু অথবা সাহিত্য, দর্শন, শিল্প, বিজ্ঞানের উন্নতি-কল্পে এবং দেশ আবিষ্কার হেতু নিজ প্রাণ পরিত্যাগ করিতেছেন। এই আত্ম-নাশ আত্মোৎসর্গে পরিণত হইয়াছে। ইহা সকলের অনুকরণ স্থল হইয়াছে। ইহাও পাঠ করা যায় যে, ধর্ম্মযাজক, ক্ষমতাশালী শাসকগণ তাঁহাদিগের অন্ধ বিশ্বাসে প্রণোদিত হইয়াএই সকল সংস্কারকের কার্য্যাবলী দেশের ও জগতের অনিষ্টকর ও উন্মত্ততার বিকার বিবেচনায় তাহাদিগের উচ্ছেদহেতু অত্যাচার উৎপীড়নের অনুষ্ঠান করেন। ফলতঃ ইহাদিগের নির্ব্বুদ্ধিতাই নানা অশুভ ফলের আকর হয়। কারণ দেখা যায়, ইহাঁরা জ্ঞানী, সাধুচরিত্র নম্রপ্রকৃতির মহাশয় ব্যক্তি ছিলেন। কেবল মাত্র অমূলক সংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া ইহাঁরা জগতের কি অমঙ্গলই সাধন না করিয়াছেন? বকল্ বলেন, ইহাঁরা জীবের হিত

কল্পে অন্ধ জ্ঞান বশতঃ এই অমঙ্গলের হেতু হইয়াছেন। বিভিন্ন ধর্ম্ম সম্প্রদায় ভিন্ন ভিন্ন জাতির পরস্পরের আচরণের ও ব্যবহারের ব্যাখ্যায় ইহা উপলব্ধ হইবে।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে ফরাসী রাষ্ট্রবিপ্লবের সূচনায় ইউরোপখণ্ডে আত্ম-হত্যার প্রাবল্য হয়। দেশের নিমিত্ত অনেক ব্যক্তি অকাতরে নিজ প্রাণ বলি দেন। ম্যাডাম চালটি কডের লোমহর্ষজনক ব্যাপার ও আত্মবলিদান রাষ্ট্র-বিপ্লব ঘটনার অকিঞ্চিৎকর তুচ্ছ উদাহরণ মাত্র। রোবেস পিয়ারের সহযোগী বা শিয়া সেণ্ট জাষ্ট বলিতেন, রোমানদিগের পরবর্ত্তী সময় হইতে পৃথিবীতে আর প্রকৃত মনুষ্যের জন্মগ্রহণ হয় নাই। পৃথিবী যেন এতদিন মনুষ্যশূন্য হইয়াছিল।

প্রাচীন মতবাদের সহিত আধুনিক মতবাদের সংঘর্ষণ সূত্রে আত্মহত্যা সংক্রান্ত মতবাদের যে পরিবর্ত্তন চলিয়াছে, তাহা অতি সংক্ষিপ্তভাবে বলা হইল। আধু-নিক সভ্যতার সহিত ইহার কি সম্পর্ক আছে, তদ্বিষয়ে কেবলমাত্র দুই এক কথা বলিব। প্রাচীন ও আধুনিক সভ্যতার আদর্শ স্বতন্ত্র। অতীতের সহিত বর্ত্ত-মানের তুলনায় ইহা বেশ বুঝা যায়। অধুনা কাল ধর্ম্মস্রোতে সংসারাশ্রমের আকাঙ্ক্ষা ও অভাব ভিন্ন আকার ধারণ করিয়া শত মুখী হইয়াছে। সমাজে অর্থনীতিশাস্ত্রের ব্যবহার ও প্রচলনে মনুষ্যজীবনের কি পরিবর্ত্তনই না হইয়াছে? আচরণ, ব্যবহার, পরিচ্ছদ, খাদ্য, বিবাহ, স্ত্রী ও পুরুষ, এই সকল নানা জটিল প্রশ্নের মীমাংসায় বুঝা যায় যে, অতীতের সহিত বর্ত্তমানের মিল হয় না। ফলতঃ এইগুলি এক্ষণে ভিন্ন প্রণালী অনুসারে পরিচালিত হইতেছে। সেই কঠোর ধর্ম্মজীব, সেই অনশনব্রত অবলম্বনপূর্ব্বক নিজ শরীরকে অশেষবিধ যন্ত্রণা প্রদান করিয়া ঈশ্বরের আরাধনা করিতে করিতে দেহত্যাগ,তপস্যা ও ব্রহ্মচর্য্য ব্রত-অবলম্বন এইগুলি বর্ত্তমানকালে অন্তর্হিত হইতেছে। ইহা চিত্তবিকারের লক্ষণ বলিয়া অভি-হিত হইতেছে। ভোগ্য বস্তুর উপভোগও সুখস্পৃহা,ইহাই বর্ত্তমান কালে প্রার্থনীয়ও লক্ষ্যবস্তু হইয়াছে। ইহার আহরণ হেতু আমরা অনুক্ষণ সচেষ্ট। অধুনা শিক্ষা লাভের উদ্দেশ্য হইতেছে, কি উপায়ে সংসারে আমরা সুখস্বচ্ছন্দে জীবন যাপন করিব। শিক্ষাপ্রণালীও সেইভাবে গঠিত করিয়াছি। সুখ, স্বচ্ছন্দতা ও বিলাসিতার প্রতি অধিক পরিমাণে আমাদিগের চিত্ত আকৃষ্ট হইতেছে। আমি এমন কথা বলি না যে, প্রাচীনদিগের আদৌ এ বিষয়ে দৃষ্টি ছিল না, ও তাঁহারা এ বিষয়ে মনোযোগ দিতেন না। আত্মোৎকর্ষসাধন ও বীরভাবের

গৌরব তাঁহাদিগের মধ্যে অধিক পরিমাণে ছিল। যে উপকরণে ও যে সাধনায় ইহার প্রাপ্তি হইত, সেইরূপ শিক্ষা তাঁহাদিগের নিকট আদরণীয় ছিল। অধুনা মধুর ভাবই (Amiability) সভ্যতার বিশেষ লক্ষণ। ইহা অনেক স্থানে শুভপ্রদ হইয়াছে। সার্ব্বজনীন ভাবের সমাদর এখনকার ন্যায় পূর্ব্বে ছিল কি না তাহা আমি জানি না। সর্ব্বসাধারণের মধ্যে বাণিজ্যও শিল্পের এতঅধিক আদরও প্রচলন তখন বোধ ছিল না। তৎকালে সুখ অপেক্ষা ন্যায়ানুমোদিত কার্য্যের অধিক অনুষ্ঠান হইত। প্রাচীন বীরচরিত কাহিনীতে হৃদয় উদ্বেলিত হইয়া উঠে, ভক্তিরসে আমাদিগের মন আপ্লুত হইয়া থাকে এবং এরূপ দেবোপম ব্যক্তি মনুষ্যশরীর ধারণ করিয়াছিল,এইবলিয়া স্পর্দ্ধা করিয়া থাকি। অধুনা যুদ্ধাদির কারণ অন্যরূপ হইয়াছে। নানা জাতির একত্র মিলন ও সংঘর্ষণ সূত্রে মানসিক গতির অভাবনীয় বিপ্লব ঘটিয়াছে, মনের কি প্রসার হইয়াছে। ফলতঃ মনুষ্যজীবনে এক অভূতপূর্ব্ব বিপ্লব চলিতেছে। ইহার ফল নানা প্রকার। সকলগুলির আলোচনা এস্থলে অসম্ভব। মনুষ্যজীবন এক্ষণে আর কোন বিশেষ সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মনীতি অনুসারে পরিচালিত হয়-না। নীতিপ্রণালীকে এক্ষণে ধর্ম্মশাস্ত্র হইতে পৃথক ও প্রভিন্ন করা হইয়াছে বিচারপ্রণালী ধর্ম্মশাস্ত্রের উপর সকল সময়ে নির্ভর করে না।

আমি পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি যে, মধুর ভাবই বর্ত্তমান সভ্যতার লক্ষণ। এই মধুর ভাবের উদ্দীপনে সুফলও প্রসূত হইয়াছে; আবার কুফলও প্রসূত হইয়াছে। ইহার অতিমাত্রায় তিক্ত দ্রব্যসমূহ যেন শর্করায় পরিলেপিত হইয়া ব্যবহার্য্য হইবার উপযোগী হইতেছে। বাহ্য চাকচিক্য ধারণপূর্ব্বক মনোমুগ্ধকর ভূষণে ভূষিত হইয়া কুৎসিত দ্রব্যসকল জনসমাজে আদরণীয় হইতেছে। অন্তর যতই কলুষিত হউক না কেন, বাহিরে মিষ্টভাব অবলম্বন করিলেই এ জীবনে আমাদের কর্ত্তব্য কার্য্য সম্পন্ন করা হয়। অধুনা জনসমাজে কপটতার প্রসার অতি মাত্রায় চলিতেছে। গোল্ডস্মিথ্ "পৃথিবীর জনৈক অধিবাসী" নামক (Citizen of the World) প্রবন্ধে অতি সুন্দরভাবে ইহা বর্ণন করিয়াছেন। জার্ম্মান কবি ও চিন্তাশীল গেটের "মানব জীবনের সমস্যা" (Maxims of life) পুস্তকে যে মতবাদ ও নীতিপ্রণালীর প্রচলন ও সমাদর হইতেছে, তাহা তিনি ব্যাখ্যাত করিয়াছেন। উহাতে অনেক সময়ে উঁহাদিগের ধর্ম্মনীতির বিরুদ্ধ মত দেখা যায়। আর্য্যহিন্দুগণ আত্মহত্যা দূষণীয় ও গুরুতর পাপকার্য্য বলিয়া পরিগণিত করিয়াছেন।

চতুর্দ্দশ বর্ষ সম্পূর্ণ